শারদীয় ১৩৯৬

নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

দেশ

এ যুগের নখদর্পণ 'দেশ' পত্রিকা।
এর যে শুধু বিকল্প নেই তাই নয়
তামাম ভারতবর্ষের পত্রিকা জগতেও
এর তুলনা নেই।

ধ্রুপদী ঐতিহ্যে নিষ্ঠাশীল হয়েও নতুন দিনের দিশারি
'দেশ' মানেই দশ দিগন্ত
'দেশ' মানেই অবিশ্ব স্বদেশের কথাচিত্র,
নির্ভীক স্পষ্টভাষী নিরপেক্ষ
জনমানসের মুখপাত্র।
আপনার পরিবারের অপরিহার্য
এই বহুব্যয়সাধ্য প্রকাশনার নেপথ্যে আছে
এক সুদক্ষ শিল্পী সাংবাদিক ও কলাকুশলী কাহিনীর
সজাগ তৎপরতা।
এতে পাবেন সেরা লেখকলেখিকার
শ্রেষ্ঠ রচনার পাশাপাশি নতুন
প্রতিভার সাক্ষাৎ।
সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতির পাশাপাশি
পরিবর্তমান দুনিয়ার হালচাল, রাজনীতির কূট প্রশ্ন।
সতর্ক সন্ধানী পাঠক সমাজের মুক্তচিন্তায় উজ্জ্বল
বিচিত্র স্বাদের চিঠিপত্র।
মননশীল নিবন্ধের পাশাপাশি
বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী।

এখন হাত বাড়ালেই 'দেশ'। 'দেশ' আপনার জন্য, আপনি 'দেশ'-এর জন্য।

উৎসবের দিনে আপ্যায়নে
অপরিহার্য অভিনব মিষ্টান্ন

অমৃতকুম্ভ

নিটোল এ সন্দেশ
পেলব অমৃতে ভরপুর

কে. সি. দাশ প্রাঃ লিঃ

ব্যাঙ্গালোর
৩, সেন্ট মার্কস রোড
ফোন : ৫৭৫০০৩

কলিকাতা
১১, এসপ্লানেড ইস্ট
ফোন : ২৮৫৯২০

ONLINE/KCD

A

চিরন্তন ঐতিহ্য
বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প

দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের মিলনের অপর নাম
বাংলার হস্তশিল্প নিপুণ কারিগরের
হাতের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন রুচিসম্মত
শিল্পবস্তু। রয়েছে মনের মত নানান্
নকশায় তাঁতের শাড়ি, পুরুষ এবং
মহিলাদের পোশাকের কাপড়, বেডকভার,
বেডশীট, পর্দার কাপড়, চামড়া ও কাপড়ের
ব্যাগ এবং ঘর সাজানোর জন্য অনেক উপকরণ।

প্রতিবছরের মত এবারও পূজার কেনাকাটার
তালিকায় বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীকে
শীর্ষে রাখুন।

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প : শিল্পীর গৌরব
ক্রেতার রুচির পরিচয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ./৩৮২১/৮৯ ৮. ৯. ৮৯

পশ্চিম বঙ্গের এই গৌরবময় মানচিত্রের কোনোখানে আছে একটি ছোট্ট বিন্দু— যার নাম বিজলী গ্রীল।

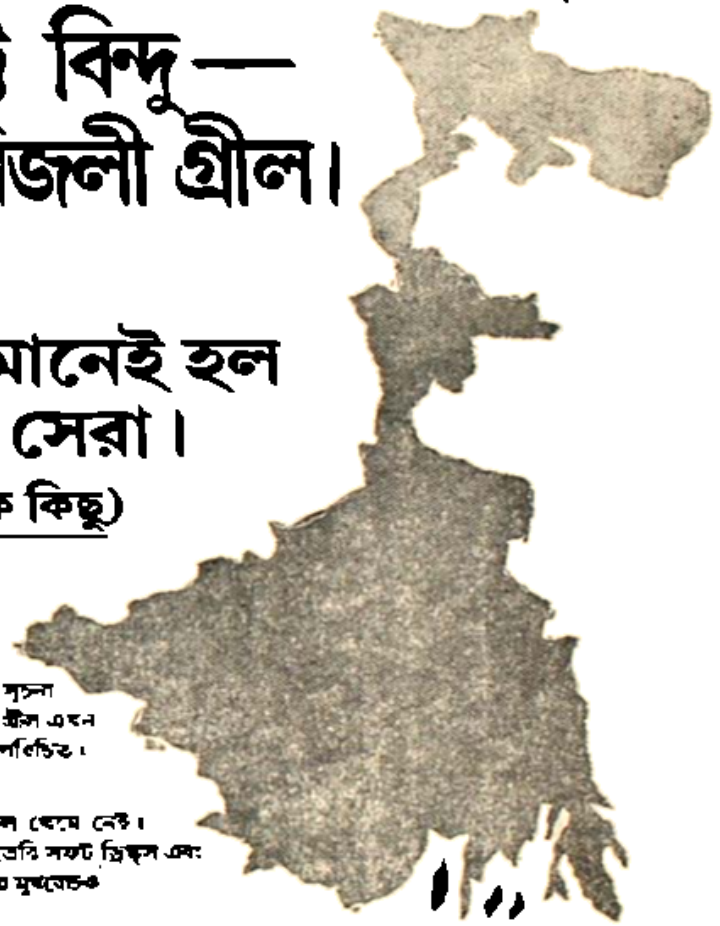

এই নামের মানেই হল কেটারিং-এ সেরা।

(এবং আরও অনেক কিছু)

চুয়াল্লিশ বছর আগে এক নামমাত্র সূচনা থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসে বিজলী গ্রীল এখন কলকাতার সেরা কেটারার হিসাবে পরিচিত। তার একমাত্র সেবার পুরস্কার।

কিন্তু শুধু কেটারিং-এই বিজলী গ্রীল থেমে নেই। আজ তার আছে উৎকৃষ্ট মানের তৈরি সফট ড্রিঙ্কস এবং আইসক্রিম মেশে ভরপুর। দুটিই পরিবার আর মুখরোচক একেবারে ঘরে

ধন্যবাদ বিজলী গ্রীলের গুণগ্রাহীদের— পশ্চিম বঙ্গ ও কলকাতার মানুষদের।

Bijli Grill

১৪, এলগিন মুখার্জী রোড
কলিকাতা- ৭০০ ০২০
ফোন: ৪৮ ৩৪৯১, ৪৮ ১৪৯৭, ৪৮ ১৪৯৮
(আলিপুর টেলিফোন এক্স ১৩৯)

With best compliments from

SHYAM TRADING CO.

10 Clive Row (2nd Floor, Room No. 7)
Calcutta 700 001

Phone { Off. : 25 3308
,, : 25-8115
Res. : 39-0761

Dealings in

Leather Hand Gloves, Electrodes, Welding Holders, Soldering, Brazing, Safety Equipments, Welding Materials, Tools and Grinding Wheels.

With compliments of

Anand Hardwares & Tools Co.

Authorised Distributors of :

M/s. Carborundum Universal Ltd.
M/s. Grindwell Norton Ltd.
M/s. S. S. Miranda Ltd.

11 Clive Row (Shop No. 10, Ground Fl.)
Calcutta 700 001
Gram : ANAND CARBO

Phone { Show 27-5449
Room 26-7792
Resi. 25-0719

WITH COMPLIMENTS OF

I.T.C. LIMITED

With compliments
from

GILCON PROJECT SERVICES LIMITED

19 Ballygunge Circular Road
Calcutta 700 019

With compliments
from

PARAMOUNT ENTERPRISE

Paper Merchants

57 RADHA BAZAR STREET, 1st FLOOR
CALCUTTA 700 001
Phone 27-6542 / 26-7073

সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে

টাটা ষ্টীল

With compliments of

Hindustan Motors Ltd.

Manufacturers of :

Hindustan Ambassador and Contessa Classic 1.8 GL ☐ Hindustan Trekker, Porter and Driveaway Chassis ☐ Hindustan-Isuzu Trucks and Passenger Coach ☐ Hydraulic Excavators and Electric Overhead Travelling Cranes ☐ Dumpers, Front End Loaders, Crawler Tractors and Scrapers ☐ Engines and Transmissions ☐

Registered Office :

/1 R N Mukherjee Road
Calcutta 700 001

Factories :

Hindmotor (West Bengal)
Trivellore and Hosur (Tamil Nadu)
Pithampur (Madhya Pradesh)
Halol (Gujrat)

Recent Publications

B. R. NANDA
Gandhi—Pan-Islamism, Imperialism and Nationalism Rs 250

C. B. LEVENSON
The Dalai Lama
A Biography Rs 250

RANAJIT GUHA
Subaltern Studies VI
Writings on South Asian History and Society 200

W. CROOKE
A Glossary of North Indian Peasant Life Rs 250

JAWAHARLAL NEHRU
A Bunch of Old Letters
Written mostly to Jawaharlal Nehru and some written by him Rs 160

RAMCHANDRA GUHA
The Unquiet Woods
Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya Rs 175

DIPESH CHAKRABARTY
Rethinking Working-Class History
Bengal 1890-1940 Rs 225

J. KRISHNAMURTY
Women in Colonial India
Essays on Survival, Work and the State Rs 190

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

With Best Compliments
From

MAYO CLINIC
Nursing Home

2 Old Mayor's Court
Calcutta 700 005
[Near 55 Tel. Exchange]
Phone : 55-7694

WITH COMPLIMENTS FROM

LAKSHMIBILAS

AURVEDIC HAIR OIL & TOOTH POWDER

Puja Greetings
from

Thoughtshop

Dedicated to Public Service Communications

16 R N Mukherjee Road
Calcutta 700 001
Phone 28-52-3 / 74

New Books from Subarnarekha

Suniti Kumar Ghosh
India and The Raj 1919–1947
Glory, Shame and Bondage
P.B. Rs. 70.00 H.B. 200.00

Edited by Tarasankar Banerjee
Changing Land System
Tribals of Eastern India
Rs. 100.00

R. Mukherjee
Finance Capital and Crisis
Rs. 125.00

SUBARNAREKHA
73 Mahatma Gandhi Road Calcutta 700009

With best compliments from

J. N. SHARMA
of

SHARMA TRAVELS

Operators of Luxury Buses and School Transports
Tour Conductors and Commission Agents.

14 Ultadanga Road : Calcutta 700 004
Telephone : 543731

With Best Compliments

Bata

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন, যদি :—

আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকার কম)।

অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য প্রশংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। কলকাতার জন্য যোগাযোগ করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। ঠিকানা—নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভবন, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০১।

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার-বিভাগ), মহাকরণ, কলিকাতা ৭০০ ০০১ —এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে পারেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে। 'লোক আদালতের' তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। —তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নানাস্বাদ ভ্রমণের বই, আনন্দের বই

অতুলচন্দ্র গুপ্তের
নদীপথে ৮.০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
ভ্রমণে নয়, ভুবনে ২০.০০

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
আলোছায়ার পথে ১৬.০০
মুক্তিনাথ ১২.০০

কৃষ্ণা বসুর
চরণরেখা তব ২৫.০০

ধ্রুব মজুমদারের
সহসা হিমালয় ১৫.০০

নবনীতা দেবসেনের
ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে ১৮.০০

নীরদ মজুমদারের
পুনশ্চ পারী ৫০.০০

বনী মজুমদারের
হিংস্র নরমুণ্ড শিকারীদের দেশে ২৫.০০

মৈত্রেয়ী দেবীর
অচেনা চীন ১৮.০০

রানী চন্দের
পথে ঘাটে ২৫.০০

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ২০.০০

শ্যামসুন্দর বসুর
ত্রিকৈলাস ও মানস সরোবর ২৫.০০

সুদীপ্তা সেনগুপ্তের
আন্টার্কটিকা ৫০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাশিয়া ভ্রমণ ২০.০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
এখন এখানে ১২.০০

সমরজিৎ কয়ের
দুই দেশ শক্তি ও মানুষ ২০.০০
মানুষ পাথর ২০.০০

নীললোহিতের
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী ৩০.০০

ও
সম্পূর্ণ
পুস্তক তালিকার জন্য
লিখুন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা ৭০০০০৯

আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এই প্রবণতা রুখতে পারে সুসম আঞ্চলিক বিকাশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে, ঘামে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবলমাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর...

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৩৮৯১/৮৯ তাং ৮।১।৮৯

১৯৮৯-এর বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
নলী ভৌমিক
ধুলোমাটি
৩৫·০০

এই লেখকের অনন্য একটি গল্প-সংকলন
ধানকানা
১৫·০০

১৯৮৬-র বঙ্কিম পুরস্কার ও অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
অমিয়ভূষণ মজুমদার
রাজনগর
৪০·০০

এই লেখকের অপর দু'টি বিখ্যাত উপন্যাস
গড় শ্রীখণ্ড ৬০·০০ **নয়নতারা** ৩০·০০

একালের শক্তিমান লেখকের অসামান্য উপন্যাস
অসীম রায়
দ্বিতীয় জন্ম
১৬·০০

শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য-সম্পাদিত
সতীনাথ গ্রন্থাবলী
১ম খণ্ড ১০·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কবিতার ক্লাস ২০·০০

শঙ্খ ঘোষ
ছন্দের বারান্দা ২০·০০

বিনয় ঘোষ
বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ২৫·০০

সত্যজিৎ চৌধুরী
নন্দলাল (সচিত্র) ১০·০০

অরুণকুমার সিকদার
আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় ৩০·০০
আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস ৫০·০০

অরুণা প্রকাশনী : ৭ ঘুগলকিশোর দাস লেন কলকাতা ৬

সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

- প্রসঙ্গ বাংলাভাষা ১০.০০
- সুকুমার লীলা মজুমদার ১৪.০০
- সুকুমার পরিক্রমা পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০.০০
- কলকাতা তিন শতক : কৃষ্ণ ধর ১২.০০
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজিতকুমার দত্ত ২.০০
- প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ ৪৫.০০
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ ৫০.০০
- আকাদেমি পত্রিকা ১ অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০.০০
- আকাদেমি পত্রিকা ২ অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০

২। কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট হল কাউন্টার
৭ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৩। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৪। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৫। দে বুক স্টোর, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৩৮৯১/৮৯ ভাং ৮।৯।৮৯

It's PUJA. It's Time to Look your Best...

Puja days are days when you'd like to look your best. And we're here to give you the ease and care free mood you now need to make your days festive and bright. Just for the joy of getting dressed, start with **RAJU'S** undergarments. Let your Puja days be glorious with the magic touch of **RAJU**

A king in the world of Vests, Brief and Socks

RAJU ®

GREETINGS FROM

EVEREST GROUP OF INDUSTRIES

IN TEA, CHEMICALS, ENGINEERING

1 AUCKLAND PLACE
CALCUTTA 700 017, INDIA
Telephones 44-7997 / 3635
Telex : 021-8175 MIMI IN
Cable : GOOPTUINT

WITH THE COMPLIMENTS OF

Lalchand Roy & Company Private Limited

7 & 7/1 GRANT LANE
CALCUTTA 700 012
Phones : 26-7623, 26-5509, 26-1285 & 26-5232

With best compliments from

Metal Engineering & Treatment Co.

235/2 B. B. Ganguly Street
Calcutta 700 012

With best compliments from

Bhagatpur Tea Company Limited

Regd. Office
5 Pannalal Banerjee Lane, 6th Floor
Calcutta 700 001

Gram : GRASPORT
Telex : 7396 FIBR

Telephone
28-5883
28-8136

Manufacturers & Exporters of Quality Teas

Gardens
BHOGOTPORE & GRASSMORE TEA ESTATES
P. O. Nagrakata Dist Jalpaiguri
West Bengal

WITH BEST COMPLIMENTS
FROM

West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited

A Govt. of West Bengal Undertaking

225E ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD
C A L C U T T A 7 0 0 0 2 0

TELEPHONES :
44-2645, 43-1981, 43-1915, 44-0223, 44-0282

With compliments of

MAGNATE CONSTRUCTION CO.

Engineers & Contractor

85 Upper Chelidangal (Goai Road)

Asansol

Head Office : 11 Kabitirtha Sarani, Flat No. 5

Calcutta 700 023

Government Contractor

Specialist in : Civil, Heavy Earthmover, Refractory & Acid Proof Brick Lining, Insulation (Hot & Cold) Water Proofing Works. Etc.

Telephone : Asansol 3107, Calcutta 491404

With best compliments from

BEARDSELL LTD.

(Formerly Mettur Beardsell Ltd.)

A-3 Gillander House

8 N. S. Road, Calcutta 700 001

Regd. Office : 47 Graemes Road

Madras 600 006

Branches : Bombay - Delhi - Madras - Bangalore

Hyderabad - Cochin - Coimbatore - Vizag.

Rupa publications :

The Art of
Rabindranath Tagore
By Andrew Robinson
Foreword by Satyajit Ray
Rs. 750

Kashmir
With Tourist Index of Jammu
Kashmir Valley and Ladakh
If There is Paradise
on Earth it is in Kashmir
By Francis Brunel
Foreword by Dr. Karan Singh
112 Coloured Illustrations.
Rs. 395

Nepal : Moments of Life
Over 140 coloured pictures.
These "moments of life" are in a way, the soul
of Nepal, the home of God, a source of serenity.
"A great place to go for a week or a
lifetime or a couple of lifetimes". —An Oldman,
Rs. 395

Valmiki
Ramayana
This is the faithful translation of the original
complete Sanskrit text by Makhanlal Sen.
Hard Cover Rs. 150 Paperback Rs. 95

Timeless Shepherd
A Novel By
Chittaranjan Maity
Rs. 30

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Also at—Allahabad ☐ Bombay ☐ Delhi.

অকাদেমির বই

রক্তবন্যা
ইন্দিরা পার্থসারথি [অনুবাদ : সুব্রমণিয়ন্ কৃষ্ণমূর্তি]

ইয়ারুইঙ্গম
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য [অনুবাদ সুকুমার বিশ্বাস]

রসুম ছাঁচের রোবট
কারেল চাপেক [অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক]

ইয়োনা
মারিন সোরেস্কু [অনুবাদ : অমিতা বসু]

বঙ্গীয় শব্দকোষ
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত দুই খণ্ডে ২০০.০০

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১
রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা ৭০০০২৯ (৪৬-১৩৯৯)

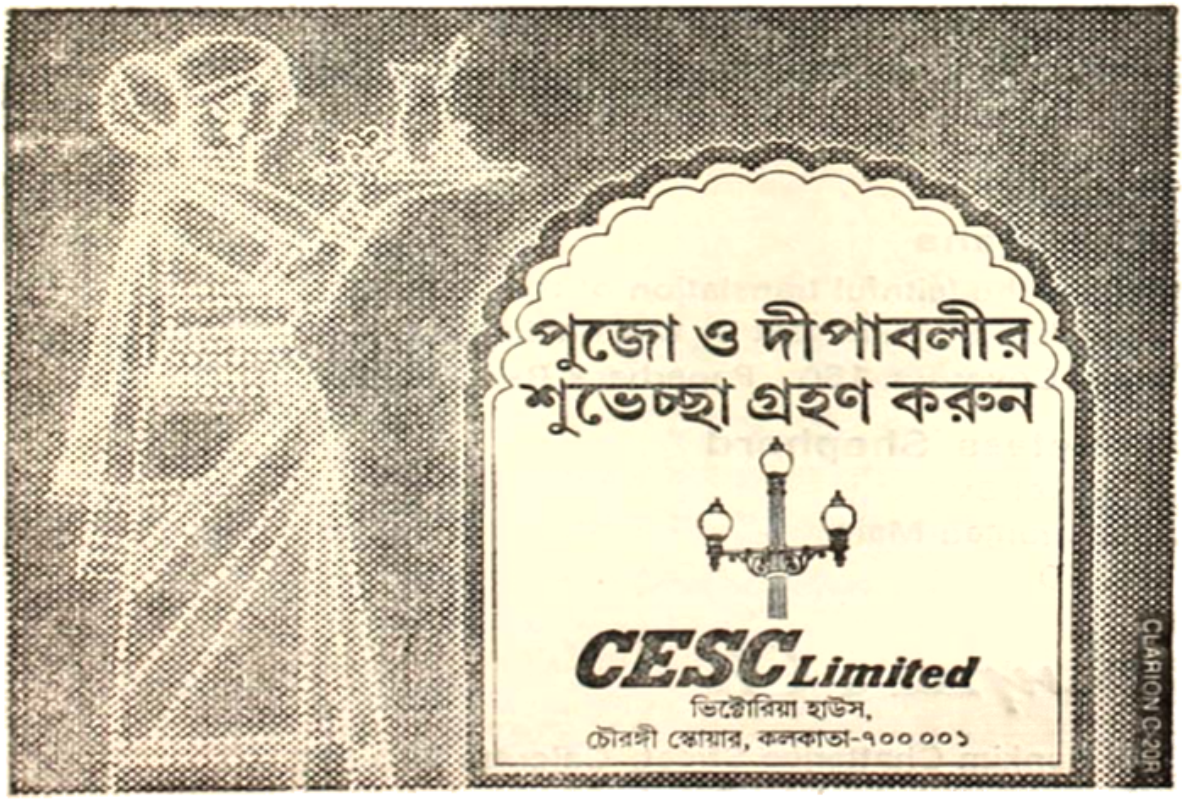

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় আমাদের চর্চা যত বাড়ছে, ততই নানান বিদেশী নাম আমাদের আলোচনায় এসে পড়ছে। কিন্তু বিদেশী নামের উচ্চারণ না জানা থাকলে বাংলাতেই বা আমরা কীভাবে সেইসব নাম লিখব? বিদেশী নামের উচ্চারণ না জানলে লেখায় বিপর্যয় হতে বাধ্য। বিদেশী সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক তো আছেনই, উপরন্তু আছে পাহাড়-পর্বত, নদী, শহর, উপসাগর, প্রভৃতি ভৌগোলিক নাম।

সুভাষ ভট্টাচার্যর

বিদেশী নামের উচ্চারণ (১ম খণ্ড)

বইটিতে লাতিন, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ও পর্তুগিজ এই পাঁচটি বিদেশী ভাষার প্রায় দু-হাজার নামের উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সেই পাঁচটি ভাষার উচ্চারণের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দাম ২৫ টাকা।

সুভাষ ভট্টাচার্যর আরো একটি বই—
১৯৮৪-র আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত

আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান

পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত ২য় সংস্করণের দাম ৫০ টাকা।

● ● ● ● ●

উত্তর ভারতীয় দশ থাটের অন্তর্ভুক্ত রাগসমূহ এবং দক্ষিণ ভারতীয় থাটের কয়েকটি রাগসহ শাস্ত্রোক্ত প্রচলিত অপ্রচলিত, কর্ণাটক, মধ্যকালীন সঙ্গীত শিল্পীদের রচিত এবং আধুনিক রাগগুলির পূর্ণ পরিচয়, মুখ্যাঙ্গ, সংক্ষিপ্ত স্বর-বিস্তার, তাল, সংকেত, সম-প্রকৃতির রাগগুলির পার্থক্য নির্ণয় এবং রাগের রূপায়ণে মতান্তরের উল্লেখসহ আলোচনা—

পবিত্র দাশগুপ্তর

রাগের ক্রিয়াত্মক রূপায়ণ

দাম ৩০ টাকা।

ডি. এম লাইব্রেরী / ৪২ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

'এক্ষণ'-এর সুধী পাঠকদের জন্যে দে'জ-এর নিবেদন

মনীষী কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত
সঞ্জীবনী ১৫·০০
ভূমিকা কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ রায়
দেবগণের মর্ত্যে আগমন ৬০·০০
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র
যোগীন্দ্রনাথ বসু
মাইকেল মধুসূদন দত্তের
জীবন-চরিত ৪০·০০
ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী
১ম ১৫·০০ । ২য় ও ৩য়
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বোম্বাই রায়ৎ
সম্পাদক : নেপাল মজুমদার
দেবেন্দ্রনাথ সেন
কাব্য চয়নিকা
সমর সেন
বাবু বৃত্তান্ত
অশোক মিত্র
প্রতিদিনের কথা
অচেনাকে চিনে চিনে
সংকটের স্বরূপ
হীরেন মাস্তাল
প্রাত্যহিক প্রসঙ্গ
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
বাংলা বানান
প্রবাল দাশগুপ্ত
কথার ক্রিয়াকর্ম
শিশিরকুমার দাস
গদ্য ও পদ্যের ছন্দ ১২·০০
কবিতার মিল ও অমিল ১৫·০০
সজনীকান্ত দাস
বাংলা গদ্য সাহিত্যের
ইতিহাস

চিঠি লিখলে বিস্তৃত পুস্তক-তালিকা পাঠানো হয়।

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

এক্ষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
অষ্টাদশ বর্ষ ॥ ৫-৬ সংখ্যা : শারদীয় ১৪৯৬ ॥ সূচিপত্র

P2930

স্মৃতিকথা
স্মৃতির পাতা ॥ সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন
আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত ১
কফি হাউস : কাউন্টারের ওপার থেকে ॥ সুচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
চা-বাগিচার কড়চা [সচিত্র] ॥ সোমনাথ ঘোষ ২৪৫

চাষের কথা
চাষীর মেয়ে ॥ মীরা চৌধুরী ৫৩

প্রবন্ধ
মনী ভৌমিক : গল্প-উপন্যাসে আধুনিকতা ॥ তাতিক লাহিড়ী ৬৫
মিশেল ফুকো বা 'মানুষে'র অন্তর্ধান ॥ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫
বাংলা চলচ্চিত্রের পট [সচিত্র] ॥ সুবীর চক্রবর্তী ১৪৪
ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক শিল্পী
(১৯৪২-১৯৪৮) ॥ মালিনী ভট্টাচার্য ১৬১
দাগের ভাষা [সচিত্র] ॥ ত্রিলোকেশ মুখোপাধ্যায়

পুনর্মুদ্রণ
পতিতোদ্ধার ॥ শ্রী প্রকৃত মুদগর বাবাজি
দেবাশিস বসু-সম্পাদিত ১৭৯

পরিভাষা-পরিচয়
মনস্তত্ত্ব মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞান ॥ বাসবদত্তা দেব
এপিক থিয়েটার ॥ দত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৩

পরিপূরণ
'ছবি তোলা'র পরিপূরণ প্রসঙ্গে ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ২২২
'রসাপাগলা উন্মাদাগার' প্রসঙ্গে ॥ উৎপল মিত্র ২২৭

চিত্রমাট্য
জলসাঘর ॥ সত্যজিৎ রায় ২৩৫
পরিচালকের কথা ॥ সত্যজিৎ রায় ৩১১
জলসাঘর প্রসঙ্গ ॥ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৩১৩
জলসাঘর : চলচ্চিত্রোপযোগী রূপান্তর ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৭
ছবি বিশ্বাস প্রসঙ্গে ॥ সত্যজিৎ রায় ৩৫৯

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

এক্ষণ পত্রিকার কথা

শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬ প্রকাশিত হল। এই সংখ্যাটির সঙ্গেই পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

নতুন কবিতা ও গল্প প্রকাশ স্থগিত থাকলেও বর্তমান সংখ্যায় জোর পড়েছে স্মৃতিকথার উপর। এর মধ্যে আছে শিল্পী সোমনাথ হোর-এর পূর্বে অপ্রকাশিত স্মৃতিচিত্র 'চা-বাগিচার কড়চা'। এই লেখার মধ্যে সংযোজিত হয়েছে শিল্পীর তৎকালীন দশখানি স্কেচ।

ছবির উপর কিছুটা জোর রাখার প্রয়াসে ত্রিলোকেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'দাগের ভাষা'-তেও বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ছবি ও নক্‌শা মুদ্রিত হয়েছে। সুধীর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'বাংলা চলচ্চিত্রের শট' রচনাটিও সচিত্র। মিশেল ফুকো-র উপর অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের মধ্যে আছে দু'টি নক্‌শা। এ ছাড়া জলসাঘর চিত্রনাট্যের সঙ্গে তিনখানি ফোটোগ্রাফ আর্ট প্লেটে মুদ্রিত হয়েছে। এই সমস্ত শিল্পকর্মকে সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব সানন্দে পালন করেছেন শিল্পী প্রবীর সেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আর যাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁদের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে এ-সংখ্যার প্রস্তুতিতে নানাভাবে যাঁদের সহায়তা পেয়েছি তাঁরা : রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বিমান সিংহ সুচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাশিস মুখোপাধ্যায় অশোক উপাধ্যায় বিনয়ভূষণ রায় রঞ্জনকুমার দাস অরুণ রুদ্র অজয় দে সুধীর চক্রবর্তী ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সুযোগে তাঁদের ও পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

মুদ্রণে সহায়তা জে. ডি. প্রেস / সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রা লি.।

বাঁধাই গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স / ৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৯

আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত

সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন

স্মৃতির পাতা

টিক টিক ক'রে ঘড়ির কাঁটার মতো কালের স্রোত এগিয়ে চলেছে। অনেক অনেক বছর ধরে পৃথিবী ঘুরছে, ঘোরার আর বিরাম নেই। আহ্নিক গতির পরে বার্ষিক গতি। যুগের পর যুগ এগিয়ে চলেছে, জীবদেহে জীবন-শক্তি ধুকধুক ক'রে ঘড়ির তালে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে মানুষের মন, জীবন ধারা, কাজের ধারা। এক মানুষ শেষ হচ্ছে, যাদের রেখে যাচ্ছে তারা আবার কালের চাকা ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই পঞ্চাশের কোঠায় বসে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে ভাবছি কখন ডাক আসবে, কখন এই ভাঙা দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে। শ্রাবণের এই বর্ষণমুখর দিনে কর্মহীন জীবন কত কি এলোমেলো চিন্তায় ভরা।

এমনি এক শ্রাবণ দিনে কোনো এক পল্লীগ্রামে পঞ্চাশ বছর আগে আমার জন্ম। শ্রাবণের ধারা খুব সুন্দর লাগে যদি বাইরে বিশেষ কাজ না থাকে। আমারো কোনো কাজ নেই, তাই শ্রাবণের ধারার দিকে চেয়ে নিজের শৈশবস্মৃতি আর কৈশোরের মধুরিমা মনে জাগছে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে শৈশবের কথা।

ফজরের নামাজ পড়ে যখন তস্‌বি পড়তে বসতেন আমার মা, আমাকে ঘুম থেকে ডেকে দিতেন সেই ভোরে, পুব আকাশে তখন লালের আভা। পাখিরা সব কিচিমিচি ডাকতে শুরু করেছে। আমি উঠে ফুল কুড়াতে যেতাম। বাড়ির উঠানের এক পাশে পাঁচিলের ধারে বিরাট এক শিউলি ফুলের গাছ। পাঁচিলের অপর পাশে মসজিদ। অর্ধেক ফুল পড়ত বাড়ির উঠানে, আর অর্ধেক মসজিদ প্রাঙ্গণে। বাড়ির উঠান ছিল সবুজ ঘাসে ভরা, আর সেই সবুজ ঘাসের উপর সাদা ফুলের লাল বোঁটা যে কি সুন্দর দেখাত, সে কথা আজও আমার মনে পড়ে। আমার শিশুমন মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখত। আবার ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দুঁইচাপা ফুটে থাকত। আমি বসে বসে শিউলি ফুল কুড়িয়ে সাজি ভরতাম। সাজিটা ভরে গেলে মার কাছে নিয়ে যেতাম, মা কিছুটা নিয়ে মালা গাঁথতেন, আবার কিছুটা বোঁটা বেছে শুকুতে দিতেন। আমাকে তখন মুখ হাত ধুয়ে কায়দা বগদাদী পড়তে বসতে হতো, মা-ও কোরান শরীফ পড়তেন। নাস্তার বেলা হলে নাস্তা আসত, খেয়ে মা অনেক বইটই নিয়ে পড়তেন, আমিও ছবির বই নিয়ে পড়তে বসতাম। কোনো সময় পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার খেলার সাথী কেউ ছিল না, কোনো জায়গায় যেতেও পেতাম না। আবার ধুলো মাটি নিয়ে খেলাও মা পছন্দ করতেন না। কাজেই এই পড়া পড়া খেলা ছাড়া আমার আর বিশেষ কিছু কাজ ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন না। আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স তিন বছর চার মাস মাত্র, তবু আমার কিছু কিছু কথা মনে আছে। কি ক'রে জানি না, হয়ত মার কাছে অনবরত শুনে শুনেই হবে।

আমার আব্বা ছিলেন যশোহর জেলার অন্তর্গত কোনো এক গ্রামের জমিদার। আমার মায়েরাও চারজন ছিলেন। আমার মা-ই সকলের ছোট। আমার মা যখন এসেছে, তখন আমার আর আর মায়েরা গত হয়েছেন ছোট ছোট কতগুলি ছেলেমেয়ে রেখে। আমরা ভাই বোন ছিলাম আট দশ জন। আমার আব্বা যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমার ভাইরা কেউ কেউ যশোর টাউনে থেকে স্কুলে পড়তেন, একজন কলকাতায় এম.এ-তে পড়তেন। আমার বড় বোনকে আব্বা মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তার খালাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমি বাড়িতে একাই থাকতাম।

আমার একটা পশ্চিমা খেলাই ছিল, সে আমাকে ভোটা বলে ডাকত। আর কতগুলো চাকরানি মার কাজ করবার জন্য ছিল—তারা বোধ হয় আট দশ জন হবে—তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল, তার মধ্যে আমার বয়সিও কয়েকজন ছিল। কিন্তু তারা আমার সাথে খুব বেশি খেলতে আসত না। তবে প্রায় সামনে সামনেই থাকত—আমার কোনো কাজের দরকার হলে তাড়াতাড়ি করে দেবার জন্য।

রান্নাবাড়ির লোকজন ছিল আলাদা। সরকারি বাবুর্চি, সে যা রান্না করত সে সবার জন্য। তারপরে আমাদের জন্য সুখাদ্য ভালো রান্না আমাদের আশ্রিতা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা যাঁরা থাকতেন তাঁরা করতেন। আমাদের বাড়িটা এত বড় ছিল যে আমি একদিনে হেঁটে কোনো দিন শেষ করতে পারি নি। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পুব কোণে আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিরাট তিনমহলা বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে পাহাড়ের মতো হয়ে, ঘন জঙ্গলে ভরা। আমি অনেকদিন বিকাল বেলা মার সাথে সেইটার উপর বেড়াতে যেতাম। অনেকগুলি কামরার চিহ্ন দেখা যেত। অনেকদিন আগের লোক যারা থাকত তাদের কাছে পুরনো বাড়ির গল্প শুনতাম। সেই বাড়ির সাথে লাগান বড় সিং-দরজা, যেখান দিয়ে হাতি এসে সেখানে দাঁড়াত, সেসব গল্প করত, সেসব জায়গা দেখাত। সিং-দরজার পাশে একটা বড় আটচালা, খড়ের ছাউনি, দেয়াল মেঝে পাকা—সেটা ছিল অতিথিশালা। সেই ভাঙা ত্রি-তল বাড়িটার উপর জঙ্গলের ভেতর আমরা ঘুরে বেড়াতাম। জায়গায় জায়গায় দেয়ালের গায়ে, জানলা দরজার খিলানের উপর, সিমেন্ট বালির সুন্দর সুন্দর কারুকাজের চিহ্ন তখনো ছিল। সে বাড়ির একধারে অতিথিশালা আর একদিকে ছিল গোলাবাড়ি। সেখানে মিছরি শাবু মিহি চাল ইত্যাদি মজুদ থাকত। দরিদ্র প্রজাদের কারো অসুখ হলে সেখান থেকে সাহায্য করা হতো। এ-সব আমার দাদার সময়কার কথা। আমার আব্বাও সে বাড়িতে ছিলেন। প্রথম যখন আমার আব্বা বিয়ে করেন তখন হাতিতে চড়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। তার পরে কবে যেন খুব বড় ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পে সেই বাড়ি পড়ে গেছে, সেই হাতিও মরে গেছে। নানারকম মকর্দমায় পড়ে জমিদারি তখন ভাটার টানে চলেছে।

সেই বাড়ি পড়ে যাবার পরই আমার আব্বা সেই পাঁচিলের ভিতর একতলার ভিত্ করে তিন মায়ের তিনটা বাড়ি তৈয়ার করেছিলেন। আমার মার জন্য আর নতুন কেনো বাড়ির দরকার হয় নি, কারণ আমার মার যখন বিয়ে হয়েছে তখন আমার অন্য মায়েরা বেঁচে ছিলেন না।

পর পর সেই তিনটা মহল পার হবার পর আর একটা বেশ বড় উঠান পার হয়ে তবে বৈঠকখানা বা লাইব্রেরি। বৈঠকখানা ঘরখানা খুব বড় একটা হল ঘর। হল ঘরের মাঝখানে ছোট পায়ার তিনটা সমান তক্তপোষ পাতা থাকত। তার উপর বড় শতরঞ্জি আর সাদা চাদর। আর একধারে ছোট টেবিল, আর একটা চেয়ার। তার পাশেই দেয়ালের গা ঘেঁষে তিনটা বড় বড় আলমারি—বইয়ে ঠাসা। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা—বোধহয় যখন থেকে বাংলা ভাষায় বই ছাপা হয়েছে তখনকার সব বইই আমাদের ছিল। গোলাম মোহাম্মদ নামে একটা পাঞ্জাবি ছেলে বারো চৌদ্দ বছর বয়েসের সময় দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল। আমার আব্বা তাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিলেন, সে আর দেশে ফিরে যায় নি। আমরা তাকে গ ভাই বলে ডাকতাম। সে থাকত ঘরের জিম্মাদার হয়ে। সেলায়ের কল ছিল, সে এই ঘরে বসে বসে বাড়িসুদ্ধ লোকের ছোটখাটো সেলাই করত। এই ঘরের এক পাশের দেয়ালের শেলফে অনেকগুলো অনেক রকমের তলোয়ার সাজান ছিল। বন্দুক ছিল, বাঘের চামড়া, হরিণের শিং এ-সব কত কি ছিল। বৈঠকখানা ঘর থেকে প্রায় দু বিঘা জমি দূরে কাছারি ঘর। এই কাছারি ঘরে আমলা, গোমস্তা, নায়েব, পাইক-পেয়াদারা সব জমিদারি সংক্রান্ত কাজ কর্ম করত। কাছারি ঘরের বারান্দায় ছোট কুঠরি ছিল, সেটা ছিল গারদ ঘর। কাউকে শাস্তি দিতে হলে ঐ ঘরে আটক রাখা হতো। বৈঠকখানা আর কাছারি ঘরের মাঝামাঝি যে জায়গা সেখানে ছোট একটু ফুলের বাগান। দুই পাশে দুই বড় বড় পুকুর, শান বাঁধান ঘাট। একটা তো বিরাট দীঘি। তার পরেই আম, কাঁঠাল, নারকেল সুপুরির বাগান। তার পরেই আমাদের বাড়ির চার পাশ দিয়ে ঢালি পাড়া। ঢালি পাড়ার পর বাগদি পাড়া। এই রকম ক'রে গ্রামখানা সাজান। ঢালিরা বোধহয় অনেক আগের দিনে ছিল পুররক্ষক হিসাবে। সরকার থেকে ভাতা পেত তাতেই তাদের চলত। কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন তারা চাষ করে খেত। তবু প্রত্যেকের ঘরে ঢাল তো ছিলই, তলোয়ারের বদলে লাঠি-সড়কিও ছিল। পুরুষানুক্রমে তাদের ছেলেদের ঢালি খেলা লাঠি খেলা শিখিয়েছে। বছরে দু বার তারা আমাদের সেই লাঠি খেলা দেখাত—'পুণ্যে'র দিন আর মহরমের দিন।

পুণ্যের দিন আমাদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্মরণীয় দিন ছিল। সেদিন জমিদারি সেরেস্তার বাকি-বকেয়া খাজনা সব আদায় করা হতো। পুরান খাতা বদলিয়ে নূতন খাতা করা হতো। সেদিন ভোরে উঠে যত ফুলপাতা যোগাড় ক'রে কাছারি ঘর সাজান হতো। ঝুড়ি ভরে পদ্মফুল আসত। আমাদের

অনেক দাঘিতেও কত পদ্মফুল ছিল, সে সব তোলা হতো। আমি কিন্তু কোনো দিন কাছারি ঘরে যেতে পেতাম না। আমাকে 'পরদা' করা হতো খুব ছোট থেকে। বৈঠকখানা ঘর থেকে অল্প অল্প দেখা যেত, তাই দেখতাম।

বাজনা আসত ঢোল, শানাই, কাঁসি, বাঁশি সব। আমার আব্বা মারা যাবার পর আমার বড় ভাই-ই সেদিন সকাল থেকে কাছারি ঘরে বসতেন। খাতাপত্র দেখতেন। দলে দলে প্রজারা সালাম করত, টাকা রাখত। বড় বড় কাঁসার থালা রাখা থাকত টাকার জন্যে। টাকা আলাদা, খুচরো পয়সা আলাদা, আবার নোট আলাদা রাখা হতো। সারাদিন বাজনা হতো আর আমাদের ছোটাছুটির অন্ত ছিল না। দু'টো খাসি জবাই করা হতো, পুকুর থেকে বড় বড় মাছ তোলা হতো, বাগান থেকে ঝুড়ি ভরে তরকারি আসত। সেদিন আর বাবুর্চি রেঁধে পারত না, পাড়া থেকেও লোক ডাকা হতো রান্না করতে। ঢালি পাড়ার মেয়েদের যে কোনো কাজে যখন খুশি ডাকলে তারা খুশি হয়ে করে দিয়ে যেত। তারাও আসত আর আমাদের বাড়িতে কাজের লোক যারা ছিল সবাই মিলে তাড়াতাড়ি করে রান্না শেষ করত। সেদিন নায়েব গোমস্তা পেয়াদা শাইক কর্মচারিরা কেউ ছুটি পেত না, সারাদিন বাড়ি যেতে পেত না, সুতরাং তারা সবাই খেত। দূর গ্রাম থেকে কোনো প্রজা এলে তারাও খেত। যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হতো ততক্ষণ রাঁধা চলত। রাঁধা খাওয়া শেষ ক'রে জোহরের নামাজ পড়া হতো। নামাজ হলে তবে ঢালি খেলা শুরু করা হতো। কোনো কোনো সময় যশোর টাউন থেকে ব্যাণ্ড পার্টি আনা হতো, তারাও ঢালি খেলার সাথে সাথে বাজাতো। সাজ পোশাক ক'রে মার্চ করত। আমরা সবাই বৈঠকখানা ঘরে যেতাম। মা যেতেন, মার সাথে আত্মীয়রাও যেতেন। বৈঠকখানা ঘরের যে দিক দিয়ে খেলা দেখা যায়, সেই দরজাগুলাতে বড় বড় মাদুর বাঁধা হতো, সেই মাদুর হাত দিয়ে অল্প ফাঁক ক'রে তবে আমরা খেলা দেখতাম। তিন-চার ঘণ্টা খেলা হতো, ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেখান হতো। কুস্তি, আরো দু' এক রকম। তারপরে আসরের আজান হলে খেলা বন্ধ হতো, বাজনা বন্ধ হতো। মগরেবের নামাজের পরই আবার সাঁঝা তোলা, অর্থাৎ যে টাকা পয়সাগুলো উঠত সেসব আলাদা আলাদা থলিতে ক'রে জমা হতো। থলিগুলো বেশ বড় বড়, টাকার আলাদা, আবার খুচরো সিকি দু'আনি পয়সার আলাদা, নোটের আলাদা। এক একটা থলি এক একটা থালার উপর ক'রে বা খাঞ্চার উপর ক'রে চার-পাঁচজন পেয়াদা মাথায় নিত। একজন একটা ঝুড়ি ক'রে খই কড়ি আর পয়সা নিত। বাজনা থাকত, গোমস্তারা সাথে থাকত। আমার ভাইরাও সাথে থাকত। বাজাতে বাজাতে খই, কড়ি আর পয়সা ছিটাতে ছিটাতে কাছারি ঘর থেকে বৈঠকখানা ঘর, তারপরে অন্দর মহলে একেবারে আমার মার শোবার ঘরে এসে তবে থামত। টাকাগুলো আমার ভাই নিজের হাতে লোহার সিন্দুকে রাখতেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় পড়ে যেত খই, কড়ি আর পয়সা কুড়াবার। রাত্রে আবার ঘরের চার পাশে পালা ক'রে জেগে জেগে পাহারা থাকত। সকালে উঠে সেই সব টাকা পয়সা গোনা হতো। লাটের কিস্তি পাঠান হতো। কর্মচারিদের মাইনে বার যা পাওনা মেটান হতো, আর তারপর কি থাকত না থাকত সে আর আমরা জানতাম না। এমনি ক'রে সে দিনটা আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকত।

ধোপা কাপড় কাচত, কখনো আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিত না। বাড়ি সুদ্ধ লোক যত ইচ্ছা কাপড় দিত। আমার ভাইরা কেউ বাড়ি থাকলে, প্রজারা কেউ কেউ কোনো গ্রাম থেকে দেখা করতে আসত। সাথে নজর নিয়ে আসত—টাকা, খাসি বা মুরগি,গুড়, পাটালি যার যা ক্ষমতা তাই নিয়ে আসত। কখনো খালি হাতে আসত না। মাকেও নজর পাঠাত বাড়ির ভিতর। একটা বুড়ি এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সালাম করত। ভক্তি ক'রে পায়ের কাছে টাকা রাখত। আমার ভারি লজ্জা করত, পা ছাড়িয়ে নিতে গেলে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে আসত। বলত মনিব ছোট বড় সব সমান, আপনাদের পায়ের ধুলো নিলে আমাদের পুণ্য।

পাড়ায় কারো বিয়ে হলে, আমাদের বাড়ি আগে নিমন্ত্রণ করত। আমরা মেয়েরা তো কোনো দিন কোনো জায়গায় যেতামই না, ছেলেরাও যেত না। রান্না হলে থামা ভরে দু'থামা ভাত, নূতন মালসা ক'রে দু' চার মালসা খাসির গোস্ত, ঘই, ডাল ইত্যাদি আগে পাঠাত, তার পরে বরযাত্রিদের পাতে ভাত দিত। নূতন বউ এলে আমাদের বাড়ি পাল্কি নামাত। বউ একটা টাকা দিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে সালাম করত, আবার সবাই সে টাকাটা বউকে ফেরত দিত। ছোট একটা বউ, লাল চেলির শাড়ি পরা। কপালে কপার সিঁথে পাটি, নাকে সোনার নোলক। অবস্থাপন্ন ঘরের বউ হলে নাকে সোনার বেসর থাকত। মাথার ঘোমটা অল্প টেনে যাতে সিঁথেপাটি দেখা যায় এমনি ঘোমটা দিয়ে বসে থাকত। সাথে যে সব মেয়েরা থাকত কারো কাপড়ে রং মাখা, কারো কাপড়ে হলুদ মাখা থাকত। কিছুক্ষণ বসে গান টান ক'রে তবে বউ বাড়ি নিয়ে যেত।

গ্রামের প্রজাদের পারিবারিক বা জমি সংক্রান্ত কোনো বিবাদ বাধলে জমিদারি সরকারেই নালিশ হতো। বিচার করতেন জমিদাররাই। অপরাধীর শাস্তি হতো —জরিমানা, বা বেত্রাঘাত—অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। কেউ কারুর ইচ্ছা ক'রে ক্ষতি করলে ছাগল গরু যার যা থাকত বিক্রি ক'রে ক্ষতিপূরণ করা হতো। জমিদারের হুকুম অটল অচল, কারুর সাধ্য ছিল না একচুল এদিক ওদিক করে।

একদিন শুনলাম এক গরিব প্রজা তার মা মরে যাওয়ায় পুরানো কাপড় দিয়ে কাফন দিয়ে মাটি দিয়েছে। তাকে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হল, জরিমানা করা হল। সে বলল, হুজুর টাকা না থাকলে কেমন ক'রে নতুন কাপড় দেব? উত্তর

হল, তোর যেন টাকা নেই—সরকারে টাকা ছিল না ? তারপর থেকে গ্রামে কেউ মারা গেলে সত্যিই গরিব কি না সন্ধান ক'রে দাফন কাফনের টাকা সরকার থেকেই দেওয়া হতো।

প্রজারা খাজনা না দিলে বা দিতে অপারগ হলে কেঁদে কেটে মাফ চাইলে মাফ করা হতো। আবার বিশেষ জায়গায় শাস্তি দেওয়া হতো। গরু বাছুর তৈজসপত্র ক্রোক ক'রে আনা হতো। কেউ মারা গেলে তার যদি কোনো শরিক না থাকে সরকার থেকে তার জমি-জমা, তৈজসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতো। আজকাল জমিদারি উচ্ছেদ করা হয়েছে, এসব কথা আজকালের লোকেরা কেউ জানবে না। তাই আমার খাতার পাতায় কয়েকটি কথা লিখলাম—ভালো ছিল কি মন্দ ছিল, তার বিচারক পাঠক পাঠিকারাই। আজকাল একটা মামলা মকর্দমা করতে হলে কোর্ট ফি আর উকিল মোক্তারের খুশি করতে গরিবদের নিঃস্ব হতে হয়। শুধুই দিন পড়ে, মুলতুবি থাকে, তবু সুবিচার হয় না। অবশ্য খুন জখমের মামলা হাতে নেবার ক্ষমতা সে আমলেও ছিল না, তবে মারপিট ফয়সালা করতে হতো।

অনেক সময় পাড়ার প্রজাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হতো। প্রায়ই স্বামীরা তাদের বউদের মেরে রক্তপাত ক'রে দিত, বউরা তখন আমাদের বাড়িতে আমার মার কাছে চলে আসত। মা তাদের দুই চার দিন রাখতেন, সঠিক বৃত্তান্ত পাড়ার লোক ডেকে খবর নিতেন। সম্ভব হলে বুঝিয়ে টুঝিয়ে আবার তাকে স্বামীর ঘরে পাঠান হতো, না হলে তাদের স্বামীদের ডেকে সব কিছু দু'জনের মোকাবেলায় শুনতেন। স্বামীর অপরাধ বেশি হলে দু'কথা বলা হতো, বুঝান হতো, ভয় দেখান হতো। দু' চারবার কোনো বাড়ির বউ ওরকম বেরিয়ে এলে তাদের জরিমানা করা হতো। তাও না শুধরালে তালাক নেওয়া হতো। তিন মাস পরে অন্য জায়গায় তাদের বিয়ে হতো।

আমাদের বাড়ির অনতিদূরে দীঘির ধারে ছিল এক ঘর চাষী প্রজা। লোকটার নাম ছিল মাদার। তার তিন বউ। বড় বউটা ছিল দেখতে খারাপ, সে সব সময় ঘোমটা দিয়ে থাকত। বাড়িতে কাজ কর্ম করত সে-ই বেশি। একটা দু'টা ছেলেও হয়েছিল তার। মেজ বউ আর ছোট বউ ছিল সুন্দরী। একজনের নাম আলতি, আর একজনের নাম আতসী। এরা কেবল ঝগড়া করত, মাদার এসে তাদের খুব মারত। যার মারটা বেশি হতো, সে এসে আমাদের বাড়ি নালিশ জানাত। আবার সপক্ষে-বিপক্ষে লোক জড়ো হতো। বিচারের পরে আবার তাকে স্বামীর ঘরেই যেতে হতো। একদিন শোনা গেল আতসীকে তার স্বামী চরিত্রের উপর দোষ দিয়ে মেরেছে। মার খেয়ে আমাদের বাড়ি এলে বিচার হল। বিচারে উভয়ের সম্মতিক্রমে তালাক নেওয়া হল। তিন মাস আতসী আমাদের বাড়িতেই থাকল। সতিশ নামে এক নাপিত ছিল। সে দিনে গ্রামে ক্ষৌরকার্য করত, রাতে

তার এক শুঁড়ির দোকান ছিল। সেই নাপিত আতসীকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাল, আতসীও সম্মতি দিল।

তখন সেই নাপিতকে আমাদের বাড়িতে আনা হল। আমাদের বাড়ির মসজিদে এনে গ্রাম থেকে দু'এক জন মৌলবি গোছের লোক ডেকে এনে তাদের দিয়ে সতিশকে মুসলমান করা হল, তার মুসলমান নাম দেওয়া হল সবিতুল্লা খাঁ। সেই মজলিসেই আতসীর বিয়ে হল। বিয়ের পরও সে আমাদের বাড়ি কিছুদিন ছিল। সবিতুল্লা নাপিতের কাজ করা ছেড়ে দিল। শুঁড়ির দোকান বিক্রি ক'রে দিল। মুসলমান পাড়ায় ঘর বেঁধে একটা মুদির দোকান ক'রে তবে আতসীকে নিয়ে গিয়েছিল। শোনা যেত সে সেখানে খুব সুখেই ছিল। আর কখনো আমাদের বাড়িতে আসে নি। সবিতুল্লা নমাজ রোজাও শিখেছিল। মসজিদে আসত নামাজ পড়তে।

আলতিও সে স্বামীর ঘর আর করে নি। কিছুদিন পর সেও এসে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। মাদার তালাক দিয়ে দিয়েছিল, এবং তাকে গ ভাই বিয়ে ক'রে রেখেছিল। অনেক সোনার গয়না তৈয়ার ক'রে দিয়েছিল আর খুব সুখে রেখেছিল তাকে গ ভাই। এই রকম অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলের সাথে বেরিয়ে আসত। তারা সাধারণত বাগদি, নমশূদ্র প্রভৃতি ছোট জাতের মেয়ে। তাদের মসজিদে এনে মুসলমান ক'রে কিছু দোয়া কলমা শিখিয়ে বিয়ে দেওয়া হতো, তাদের হাতের রান্নাও খাওয়া হতো।

আমার বড় আপার যেখানে বিয়ে হয়েছিল, তাদের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি। আমাদের গ্রামথেকে তাদের গ্রাম ক্রোশ তিনেকের ব্যবধান। তারাও জমিদার ছিল। আমার দুলাভাইয়ের মায়েরাও ছিলেন চার-পাঁচজন। দুলাভাইয়ের আব্বা যেখানে প্রথম বিয়ে করেছিলেন, সেই বউয়ের নাম ছিল বদরোন নেছা। বদরোন নেছা বাপের বাড়ি থেকে জমিদারি যৌতুক পেয়েছিলেন। ওনার স্বামীর কোনো সম্পত্তি ছিল না। উশৃঙ্খল মেজাজ স্বভাব খুব খারাপ ছিল। তিনি এই বদরোন নেছার টাকাতেই অনেক মোসাহেব, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিন কাটাতেন। কোনো জায়গায় কোনো কাজে বা বেড়াতে গেলে সুন্দরী মেয়ে দেখলে বিয়ে ক'রে নিয়ে আসতেন। এই রকম বদরোন নেছারা চার সতিনে একসাথে ছিলেন। অনেক চাকর চাকরানি থাকা সত্ত্বেও স্বামীর কাজ বদরোন নেছা নিজের হাতে করতেন। স্বামী-সেবা তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সতিনদের তিনি চুল বেঁধে সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামীর কাছে পাঠাতেন। এ কাজটাও তার স্বামী-সেবার একটা অঙ্গ ছিল। বদরোন নেছা শিক্ষিতা ছিলেন, নিজেই পরদার আড়ালে থেকে নায়েব গোমস্তা দিয়ে তার জমিদারি পরিচালনা করতেন। পরদার আড়ালে থেকে চাকরানি দিয়ে নায়েব গোমস্তাদের সাথে কথা বলতেন। হাদিছ মসলা ভালো রকম জানতেন, অবসর সময় কেতাব পড়ে কাটাতেন। স্বামীর জন্য মুখরোচক তরকারি বা নাস্তা নিজের

হাতেই তৈয়ার করতেন। নিজের হাতে পান সেজে বাটা ভরে রাখতেন। স্বামী বাড়ির ভিতর আসলে তটস্থ হয়ে থাকতেন, কখন কোন কাজের দরকার হয়। চার বিবির মধ্যে কোনো বিবির ছেলেমেয়ে তখনো হয় নি, একদিন হয়েছে কি, চার বিবি থাকা সত্ত্বেও আবার একটা বিয়ে ক'রে বাড়ির ঘাটে নৌকায় বউ রেখে অন্দর মহলে খবর দিতে এসেছিলেন পাল্কি পাঠিয়ে বউ তুলে আনতে। তখন বদরোন নেছা বিনীত-বিনয়ে বলেছিলেন, চারজন বউয়ের বেশি বউ তো শরিয়ত বিরুদ্ধ। হয় আমি তালাক নিয়ে যাই—নচেৎ যে বউটা এসেছে সে তালাক হয়ে যাক, আপনার যাকে খুশি রাখুন, আমার তো বয়স হয়েছে, আমাকেই বাদ দিন। ও নতুন কুমারী মেয়ে একটা এসেছে, ওকেই রাখুন। তখন স্বামী দেখেন বে-পতিক। বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি-বিষয় তো বদরোন নেছার, ওকে বাদ দিলে তো ওর কিছু ক্ষতি হবে না, আমিই বউদের নিয়ে বিপদে পড়ব। অগত্যা নতুন বউকেই নৌকাসমেত ফেরত দেওয়া হল।

এসব গল্প নয়, সত্যি। তবে আমার শোনা গল্প। আমার বড় আপার শাশুড়ি অর্থাৎ বদরোন নেছার ছোট সতিন, তার কাছ থেকে শোনা, আর এসব বোধহয় নব্বই কি একশো বছর আগের ঘটনা।

আমার জন্ম বাংলা ১৩১৬ সালে। আমার জন্মের বহু আগে এসব হয়ে গেছে। বদরোন নেছার স্বামীর যখন পঞ্চাশ বছর বয়েস তখন সাত বছরের মেয়ে বড় আপার শাশুড়ির সাথে বিয়ে হয়েছিল। তিনি তখন স্বামীকে দেখলে ভয়ে থর-হরি কাঁপতেন। বদরোন নেছা তাকে হাতে ধরে মায়ের মতো ক'রে মানুষ করেছেন, নিজের হাতে কাজ-কর্ম শিখিয়েছেন, নামাজ-রোজা কোরানশরীফ পড়তে শিখিয়েছেন, আবার সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামীর কাছে পাঠিয়েছেন। বড় আপার শাশুড়ির যখন ষোল বছর বয়স, তখন পাঁচ মাসের ছেলে পেটে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। কিন্তু তখনো বদরোন নেছা বিবি বেঁচে ছিলেন, কাজেই কোনো অসুবিধা হয় নি। ছেলে হলে ছেলের নাম মাহমুদ রাখা হয়েছিল। এদের কারুর কোনো ছেলেপিলে ছিল না, কাজেই সবেধন নীলমণি মাহমুদ খুব আদরে চারজন মায়ের হাতে বড় হতে লাগল। আদরের চোটে ছেলের লেখাপড়া তো হলই না, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে বড় হওয়ার সাথে সাথে বাবার গুণগুলো খুব শিগগিরই পেয়েছিল। বদরোন নেছা বিবি মারা গেলে মৃত্যু খবর গোপন ক'রে দলিল লেখা হল, মরা মানুষের আঙুলের ছাপ নিয়ে দলিল রেজেস্ট্রি করা হল। সমস্ত সম্পত্তি বিষয়-বাড়ি ঘর মাহমুদ সাহেবের নামে উইল করা হল।

মাহমুদ সাহেব নির্দয় অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। শুনেছি প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের ধরে এনে কাঁটা ফুটিয়ে নুন দিতেন, রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। বিয়েও করেছিলেন চার-পাঁচটা। যেমন সুন্দর ছিলেন তেমন শৌখিন ছিলেন। শিকারেও পটু। তাঁর প্রথম বিয়েটা বেশ একটু

রোমান্টিক। অত সেকালেও আর এত কড়াকড়ি অবরোধের ভিতরেও সম্ভব হয়েছিল। মেয়ে এক গ্রামে ছেলে আর এক গ্রামে। কেউ কাউকে দেখেছিল কিনা জানি না, নাম শুনেই সেই স্পেনের সুর রাজকুমারি জেরোহেদার মতো প্রেমে পড়েছিল। শুধু পত্রবিনিময় চলত। একদিন মামুদ সাহেবের মা জানতে পেরে সেই মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। মেয়ের বাবা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অধিকন্তু তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক ক'রে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠালেন। এরাও তৈয়ারি ছিলেন, ঠিক বিয়ের দিন ছেলেকে নিয়ে মেয়ের লেখা চিঠিগুলো নিয়ে মাহমুদ সাহেবের মা বিয়ের মজলিশে উপস্থিত হলেন। ছেলেকে মজলিশে পাঠিয়ে নিজে অন্দর মহলে পাল্কি নামালেন। বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথির মতো নামলেন, তারপরে এ ঘর সে ঘর বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বলে উঠলেন, কই আমার বৌমা কোথায়, কনেও প্রস্তুত ছিল, আর একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাশুড়ির পায় হাত দিয়ে সালাম ক'রে দাঁড়ালো। কনের পূর্বলিখিত কতগুলো চিঠি মজলিশে পাঠান হল। দেখে শুনে তো আগে যে বর এসেছিল তারা রাগ ক'রে উঠে গেল। অগত্যা মাহমুদ সাহেবকেই বাধ্য হয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে হল। পরে সে বউ ছেলে হতে মারা যায়। তারপরে আর একজনকে বিয়ে করেছিলেন। মাত্র তেরদিনের নতুন বউ ঘরে রেখে আমার বড় বোনের সাথে বিয়ে হল। শেষ কালে ইনি অপুত্রক মারা যান।

আমার আব্বা যখন মারা যান তখন আমার বয়স মাত্র তিন বছর। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে সব কথা। আব্বা রোগশয্যায় বড় একটা বজরা ভাড়া ক'রে আমার মা, আমরা ভাই বোনে মিলে লোকজন সাথে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম আব্বার চিকিৎসার জন্য। একটা একতলা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। আব্বা একটা ঘরে শুয়ে থাকতেন। মা সব সময় কাছে থাকতেন। আমি সামনে সামনে ঘুরে বেড়াতাম, আর বাইরে কেরিওয়ালা আসত পেটিস বিক্রি করতে। প্রত্যেকদিন নিয়মিত সময় আসত। আর আমি আব্বার কাছ থেকে দুটো পয়সা চেয়ে নিয়ে প্রত্যেক দিনই একটা ক'রে পেটিস কিনতাম। পেটিস গুলোতে কোনো কোনো দিন নারকেল থাকত, আবার কোনো দিন থাকত গোস্ত ভরা। আমার বড় ভাই কলকাতাতে তখন এম. এস-সি পড়তেন। আমার পয়সা চাওয়া দেখে বলতেন কখনো কারুর কাছে কোনো কিছু চাইতে নেই, খুব লজ্জার কথা। তিনি মোজাম্মল হকের 'জাতীয় মঙ্গল' নামে একখানা বইয়ের প্রথম কবিতাটা আমাকে শিখিয়েছিলেন। আমি হাত নেড়ে নেড়ে বলে বেড়াতাম :

দাও বলে হাত পেতো না
মরবে মরো দুঃখ কি তায়
একটি প্রাণও কাঁদবে না তায়
অলস বাঁচা বেঁচে থাকায় লাভ হবে কি বল না

দাও বলে হাত পেতো না।
জন্ম তোমার উচ্চ ঘরে
কেবল আপন দোষের তরে···

অত ছোটবেলায়ও কবিতাটা আমার মনে একটা ছাপ রেখেছিল। তাই বড় হয়ে শত দুঃখ ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে চলেও কারুর কাছে কিছু চাইতে পারতাম না। আর্থিক যে কষ্ট আমি পেয়েছি কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে হলে মনে হতো তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি কষ্ট পেলাম। মনে হতো—

চাওয়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে
না খেয়ে পরাণে মরা ভালো তার চেয়ে।

কবে যেন কিসে ক'রে আমরা দেশে ফিরে গিয়েছিলাম, কিছুমাত্র মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, আমার আব্বা খুব বড় একটা পাল্কিতে ক'রে আমাদের বাড়িতে এসে নেবেছিলেন। পাল্কি থেকে সবাই ধরাধরি ক'রে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। আমার জন্য এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনেছিলেন, আমার হাতে হাঁড়িটা দিয়ে বলেছিলেন, আর তো কিছু দেব না, এই আমার শেষ দেওয়া। তার পরে কিছু মনে নেই, শেষ মৃত্যুশয্যার কথা শুধু মনে পড়ে। মা শিয়রের কাছে বসে একটা ক'রে ডালিমের দানা ছাড়িয়ে মুখে দিচ্ছিলেন, খাওয়া হয়ে গেলে আবার বিচিটা হাত দিয়ে বার ক'রে ফেলছিলেন। আব্বা মাকে বললেন, অন্য ঘরে চলে যাও, আমি নায়েব-গোমস্তাদের ডেকেছি। মা আমাকে ডালিমের দানা খাওয়াতে বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন। গোমস্তাদের আসতে যতটুকু দেরি ততক্ষণের মধ্যে আব্বা আমাকে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। বললেন, মা আমি মরে যাচ্ছি, তোমার তো কেউ থাকল না, তোমার তো খুব কষ্ট হবে, কিন্তু তুমি যেন কেঁদ না। তুমি যেন কারুর কাছে কিছু চেও না, তুমি আমার মেয়ে, আমার সম্মান তুমি রাখবে। গোমস্তারা আসলে আমি মার কাছে উঠে গিয়েছিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আব্বা তোমাকে কি বলেছেন? আমি যা শুনেছিলাম সব বললাম। মা বললেন, মনে থাকে যেন তোমার আব্বার মরণকালের অসিহত। নচেৎ তোমার আব্বা মরার পরেও কষ্ট পাবেন। আমি যথাসম্ভব আমার জীবনে তা পালন করার চেষ্টা করেছি। তারপরে আমি কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি বাড়ি সুদ্ধ লোক কাঁদছে। আব্বাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে। তার ঠিক দুই বছর পর আমার মেজো ভাই মারা গেলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে অবসর যাপনের জন্য বাড়ি এসেছিলেন, কি একটা অসুখ হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি মারা যাবার ক'দিন পরই পরীক্ষার খবর বেরুলো ফার্স্ট হয়ে পাশ করেছে। পর পর আরো কয়েকজন আমাদের আশ্রিতা আত্মীয়ারাও মারা গেলেন। আমি মাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতাম, মা,

মানুষ মরে কোথায় যায়? মা যথাযথ উত্তর দিতেন, আল্লা পাঠিয়েছিলেন আবার তাঁর যখন ইচ্ছা হল তখন নিয়ে গেছেন। তবু সুধাতাম কোথায় গেছে? মা বলতেন দেহটা তো মাটিতে মিশে গেছে, আত্মাটা অথবা নিশ্বাসটা আকাশে উঠে আল্লার কাছে গেছে। আমি বলতাম, আল্লা কোথায় থাকে? মা বলতেন, আল্লা আকাশে বাতাসে সারা পৃথিবীতে জুড়ে আছেন, তিনি আমাদের দেখছেন, খেতে দিচ্ছেন, আরাম ক'রে থাকতে দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, আমরা যদি দুনিয়ায় ভালো কাজ ক'রে মরি, তবে মরার পরে তাঁকে দেখতে পাব।

আমি ভাবতাম, অনেক কথাই ভাবতাম। ঘরের উত্তর দিককার বারান্দায় একখানা চৌকি পাতা ছিল, দুপুর বেলা সেটাতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। সবাই তো ঐ আকাশে চলে যায়। সাদা সাদা মেঘগুলো ঢেউ খেলান হয়ে সারি সারি ভেসে যেত, আমার মনে হতো মানুষের মাথার মতো। সব চেয়ে বড়টা মনে হতো আমার আব্বার। তার পরেরটা মনে হতো আমার ভাইয়ের, আর যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মারা গেছে তাদের আত্মা মেঘ হয়ে উড়ে ভেসে যাচ্ছে, মনে হতো ওরা আমাদের দেখছে, আমরাই ভালো ক'রে ওদের দেখতে পাচ্ছি না। পড়ন্ত বেলায় যখন পশ্চিমের আকাশে নানা রংয়ের মেঘ দেখা যেত, আমার মনে হতো যেন ওদের দেশের ঘাসের উপর নানা রংয়ের শাড়ি লম্বা লম্বা ক'রে কে যেন বিছিয়ে শুকুতে দিয়েছে। আমার ইচ্ছা হতো ঐ রকম শাড়ি যদি আমি পরতে পেতাম। মার বাক্সে অনেকগুলো শাড়ি আছে। ভাদ্র মাসে রোদ হলে বাইরে বের ক'রে দেয়। সে শাড়িতে অনেক সোনা রুপার ঝক-মকানি আছে। তবু এত সুন্দর লাগে না, এত সুন্দর কোমল একটা রং পড়ন্ত বেলার আকাশের। দেখতাম নানা রকমের মেঘ, এক এক সময় মনে হয় একটা বড় কুকুর থাবা পেতে বসে আছে। আবার বড় একটা ঝুড়ি ক'রে মাছ তরকারি ভরা শূন্য থেকে আস্তে আস্তে নামছে। উপর থেকে শাক সবজি দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প। সে নামতে নামতে কোথায় যেন মিশে যেত, আমি চেয়ে থেকে থেকে এক সময় চোখ বন্ধ ক'রে নিতাম। মনে হতো বড় সুন্দর ওদের দেশ। আমরাও তো একদিন ওদের দেশে যাব, তখন সবার সাথেই দেখা হবে।

আমাদের পরদার খুব কড়াকড়ি ছিল। অন্দর মহলে ছোট তের চোদ্দ বছরের একটা চাকর পর্যন্ত ঢুকতে পেত না। যদি খুব দরকার হতো, তবে খবর পাঠাত, আমরা আড়ালে গেলে তবে ঢুকত। আমাদের খালাত মামাত ভাইয়ের সামনেও আমরা কখনো যেতাম না। খালু মামু এ রকম সম্পর্কের মুরব্বি কেউ এলে সামনে এসে শুধু সালাম ক'রে যেতাম। বড় আপার শ্বশুরবাড়ি যখন বেড়াতে যেতাম, পাল্কি আসত।

আমাদের নিজেদের একটা পাল্কি ছিল, অনেক বড়। সে পাল্কিতে বড়

একটা মানুষ শুয়ে যেতে পারত। একদিকে তার রান্না বান্নার জায়গা, লাল রংয়ের ফুল-কাটা কাঁচ-বসান জানলা। সে পাল্কি ষোলো জন বেহারার কম নিয়ে যেতে পারত না। আবার ভাড়াটিয়া পাল্কিতেও যেতাম। আমাদের দেশে তখন ভাড়াটিয়া পাল্কিও নেহাৎ ছোট ছিল না। পাল্কিতে যখন উঠতাম, পাল্কির ভিতরে ভালো ক'রে তোশক বালিশ দিয়ে বিছানা পাতা হতো। তার ভিতরে আমরা বসলে পাল্কির দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হতো। তার উপর হালকা নীল রংয়ের একটা কাপড়ের কভার দেওয়া হতো। পাল্কির মাপে তৈরি কুঁচি দেওয়া সে কভারটা বেশ সুন্দর দেখাত। পাল্কি যখন উঠাত তখন পাল্কির দুই পাশে দুইজন বরকন্দাজ রুপা বাঁধান ছড়ি হাতে দাঁড়াত। পাল্কি চলত, সাথে সাথে তারাও চলত। বেহারারা গান গাইতে গাইতে চলত সুন্দর সুরে। লোকসংগীত গাইত। আমি বড় হয়ে কত কত দেশের কত পাল্কিতে উঠেছি, কিন্তু এত সুন্দর গান কোনো দেশে শুনি নাই। খুলনায় উড়ে বেহারা কিচির মিচির ক'রে সব বলত। আবার অন্য দেশেও বাঙালি বেহারা এ-হুম ও-হুম হু-হুম-না—পরের শোয়ার, বোঝা ভার, সাবাস জোয়ান, সাবধানে চল—বলে সেরে দেয়। আমাদের বেহারারা সে তুলনায় সুন্দর গাইত, আর সে গান বোধহয় এক ক্রোশ দূর থেকেও শোনা যেত। আমার বড় আপাকে আনতে যখন পাল্কি পাঠান হতো, বা দূর গ্রাম থেকে যখন কেউ বেড়াতে আসত, আমরা শুনতাম বাতাসে ভেসে আসছে গানের রেশ। অনেক দূর থেকে অল্প অল্প সুর শোনা যেত। একবার আবার বাতাসে ভেসে সুর কোথায় চলে যেত। এই রকম ক'রে যখন বেয়ারাদের গান নিকটতর হতো, আমাদের ধার যা হাতের কাজ গুছিয়ে বসতে বসতে পাল্কি বাড়ির দরজায় এসে হাজির হতো। বেয়ারা হাঁকত, আমরা বাড়ির ভিতর আসছি। আমরা তাড়াতাড়ি আড়ালে যেতাম, আমাদের ঝিরা থাকত। ভিতরে এসো হুকুম পেলে তবে বাড়ির উঠানে পাল্কি নামাত।

আমাদের খুব ভালোই লাগত পরদা করতে। ছুটাছুটি ক'রে লোকের সাড়া পেলে পালিয়ে যেতাম। অবিবাহিতা মেয়েদের তো আরো জ্বালা। ভিখারিনীদের সামনেও পরদা করতে হতো। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়া বেড়াতে এলে তাকেও পরদা করতে হতো। আত্মীয়ারাও তেমনি, যেখানে আমরা পালাতাম সেখান থেকে খুঁজে বের করবেই। পরে আমাদের শোচনীয় অবস্থা। মা'দের কাছে বকুনি খেতে হতো।

অসুখ হলে ডাক্তার দেখান এক বিপদ ছিল। সে শুধু অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য নয়, ছোট বড় সব মেয়েদের বউদের বুড়িদের সকলের জন্য এক ব্যবস্থা। বেশির ভাগ রোগের অবস্থা শুনে ডাক্তার ওষুধ দিত। যদি কারো খুব বেশি অসুখ হতো, হার্ট কিংবা লাংস একজামিন করতে হতো, তাহলে রোগীর শয্যার উপর মশারি টাঙান হতো। সেই মশারির উপর মোটা চাদর দিয়ে চার পাশে

ভালো ক'রে ঢেকে দিত। ডাক্তার এলে বসত শয্যার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে। রুগী মশারি থেকে হাত বের ক'রে দিত না. ডাক্তার মশারির ভিতর হাত দিয়ে রুগীর হাতে রবারের নাড়ি পরীক্ষা করত। বুক পিঠ কল দিয়ে পরীক্ষা করতে হলে আমাদের ভাইদের কেউ ঢুকে মশারির ভিতর বসত। ডাক্তারের কানে থাকত কল, আর কলের এক দিক মশারির ভিতর পাঠিয়ে দিত। আর ভিতরে যে থাকত সে ডাক্তারের নির্দেশ মতো সেটা লাগাতো নামাতো। রবারের নলে মশারির চাদরের ঘষায় আর অনভ্যস্ত হাতের কল বসানোতে ডাক্তার যতটা যা বুঝতে পারত, তাতেই ঔষধ দিত। আল্লু থাকলে বাঁচত—না হয় মরত। এই রকম ক'রে অনেক রোগিণী অনেক প্রসূতি মারা যেত। আমার মা নানিরা বলাবলি করতেন, মেয়েদের মান সম্মানের সাথে মরাই তো ভালো। আমার নানি বলতেন, থাক জান—থাক মান।

আমরা বছরের ভিতর একবার বেড়াতে যেতাম খুলনায় আমার নানার বাড়ি। বর্ষার সময় নৌকাতে বেড়াতে খুব ভালো লাগত। বড় একটা বোট ভাড়া করা হতো, আমার মামার নিজেরও একটা বোট ছিল। কখনো কখনো সেটাও পাঠা-তেন। আমরা বাড়ি থেকে পাল্কিতে উঠতাম, সঙ্গে দু'জন বরকন্দাজ থাকত, দু'জন ঝি থাকত, আর আমার ভাইদের মধ্যে সেজো ভাই-ই প্রায় সময়ে সঙ্গে থাকত। ছোট ভাইও অনেক সময় সঙ্গে থাকত, আর আমার গ ভাই থাকত। পাল্কিতে প্রায় ক্রোশ খানেক যেতে হতো। তার পরে নৌকায় উঠতাম, বোটে তিনটা কামরা থাকত। বসে একটাতে আমরা, একটাতে মাঝি-মাল্লা বরকন্দাজরা আর মধ্যের কামরাটায় আমার ভাইরা থাকত। তিন দিন, কখনো সাড়ে তিন দিন থাকতে হতো নৌকাতে। নৌকা বেশি বাঁধা হতো না, আর যদিও বাঁধা হতো তা কেবল দিনের বেলা। রাত্রে সমস্ত ক্ষণই নৌকা চলত।

বরষার নদীতে কি শোভা, মা ঠায় বসে থাকতেন জানলা খুলে। নদীর পাড়ে গ্রাম দেখা যেত, কত গ্রামের বউঝিরা নদীতে স্নান করত, কলসি ক'রে পানি নিয়ে যেত, নেংটা নেংটা ছেলেরা দুষ্টামি করত, কাদা ঘেঁটে মাছ ধরত। আবার জায়গায় জায়গায় ছেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে দেখা যেত। আমরা এই সব দেখতে দেখতে যেতাম। অনেক জায়গায় নদীতে খুব সুন্দর সুন্দর গাছ দেখা যেত। কি গাছ জানিনা।

নৌকা এক এক সময় এমন জায়গা দিয়ে যেত যে গাছগুলোর ঝাপটা লাগত নৌকার গায়, আমরা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাতা ছিঁড়ে নিতাম। শাপলার ফুল, পদ্মফুল, কচুরি পানার ফুল ফুটে থাকত নদীতে। মাঝে মাঝে কুমির দেখা যেত শুশুক দেখা যেত। আমরা জানলা দিয়ে দেখতাম। আমি বেশিক্ষণ বসতে পারতাম না। শুয়ে পড়তাম। আমার মাথা ঘুরত, বমি বমি লাগত। বিশেষ ক'রে যখন স্টিমার আসত, আর সে স্টিমারের ঢেউ লেগে নৌকা নাচাতে থাকত।

মা প্রায় দিন রাত জেগে বসে থাকতেন। ঘুমাতে বড় একটা দেখতাম না। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতেন। নামাজ পড়তেন, মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বাইরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেন। দিনের বেলা নৌকা বেঁধে ছিপ বরশি দিয়ে বড় বড় মাছ ধরা হতো। আমার সেজো ভাই মাছ ধরতে খুব ওস্তাদ ছিলেন। বন্দুক সঙ্গে থাকত, পাখি শিকার করতেন। সে সব নৌকায় এনে রাঁধা হতো। মাঝিরা রাঁধত, আমাদের ঝিরা সাহায্য করত। আমার গ ভাই খুব ভালো রাঁধতে জানতেন। সবাই মিলে খুব হৈ হুল্লোড় ক'রে খেত। আমাকে খাওয়াবার জন্য খুব চেষ্টা করত, আমি তখন ভালো ক'রে খেতে পারতাম না।

নৌকায় চলতে চলতে গৌরীঘোনা বলে একটা জায়গা পথে পড়ত, সেখানে আমাদের তালুক ছিল। আমাদের কাছারি ছিল। নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা সবাই ছিল। সেখানে এসে নৌকা এক বেলা বাঁধা থাকত। সতিশ নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ ওখানকার কাছারির নায়েব ছিল, তাকে খবর পাঠালে সে এসে আমার মাকে সালাম পাঠাত, সাথে সাথে অনেক ভেট পাঠাত। পাঠাত ডাব নারকেল, কুনো নারকেল। জাল ফেলে মাছ ধরে পাঠাত, বাড়িতে কোনো খাবার রান্না ক'রে পাঠাত, কিংবা সন্দেশের হাঁড়ি পাঠাত।

সেখানে আমাদের নৌকা এক বেলা বাঁধা থাকত। তারপর আবার নৌকা চলতে থাকত। সময়মতো গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতাম। খুলনার ঘাটে নৌকা থাকত। পাল্কিগুলো ছোট ছোট, কিন্তু ঘাট থেকে বাড়ি বেশি দূর ছিল না। উড়ে বেহারা ঝকড় মকড় করতে করতে বাড়িতে নিয়ে উঠত।

আমার মামারা বেশি বড়লোক ছিলেন না। মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘর। চাকরি ক'রে খেতেন। আমার মামা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার। আমার নানা ওখানকার জেলা স্কুলের মৌলবি মাস্টার ছিলেন। আমি যখন দেখেছি তখন তিনি রিটায়ার করেছেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন। ওনাদের বাড়িটা তখনো দালান হয় নি, ছোট বাড়ি, একখানা বড় টিনের ঘর। চার পাশে কাঠের বেড়া। আরো ছোট কয়েকখানা মাটির ঘর, খড়ের চাল। আমার নানি ছিলেন, মামানি ছিলেন। আর ছোট ছোট ভাইবোনেরা তিন চার জন ছিল। খেলার সাথী পেয়ে আমার উৎসাহের অন্ত থাকত না। খুব ভালো লাগত খুলনায়। যে ক'দিন থাকতাম, সবাই আদর করত। বিশেষ ক'রে আমার নানি কি মজার মজার কথা বলতেন। কত গল্প ছড়া কাটতেন। রাত্রে কত রাজার গল্প, কত রাক্ষস খোক্কোসের গল্প করতেন। আমার নানি নিজে হাতে রাঁধতেন, মামানি যাবতীয় ঘরের কাজ করতেন। একটা ঠিকা ঝি কেবল বাসন মেজে পানি তুলে দিত। আর সব কাজ এঁরা নিজের হাতে করতেন। একজন সেপাই বাজার ক'রে দিত, আর মাঝে মাঝে বাগান করত। সকালে উঠে আমার মামাত বোনেরা পড়তে বসত, আমি তখন খুব ছোট, পড়তে শিখি নি ভালো ক'রে, নানির কাছে বসে নানা রকম গল্প শুনতাম। আমার

নানির এক বিধবা বড় বোন ছিলেন, তিনি খুব ভালো লেখাপড়া জানতেন। আরবি – উর্দু – ফারসি – বাংলা পড়তে পারতেন। লিখতেও জানতেন। তখন তো ইংরেজির চল ছিল না। অনেক লোকের তাবিজ তিনিই লিখে দিতেন। শুনেছি তিনি বাড়িতে একটা পাঠশালার মতো করেছিলেন। পাড়ার মেয়েরা তাঁর কাছ থেকেই বাড়িতে এসে পড়ত। যার যা সাধ্য পয়সা দিত। আমার মা খালাম্মা তাঁর কাছ থেকেই পড়া শিখতেন। আমার নানি খুব নামকরা জমিদারের মেয়ে ছিলেন। ওনার বাবার এক কালে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। নানার বাবা খানদানি ঘরের ছেলে, অথচ গরিব দেখে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইলে বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বউ নিতে চাইলে মারতে উঠতেন। বলতেন, কি আমায় অপমান করা, আমার এ বাড়ি ছেড়ে কোনো জায়গায় যাবে না। কাজেই আমার নানি শ্বশুরবাড়ি যান নি। আমার নানারা সব ঘর-জামাই ছিলেন। বিয়ের পর প্রায় চার বছর পর আমার নানি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যান। তাও মাত্র সাত দিন থেকে এসেছিলেন। দু'জন চাকরানি সাথে ছিল। আমার নানির বাবা মারা যাবার পর, আমার নানি দেখলেন তাঁর ভাইয়েরই যত আধিপত্য। সবাই তাকেই মানে। আমার নানার কিছু কর্তৃত্ব নেই। তাছাড়া এক খুনের মকর্দমায় জড়িয়ে জমিদারি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। তবু তিনি আভিজাত্যের গরিমায় বোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চান নি। তাছাড়া আমার নানা কিছু কাজকর্মও করতেন না। আমার নানা ওলামা শাশ ছিলেন, তবু জমিদারের জামাই – চাকরিতে অপমান বোধ করতেন। নানির বড় বোনের বিয়ে দশ বছর বয়সে হয়েছিল। আর ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বাকি জীবনটা বই-কেতাব আর নামাজ-রোজা ক'রে কাটিয়ে দিয়েছেন। ছেলে পিলে কিছু হয় নি। কখনো ভাইয়ের বাড়ি কখনো বোনের বাড়ি দিন কাটিয়েছেন। যেখানে থাকুন সবাই মর্যাদা দিয়ে সম্মানে রাখতেন। কেউ কখনো কুটোটুকু কাটতে দিত না।

আমার নানি যখন দেখলেন যে ভাইয়ের বাড়ি সম্মানের নয়, বিশেষ ক'রে তিন চারটা ছেলেপিলে নিয়ে – তখন কেবল মাত্র খোদা সহায় ক'রে নিজের ভাইকে লুকিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে নানার সাথে নৌকা ক'রে শ্বশুরবাড়ির গ্রামের দিকে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। গায়ে শুধু একখানা গয়না ছাড়া টাকা পয়সা কিছু আনতে পারেন নি। ওনার ভাই জানলে তো আসতেই দিত না। শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসে দেখলেন সেখানে অজ পাড়াগাঁ। স্কুল নেই, ছেলেকে তো লেখাপড়া শেখাতে হবে। তখন রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ। ইংরাজি না শিখলে তো চলবে না। কাজেই আমার নানি খুলনায় এসে গায়ের গয়না বেচে নেহাৎ একটু বাড়ি তৈরির মতো জায়গা কিনে কোনো মতে ছোট একখানা ঘর বেঁধে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন।

আমার নানাও ওখানকার জেলা স্কুলে চাকরি নিলেন। সব আভিজাত্যের গরিমা

বিলাস আরাম বিসর্জন দিয়ে শক্ত হাতে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালেন। আসবার সময় এক টাকা দিয়ে চার জন চাকরানি কিনে এনেছিলেন। খুলনায় এসে আর তাদের রাখেন নি, আজাদ করে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে সমস্ত সংসারের কাজ করতেন। বাসন মাজা, ঘর লেপা, কুয়ো থেকে পানি তোলা ইত্যাদি। ভোর রাত্রে উঠে নামাজ পড়ে খোদার কাছে উন্নতির জন্য দোয়া চাইতেন। অভিজাত পরিবারের মেয়ে গর্ব, অলসতা, বিলাসিতা দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের খাটুনির টাকায় সাধারণ গরিব গৃহস্থ ঘরের মতো দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকটা ভদ্র পরিবার (তাঁর শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়) তাঁর বাড়ির কাছে এসে বাড়ি তৈয়ারি করেছিলেন। এমনি ক'রে একটা পাড়া জেগে উঠল। তখন আর কিছু অসুবিধা থাকল না।

নানির খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। পাড়ার লোক খুব সম্মানের চোখে দেখত। কারো কোনো বুদ্ধির দরকার হলে নানির কাছে আসত। পাড়ায় কারুর প্রসব বেদনা উঠলে আমার নানিকে ডাকত। সাধারণ দাইদের চাইতে আমার নানি খুব ভালো প্রসব করাতে পারতেন। কোনো মেয়েলোক মারা গেলে আমার নানি তাকে গোসল কাফন দিতেন। কারো বাড়ি বিয়ে হলে আমার নানিকে ডাকত রাঁধতে। এক মণ চালের পোলাও আমার নানি নিজে রাঁধতেন। অনেক বলত মিস্ত্রীডারার মেয়ে, নোনা চিংড়ি, ঘাতে দাও তাই মজে। আমার মার কাছে শুনেছি তখনকার দিনে জিনিসপত্র খুব শস্তা ছিল। এখন যা খান তখন তার থেকে খুব ভালো খেতেন।

পাঁচ পয়সা দিয়ে বড় এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনতেন, তাও দরজায় আসত। একটা ভাজতেন, একটা রাঁধতেন, ইলিশ মাছের পিঠে ক'রে সকলে নাস্তা করতেন। এমনি সব কত কি শস্তা জিনিসপত্রের কথা শুনতাম। তারপর যখন রেল হল, আর ট্রেনে ক'রে জিনিসপত্র সব চালান যেতে লাগল, তখন থেকে দাম হতে শুরু হল।

আমার নানির কাছে অনেক রূপকথার গল্প শুনতাম। সেই যে রাজকন্যা কাঞ্চনমালাকে তার সতিন নির্বাসন দিয়েছিল বনে, কাঞ্চনমালা গর্ভবতী থাকার হিংসায়। কাঞ্চনমালা বহু কষ্টে এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রম খুঁজে পেয়েছিল। কালে তার একটা মেয়ে হয়েছিল, সে মেয়ের নাম রেখেছিল বনমালা। কাঞ্চনমালা ঘুমিয়ে থাকলে সন্ন্যাসিনী রোজ সকালে ডাকতেন :

উঠো উঠো কাঞ্চনমালা
কাঁদে তোমার বনমালা—

এই ডাক শুনেই তার সওদাগর স্বামী তার সন্ধান পেয়েছিলেন। শেষ কালে কাঞ্চনমালার ভাগ্য আশাতিরিক্ত ফিরে গিয়েছিল। আবার আর এক রাজকন্যার গল্প বলতেন। ভাগ্যদোষে বিপাকে পড়ে থাকে বাঁদিগিরি করতে হতো। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রে যখন সবাই ঘুমাত, তখন রাজকন্যা নিজের ঘরের

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেঁড়াবন্দ শেটারি খুলত, আর তার মধ্য দিয়ে শরীরা বেরিয়ে এসে নাচ গান ক'রে যখন বাক্সের ভিতর ঢুকতে যাবে তখন রাজকন্যা বলতেন :

হাতের কাঁকন দিয়ে কিনলাম বাঁদি
সেই হল বিবি আর আমি হলাম বাঁদি।

শরীরা উত্তর দিত :

সবুর কর বাদশাজাদী, তোমারি
শয্যাপাটি।

এমনি ক'রে বহু গল্প বলতেন। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আর একটা কবিতা বলতেন। সেকালের অলংকারের কথা। ঘটক এসেছে বাড়িতে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে, গিন্নি বলছেন :

হেথায় এস ঘটক ঠাকুর আমার কাছে বস।
কি জানে ও বুড়ো মিন্সে কি বলিতে গেছ,
যেমন ঝাপা তেমন খোঁপা কপাল সোরা সিঁথি
পাকা সোনা গিলটি করা কালট লাগা মোতি।
দোহারা চাঁদ কলি শোভে দেখিতে যেমন
হয়ত শশক নয়ত কামরাঙ্গা মাদুলি।
ওপর কানে পিপুলপাত নল ঝোমকা দেড়ি,
তাড়, কঙ্কণ, বাজুবন্দ, সোনাবাঁধা চুড়ি
ডান নাকেতে বেসর শোভে নথ শোভে বাম নাকে
ঢাকাই নথ ফুলকো দেওয়া নোলক যেন থাকে।
এই ইত্তক সোনার গয়না কি কইব আর
আমার বাছার যেমন পাছা তেমন চন্দ্রহার।

আবার বর কেমন হওয়া চাই তা-ও বলে দিচ্ছে :

জোড়া ভুরু মাজা সরু তিলক কাটা নাকে।
লম্বা কোঁচা জোড় গামছা বাবরি যেন থাকে॥
রাজরানী হবেন বাছা বসবেন রাজপাটে
আমার বাছার কাছে যেন দাস দাসী খাটে।

এই রকম কত সুন্দর গল্প যে আমার নানি বলতেন তার ইয়ত্তা নেই। কত দরবেশ ফকিরের গল্প, কত অলৌকিক ঘটনা, কত উপদেশপূর্ণ কথা বলতেন।

'বেটি ভালো লাজে, গোস্ত মজে শিয়ালে।'—তারপর একটু থেমে বলতেন, 'ছেলে হোক আর মেয়েই হোক লজ্জাই মানুষের ভূষণ, যার লজ্জা কম তার ঈমান কম। আজকালকার দিনে যেমন লজ্জা উঠে যাচ্ছে, তেমন ঈমান উঠে যাচ্ছে।' আবার বলতেন, 'বেটি না মাটি। মাটি যেমন ফসল উৎপন্ন করে, আবার ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, শত অত্যাচার চুপ ক'রে সহ্য করে, তেমনি মেয়েদেরও

সব গুণ থাকা উচিত। ধৈর্য, সহ্য, সেবার গুণে সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে।' নানি খুব টোটকা চিকিৎসা জানতেন। গাছের পাতা শিকড়-বাকড় কত কি। পাড়ার কিংবা ঘরের বাচ্চাদের তো দিতেনই, এমন কি বড়দেরও দিতেন।

হাতের কব্জির নাড়ি দেখতে জানতেন খুব ভালো। বাই, পিত্তি, কফ তিন রকম নাড়ির গতি। নাড়ি সম্বন্ধে নানান কথা বলতেন। জ্বর কত নাড়ি দেখে বলতেন। ছেড়ে যাবে কি যাবে না বলতে পারতেন। আমরা এত নাড়ি জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যেতাম। শিখবার চেষ্টা করতাম, পারি নি। তিনি অযাচিত লোকের উপকার করতেন। কিছু বললে বলতেন, আর তো কিছু সঙ্গে যাবে না, জীবনের পরপারে এই পুণ্যটুকুই তো সম্বল। টাকা দিয়ে না পারি, গতর দিয়ে তো পাড়া-পড়শির 'হামছায়ার' হক আদায় করতে হবে।

এক দিন পাড়ায় একটা বসন্ত রুগিণী মারা গেল। রুগিণীর এত বেশি জাত বসন্ত হয়েছিল যে সমস্ত শরীর ফেটে গিয়েছিল। কেউ তাকে গোসল দিতে আসে নি। তখন নানি একাই তাকে গোসল কাফন দিয়েছিলেন। নিজে গোসল করে বাড়ি আসতে আসতে জ্বর এসেছিল। দুই দিন পরে নানি বসন্ত দেখা দিল।

খুলনায় গিয়ে আমি খুব আনন্দেই থাকতাম। কিছু দুষ্টামি করলে মা মারতে পারতেন না। আমার মামাত বোনেরা সকালে উঠে পড়া করে তবে নাস্তা খেত। গুড়, মুড়ি, নারকেল, কোনো কোনো দিন পান্তাভাত পিঁয়াজ দিয়ে, নেবুর রস দিয়ে খেত। আমার খুব ইচ্ছা করত পান্তাভাত খেতে। খুব ভালো লাগত। মা বলতেন, অভ্যেস নেই অসুখ হবে। মামানি বলতেন, মামার বাড়ি এসে পান্তা খেতে নেই। লোকে মন্দ বলবে। আমার নানি বলতেন, মেয়েমানুষের জাত, কোন ঘরে যাবে তার ঠিক নেই, সব রকম অভ্যেস করা ভালো। নাস্তা খাওয়া হয়ে গেলে আমার বোনেরা ছোট ভাই বোন কোলে নিয়ে বেড়াতে যেত। খালি পায়ে শাড়ির আঁচলটা কোমরে ঘের দিয়ে বাঁধত। শাড়িটা পরত খাটো করে, যাতে দৌড়াতে অসুবিধা না হয়। আমিও ওদের সাথে সাথে যেতাম। ওরা যেত বাড়ির পিছন দিকে বাগানের ভিতর। সেখানে কয়েকটা আম গাছ কাঁঠাল গাছ আর বড় একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আমরা সবাই গিয়ে সেখানে বসতাম। ওরা কত দৌড়াত। উঁচু জায়গায় উঠে লাফ দিত। আমিও ওদের সাথে দৌড়াতে লাফাতে যেতাম; কিন্তু ওদের সাথে কোনো খেলাতেই পারতাম না। আমাকে নিয়ে ওরা হাসত, বলত: এত যে দুধ খাস, তা গায়ে বল কই? সব চেয়ে বড় যে সে পেয়ারা গাছে উঠত, পেয়ারা পাড়ত। আর সবাই সমস্বরে চেঁচাত, 'গেছো মেয়ে গাছে ওঠে, গাছ মড় মড় মড় করে। হলদে কাপড় পরে বোলদিয়ে ভাতার ধরে।' যে গাছে উঠত সে খুব রাগ করত, পেয়ারা দেবে না বলত, মায়েরা শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না। বিশেষ করে ওই পাড়াতেই ওর বিয়ের কথা চলছে। মেয়ে

গাছে ওঠা খুব নিন্দার কথা ছিল। দুই তিন ঘণ্টা খেলে আবার ঘরে ফিরতাম। বিকালে সব পাড়ার লোকেরা বেড়াতে আসত। আমাদের সাথে দেখা করতে। কেউ আমার খালাম্মা, কেউ বোন, কেউ ভাবী।

দুই তিন মাস পরে আমার সেজো ভাই আবার আমাদের আনতে যেত। বোট একটা ভাড়া করত, পাল্কি আসত। আবার সেই উড়ে বেয়ারা ঝকড় মকড় করতে করতে পাল্কি নিয়ে নৌকায় উঠত।

খুলনার নদীতে বড় বড় ঢেউ। ইছামতী আর ভৈরবী এক সাথে মিশেছে। আর বর্ষা কালের ভরা নদী বাতাসে উত্তাল তরঙ্গ তুলত। নৌকা খুব দুলত, আমি ভাত খেয়ে নৌকায় উঠলে বমি করে দিতাম। দুই নদী একসাথে মেশার ফলে কি জানি না, খানিক দূর এগিয়ে এলে অনেক সময় নৌকা এসে যেখানে ডুবে যায় — জায়গাটা অনেক গভীর আর ঢেউগুলো ঘুরতে থাকে — মাঝিরা সেসব জায়গা চেনে। নৌকা আস দিয়ে পাশ দিয়ে নিয়ে যায়। একদিন আমাদের নৌকা সেই জায়গায় এসে পড়েছে, মাঝিরা সামাল সামাল করে নৌকা ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসতে সেজো ভাইয়ের একটা ছাতা ছিল নৌকার গায়ে টাঙান, ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে। গণ্ডগোলে তখন আর কেউ দেখতে পায় নি। যখন দেখেছে তখন নৌকা বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ হাত এগিয়ে গেছে। সেজো ভাই বললেন ছাতাটা তুলে আনতে, কিন্তু লোকজন যারা পথে ছিল বা মাঝিরা কেউ স্বীকার হল না ও রকম জায়গায় নামতে। ওরা বলল, ও রকম জায়গায় কেউ নামে না, আর নামলেও ছাতা পাওয়া যাবে না, আমাদের মাফ করবেন। সেজো ভাই বিসমিল্লা বলে নেমে পড়লেন। যেখানে নৌকা ধাক্কা লেগেছিল সেখানে গিয়ে ডুব দিলে মাথার উপর বোধ হয় দশ হাত পানি থাকে। আধ ঘণ্টাখানেক ডুবে ছিলেন। পরক্ষণে ছাতা নিয়ে উঠে পড়লেন। নৌকা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল — সেজো ভাই ছাতা নিয়ে নৌকায় উঠে পড়লেন। সবাই প্রশংসা করতে লাগল। মাঝিরা বলতে লাগল, আপনার কথা আমরা চিরকাল মনে রাখব। আমরা যে মাঝি, চিরকাল নদীতে কাটাই, তবু আমাদের ক্ষমতা ছিল না যে ওরকম জায়গায় নামি।

নৌকা চলত আবার। গোয়ালন্দ এলে সেখানে নৌকা এক বেলা বাঁধা থাকত। সেজো ভাইয়ের কাছে বন্দুক থাকত। সে নেমে চলে যেত কিংবা নৌকায় বসে বসেই পাখি শিকার করত। আবার নৌকা চলত। যেদিকে নৌকা যাবে সেদিকে স্রোত থাকলে পাল তুলে দিয়ে মাঝিরা গুণ টানত। নৌকা তখন নদীর পাশ দিয়ে চলত। জানলা খুলে আমরা বসে থাকতাম। নদীর ধারে ধারে খেতের পর খেত দেখা যেত। ধান খেত, আখ খেত, পাট খেত। পানের বরজ সব যেন পিছনে দৌড়াত। গুণ টানলে নৌকা জলদি এগিয়ে যায়। মা জানলায় বসে বসে দেখতেন আর বলতেন, 'যতক্ষণ পারি চোখ ভরে দেখে নি, বাড়ি গেলে তো সেই

p2730)

চার দেওয়ালে বন্দী। কতকাল তো আর কিছু দেখতে পাব না।' কোনো সময় মাঝপথে ঝড় উঠত। আকাশে কালো মেঘ, গাছপালার মাতামাতি, নদীর পানিতে হাত দিয়ে দেখত, গরম হলে মাঝিরা ভয় পেত। যদি ঝড় ওঠে নৌকা বাঁচাতে পারবে কেমন করে বাঁধবার জায়গা না হলে। সব জায়গায় তো বাঁধতে পারত না। আর আমার মা নৌকার কামরার মধ্যে বসে বাক্স খুলে ডবল ডবল কাপড় পরতেন, মোজা পায়ে দিতেন। একটা হাফ একটা ফুল। পায়জামা পরে তার উপর পেটিকোট তার উপর শাড়ি, দুটো তিনটা জামা গায়ে দিতেন, মাথার চুলগুলো একটা কাপড় পেঁচিয়ে খোপা করে বাঁধতেন। বলতেন, নৌকা যদি উল্টায় তো সাঁতার দিয়ে যতক্ষণ পারি বাঁচবার চেষ্টা করব, আঁট সাট কাপড় থাকলে সাঁতার দেবার সুবিধা হবে। আর যদি মরি তো আমার লাশ ভেসে উঠবে বা কেউ তুলবে, তখন যেন বিবস্ত্র না উঠি। অনেকগুলো কাপড় তো পরলাম, একটা না একটা গায়ে থাকবে।

এমনি করে আমরা প্রত্যেক বছর একবার করে বেড়াতে যেতাম। আমাদের দেশের ঘাটে এসে নৌকা লাগত। সেখানে পাল্কি-বেহারা, লোকজন সবাই অপেক্ষা করত। বেহারা পাল্কি নিয়ে সমস্বরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির পথে রওয়ানা হতো, আমরা পাল্কির ভিতর বসে পাল্কির বিছানা সরিয়ে দেখতাম মাটির দিকে। মনে হতো, মাটি যেন সরীসৃপের মতো কিল বিল করে পাল্কির নিচে দিয়ে দৌড়াচ্ছে।

আমার সেজো ভাই শিকার করতে ভালোবাসত। হয় পাখি মারবে, না হয় মাছ ধরবে। প্রত্যেক দিন একটা না একটা তার চাইই। আমার আর আর ভাইদের মতো বই পড়া তার ভালো লাগত না। তার আবার বাবা মারা গিয়েছে। পড়াবার জন্য তাগিদ দেবার কেউ ছিল না। সে ইচ্ছা মতো জমিদারি কাজ-কর্ম একটু আধটু তদারক করত। আর সারা দিন বন্দুক নিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াত। শিকারে হাত খুব পাকা ছিল, সাহসও ছিল দুর্জয়। আমাদের দীঘিতে একটা ছোট ডিঙি বাঁধা থাকত। সেটাতে চড়ে দীঘিতে জাল ফেলত সেজো ভাই। দেখতেও ছিল সুন্দর সুপুরুষ। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গঠন, পাকা কলার মতো গায়ের রং। মাথায় এক ঝাঁক কালো কালো কোঁকড়ান রেশমের মতো চুল। ব্যবহারও ছিল অমায়িক। কিন্তু এত দুরন্ত যে স্থির হয়ে একদন্ড বসতে পারত না। দীঘিতে সাঁতার কেটে কেটে সাধ মিটত না। বিলে যেত মাছ ধরতে, সাঁতার দিতে। বিলে সাঁতার দিয়ে পদ্মফুল, পদ্মের চাকা তুলে আনত। আমরা খুব ভালোবেসে পদ্মের চাকা খেতাম। পদ্মের চাকার বিচির ভিতর সবুজ রংয়ের একটু শিকড় পাওয়া যেত, দেখতে ঠিক আই হুকের মতো। সেগুলো নিয়ে খেলতাম। অনেক শাপলাও তুলে আনত। সেই শাপলা ভেঙে ভেঙে পাঁচ নহরি হার গাঁথা হতো, লকেট হতো শাপলার ফুল। সেই হার আমরা গলায় পরতাম। আবার খানিক পরে একটু

একটু ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দিতাম। খেতে খেতে শালপাতা শেষ হয়ে যেত, খোসাটা শুধু গলায় থাকত লকেট ফুল সমেত। তখন ফেলে দিতাম। দীঘিতে যখন মাছ ধরত, জাল ছিল, সিপ ছিল। ছোট মাছ পেলে আবার পানিতে ছেড়ে দিত। দশ সের বা তার চেয়ে বেশি ওজনের রুই, কাতলা কি কালো বাওস মাছ হলে বাড়ির ভিতর নিয়ে আসত। আমার মা সেই মাছ নিজের হাতে কুটতেন, রান্না করতেন। না হলে সেজো ভাইয়ের মন ভালো লাগত না। বড় বাটা মাছ বা পাবদে মাছ পেলে আনত। আমার মা সেগুলো আস্ত আস্ত ভাজা করতেন। তার একটা মাছে থালা ভরে যেত। তাই বলে আমি বা সেজো ভাই কেউই ভালো ক'রে খেতে পারতাম না। যখন ভাজত তখন শুধুমুখে ভাজামাছ খেতাম। আর বড় মাছ রাঁধলে ভাত দিয়ে এক টুকরা পেটের মাছ খেতাম।

ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যেত। যেদিন দূরে পাখি শিকার করতে যাবে, সেদিন দুলা ভাইকে খবর দিয়ে ডেকে আনত। দুলা ভাইয়ের খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় ঘোড়া ছিল। একটা সাদা রংয়ের একটা কালো রংয়ের। তাদের খুব যত্ন করতেন। সে ঘোড়াদের গা দিয়ে যেন তেল চুয়ে চুয়ে পড়ত। খুব সুন্দর নরম চামড়ার জিন থাকত পিঠে। দুলা ভাই ঘোড়ায় যখন দৌড়াত, তখন তার মাথার কালো কালো কোঁকড়ান চুলগুলো লাফাতে থাকত। ঘোড়া বাড়ির ভিতর এনে আমাকে চড়তে বলতেন। আমার তো সে ঘোড়া দেখলে ভয় লাগত। আমাদের বাড়িতে সেজো ভাইয়ের যে ঘোড়া ছিল, তাইতে চড়িয়ে দিয়ে দুলা ভাই আমাকে ধরে থাকতেন, ঘোড়া কদমে কদমে হাঁটত। তিনিও কদমে কদমে ঘোড়ার সাথে সাথে হাঁটতেন। অল্পকাল চড়িয়ে নামিয়ে দিতেন।

দুলা ভাইও শিকার করতে ভালো জানত। সেজো ভাই আর তিন যখন এক সাথে শিকারে বেরুতেন নৌকায়—তখন সাথে অন্য অন্য লোকজন হাঁড়ি বাসন চাল ডাল নিয়ে বেরুত। একটা গ্রামোফোনও থাকত। রওয়ানা হতেন সেই ভোরে, আর ফিরতেন রাত নটা-দশটায় এক বোঝা পাখি নিয়ে। সব সময় দুলা ভাই না থাকলে সেজো ভাই একাই শিকার ক'রে বেড়াত।

আমাদের গ্রামের জঙ্গলে তখন বুনো শুয়োরের খুব আমদানি ছিল। বাঘও ছিল। রাতের বেলা বাঘ ডাকলে আমরা খুব ভয় পেতাম। লোকেরা টিন বাজাত। মশাল জ্বালাত। সেজো ভাই একটা বাক্স লোহার গরাদি দেওয়া, বাঘ মারবার কল বানিয়ে সেতে রেখে দিত। কাঠের বাক্সের সাথেই একটা ছোট কুঠরি থাকত, সেটাতে ছাগল থাকত। ছাগল রাত্রে খুব চেঁচাত আর সেই ছাগলের ডাক শুনে বাঘ এসে হাজির হতো। যেমন ছাগল ধরবার জন্য বাঘ বাক্সের মধ্যে উঠত অমনি ইঁদুরের কলের মতো খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যেত। বাঘ কলে পড়ত। সকালবেলা গ্রাম সুদ্ধ লোক হৈ হৈ ক'রে ছেলে পিলে নিয়ে সব দেখতে আসত। সেই বাক্সের নিচে চাকা লাগান থাকত। লোকেরা দড়ি দিয়ে টেনে এনে আমাদের

বাড়ির খিড়কির দরজায় লাগাত। আমরা দরজার কাছে গিয়ে দেখতাম, দুই ছেলের দলও থাকত। কাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে বাঘ খেলাত। বাঘও ভেংচি কেটে গর্জন করে লাফিয়ে উঠত। ছেলের দলও ভয় পেত। এমনি করে বাঘ টেনে টেনে লোকদের বাঘ দেখিয়ে বেড়াত, পরে গুলি করে মেরে ফেলত। একটা বাঘ মারা গেলে কিছুদিন বাঘের উৎপাত কম থাকত।

দাঁতাল বা বুনো শুয়োর কম ছিল না গ্রামে। বুনো শুয়োরকে দাঁতাল বলা হতো। দুই পাশে হাতির দাঁতের মতো দুই দাঁত থাকত বলে। আর ওরা বাঘের চেয়ে কম হিংস্র নয়। আমাদের যে আগেকার বাড়িটা ভূপ হয়ে পড়ে ছিল তার উপর জঙ্গল হয়ে থাকত। সেই জঙ্গল থেকে বুনো শুয়োর উঁকি মারত, আমরা দেখে ভয়ে পালাতাম। আর সেজো ভাই ছুটত বন্দুক নিয়ে। কোনোদিন মারতে পারত না।

আমার মা সাপ দেখলে লাঠি নিয়ে সাপের পিছনে পিছনে ছুটতেন। সাপে ব্যাঙ ধরলে কেমন একটা শব্দ হয়, সেই শব্দ লক্ষ করে মা সাপ খুঁজতেন। খুঁজে বের করে মারতেন। এক একটা বেশ বড় বড় সাপ। নাম শুনতাম গোখুরা, কেউটে, হেলে। মা দৌড়াতেও পারতেন খুব, হাতের লক্ষ্যও তীক্ষ্ণ ছিল। সাপ মেরে বলতেন সাপ মারলে এক কাকের মারার সোয়াব হয়, তবে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নেই, তাহলে কবিরা গোনাহ্ হয়।

একবার একদল বেদে আমাদের গ্রামে এসে থাকবার অনুমতি চাইল। সেজো ভাই তাদের থাকবার অনুমতি দিল। বিলের পাশে একটা জঙ্গল সাফ করে বেদেরা টোল ফেলে থাকল অনেকখানি জায়গা নিয়ে।

অনেক ছেলে পিলে বউ ঝি সমেত আমাদের দীঘিতে আসত পানি নিতে। আমাদের পুরানো বাড়ির সিং-দরজার কাছে যেটা আগে অতিথিশালা ছিল, সেই ঘরের জানলা দিয়ে মা আর আমি ওদের দেখতাম।

মা আসরের নামাজের পর বেড়াতে বেড়াতে ওদের দেখতে আসতেন। ওরা টুং টাং বাজনা বাজাত, পুজো করত, আরো কি কি করত। আমি অত বুঝতাম না, তবে সেজো ভাই প্রত্যেক দিন একটা করে বুনো শুয়োর মেরে ওদের খেতে দিত। আমরা তো প্রত্যেক দিন ওদের দেখতে যেতাম। ওরা খুব খুশি হয়ে সেগুলো খেত। গোস্ত ছাড়িয়ে বাবলা গাছে চামড়া সুন মাখিয়ে শুকুতে দিত। সেগুলো লাল টুক টুক করত দেখতে।

সেজো ভাই একদিন সকালে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেছে শুয়োর মারতে। আর সারা দিন পর সন্ধ্যা বেলায় ফিরেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে বলল, শুয়োর মারতে তো গিয়েছিল, সঙ্গে কয়েকজন লোকও ছিল, যদিও শেষ কালে তারা পিছিয়ে পড়েছিল। সেজো ভাই একাই শুয়োর তাড়িয়ে খড় বনের [illegible]

দৌড়াচ্ছিল। দৌড়াতে দৌড়াতে খড় বনের ভিতর একটা কুয়া ছিল, বন্দুক সমেত সেই কূপের ভিতর পড়ে গেছে। সঙ্গের লোক যারা ছিল তারা খুঁজে পায় নি। নিজে নিজে অতি কষ্টে উঠেছে। এই চেষ্টা করে উঠতে উঠতেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

একদিন শোনা গেল বাঘ গ্রামে এসেছে, আর একজন লোকের গরুর বাছুর খেয়েছে। পরদিন সেজো ভাই দুলা ভাইকে খবর পাঠাল, আর লোকজন সাথে নিয়ে বাঘ মারতে গেল। সেবার দুটো বড় বড় বাঘ মেরেছিল। তার ছোট দুটো বাচ্চাও ধরে এনেছিল। বাচ্চা দুটো আমরা পুষতাম, একটা দুলা ভাই পুষত, একটা আমরা। গ ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত বাঘের বাচ্চাটা। বাঘের বাচ্চাটাকে যখন এনেছিল তখন বিড়ালের মতো ছোট ছিল, পরে বেশ একটু বড় হয়েছিল। রোজ তাকে কাঁচা গোস্ত খেতে দিতাম, গায়ে কালো কালো ডোরা কাটা ছিল বাচ্চাটার। মাঝে মাঝে শিকল খুলে যেত, আর ছাড়া পেলেই বাড়ির ভিতর আসত। আমরা যে ওকে দেখলে ভয় পেতাম ও সেটা বুঝত। আমাদের দিকে চেয়ে ভেংচি কাটত, ভয় দেখাত, আমরা চিৎকার করে গ ভাইকে ডাকলে, গ ভাই এসে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে কোলে করে নিয়ে যেত, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত। পরে কেমন করে জানি না একটা বিড়ালের কামড় খেয়ে না বিড়ালের গোস্ত খেয়ে মরে গেল। একদিন আমার মা শোবার ঘরের মেঝেতে বসে একটা নারকেল কুড়াচ্ছিল, আমি বিছানায় বসে বই পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে বাঘের বাচ্চাটা এসে বারান্দায় বসে দরজা দিয়ে মার দিকে চেয়ে আছে। মা তো প্রথমে দেখে নি, পরে যেমন বাঘের দিকে দৃষ্টি পড়েছে অমনি যেন বুঝেই মার দিকে চেয়ে ভেংচি দিল। মা তো ভয়ে চিৎকার করে উঠে যেয়ে আর একটা ছোট কামরার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, আর আমি বিছানার উপর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাঘটা কেমন স্বচ্ছন্দ মনে থালার উপর নারকেল কোঁড়াগুলো খেতে লাগল। গ ভাইয়ের কাছে খবর পাঠান হয়েছিল। ততক্ষণে তার নারকেল খাওয়া শেষ হয়েছে। গ ভাই এসে কেমন আদর করে কোলে তুলে চলে গেল। গ ভাইকে কিছু বলত না, আমাদের দেখলে ভয় দেখাত। বাঘটাকে দেখলে আমরা যেমন ভয় পেতাম, তেমন আমোদও পেতাম বেশ। ও যেন সেটা বুঝত, বুঝেই ভয় দেখাত। যেন আমাদের সাথে খেলতেই আসত, কাউকে তো আঁচড়াত-কামড়াত না। বাঘটা মরে গেলে আমাদের খুব দুঃখ হয়েছিল।

সেজো ভাই পাখি শিকার করত। দুই একদিন পর পরই খুব সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসত। তার মধ্যে ঘুঘু পাখিই বেশি থাকত। বক, মাছরাঙা, শানকৌড়ি আরো কি কি সব পাখি—এখন অত নাম মনে নেই। দেখলেও বোধ হয় চিনতে পারব না। সেজো ভাই পাখির গোস্ত খেতে খুব ভালোবাসত, নারকেল দুধ দিয়ে

ফুলা করে দিতে হতো। বাঘটাকে তো রোজ দু একটা খেতে দিতে হতোই।

ছোট ভাইও শিকার করতে পারত। আর একদিন শোনা গেল গ্রামে বাঘ এসেছে, কে একটা লোক রাত্রে ঘরের বারান্দায় শুয়ে ছিল, বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সকালে উঠে সেজো ভাই এই খবর পেয়ে শিকারে যাবার জন্য সাজতে লাগল। ফুলা ভাইকে খবর পাঠান, আরো কতকগুলো লোক সঙ্গে নিল। যারা একটু সাহসী, শিকার করতে জানে, এ রকম দেখে কয়েকজন লোক নিয়ে ফুলা ভাইও বন্দুক নিয়ে এসেছিল।

সবাই মিলে বাঘের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। পায়ে হেঁটে যেতে হবে, ঘোড়া তো যাবে না। ঘোড়া বাঘের গন্ধ পেলে এগোবে না। পায়ে হেঁটে বনে বাদাড়ে বাঘ খুঁজতে হবে। ওরা সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে বাঘ খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সেদিন বাঘ দেখতে পাওয়া গেল না। বেলা যখন ৩টা-৪টা বাজল, তখন সকলে শিকার না পেয়ে বিকল মনে ফিরে আসছিল। খানিকটা পথ এগিয়ে এসে সঙ্গের একটা লোক দেখতে পেল পথের এক পাশে ঝোপের মধ্যে গুটি সুটি হয়ে একটা বাঘ বসে আছে। দেখা মাত্র আঙুল দিয়ে বলে উঠল — সেজো মিয়া ঐ···আর বলা মাত্র বাঘটা লাফ দিয়ে সেজো ভাইয়ের উপর পড়েছে। সেজো ভাই প্রস্তুত ছিল না, সেখানেই কাঁটা জঙ্গলে পড়ে গেল। কাঁটার উপর শুয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে ঘাড় আর চোখ মুখ ঢেকে ফেলল। ফুলা ভাই তাড়াতাড়ি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল। বাঘ তো পালাল, বাঘ পালালে দেখা গেল সেজো ভাইয়ের ঘাড় ভাঙতে পারে নি, তবে হাতের বাজুর উপরে তিন চারটা থাবা মেরেছে। নখ বেশ বসে গেছে, রক্ত পড়ছে।

সকলে মিলে ঘাড়ে করে তো সেজো ভাইকে বাড়ি আনল। বাড়িএনে রক্ত টক্ত ধুয়ে বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও এসে গেল। ডাক্তার দুই তিন জন মিলে চেষ্টা করল ; কিন্তু কিছু করতে পারল না, সাত-আট দিন বেঁচে ছিল, তার পর মারা গেল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে আত্মীয়-স্বজনদের কাঁদিয়ে, গ্রামবাসিদের কাঁদিয়ে চিরনিদ্রায় কোলে বিশ্রাম নিল।

ছোট ভাইয়েরও শিকারে শখ ছিল। সে আবার টাউনের হোস্টেলে থেকে স্কুলে পড়ত। যখন বাড়ি আসত, তখন পাখি শিকার করত। সেজো ভাইয়ের মতো বাঘ খুঁজতে জঙ্গলে যেত না। গ্রামে বাঘ আসলে কল পেতে রাখত। কখনো বাঘ পড়ত, কখনো পড়ত না।

একদিন একটা বড় অজগর সাপ দিনের বেলা আমাদের দীঘির ধারে একটা ছাগলের বাচ্চা গিলছিল, অর্ধেক গেলা হয়েছে এই অবস্থায় ছোট ভাই দেখতে পেল। হাতের কাছে কুড়ুল ছিল সেটা নিয়ে সাপটার সামনে যেয়ে মাথার মাঝখানে একটা কোপ মারল আর এক কোপেই মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেল। সাপটা মরে নি, কিন্তু তার আর কোনো ক্ষমতা থাকল না। তখন সবাই মিলে সাপটার

গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বাড়ির ভিতর নিয়ে এল আমাদের দেখাতে। বাড়ির উঠানে একটা মোটা বাঁশ পোতা ছিল, সেই বাঁশে সাপের গলার দড়িটা বাঁধল। আমরা তুলনা করে দেখলাম যে সাপটা এত মোটা যে ঐ রকম দু'টো কি তিনটে বাঁশ এক সাথে করলে তবে সাপটার সমান মোটা হয়। আর লম্বায় আট হাত। সাপটা ছট ফট করছিল। একবার কুণ্ডলি পাকায়, আর একবার লম্বা হয়ে যায়। টানা টানিতে বাঁশটা ভেঙে গেল, কুণ্ডলি পাকানে একটা ধামার মতো দেখাচ্ছিল। তখন সাপটাকে নিয়ে শিউলি ফুলের গাছে বেঁধে দিল। সেই দিন টুকু আর রাতটা সেখানেই বাধা থাকল, আর গর্জন করতে থাকল সমস্ত রাত। গর্জনের শব্দটা গরুর গর্জনের মতো শোনাচ্ছিল। সাপটার গায়ে সুন্দর নক্সা কাটা ছিল। ছোট ভাই বলল চামড়াটা রেখে দিতে, জুতো তৈয়ারি করালে বেশ হবে। এই রকম করে সকাল হয়ে গেল। সাপটাকে দু'টো বাঁশের সাথে জড়িয়ে দু'জন লোক কাঁধে করে সারা গ্রাম দেখিয়ে এনেছিল। পরে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাটির মধ্যে পুতে ফেলেছিল। সাপটার নাম শুনলাম চন্দ্রবোড়া।

আমার আব্বা স্কুল-কলেজে পড়ে ডিগ্রি পান নি, কিন্তু লেখাপড়া জানতেন কম না। আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা খুব ভালোভাবেই জানতেন। ইংরাজিটাই কম জানতেন। সব সময়ই সব রকম বই পড়তেন। কোরান হাদিস তো পড়তেনই, যেখানে যত তফছির তরজমা আলোচনা সবই পড়তেন। পুরান, বেদ, মহাভারত, রামায়ণ সব ছিল, বাইবেলও ছিল, আবার বন্ধে খৃস্টিয়ান বলে একটা বই ছিল তাও দেখেছি। কালিদাসের বইগুলোও ছিল, কত বড় বড় ডিকসনারি ছিল। আমার আব্বা এসব পড়তেন—আলোচনা করতেন, বলতে গেলে পণ্ডিত লোক ছিলেন। লিখতেও জানতেন ভালো। তাঁর হাতের লেখা বই আমি দেখেছি। 'পাষাণী' বলে একটা নাটক লিখেছিলেন। কবিতা লিখতে পারতেন খুব ভালো, কিন্তু একখানাও ছাপতে দেন নি। মার কাছে হাতের লেখা বই আমি দেখেছি, আর কি যে সুন্দর হাতের লেখা! যেন ছাপা অক্ষর, কবিতার বইও অনেকগুলো ছিল, অনেক রকমের কবিতা। তার মধ্যে কবিতায় একটা মিলাদ শরিফ লিখেছিলেন। একটা কবিতার দু লাইন আমার আজও মনে আছে, সেটা এখানে লিখে রাখলাম

দেখাও আমারে বিভু বারতুল্লা
কি রূপ ধর
যেখানে বরষিছে তব দয়া বারি
নিরন্তর॥

আমার মা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল করেছিলেন। স্কুলটা গড়ে উঠতে দু'বার করে দু জন ইনসপেকট্রেস ইনসপেকশনে গিয়েছিলেন। মিস বোয়াক আর মিস হৃদয়বালা। আব্বা খুব সুন্দর স্বাগতম কবিতা লিখেছিলেন। আর বড় আশা

সেগুলো ইনস্পেকট্রেসদের সামনে আবৃত্তি করেছিল। মার কাছে শুনেছি আর কোনো মেয়ে আবৃত্তি করতে পারে নি, ইনস্পেকট্রেসদের দেখে ভয় পেয়েছিল। আমার মা এমব্রয়ডারি ভালোই জানতেন। কারপেটের সেলাই কাটার কাজ সব জানতেন।

একবার যশোর টাউনে একটা শিল্প মেলা হয়েছিল। মা হাতের কাজ পাঠিয়েছিলেন। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাকে পুরস্কার পাঠিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ম্যাজিস্ট্রেট ইংরাজ ছিলেন। একটা সার্টিফিকেট আর প্রাইজ ছিল একটা সুন্দর সিনারি আঁকা পাটি, একটা পিতলের উট, আর সঙ্গে একটা মর্মরের সাবানদানি। প্রাইজগুলো মার কাছে অনেকদিন ছিল। আমি বড় হয়ে দেখেছি। পাটিটা আমার বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিলেন।

মার স্কুলটা যখন ভালোভাবেই গড়ে উঠল গভর্নমেন্ট থেকে সাহায্য ধার্য করা হল। মার পঁচিশ টাকা করে সাহায্য ধার্য করা হল। যে মাসে মাইনে পাবার কথা হল, সেই মাসেই আমার আব্বা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। আমার মা বাড়িতে গণ্ডগোল নিবারণের জন্য স্কুল তুলে দিলেন। সে স্কুলে আমার মা ছাড়া আর তো টিচার ছিল না। মা তখন আব্বার রোগশয্যার পাশে দিন কাটাতে লাগলেন। এই রোগ নিয়ে আব্বা নয় মাস বেঁচে ছিলেন।

আর অসুখ হবার আগে—অনেক আগে—বঙ্গচ্ছেদের সময় যে আন্দোলন হয়, সে আন্দোলনে আব্বা যোগ দিয়েছিলেন। নিজে পারতপক্ষে বিলাতি কাপড় কিনতেন না। নিজে পরতেন না বা মাকেও পরতে দিতেন না। ঢাকাই, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙ্গা এই সব দেশি তাঁতের শাড়ি পরতেন। তখনকার দিনে বিলাতি শাড়িগুলো খুব সুন্দর ছিল।

বাড়িতে নিয়মিত সংবাদপত্র আসত। আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, মিহির, সুধাকর। আমার মা এই সব কাগজ পড়তেন। আমার আব্বা মারা যাবার পর মা শুধু পড়াশোনা করেই দিন কাটাতেন। উর্দু ফারসি গজল পড়তে শুনতাম। উর্দু খেলাছেতল আম্বিয়া খুলে ইউসুফ জোলেখার কাহিনীর গজল প্রাণঢালা সুরে পড়তেন। পড়ে যে কাউকে শোনাতেন, এমন নয়। নিজের মনের তৃপ্তির জন্য পড়তেন। একটা ফারসি গজল শুয়ে শুয়ে পড়তেন আর চোখ দিয়ে পানি পড়ত। গজলটা যতটুকু পারলাম ততটুকু লিখলাম :

কাদেরে কুদরত তো দারি
হরচে খাহি আকুনি।
মুরদারা জানে তুবখসি জিন্দারা
বেজাঁ কুনি।
গোই গেদারে মুলখ বখসি
গোনাহেরে চুঁ গাদা।

আজ বরায়ে নিম নানে
দর বেদারে হয়রা কুনি ॥

আর একটা পড়তেন :

বাদশাহ জারমে মারা
দর গোজার।
মা গোনাগারেন
তু আমজগার।

মা গান শুনতেও খুব ভালোবাসতেন। এক একদিন জোহরের নামাজের পর সব চাকরানিদের বলতেন গান গাইতে। সবাই এসে বারান্দায় বসলে বারান্দাটা প্রায় ভরে যেত। অন্য কেউ থাকলে তাকে বলতেন। পঞ্চাশ জন ছিল। তখন বারান্দাটা সব ভরে যেত। এখন তো অনেকে ছেড়ে গেছে। অনেকে মরে গেছে। মিয়া নয়বার সাথে সাথে সবাই যেন ভাটার টানে চলেছে। মা ওদের গান গাইতে বলতেন, তার মধ্যে যারা জানত গাইত। মা আবার এক একটা গানের ফরমাস দিতেন। ওরা যদি না জানত তো পাড়া থেকে লোক ডেকে আনত। অধিকাংশ বিয়ের গানই গাইত। হলদি কোটার গান। হলুদ মাখাবার গান। কনে সাজাবার গান, বর আসবার গান, আবার কনে বিদায়ের গান। আবার মা ফরমাস করলে ভাবের গান, মারফতি গান সব গাইত। আবার এক এক সময় গানের ভিতর দিয়ে কত কাহিনী বলত। শুধু গানের ভিতর দিয়ে যে কত সুন্দর কাহিনী হতো আর সে গানের ভিতর কত যে মনের ব্যথার প্রকাশ, শুনতে শুনতে অনেকে কেঁদে ফেলত। খুব সুন্দর করুণ সুরের গানের ভিতর দিয়ে একটা কাহিনী বলত আমাদের একজন চাকরানি। আবার আমার বড় আপাও সেই গানগুলো গাইত। আমি খুব শুনতাম, আমার মনে খুব লাগত। কাহিনীটা সংক্ষেপে বলছি।

রাজার মেয়ে কমলমণির ভাগ্যদোষে তার বাবার একজন চাকরের সাথে বিয়ে হল। চাকরটার নাম ছিল গোলাম হাদি। বিয়ের সময় গায়ে হলুদ থেকে কনে সাজান—কি রকম কাঁদন মেয়ের, 'গোলাম হাদির শাড়ি গয়না না পিন্দাইও মোরে! তবু যখন বিয়ে হয়ে গেল, মেয়ে কেঁদে কেঁদে বিদায় নিল। 'জন্মের মতো বিদায় দাও।' তারপরে মায়ের কাছ থেকে ছোরা চেয়ে নিল। বলল, 'আমি ছোটবেলায় যে ছোরাখানা দিয়ে যুদ্ধ শিখতাম, সেই ছোরাখানা আমাকে শৈশব-স্মৃতি স্বরূপ দাও।' ছোরাখানা দিলে ছোরা হাতে নিয়ে পাল্কিতে উঠল। পথে যেতে যেতে ছোরাখানা নিজের বুকে বিদ্ধ করে মরে গেল। মান বাঁচাল। পাল্কির পায়া বেয়ে রক্ত পড়ে। পথের চাষী ভাইরা ডেকে বলে রক্ত কিসের? বেহারা উত্তর দেয় পান খেয়ে বুঝি পিক ফেলেছে। পাল্কি ভার হয়। এক বেহারা আর এক বেহারাকে জিজ্ঞাসা করে, পাল্কি ভারি কেন হয়? নিজেদের ভিতর দিয়েই উত্তর দেয় ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। বাড়ি নিয়ে দেখে পাল্কির ভিতর রক্তাক্ত দেহে পড়ে

আছে। তখন গোলাম হাদির কি কাঁদন। 'খাইলাম না ছুঁইলাম না বধের ভাগি হলাম···আমি যে রাজার ছেলে—না চিনলা মোরে—তোমারে পাবার লাগা এত দিন চাকরি করি তোমার বাপের ঘরে।'

আমি ছেলেবেলায় খুব পল্লীগীতি শুনতাম। তাই বুঝি আমার এখনো পল্লী-গীতিই ভালো লাগে। গানের ভিতর কি যে প্রাণ আর যে কত সুন্দর সুন্দর বিয়ের গান। মা তো তিন চার দিন পর পরই গান গাওয়াতেন।

সন্ধ্যাবেলা গান হতে পারত না। কারণ মা ও আরো অনেকে মগরেবের নামাজ পড়ে তছবি দোয়া দরুদ পড়ত। তারপরে এশার নামাজ পড়ে তবে উঠত। আবার আমরা পড়াশোনা করতাম। কাজেই রাত্রে খুব জমত না। আমার তো পড়তেই ঘুম আসত। সুতরাং গানের যে আসর তা জমত জোহরের পরই।

ক্রমে আমি বড় হতে লাগলাম। আমার পড়াশোনা করতে হতো মার কাছেই। পড়তাম তো বাংলা, উর্দু, আর আমপারা। উর্দু পড়তে আমার খুব কষ্ট হতো। পড়তে চাইতাম না। তার জন্য যে আমি মার কাছে কত মার খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আমার বয়স যখন ছয় কি সাত, তার মধ্যে আমার দুই তিন খানা উর্দু বই শেষ হয়েছে। মেশকাতুল জান্নাত, বেহেশ্‌তে জেওর পড়া নিয়ে কণ্ঠস্থ করে পড়তে হতো। মার ইচ্ছা ছিল সবা সারয়ত মসলা মসায়েলগুলো আমাকে সাত বছরের মধ্য পড়িয়ে দিয়ে আট বছরে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তখন তো আর পড়াশোনা হবে না। এই সব মসলার বই পড়বার পরও যখন আমার ভালো করে উর্দু চলল না তখন মিলাদ শরাফ, বাগ বাহার আরো কত কি গল্পের বই পড়তে দিতেন। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য মা নিজে কত গল্পের বই পড়ে পড়ে শোনাতেন। কত গজল পড়ে পড়ে শোনাতেন।

আমার এক দূর সম্পর্কের চাচি আম্মা ছিলেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তিনি সারাদিন নামাজ রোজা নিয়ে থাকতেন। ফজরের নামাজ পড়ে তছবি পড়তে পড়তে এশরাকের নামাজ পড়তেন। এশরাকের নামাজের পর আজকা পড়তে পড়তে বেলা ন'টা বাজত। তখন চাহাসতার নামাজ পড়তেন। চাহাসতার নামাজের পর আরো কিছুক্ষণ দরুদ শরীফ পড়ে তবে জায়নামাজ থেকে উঠতেন। তারপরে নিত্যকর্ম সারতে তার বেলা বারোটা বাজত। বেলা বারোটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাতে যেতেন। বেলা দু'টার সময় উঠে জোহরের নামাজ পড়তেন। জোহরের নামাজের পর কোরান শরীফ পড়তেন। আমার মা আরো অনেকে ঐ সময় কোরান শরীফ পড়তেন। আছরের নামাজের পর যার যা কাজে উঠে যেত। চাচি আম্মাও উঠতেন, তবে তিনি সে সময় পারস্য কবির দেওয়ান-ই-হাফেজ, পন্দেনামা আমাকে পড়ে পড়ে শোনাতেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখে পানি এসে যেত। আমি

তাঁর সাথে পড়তাম। যেখানে না বুঝি, বুঝিয়ে দিতেন। তিনি আমাকে একটা পকেটমাপা বাংলা তরজমা সহ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আমার একটা চিহ্ন তোমার কাছে রেখে দাও। আমাকে কত দোয়া দরুদ শেখাতেন। সাথে করে ফরজ নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়াতেন। বলতেন সাত বছর বয়সে সব মুসলমান ছেলেমেয়েদের নামাজ পড়তে হয়। আর দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে তাকে মেরে নামাজ পড়াতে হয়। হাদিছের হুকুম। আর তোমরা তো সৈয়দ বংশের ছেলেমেয়ে। তোমরা তো হয়রত রছুলুল্লার বংশধর। তোমাদের পূর্ব পুরুষে কে কোন শহীদ নাজেল হয়েছে। এত বড় সম্মানের অধিকারী হয়ে তার যোগ্য হবার চেষ্টা করতে হবে। খোদার কাছে শোকরানা আদায় করতে হবে। তোমাদের বংশে কত পীর আউলিয়া দরবেশ হয়ে গেছেন। তোমরা যদি ভালো না হবে তো কি জবাব দেবে কেয়ামতে তাদের কাছে আর খোদার কাছে? খুব ভালো ভালো কথা তিনি বলতেন। মাগরেবের নামাজের সময় হলে অজু করে নামাজ পড়তে বসতেন। এই যে সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়তে বসতেন, সমস্ত রাতের মধ্যে আমি আর তাঁকে বিছানায় পিঠ দিতে দেখতাম না বা কারুর সাথে কথা বলতে দেখতাম না। পরদিন বেলা ন'টা পর্যন্ত একই জায়গায় বসে থাকতে দেখতাম। আমার মার কাছে জিজ্ঞাসা করে তখন তাঁর সম্বন্ধে যে কথা শুনেছিলাম, তা আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে।

মায়ের কাছে জেনেছিলাম যে তিনি রাত দশটায় ভাত খেয়ে টাটকা অজু করে এশার নামাজ পড়েন। নামাজান্তে তছবি তেলাওত পড়তে পড়তে রাত বারোটা বাজত, বারোটায় উঠে ঘুমান। আবার ঠিক রাত দুটোতে উঠে অজু করে তাহাজ্জতের নামাজ পড়তেন। তাহাজ্জতের নামাজ পড়তে পড়তে ভোর হয়ে যেত। আবার টাটকা অজু করে ফজরের নামাজ পড়তেন। আমি এই সময় ঘুমিয়ে থাকি, তাই কিছু দেখি না।

আমার বড় ভাই কলিকাতাতে ল পড়তেন। আব্বা ইন্তেকাল করবার পর প্রায় বছর দুই বাড়িতে ছিলেন। জমিদারি সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখা শোনা করে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে রেখে ল পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি কলিকাতাতেই থাকতেন। মাঝে মাঝে ছুটি হলে বাড়ি আসতেন। যখন আসতেন খাবার জন্য অনেক কেক বিস্কুট মিঠাই আনতেন, ছবির বই আনতেন। বড় ভাই বাড়িতে আসবার সময় হলে আমার মাও অনেক রকমের খাবার বাড়িতে তৈয়ারি করাতেন। বড় ভাইও নিয়মিত নামাজ রোজা করতেন। রোজার সময় আমাদের মসজিদে খতম তারাবি পড়ান হতো। তারাবি খতম হলে, রোজাদার খাওয়ান হতো। রোজার সময় দিল্লি থেকে একজন সওদাগর আসত। কিছুদিন আমাদের বাড়িতে থেকে অন্যত্র জিনিসপত্র বিক্রয় করত। আর আমাদেরকে আতর গোলাব

আর কেওড়া, মাথায় দেবার জন্য তেল, অনেক করে এক বছরের মতো দিয়ে যেত। তেল অধিকাংশ বেলা-চামেলি থাকত।

আমাদের ভাঁড়ারের জিনিসপত্র বাইরের ঘরে থাকত। একজন মুহুরি ছিল, সে কত কেনা হল আর কত খরচ হল হিসাব রাখত। আর একজন হিসাব করে মেপে বের করে দিত, ছোট বড় মাথাপিছু এক পোয়া করে চাল এক বেলার জন্য থাকত। অন্য বেলায় আবার ঐ রকম করে মেপে দিত। চাকর-চাকরানিদের সবার এক পোয়া করে চাল দেওয়া হতো। তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবার হিসাব করে যার যত বেশি ছেলেমেয়ে সে তত বেশি চাল পেত। বাইরে দপ্তরখানে যেদিন যত লোক খেত, তত পোয়া চাল পাঠাত। আর সে খুব ভালো চাল। ভালো মিহি বরিশালের বালাম। এখন সে চাল পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন রাঁধা হতো। আমাদের জন্য যা রাঁধত সেখান থেকে ভাত বাঁচত। আমাদের সামনে যারা খাওয়াত, তারা সে ভাত খেত। তাদের চাল কখনো অল্প-স্বল্প রাঁধা লাগত—কখনো লাগত না। সবাই প্রায় চাল জমা করত। দুই তিন বস্তা হলে পাড়ায় বিক্রয় করত।

একবার অজন্মা হয়ে গ্রামে একটু দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপও বেড়ে গেল। ঘরে ঘরে শুধু মড়ার খবর শোনা যেতে লাগল। একে তো গ্রাম। টিউব ওয়েলের তখন জন্মই হয় নি; নদী দূরে, পুকুরের পানি সবাই খেত, ম্যালেরিয়ায় ভুগত। আবার কলেরা বসন্তও দেখা যেত মাঝে মাঝে। ডাক্তার ছিল নাম মাত্র। খুব ভালো চিকিৎসা হতো না। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যতটা সম্ভব আমাদের বাড়ি থেকে সাহায্য করা হতো।

একদিন দুপুর বেলা অপূর্ব সুন্দরী একটা বউ ততোধিক সুন্দরী আট-দশ বছরের ছোট দুটো মেয়েকে সাথে করে নিয়ে এসে আমার মায়ের পায়ের কাছে পড়ে সাহায্য চাইল। আমরা দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম, একে তো আমরা কোনোদিন দেখি নি আর এত সুন্দর তো বাঙালির ঘরে নজরে পড়ে না! আমার দেখে ঠিক মনে হল ঠাকুরদাদার ঝুলিতে যে রূপকথা পড়েছি, সওদাগরের বউকে তার ননদ ঝাঁটা মেরে বের করে দিয়েছে গয়না শাড়ি সব কেড়ে নিয়ে, একটা ছালা পরনে, ছালা গায়ে রুক্ষ জটা পড়া চুল নিয়ে বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছে! ঠিক সেই ছবিটা আমার চোখে ভেসে উঠল। খাটো একখানা ময়লা কাপড় পরা। সমস্ত গা ভালো করে ঢাকে নি। মাথায় কত দিন তেল পড়ে নি। রুক্ষ চুল জটা হয়ে পায়ের উপর দিয়ে দড়ি দড়ি ঝুলছে। কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে দুঃখের কথা জানাতে লাগল। তার স্বামীর আজ অনেক দিন যাবত অসুখ, কাজে যেতে পারে নি, ঘরে যা ছিল ঘটি-বাটি, কাপড়-চোপড় সব বেচে চিকিৎসা চালিয়েছে, তবু অসুখ সারে নি। এখন আরো বেশি শয্যাগত হয়ে গেছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠতে পারে

না। আমি বাচ্চা দুটো নিয়ে না খেয়ে মরবার পথে চলেছি। আমাদের কিছু সাহায্য করুন। মা তাকে তখনকার মতো সের পাঁচেক চাল, কিছু টাকা আর একখানা কাপড় দিলেন। বলে দিলেন দরকার মতো আবার আসতে। বাইরে গোমস্তাদের বলে পাঠালেন ওর স্বামীকে যেন চিকিৎসা করান হয়। আর তাদের দরকার মতো সাহায্য করা হয়। চাকরানিদের কাছ থেকে ওর পরিচয় ভালো করে শুনলেন।

ওর বাপ-মার ঠিকানা কেউ বলতে পারে না। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে একটা পথের ধারে গর্তের ভিতর ফুল নাড়ি সমেত একদিনের মেয়েটাকে ফেলে গিয়েছিল। গ্রামের একটা অপুত্রক বুড়ি তুলে নিয়ে পালন করেছে। বিয়ের বয়েস হলে নেছারের সাথে বিয়ে দিয়েছে। মা কিন্তু ওর কথা খুব বলতে লাগলেন। জন্ম যে ভাবেই হোক, ওর স্বভাবটা কি সুন্দর। কি দয়া-মায়া, স্বামী ভক্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা। এ রকম ভদ্রতা অনেক ভদ্র ঘরের শিক্ষিত মেয়ের মধ্যেও দেখা যায় না। খোদা যে কার মধ্যে কি দিয়েছেন, বোঝা যায় না। অপবিত্র ভাবে জন্ম নিলেও ও তো অপবিত্র নয়। ও তো ফুলের মতোই পবিত্র আর সুন্দর! গোমস্তাদের বলে পাঠালেন, নেছার যদি মারা যায় তো ওর বউয়ের যেন কোনো কষ্ট না হয়। আবশ্যে ওকে আমার কাছে এনে দেবে।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন জার্মানে-ইংরাজে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। মা প্রত্যেকদিন দৈনিক সংবাদপত্র পড়তেন আর যুদ্ধের খবর বলতেন। মা আর আমি তখন সব সময় বই পড়তাম। পুঁথি ছিল। মোটা মোটা, বড় বড়। শাহনামা, আমির হামজা, কাছাছুল আম্বিয়া, শহীদে কারবালা, চাহার দরবেশ ইত্যাদি। আবার উর্দুতেও ওই সব বই ছিল। আমি তো উর্দু পড়তে চাইতাম না, পুঁথিই পড়তাম। কাছাছুল আম্বিয়াতে একদিন জম জম বাদশার কাহিনী পড়ে আমি ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম—কত দিন যে ঘুমাতে পারি নি, রাত্রে শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতাম।

মুছা নবী পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে একটা মড়ার মাথার খুলি দেখতে পেয়ে খোদার কাছে মোনাজাত করেছিলেন, হে আল্লা আমাকে বলে দাও এটা কার মাথা, পাপীর কি পুণ্যবানের? রাজা কি রাখাল, পুরুষ কি মেয়ে? খোদা হুকুম দিলেন, তুমি তোমার হাতের লাঠি ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস কর, ও-ই সব কথা বলবে। তখন মুছা নবী হাতের লাঠি ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসা করলেন (মুছা নবীর হাতের লাঠির অনেক রকম আশ্চর্য গুণ ছিল), হে খুলি, তুমি খোদার হুকুমে তোমার অবস্থা আমাকে বর্ণনা কর। তখন খুলি বলতে লাগল : আমি একজন মহা বিক্রমশালী রাজা ছিলাম। কিন্তু খোদাকে চিনতাম না। অগ্নি উপাসক ছিলাম। কেবল নিজের খেয়াল খুশি মতো প্রত্যেক দিন হাজার হাজার মিসকিন খাওয়াতাম। এইটুকু আমার পুণ্য ছিল। যেদিন মালেকুল মওত আমার জান কবজ করে নিয়ে গেল,

সেই দিন বুঝলাম সেই মওতের বর্ণনা, আর দোজখে যাবার পর বুঝলাম দোজখের বর্ণনা। এক এক ক'রে সে তখন সাত দোজখের বর্ণনা দিতে লাগল। সে যে কি ভীষণ বর্ণনা—পড়তে বসলে মাথা ঘুরে আসে। যেটুকু পুণ্য ছিল সেই পুণ্যের জোরে আপনি যাবেন যে পথ দিয়ে সেই পথে ফেলে গেছে। হে রসুলুল্লা, আমি এক হাজার বছর দোজখে ছিলাম। মুছা নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও? মাথার খুলি উত্তর দিল, আমি আবার বাঁচতে চাই। মুছা নবীর দোয়ায় আবার সে তার দেহ পেয়েছিল। এক হাজার বছর পরমায়ু পেয়েছিল। এবার সে যতদিন বেঁচেছিল, খোদার এবাদতই করেছে।

শাহনামায় অনেক রাজা বাদশার কথা, রুস্তমের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী, আমির হামজার অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী পড়তাম আর পড়ে পড়ে চাকরানিদের শোনাতাম। আগেই বলেছি, আমাদের বাড়ি বই ছিল অনেক। মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলি। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলি। দীনবন্ধু, হেমচন্দ্রের, রমেশচন্দ্রের ও আরো অনেকের। 'জন্মভূমি' বলে মাসিকপত্র একবছরের এক সঙ্গে ক'রে বাঁধানো তিন-চার খানা। 'এসলাম প্রচার' মাসিক পত্র এক সঙ্গে ক'রে বাঁধানো তিন-চার খানা। আরো কত জনের কত উপন্যাস। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'। এই কঙ্কাবতী বইটা আমি খুব পড়তাম। আর একবার পড়ে সাধ মিটত না। কঙ্কাবতীর দুঃখে মুষড়ে পড়তাম। নাকেশ্বরীর ভয়ে সন্ধেবেলা ঘর থেকে বারান্দায় যেতে পারতাম না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে নাকেশ্বরীর রূপ ভাবতাম। আর ভাবতাম কঙ্কাবতী নৌকা শেল কোথা? মাছেরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে। মশা, ব্যাং সবাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক করত। আরো সব গ্রন্থাবলি পড়তাম। উর্দু পড়ার পাট একেবারে তুলে দিলাম।

জন্মভূমি মাসিক পত্রিকার মধ্যে বঙ্গচ্ছেদের সে আন্দোলন পড়লাম। তিন-চার জন যুবক দেশের জন্য আন্দোলন ক'রে জেলে গেছে। তাদের সে জেলের বর্ণনা পড়লাম। মাটির পাত্র দিত। তাতেই তাদের মুখ হাত ধোয়া, শৌচ কার্য আর খাওয়া সবই করতে হতো। একখানা কম্বল দিত, তাই খানিকটা পেতে আর খানিকটা গায়ে দিত, আরো কত কষ্ট সয়ে প্রহরীদের ধমক খেয়ে হাসি মুখে গান ক'রে গল্প ক'রে কাটাত। মার সাথে এই সব ছেলেদের গর্বে আমার বুক ফুলে উঠত।

ইতিমধ্যে আমার বড় ভাই যশোর টাউনে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে আমাদিগকে নিতে এলেন। ল' পাশ ক'রে তিনি তখন যশোর জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেছেন। যশোর থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এলেন। ঘোড়ার গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত এল না, এক মাইল দূরে থাকল। আমরা আবার সেই রকম পাল্কি ক'রে পাল্কির উপর কাপড়ের পর্দা দিয়ে লোকজন নিয়ে

রওয়ানা হলাম। পাল্কিটা গাড়ির গায়ে লাগিয়ে ধরত, আবার দু'পাশ দিয়ে পরদা ধরত, আমরা পাল্কি থেকে গাড়ির ভিতর উঠতাম। গাড়ির উপর একটা মোটা বড় চাদর দিয়ে বেঁধে দিত। আমরা বেলা দশটার সময় গাড়িতে উঠলুম। আর বাসায় পৌছলাম বেলা ছয়টা কি সাতটা।

আমার আর একজন বোন ছিল। সে আমাদের কাছে থাকত না। তার মা মারা যাবার পর সে তার খালাম্মার কাছে থাকত। তার মা মারা গিয়েছিল অতি শৈশবে। তখন তার খালাম্মা তাকে নিয়ে লালন-পালন করেছে। সে আমার থেকেও চার বছরের বড়। আমরা যখন যশোর এলাম, তখন তাকেও সঙ্গে আনলাম। তার খালাম্মা স্বেচ্ছায় দিয়ে পাঠালেন। মেয়ে এখন বড় হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে তো। বাপ-মা নেই। ভাইকে তো দিতে হবে। আমরা যশোরে এলাম অনেক কম লোক নিয়ে। আমরা দুই বোন। মা আর একজন গরিব ভদ্রঘরের মেয়ে, আমাদের নায়েবের তালাক দেওয়া বউ রাঁধুনি হয়ে এল, আর তিন জন ঝি, দুই জন চাকর। আর যশোরে হোস্টেলে থেকে আমার আর দুই জন ভাই পড়ত। তারাও হোস্টেল ছেড়ে বাসায় এসে উঠল। বাসাটা বেশ ছোট আর সুন্দর দেখতে। দোতলা বাড়ি উপরে নিচে ছয় সাতটা কামরা। উঠানের এক পাশে রান্না ঘর, এক পাশে কাঠের ঘর. সামনে একতলায় দুই কামরা যুক্ত বৈঠকখানা। ছোট চার কোণা উঠান। বেশ লাগত।

আমাদের বাসার তিন দিকে রাস্তা। রাজপথ। আর এক পাশে কোচোয়ান পাড়া। তার পরেই বাজার। বাড়ির সামনে যে রাস্তা তার পরেই ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল। পাশে পাশে নানা রংয়ের দোকান, ডাক বাংলো—সব আমাদের উপরতলা থেকে দেখা যেত। আর দু পাশের রাস্তার পরই দু'জন উকিলের বাড়ি। বাড়ি দু'টো এত কাছে যে ওদের বাড়ির বৌ-ঝিদের সাথে কথা বলা যেত। আমরা তো কারুর বাড়ি যেতাম না। আমার ভাইরা যখন বাড়ি না থাকত, দুপুর বেলা জানলা দিয়ে তাদের সাথে কথা বলতাম। বেশ লাগত সুন্দর ছোট বাড়িটা। গ্রাম ছেড়ে টাউন, বাইরের রাস্তা-ঘাট, দোকান-বাজার, লোকজন সবই দেখা যেত। তাছাড়া আমার মেজ বোন আমার সঙ্গী হল খেলার। আমরা দুই বোনে মিলে ছাদে উঠতাম, আবার নিচে নামতাম। কিন্তু কি ভীষণ পরদা, ছাদে উঠলে কি ভুলবশত দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে যদি আমার ভাইদের মধ্যে কেউ দেখতে পেত তা হলে মারতে আসত। তবু লুকিয়ে দুপুর বেলা যখন কেউ বাড়ি থাকত না তখন ছাদে উঠতাম। ছোট টাউন। তিনতলার উপর উঠলে অনেক কিছুই দেখা যেত।

আমাদের বাসা থেকে আর একটা বাসার পরই একটা মসজিদ ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ছোট মেয়েদের একটা মক্তব ছিল। অনেক কোচোয়ান পাড়ার মেয়েরা তো আসতই, তাছাড়া অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরাও আসত। স্কুলের গাড়ি ছিল,

ঘোড়ার গাড়ি। স্কুলের গাড়িতে ক'রে দূর দূর থেকে মেয়েরা আসত। আমার ঐ মক্তবে যেতে খুব ইচ্ছা হতে লাগল। খুব উৎসাহ নিয়ে আমি মাকে আর ভাইদের বলতে লাগলাম। মা রাজি হলেন; কিন্তু ভাইদের রাজি করান গেল না। ভাই বলেন বেপরদা হবে। মা বললেন, ঘোড়ার গাড়ি তো আছে, আর বাড়ির পাশে স্কুল, মেয়ে ছোট—মোটে সাত বছর বয়স। আর কত ভদ্রলোকের মেয়েরাই তো যায়। ভাই উত্তর দিলেন, গাড়ির থেকে নামবার সময় তো কেউ পরদা ধরবে না। স্কুলের দরজার গায়ে গাড়ি লাগলে কি হবে, নামবার সময় রাস্তা দিয়ে তো দেখা যায়। কোনো যুক্তিই ভাইয়ের কাছে টিকল না। আমার স্কুলে যাওয়া হল না। বাড়ি বসে বসে ইঁচড়ে পাকতে লাগলাম।

কোচোয়ান পাড়ার মেয়েরা টিফিনের ছুটি হলে আমাদের বাসায় আসত। তাদের আমি বলে দিতাম আসতে। আমার সমবয়সী মেয়েরা কি আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট বা বড় আসত। আবার সময় হয়ে গেলে ছুটে চলে যেত। আমিও তাদের সাথে সাথে ছুটে আমাদের বাড়ির গেট পর্যন্ত যেতাম, বড় ইচ্ছা করত তাদের সাথে ছুটে চলে যাই। কিন্তু পারতাম না; ভয়ে ফিরে আসতাম। বুক ফেটে কান্না আসত। মনে হতো ওরা যদি আর একটু থাকত। ওদের দাদি-নানিরা দু' এক সময় আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসত। মার সাথে গল্প করত, ভক্তিভরে সালাম করত। বলত, সমস্ত জায়গা আপনার শ্বশুরের ছিল, আমরা আপনাদের প্রজা ছিলাম। এখন এসব জায়গা অন্য হিন্দু জমিদারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। আপনার শ্বশুর বিক্রি ক'রে গেছেন।

তখন ইংরাজে-জার্মানে খুব যুদ্ধ হচ্ছে। বাংলা দেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ হচ্ছে। রসদ সংগ্রহ করছে। আমাদের বাড়িতে খুব আলোচনা হতো। আমার ভাইয়ের উপর বোধ হয় কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব ছিল। মিটিংয়ে যাওয়া আসা করতে শুনতাম। আমি তখন ভালো ক'রে সংবাদপত্রের খবর পড়ে বুঝতে পারতাম না। তবে কবিতা টবিতা হলে যে ক'রে হোক পড়তাম। তখনকার সংবাদপত্রের কবিতা আমার আজও মনে আছে। আমি যখন যে কবিতা পড়তাম মুখস্থ হয়ে যেত, তা আর কোনোদিন ভুলতাম না। এই রকম কবিতা বেরোত :

ইংরাজ আর জার্মানে
লড়াই লেগেছে।
মরণ বাঁচন দায়
ছুয়ো পাল্লা লেগেছে।
হা দেখ ওই নয়ন মেলে
মায়ের বৌয়ের আঁচল ফেলে
বাংলা দেশের ছেলেরা
সব সেপাই সেজেছে।

প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে
যুদ্ধে যেতেছে।

এই রকম কবিতা অনেক বেরুত। বশোর থেকে অনেক সৈন্য সংগ্রহ হল। রাস্তা ভরে সব মার্চ করত, সারা টাউন যেন কাঁপত। আমি তখন হেমচন্দ্রের এক কবিতা পড়তাম। গ্রন্থাবলিটা সবই উল্টে পাল্টে পড়তাম

হোয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি
কারে উচ্চস্বরে ডাকিতেছি আমি
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী
আর কি ভারত সজীব আছে।
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত
বীর পদ ভরে মেদিনি দুলিত
ভারতের নিশি প্রভাত হইত
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।

আমি ঐ সৈন্যদের যত দেখতাম, তত ইচ্ছা করত ঐ কবিতাটা পড়তে। এক দিন পড়ছি বসে, আমার বড় ভাই এসে শুনল। শুনে বলল, ভালো ক'রে মুখস্থ ক'রে রাখ। ওদের বিদায় উপলক্ষে শনিবারে একটা মিটিং হবে, সেখানে তোকে নিয়ে যাব। আবৃত্তি করবি। আমি তো শুনে খুব খুশি। সবার সামনে আবৃত্তি করব, আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে। মিটিংয়ে যেতে পারব। আমি উদ্দাম উৎসাহ নিয়ে গোটা কবিতাটা মুখস্থ করলাম, অপেক্ষা ক'রে থাকলাম শনিবারের। সে শনিবার এল, মিটিংও হল। সময়মতো বড় ভাই কাপড়-চোপড় পরে মিটিংয়ে গেল, আমার সাথে কথাও বলল না। আমি ক্ষুণ্ন মনে বাড়ি বসে রাস্তার লোকজন দেখতে লাগলাম।

তাও কি ভালো ক'রে দেখবার যো আছে? পরদা ফেলে দিয়ে পরদার আড়াল থেকে দেখতে হবে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে। হায় রে কেন যে এত অবরোধ! আমির হামজার পুঁথিতে পড়েছি, মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে আসত। আবার এক এক দেশের রাজকন্যা ছদ্মবেশে পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেছে। আমাদের দেশের রিজিয়া, চাঁদ সুলতানারা রাজ্য পরিচালনা করেছেন। যুদ্ধ ক'রে রাজ্য জয় করেছেন; কিন্তু আমাদের কেন এমন ক'রে রেখেছে? হায় রে আমাদের কি দুর্ভাগ্য! এখনকার দিনে তো গল্প শুনি, হিন্দু মেয়েরা বি. এ পাশ করছে। গান গাইতে শিখছে। আমাদের ধর্মে তো গান শিখতে নেই। বাইরে বেরিয়ে লেখাপড়া শিখতে নেই, গলার স্বর কাউকে শোনাতে নেই, তাই কি সত্য? আগের দিনের মুসলমান মেয়েরা তো শুনি অনেক শিক্ষিতা ছিল।

একদিন আমি একটা উর্দু বই নিয়ে পড়ছি। আমার বড় ভাই এসে শুনলেন। খানিকক্ষণ ধরে শুনলেন, শুনে বইখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে টান দিয়ে ফেলে

দিলেন। বললেন ঠিক মতো পড়তে পারো না। উচ্চারণ হয় না। কিছু পড়তে জানেনা আবার পড়তে যায়। মা একটু রাগ করলেন, ভালো ক'রে পারে না বলে পড়তে হবে না? শিখবে কি ক'রে দিন দুনিয়ার কথা? চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে থাকবে তো। তাই বললেন, বাংলাতে বিস্তর বই হয়েছে। হাদিস, কোরান, ইতিহাস যা চান সব পাবেন। আমি তো শুনে খুশিই হলাম। উর্দু আমার ভালো লাগত না। আমি যেন বেঁচে গেলাম। খুব বাংলা বই পড়তাম। আমাদের তো অনেক ছিলই। তাছাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে চাঁদা দিয়ে সপ্তাহে দু'খানা করে বই দিত।

আমার মেজ আপা, মা সবাই বই পড়তেন। আমি কবিতার বই বেশি পছন্দ করতাম। হেমচন্দ্রের কবিতাবলিটা খুব ভালো ক'রে পড়তাম। কবিতাগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাব শতক, রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল, এই সব বই ভালো ক'রে পড়তাম। তা ছাড়া আমার আর তো কোনো কাজ ছিল না।

ইংরাজ তখন আমাদের দেশ থেকে সৈন্যদের জন্য রসদ যোগাড় করছে। কাজেই আমাদের দেশে চালের খুব দাম হয়েছে। ভালো চাল তো পাওয়াই যাচ্ছে না, চিনিও পাওয়া যাচ্ছে না। সবাইকে আলোচনা করতে শুনতাম, কি হবে। সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আবার আসবে। মানুষ আবার মানুষ খাবে। ইংরাজ আমাদের দেশে এসে কি সর্বনাশই না হল। এতকাল এত জুলুম গেল। নীল কুঠির জুলুম যারা না জানে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ পড়লে তারা বুঝতে পারবে। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাদের দেশ পরের হাতে তুলে দিয়েছে, তাই তো পড়ে পড়ে ইংরাজের জুলুম আর মার খেতে হচ্ছে। এখন আবার আমাদের দেশের সৈন্য না হলে তাদের দেশ বাঁচাতে পারছে না।

সেই হেমচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, রানীর ছেলের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বিদ্রূপাত্মক কবিতা। তার মধ্যে আমি দুই লাইন লিখছি

আমি বৎস তোর জননীর দাসী
দাসী পুত্র সব এ-ভারতবাসী—

দাসী পুত্র তো সব—তাই না মনিবের হয়ে জীবন দিতে গেছে। এ জীবনগুলো যদি আমাদের দেশ স্বাধীন করবার জন্য ব্যয় করত, তবে না একটা কাজ হতো। জীবন তো দিয়েছেও অনেকে। অনেক হিন্দু আর অনেক মুসলমান।

সবাই যার যা ক্ষমতা বা সুযোগ মতো ব্যয় করেছে। এদেশের কপাল পোড়া, তাই তো কিছু হচ্ছে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল। এখন পড়ে পড়ে ইংরাজরা মোক্ষম মার মারুক। দুই আনা দশ পয়সা ক'রে চালের সের হয়েছে। আমরা যেন কোনো রকম বাঁচছি; কিন্তু গরিব লোকেরা না

খেয়ে মারা যাবে।

মিহি চাল আর খাওয়াই যায় না। ক্রমে ক্রমে মোটা চাল আসতে লাগল। সবাই সেই চালের ভাত খেত, না খেয়ে আর কি করবে! আমি শুধু ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমাদের চাকরানিদের কাছে আগের চাল জমা থাকত, সেই চাল বদলে নিয়ে আমার জন্য আলাদা ক'রে ভাত রাঁধত। ক্রমে ক্রমে সে চালও ফুরাতে লাগল। শেষে রেঙ্গুনের চাল আসতে লাগল। আমি ভাত খাওয়া ছেড়েই দিলাম। চাল ভেজে খেতাম। আমাদের বাড়ির ভিতর কে যেন কাঠের গুঁড়ি এনে চালা করেছিল। আর সেই কাঠের গুঁড়ির ভিতর থেকে মোটা মোটা হলুদ রংয়ের পোকা বেরিয়েছিল। সেই পোকাগুলো দেখে আমি ঘৃণায় চোখ বন্ধ করতাম। নিচে আর নামতাম না। মনে হলে মাথা ঘুরে আসতে। ভাতের কাছে যদি একটু বসতাম, রেঙ্গুন চালের ভাত। হাত দিয়ে নাড়া চাড়া করতাম। মনে হতো পোকাগুলোর কথা। যেমন ক'রে কদবেলের ভিতর রূপকথায় রাজপুত্র ঢুকেছিল তেমনি ক'রে যদি এই মোটা ভাতগুলোর ভিতর পোকাগুলো ঢোকে? যেই মনে হতো অমনি ভাত ছেড়ে উঠে যেতাম। এমনি ক'রে না খেয়ে খেয়ে খুব অসুখে পড়লাম। সে অসুখ আর সহজে সারল না।

ইতিমধ্যে আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের ঠিক হল। আশ্বিন মাসে পূজার বন্ধে বিয়ে। আমরা শ্রাবণ মাসের শেষে বাড়ি গেলাম। আমার ভাইরা থেকে গেল, বন্ধ হলে যাবে। দেশে গিয়ে আমাদের আর আর চাকরানিদের কাছ থেকে চাল বদলিয়ে নিতে লাগলাম, এতেও আমার কিছুদিন চলল, পরে আস্তে আস্তে অভ্যাস হতে লাগল। এদিকে বিয়ের আয়োজনও খুব বড় রকম ক'রে চলল। অনেক চাল, ঘি, মুরগি-খাসি যোগাড় হতে লাগল। উঠানে বড় সামিয়ানা টানানো হল। পাড়ার মেয়েরা রোজই আসত বিয়ের গান গাইতে। প্রায় সারা দিন সে গান চলত। অন্যান্য গ্রাম থেকে কুটুম্বদের প্রায় এক মাস আগে থেকে আনা হল। বাক্সভরা কাপড় কেনা হল। যত লোক নিমন্ত্রণ করা হবে সবাইকে এক এক খানা ভালো শাড়ি দেওয়া হল। প্রত্যেক দিন পুকুর থেকে দশ বারো সের রুইমাছ কি কাতলা মাছ আসতে লাগল। আর কত রকম ক'রে যে রান্না হতো। এমনি ক'রে দিন কাটতে লাগল। বড় ভাই বরিশাল থেকে বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলেন। বউ খুব বড় লোকের মেয়ে আর খুব সুন্দরী। বউকে বরণ করবার জন্য কুলো বাজানো হল। উঠানে সামিয়ানার নিচে চৌকি পাতা হল। তার উপর লাল রংয়ের কাপড়। সারা উঠান, ঘরের সিঁড়ি আর ঘর পর্যন্ত কাপড় পাতা হল। কত রকমের ফুল দিয়ে ঘর সাজান হল। হৈ চৈ ক'রে বেড়াতে লাগলাম। আমাদের আনন্দ আর ধরে না।

প্রথম যারেই বউ ভের দিন ছিল। প্রত্যেক দিনই একটা ক'রে খাসি জবেহ্ ক'রে পোলাও রাঁধা হতো। আর বউ-ভাতের দিন তো অনেক খাসি জবেহ্

করা। বাইরে পুরুষ বাবুর্চি আনিয়ে রাঁধা হল। তার পর বউ আবার বাপের বাড়ি চলে গেল। গালে-গল্পে মুখরিত বাড়ি যেন শ্বাস ফেলে বিশ্রাম নিল। আমরাও যশোরে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে শোনা গেল সেই নেছার মারা গেছে, আর নেছারের বউকে নিয়ে কে যেন কোন কু-পল্লীতে বিক্রয় করতে গেছে। এই কথা শুনে মা লোক পাঠালেন। পেয়াদা পাঠালেন, যেখান থেকে হয় নেছারের বৌকে যেন ধরে আনা হয়। অনে খোঁজাখুঁজি ক'রে নেছারের বউকে দুই-তিন দিনের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু সে কেন গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল অনেক জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তা বলল না। এবার আমরা তাকে নিয়ে যশোর টাউনে চলে গেলাম। সে আমাদের নূতন চাকরানির পদে বহাল হল। ক্রমে ক্রমে আবার দেশের অবস্থা ফিরতে লাগল। চাল পাওয়া যেতে লাগল। কিন্তু আগের মতো অত ভালো না—মাঝারি দেশি চাল। একদিন শুনলাম, ইংরাজ আর জার্মানে সন্ধি হয়েছে তাই উৎসব করতে হবে। সেদিন আমরা খুব উৎসাহে মোমবাতি কিনে ছাদের উপরে, নিচে, বারান্দায়, বৈঠকখানায় সাজালাম। আরো অনেকের বাড়ি, এমন কি প্রায় সারা টাউন সাজান হল।

আমাদের বাসার এক পাশে কোচোয়ান পাড়া আর বাজার ছিল। একদিন দুপুর বেলায় শুনি বাজারে আগুন লেগেছে। শুনে তো আমরা সবাই ছাদে উঠে গেলাম। ছাদ থেকে বাজার দেখা যায়। দেখি কি ভীষণ আগুন। আগুনের রং কালো দেখা যাচ্ছে। আর এত উঁচুতে সে আগুন উঠেছে যে নারকেল গাছের নারকেলগুলো পুড়ে টপ টপ ক'রে পড়ে যাচ্ছে, খড়ের ঘরগুলো তো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেই। আরো দালান-ঘরগুলোতে আগুন লেগেছে। শত চেষ্টাতেও সে আগুন নিবছে না। আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার ক'রে এক ঘর থেকে আর এক ঘরের উপর লাফিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন হাত বের ক'রে দালানের দরজাটা ধরে নিল। আবার পরক্ষণেই লাফিয়ে কড়ি কাঠে গিয়ে উঠল। কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে কালো ধোঁয়া আকাশে গিয়ে জমতে লাগল। সমস্ত শহরের লোক এক সাথে হয়ে আগুন নেবাতে চেষ্টা করতে লাগল। অফিস কাছারি স্কুল সব ছুটি হয়ে গেল। সবাই সেখানে গিয়ে জুটল। পাম্প ক'রে পানি ছিটানো হল, তবু আগুন সহজে নিবল না। বড় ভাইও ওর ভিতর গিয়ে আগুন নেবাচ্ছিলেন, লোক দিয়ে খবর পাঠালেন আমাদের বাড়িতে পানি তুলে গুছিয়ে রাখতে। আর একটা বাড়ির পরেই আমাদের বাড়ি। আমরা প্রস্তুতই ছিলাম।

দেখি চারটা বাজলে আগুন নিভল। বড় ভাই বাসায় এলেন। মুখ শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট দু'খানা পান খাওয়া লোকের মতো লাল দেখাচ্ছে, হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন। বারান্দায় বসে পড়লেন। মা তাড়াতাড়ি ডাব ভেঙে গ্লাস ভরছিলেন

খেতে দেবেন বলে, ঠিক এমন সময় আর দুই এক ফোঁটা বৃষ্টির সাথে শিল পড়তে লাগল। আর সে শিল যেন এক এক খানা ইটের অর্ধেক। শিল কুড়িয়ে বরফের মতো ডাবের পানির ভিতর দিয়ে খেতে দিলেন। পরে দেখেন এত শিল যে উঠানে পাহাড়ের মতো জমা হতে লাগল। ছিটকে এসে বারান্দার কোণে জমতে লাগল। তার এক এক খানা মাথায় পড়লে বুঝি মাথা ভেঙে যাবে। আর সে কি বাতাসের মাতামাতি, মেঘের গর্জন, চার পাশে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। আমরা তো ভয় পেয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে বসে রইলাম। সন্ধ্যা হলে শিলাবৃষ্টি থামল। তার পরে শুনলাম যে আজ সকাল থেকে দুইজন বিদেশী ফকির শহরে এসেছে আর সবার বাড়িতে, হোটেলে, দোকানে, বাজারে, লোকের কাছে খাবার চেয়েছে; কিন্তু কেউ কিছু দেয় নি। যখন দু'পহর হয়ে গেল তবু কোনো জায়গায় খাবার মিলল না, তখন ফকিরেরা রাগ ক'রে অভিশাপ দিয়েছে যে আগুন লেগে যাবে, পাথর বর্ষাবে। আর তার পরই এত সব কাণ্ড।

তখন অনেকে সেই ফকির খুঁজতে গেল। দেখে ক্ষুধার্ত ফকির দু জন একটা বটগাছতলায় বসে আছে। তখন ফকিরদের খুব সাধ্য সাধনা ক'রে অনেকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা কারুর বাড়িতে গেল না। তখন কি আর করে, লোকেরা বালিশ, বিছানা, খাবার সেই গাছতলায় দিতে লাগল। ফকিররা সাত দিন ছিল। তারপর কোথায় চলে গেল কেউ জানে না।

নেছারের বউ আমাদের ঘরে কাজ করত। বিছানা ঝাড়ত, ঘর-বাড়ি ঝাড় দিত, পান সাজত ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই কাজে তার মন ছিল না। ডেকে ডেকে কাজ করতে বলতে হতো। মা বলতেন নূতন লোক পরে অভ্যস্ত হলে ঠিক হয়ে যাবে। একদিন বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে নিজের মনে বক বক করছে, আমি চিরকাল লোকের বিছানা ঝাড়ব না কি। আমি ইচ্ছা করলে ওই রকম বিছানায় শুতে পারি। ভালো শাড়ি-গয়না পরতে পারি। আমাকেও চাকরানিতে পা টিপে দিতে পারে। মা শুনলেন, তাকে বললেন: কি সব বলছিস। ওরকম কথা কখনো বলবি না। কখনো মনে আনবি না। গোনাহ্ হবে। খোদার কাছে মাফ চা। ও শুধু ক্যালক্যাল ক'রে চেয়ে থেকে মিটি মিটি হাসতে লাগল। আমি তখন কিছুই বুঝলাম না।

তারপরে একদিন আম্মা খুলনায় বেড়াতে যাবেন বললেন। যশোর থেকে ট্রেনে দুই ঘণ্টার পথ। আমার তো খুব আনন্দ হল। ফার্স্ট ক্লাশ একটা কামরা আগের দিন রিজার্ভ ক'রে রাখা হল। পাল্কি বেহারা আনতে লোক পাঠান হল। পরের দিন ঠিক সময়মতো ঘোড়ার গাড়ি এল। দুই পাশে পরদা ধরে সেই পরদার ভিতর দিয়ে আমরা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি স্টেশনে এলে পাল্কি এনে গাড়ির গায়ে

লাগিয়ে উঁচু ক'রে ধরল। আমরা পাল্কিতে উঠলাম। বেহারারা আমাদেরে পাল্কি সমেত ট্রেনে তুলে দিল। পাল্কিখানা গাড়ির ভিতরই রেখে গেল। আমাদের বলা থাকল আমরা যেন খুলনা জংশন আসবার আগেই পাল্কিতে উঠে বসে থাকি। আমরা ট্রেনের কামরায় নামলাম।

কামরাটা কত সুন্দর! হাল্কা সবুজ রংয়ের কাঁচ জানলায়। বসবার জায়গায় নরম পুরু গদি। প্রথম ট্রেনে উঠে আমার খুব আনন্দ হল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম। কত লোক দৌড়াদৌড় করছে। কত ফেরিআলা জিনিস বেচছে, আমি মুগ্ধ হয়ে এই সব দেখতে লাগলাম। এবার আমাদের সাথে মার নূতন রূপসী চাকরানি নেছারের বউ গেল। আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছলাম। পাল্কিতে উঠে বসেছিলাম, ট্রেন থামলে বেহারারা পাল্কি নামিয়ে নিল। আর নেছারের বউ মেয়ে দু'টো নিয়ে হেঁটে গেল।

দিন পনেরো থাকতে দেখা গেল নেছারের বউ ছুটি পেলেই পাড়ায় যায়। মা তার জন্য কিছু বলতেন না, ভদ্র পাড়া। একদিন একটা পাড়ার বউ এসে মাকে বলল কেমন লোক এনেছ তুমি, সারা পাড়ায় বেড়ায়। আর জিজ্ঞাসা করে, বেশ্যা পাড়া কোন দিকে! ও মা কি হবে, আমরা কেমন ক'রে জানবো এমন কথা! মা তো শুনে নেছারের বউকে ডেকে খুব বকলেন। তার দু' একদিন পরই নেছারের বউকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে নাম লিখিয়ে বু-পাড়ায় ভর্তি হয়ে গেছে। তখন আবার মা বলতে লাগলেন: যেমন ভাবে যার জন্ম সে সেরকম স্বভাব পায়। মা-বাপের স্বভাব আবার ছেলে মেয়ে পাবে না কেন?

আমরা আর কয়েকদিন খুলনায় থেকে আবার যশোরে এলাম। আবার সেই ভাবে ট্রেনেই এলাম। যশোর স্টেশনে নির্দিষ্ট সময় পাল্কি লোকজন সব ছিল।

বড় ভাই বরিশাল গেলেন বউ আনতে। বড় ভাই একলা যেতেন না, ছোট ভাইকেও সাথে নিতেন। আবার ভাবীকে নিয়ে আসবার সময় ভাবীর ভাইও সাথে থাকত। পথে পথে পয়দা ধরতে হবে তো। বেয়ারারা কি চাকর বাকর কেউ তো পয়দা ধরতে পারবে না। তারা পয়দা ধরলে তো ভাবীকে দেখে ফেলবে। এক-খানা ডুলি থাকত সাথে আর চার জন বেহারা। ভাবীরা গ্রাম থেকে নৌকায় উঠবার সময় ডুলি ক'রে একেবারে কেবিনে পৌছে দিত। আবার খুলনায় এসে স্টিমার থেকে ট্রেনে উঠতে ডুলি লাগত, যশোর স্টেশনে পাল্কিই থাকত, এমনি ক'রে সেকালে আমাদের পথ চলতে হতো।

কিছুদিন পরে শুনলাম যে, তুর্কির সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে। আমিরুল মুমেনীন খেলাফতুল মুসলেমীন আমাদের। আমরা যদিও তাঁর প্রজা নই, তবু মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভাঙবে এবার। তাঁর নামে এখনো খোত্‌বা পড়া হয়। গ্রীসের সাথে তুর্কির যুদ্ধ হচ্ছে; কিন্তু ইংরেজ মিত্রশক্তি। আমাদের

উচিত এদেশ থেকে হিজরত ক'রে খলিফার পক্ষে যুদ্ধ করা। কিন্তু সে তো আমরা পারব না। আমরা যে ইংরাজের দাস। দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, মৌলানা আজাদ এদের নেতৃত্বে দল গঠন করা হচ্ছিল। আর আমি ভালো ক'রে সব কথা জানিও না। তবে গুজব রটল—যেদিন সুলতানকে নামিয়ে দেবে, সেদিন একটা মহা প্রলয়ের সম্ভাবনা আছে। কোন জ্যোতিষ গণনা ক'রে দেখেছেন যে, পহেলা পৌষ একটা মহাপ্রলয় হবে। মুসলমানেরা দেখল ঐ দিন তুর্কির সুলতানকে সিংহাসন থেকে নামান হবে। তাহলে সেই জন্যই সেইদিন মহাপ্রলয় হবে। সারা পৃথিবীব্যাপী ভূমিকম্প হবে। আর তার ফলে মাটি ফেটে, মাটির ভিতর থেকে গরম ধাতু গলে গলে বেরুবে। আকাশে ভীষণ রকম মেঘগর্জন আর হাতির শুঁড়ের মতো মোটা ধারে বৃষ্টি হবে। তার আগে কি পরে পুব দিক থেকে একটা বড় আগুনের গোলা আসছে। বেশিদিন বাকি নেই ; মোটে দু'এক মাস। আমরা তো ভয়ে কাঁকুড় ; রীতিমতো মন দিয়ে নামাজ পড়া ধরলাম, সেই সাথে তসবিও। আমার চাচি আম্মার কাছ থেকে যা যা দোয়া দরুদ শিখেছিলাম, সব পড়তে থাকলাম। একটা তসবি শিখেছিলাম, সেটা পড়লে খুব বড় বড় গোনা মাফ হয়। খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলাম, ভয়ে কারুর সাথে বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করত না। লোকের সাথে কথা বলে আর কি হবে, কিয়ামত তো এসে গেল। এত বই পড়তে ভালোবাসতাম, সেই বইপড়া ছেড়ে দিলাম। আমার মেজ আপাও ভয় করত। আমরা দুই বোনে মিলে এই সব কথা আলোচনা করতাম। তবুও আমি যতটা মুষড়ে পড়েছিলাম, ও ততটা পড়ে নি। মা বলতেন ভয় কি, একদিন হয়েছি, একদিন মরবই। যাঁর কাছ থেকে এসেছি তাঁর কাছেই আবার ফিরে যাব। বড় ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম মহাপ্রলয়ের কথা। তিনি বললেন, তাই তো শুনতে পাচ্ছি ; হতেও পারে। সেদিন খেলাফতি থাকবে না। সেই পাপে খোদা ইচ্ছা করলে দুনিয়া ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। তাই শুনে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল, ঠিকই তবে।

একদিন দেখি একটা ভিখারিনী মেয়েকে দিয়ে মা গান গাওয়াচ্ছেন, আমার তা দেখে মনে মনে বিরক্তি লাগল। এমন সময় মার মনে গান শোনার ইচ্ছে আসে কেমন ক'রে ? ভিখারিনীও গাইছে—

শোন গো মুমেনগণ
শুন করি নিবেদন
এ দুনিয়া কানা হবে
কিছু রবে না—

আমার কানে এইটুকু যেতেই, আমার তো মাথা ঘুরে এল—চোখ বন্ধ ক'রে উঠে গেলাম ; বিছানায় পড়লাম। আর আমি সইতে পারি না, সবাই এক কথা

বলে। আমার মেজ আপাও ভাবত, তবে বলত, সবাই যদি একসাথে একদিনে মরি, তবে আবার দুঃখ কি? আমার জন্য কেউ কাঁদবে না, আমিও কারুর জন্য কাঁদব না। আর এক দুনিয়ায় গিয়ে সেখানে আবার সবাই একসাথে হব। আমি বলতাম, অত সহজ নয়, মওতের আজাবের কথা ভেবে দেখ একবার। মালেকুল মওত কি ভীষণ মূর্তিতে দেখা দেবে। কোন মুখ যে আমরা দেখব ঠিক কি আছে! আর তারপর জান বেরুবার কষ্ট, হযরত ইদ্রিশ আলহে-সাল্লামকে মালেকুল মওত যতদূর সম্ভব আরামের সাথে জান বের করেছিলেন; তারপর তিনি আবার জীবিত হয়ে বলেছিলেন যে, জ্যান্ত মানুষ কি জ্যান্ত গরুর গা থেকে চামড়াটা খুলে নিলে যেমন কষ্ট হবে তেমনি। তিনি তো পয়গম্বর, আর আমরা তো গোনাহ্‌গার বান্দা। আমাদের কি হবে ভেবে দেখেছ? তারপরে গোর আজাব, সে তো কারো মানা নেই। কালা আর বোবা দুইজন ফেরেস্তা এসে যখন প্রশ্ন করবেন, আর ভালো ক'রে সব কথা গুছিয়ে বলতে না পারলে, আমতা আমতা করলে লোহার মুগুর দিয়ে সজোরে মারবেন। চারপাশ থেকে সাপ বিচ্ছু কনা ভুলে ছোবল মারতে থাকবে, বিষ ঢালতে থাকবে। মানুষ তো আর মরবে না, শুধুই যন্ত্রণা ভোগ করবে! ভেবে দেখ তার আর ক' সপ্তাহ বাকি!

এমনি ক'রে ভাবতে ভাবতে দিন এগিয়ে যেতে লাগল। যত দিন যেতে লাগল তত আমি ভেবে ভেবে কাঠ হতে লাগলাম। স্কুলের মেয়েরা আসত, তাদের মুখেও সেই কথা। টিফিনের ছুটিতে তো আসত সব, বেশিক্ষণ থাকত না। এমনি ক'রে ভাবনার দিনগুলি এগিয়ে এগিয়ে ঠিক দিনটি এসে হাজির হল।

পহেলা পৌষ সকাল বেলা আকাশে অল্প অল্প মেঘ, কিন্তু আবার বেশ ঝলমলে রোদও উঠেছে, বড় ভাই উঠে এসে বললেন বাঃ আজ বেশ দিনটা তো, সুন্দর রোদ উঠেছে, আবার শীতও আজ কম। আমি তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোদুল্যমান মন নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম, সত্যি বটে, তবে সূর্যটা তো পশ্চিম দিক দিয়ে ওঠে নি, সত্যিই পুব দিক থেকে উঠেছে; আমাদের দেখতে ভুল হচ্ছে না তো, পুবই এটা ঠিক। রোজই এই দিক থেকেই তো ওঠে। সবই কি তাহলে মিথ্যা কথা? তবে এখনো দিন যায় নি, রাত বারোটা পর্যন্ত দিন ধরতে হবে, তার আগে তো ঘুমিয়ে পড়ব।

ঘুমের মধ্যে রাতে যদি কিছু হয়, হতেও পারে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। নির্বিঘ্নে রাত কেটে গেল। আবার সুন্দর সকাল, যাক ভাবনা ঘুচল।

খলিফাকে গদিচ্যুত করা হল। সেই কষ্টে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একদিন রোজা রাখল। এক বেলা না খেয়ে যে চাল বা টাকা বাঁচল, তাই দিয়ে খেলাফৎ ফাণ্ড খোলা হল। সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেক টাউনে একটা ক'রে খেলাফৎ

অফিস চালু হল। যে যত পারল চাঁদা দিতে লাগল। গ্রীসে আর তুর্কে ঘোর যুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধের সাহায্যের জন্য আংকারায় টাকা পাঠান হবে, সেই জন্য টাকা যোগাড় করতে হবে। আমরা তো ইংরাজের প্রজা, আমাদের তো সে দেশে যেতে দেবে না। নচেৎ আমাদের উচিত ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হওয়া। শহীদ হয়ে মরলে কোনো ভাবনা নেই। টাকা যোগাড় করতে স্কুলের ছেলেরা দলে দলে শোভাযাত্রা ক'রে গান গেয়ে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা আদায় করতে লাগল।

একটা গানের খানিকটা বলছি :

ভাইরে চল খেলাফৎ উদ্ধারে।
ভাইরে মুসলমানি যেতে বসেছে
একছত্র অধিপতি ছিলেন
যারা ভারতের
তাদের রাজ্য কল-কৌশলে
ইংরেজ সব নিয়েছে।
বাকি ছিল আরব রাজ্য
তথায় ইংরাজ গিয়াছে
খেলাফৎ আর খলিফা
ধ্বংসের মুখে চলেছে।
গান্ধিজী আর আলী ভাইরা
নেতৃত্ব তার নিয়েছেন
প্রভুর আদেশ শিরে নিয়ে
কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন।

ছাত্রেরা সারা শহর টহল দিত। আমাদের বাসার আস দিয়ে পাশ দিয়ে গান ক'রে ঘুরত। আমার উৎসাহের অন্ত ছিল না। ছুটোছুটি ক'রে যেখান থেকে একটু দেখা যায় জানলায়, বারান্দায়, ছাদে ছুটে বেড়াতাম। আমার মনে হতো যদি আমি ওদের সাথে যেতে পারতাম, দেশের কাজের অংশ নিতে। সেই ভাগ্য কি আমাদের হবে যে দেশের জন্য একটু কাজ করতে পারি?

ইতিমধ্যে হল কি জালিয়ানওয়ালাবাগে তথা পাঞ্জাবে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড হল আইন অমান্য করবার জন্য। ইংরাজ কর্তৃপক্ষের হুকুমে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মেরেছে। মায়ের সামনে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। পোয়াতি মেয়েদের বের ক'রে রাস্তার উপর বুকে হাঁটিয়েছে। এই সব কারণে দেশে আবার নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। মহাত্মা গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীনে হিন্দু মুসলমান এগিয়ে গেল মিলিত মহাশক্তি নিয়ে। মহাত্মাজীর মূলমন্ত্র অহিংসা আর অসহযোগ আন্দোলনে দীক্ষিতা হল শৃংখলাবদ্ধ অভাগিনী ভারত মাতার

দুই ছেলে, মুসলমান আর হিন্দু। পরাধীনতার চাপে অবনত মস্তকে বিনা অস্ত্রে দীন-দরিদ্র ভারতবাসী নব পথ অবলম্বন ক'রে কাজ ক'রে যেতে লাগল। আবার তারা পথে পথে গাইল—

ভারত আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ,
কেন গো মা তোর মলিন বসন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ ?

বড় ভাই কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। ছোট ভাই স্কুল ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবকে ভর্তি হলেন। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে খেলাফৎ অফিস করা হল। আর সে খেলাফৎ অফিসের সেক্রেটারি হল আমার ছোট ভাই। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ছোট একটা মাঠ ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই মাঠে দুই একদিন পর পরই মিটিং হতে লাগল। যেদিন মিটিং হতো খেলাফৎ পার্টির কি কংগ্রেস পার্টির, সেদিন আমাদের অন্দর মহলের গেটের দরজায় বড় একটা চিক ঝুলিয়ে চিকের আড়ালে চেয়ার নিয়ে বসে থাকতাম। আমি ভাবী আর মেজ আপা। যতক্ষণ মিটিং হতো ততক্ষণ শুনতাম। কত লোক একজনের পর একজন বক্তৃতা করত। সুদীর্ঘ মূল্যবান বক্তৃতা। শুনতে খুব ভালো লাগত।

আমরা বিলেতি কাপড় পরা ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে তিন-চার রকমের চরকা কেনা হল। কমলা চরকা। বঙ্গলক্ষ্মী চরকা। আহমদাবাদের চরকা। আমরা সবাই যে যখন পারতাম চরকায় সুতা কাটতাম। আমাদের যে সব বিলাতি সুন্দর সুন্দর শাড়ি ছিল, ছোট ভাই সেগুলি নিয়ে পুড়িয়ে দিল। বড় ভাইয়ের কত সুন্দর সুন্দর গরম কোট, আলপাকার আচকান আর ভালো বিলাতি জুতো ছিল, সে সব নিয়ে আংকারায় সৈন্যদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হবার জন্য আমাদের বাড়িতে গরুর গোস্ত খাওয়া বন্ধ হল। বিলাসিতা বিসর্জন দিতে হল। এমন কি কাঁচের চুড়িগুলো পর্যন্ত আমরা কেনা ছেড়ে দিলাম। যত দিন দেশ স্বাধীন হয় ততদিন আমরা ভালো জুতো, ভালো কাপড় আর পরব না, এই আমাদের সংকল্প। সর্ব প্রথম বসিরউদ্দিন নামে একজন পাঞ্জাবি মুসলমান যুবক যশোর থেকে জেলে গেল। তার জন্য সমস্ত যশোর একেবারে টলটলায়মান অবস্থা। অগণিত লোক বন্দে মাতরম, আল্লাহ আকবার রবে তার সহগামী হয়ে হাজত ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। যত দিন না বিচার হল, ততদিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পদভারে যশোর টাউন কম্পিত হতে লাগল। বিচার হল। ছ'মাস জেল, আর দুই শত টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আট মাস জেল। সেদিনও যশোর টাউন জনতার পদভারে কম্পিত হতে লাগল ঘন ঘন আল্লাহ আকবর আর বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্য দিয়ে। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ক'রে বসিরউদ্দিনের জয় দিতে দিতে জনতার সমুদ্র বসিরুদ্দীনের সহগামী হয়ে জেলের

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। আমরা তিনতলার ছাদের উপর থেকে সব দেখলাম। জনতা যখন ফিরল তখন বেলা তিনটা। সারা টাউনে শোভাযাত্রা ক'রে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সারা টাউন হরতাল হয়ে গেল। দোকান, বাজার, গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। এই হরতাল সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আমার তখন শুধু মনে হতে লাগল লোকটার পরিচয় তো জানি না, বাংলা দেশের ছেলেও নয়, তবু তার মায় আজ কি আনন্দ। ধন্য ছেলে পালন করেছিল, যে আজ দেশের দশের কাজে জেল বরণ করল। ওর বউ যদি থাকে, তার আজ কি ভাগ্য, কি সম্মান। এরকম লোকের স্ত্রী হতে পারা কি সৌভাগ্য। স্বামীকে ভক্তি করতে হয় এটা লোকাচার; কিন্তু সত্যিকারের ভক্তি করবার মতো স্বামী ক জনের ভাগ্যে জোটে। আগের দিনে মেয়েরা স্বয়ংবরা হতো। বীর স্বামীর গলায় মালা পরাত। আর এ যুগের এই তো বীর, দেশের জন্য কারা-বরণ করছে। বীর জায়া আমার অলক্ষ অভিনন্দন নিও।

তারপর থেকে প্রায়ই লোক জেলে যেতে লাগল। আমাদের বৈঠকখানার সামনের মাঠে যে মিটিং হতো সে মিটিংয়ে আমরা দেখতাম সভাপতির সামনে তিনজন, পিছনে তিনজন পুলিশের লোক শ্রুতিলিপির মতো বক্তৃতাগুলো লিখে নিত। পাছে কোনো কথা লিখতে ভুল হয় সে জন্য এই সাবধানতা। বে-আইনী কোনো কথা পেলে তো তাকে তার পরদিনই গ্রেফতার করবে।

যশোর আর কতটুকু টাউন। তার কতটুকুই বা আমি চোখে দেখেছি। সারা ভারতবর্ষেই আন্দোলন চলছিল।

রোজই দু'খানা ক'রে সংবাদপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম। কত লোক যে আইন অমান্য ক'রে জেলে যাচ্ছে। ধর-পাকড় রোজই চলত। চিত্তরঞ্জন দাশের যে বিরাট ত্যাগ, সমস্ত সম্পত্তি দেশের কাজের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন দাশের বউ আর বোন নিজেদের গা থেকে গয়না খুলে দেশের জন্য দান করেছেন। তারা সব শিক্ষিত। মেয়েরা প্রকাশ্য মিটিংয়ে যায়, কত পিকেটিং করে, দেশের কাজ ক'রে জন্ম সার্থক করছে। পোড়া কপাল আমাদের, আমরা কোনো কাজে লাগতে পারি না। মহম্মদ আলী, শওকত আলীর মা বোরকা পরে দুই ছেলে দুই পাশে—মধ্য খানে তিনি বসে ফটো তোলেন। মহম্মদ আলী, শওকত আলীর মাকে সবাই বি আম্মা বলে ডাকত। আমরা চরকা কাটি, আর মোটা খদ্দরের কাপড় ব্যবহার করি। শাড়ি, জামা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সবই খদ্দরের। বিলাতি কোনো বিলাসিতার জিনিস আমরা ব্যবহার করি না। শুধু এইটুকুতে যেন তৃপ্তি হয় না। আরো করবার জন্য প্রাণটা উসখুস করে। কিন্তু কেন আমরা পারি না! আমাদের কথা কেউ শোনে না, শুধু অবরোধের প্রাচীরে মাথা কুটে মরবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি নাকি? ফ্রান্সের চাষার মেয়ে জোয়ান অব আর্ক যা যা করেছিল, আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে তা পারি না কেন?

বড় ভাই বাড়িতে থাকতেন না ; দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দিল্লি, আজমীর, আগ্রা, কানপুর, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, গয়া কিংবা কাশীতে থাকতেন। গান্ধিজী যেখানে যেখানে যেতেন আর যেতে বলতেন সেখানে থাকতেন। কাগজে কখনো কখনো নাম দেখতাম। কত জায়গায় কত ধর্মঘট করিয়েছেন, কত পুলিশ কর্মচারিদের চাকরি ছাড়িয়েছেন। দুই এক মাস পরে পরে দুই এক দিনের জন্য বাড়িতে আসতেন। একদিন কাগজে দেখলাম বড় ভাই ধরা পড়েছেন। কলিকাতায় খিদিরপুর জেলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কাগজে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীও বেরিয়েছে। কিছু দিন পরে বড় ভাই মুক্তি পেয়ে যশোরে এলেন। ছোট ভাইকে আবার যশোর থেকে গ্রেপ্তার করা হল। তারও ছ'মাস কি আট মাস জেল হল। ছোট ভাই যশোর জেলেই ছিলেন। আমরা তাঁকে খবরের কাগজ বই-টই পাঠাতাম।

কিছু দিন পরে খবর পাওয়া গেল কামাল পাশা যুদ্ধে জিতেছেন। সেদিন আমাদের বাসার ছাদে বৈঠকখানা ঘরে অর্থাৎ খেলাকৎ অফিস আলোকমালায় সজ্জিত করা হল। 'মোসলেম ভারত' নামে আমাদের একটা মাসিক পত্রিকা আসত। একদিন একটা মাসিকপত্রে দেখলাম, কবি কাজি নজরুল ইসলামের একটা ফটো। এমন সুন্দর ভঙ্গিতে হাবিলদার বেশে দাঁড়ানো একটা ফটো— যেন বলছে 'আমি চির উন্নত শির'। তার পাশেই 'বিদ্রোহী' কবিতা। সেই বইখানাতেই কামাল পাশার যুদ্ধ জয়ের পর ফিরে আসবার কবিতা। পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ ক'রে ফিরছে। দশ হাজার মরেছে আর পাঁচ হাজার ফিরছে। একজন সিপাহির বুকে একটা আর পিঠে একটা দু'টো ক'রে নিহত সৈন্য বেঁধেছে। মার্চ করতে করতে আসছে। কি সে উদ্দাম ভঙ্গি সেই কবিতায়। এমন একজন কবির জন্ম সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময়। যাঁর কবিতায়, গানে সুপ্ত ভারত জেগেছিল, ইসলাম ধর্ম পেয়েছিল প্রাণ। এমনি উত্তেজনা ভরা সময় সেটা সেছে যে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছেলে এসেছিল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে, কলিকাতায় যেদিন নেমেছিল, সেদিন সারা ভারতবর্ষে হরতাল। গভর্নমেন্ট শুধু দলকে দল ধরে ধরে জেলে পুরতে লাগল। বেত মারতে লাগল। সেচ্ছাসেবকেরা গান গেয়ে ফিরত :

বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমরা কি মার সেই ছেলে
রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
শাসন বলে দিক জেলে।

বিলেতি বর্জনের ফলে ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের ভিতর বেকার সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দেশে আবার কাপড়ের মিল হয়ে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছিল। ঘরে বসে থাকলেও আমরা সারা মনপ্রাণ উজাড় ক'রে দিয়েছিলাম দেশের জন্য।

কেবল দুঃখ, অবরোধের কষাঘাতে আমরা পঙ্গু, অকর্মণ্য, আলোকের পথে অবরোধের কাঁটার আঘাতে জর্জরিত, ক্লান্ত।

জীবন তরী আমাদের অবরোধের পাঁকে আটকে গেছে, আস্তে আস্তে ডুবে যাবে বুঝি। তুর্কিতে সুলতান আবদুল হামিদ, সুলতান আবদুল মজিদ খানের সময় পরদার খুব কড়াকড়ি ছিল, সুলতানের ভয়ে কোনো মেয়ে পরদার খেলাফ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে পারত না। সেখানেও অসামান্য প্রতিভাবান মহিলা খালেদা খানমের জন্ম হল। তিনি তার আব্বার পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে এসে এখন তুর্কির শিক্ষা মন্ত্রী।

আমাদের দেশে তো এসব কিছু নিয়ম নেই। তবে কি জন্য আমাদের এ দশা! মনে হতো আমার আব্বা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হলে নিশ্চয় শিক্ষার সুযোগ ক'রে দিতেন। বৈমাত্রের ভাই বলে নিশ্চয় হিংসা ক'রে দাবিয়ে রাখতে চায়, নচেৎ কেন? পরদার ভিতরেও বাড়িতে প্রাইভেট মাস্টার রেখে সুযোগ করা যেত, ইচ্ছা নেই বলেই সুযোগ হয় না। এদেশে খৃস্টান মেয়েরা বেশ শিক্ষিত, এক একজন লেখিকা, সেবিকা, কর্মী। মুসলমান কোচমান গাড়ওয়ানের মেয়েরাও বেশ শিখে উঠেছে. আমাদের বাড়িতে যে ঝি বাসন মাজে, তার মেয়ে আর ভাইঝিও স্কুলে পড়ছে। আর বোধ হয় আমরা তেরশ বছর আগের শিক্ষিত-বোধ হয় দু'শ বছরের পুরনো সম্ভ্রান্ত পরিবার, তাই আমরাই থেকে যাচ্ছি সবার থেকে পিছনে। পর জীবনে ঘটেও ছিল তাই। আমার অদৃষ্টে ওই ঝির মেয়ের অধীনে চাকরি করতে হয়েছিল। যাহারে টানিছ পিছে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে— একথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল আমার জীবনে। সবই জানতাম, সবই বুঝতাম। অথচ জেগে ঘুমাতাম। ঘুমাতে বাধ্য করত অদৃষ্ট আমার।

ছোটবেলা থেকে অনেক কিছুই শিখবার আগ্রহ ছিল—সুযোগ ছিল না। একদিন দেখলাম আমাদের বাবুর্চি ছেঁড়া কাপড় রিপু করছে। দুই এক রকমের রিপু দেখে শিখলাম, আর যখন সময় হতো পুতুলের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে রঙিন সুতো দিয়ে রিপু করতাম। আঁচলের পাড়ে সেলাইটা ফেললে লেসের মতো দেখাত। তারপর আমার ভাবী এল, ভাবীকে বড় ভাই উল কারপেট আর মোজা বোনা কাঁটা কিনে দিল। ভাবী আমার মার কাছ থেকে কারপেট সিলাই শিখতে লাগল, আমাকে সে সব ছুঁতেও দিত না। আমার যে কি কষ্ট হতো তখন তা বলার নয়। আমার দুলা ভাইয়ের হারমোনিয়ম ছিল, সেটা এনে বড় ভাই ভাবীকে অনেক রাত্রে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ ক'রে গান শিখাত, আমাকে কাছেও ঘেঁষতে দিত না। ইংরাজি বই কশিবুক কিনে অবসর সময় ভাবীকে লেখাপড়া শেখাত, ভাবী কিন্তু পড়াশোনায় ভালো ছিল না; তার পড়া এগতো না। আমি একদিন ভাবীর কশিবুকখানা চেয়ে নিয়ে দেখে দেখে খাতা ভরে হাতের লেখা করেছি।

মনে মনে ইচ্ছা, ভাবী তো পারে না, তাকে কত যত্ন ক'রে শিখান হয়, আর আমি এত সুন্দর লেখা করেছি, আমাকে ভালো বলবে নিশ্চয়ই। এই মনে ক'রে একদিন সময় বুঝে ভয়ে ভয়ে খাতাখানা নিয়ে বড় ভাইয়ের কাছে দেখাতে নিয়ে গেলাম। ভাই উল্টে-পাল্টে দেখলেন, আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন, আমি বলতে পারি নি, অমনি আমাকে খাতাখানা ছুঁড়ে মেরেছিলেন, দূর দূর ক'রে বকেছিলেন, বললেন পারে না কিছু না, তুই আবার কি শিখবি রে! আর কোনো দিন আমার কাছে বই খাতা নিয়ে আসতে পারবি না। আমি মনে মনে সব বুঝলাম, কাঁদলাম, আগ্রহ শতগুণ বেড়ে গেল। যে ক'রে হোক শিখতেই হবে। আমার এক খালাত ভাই ছিল আমার থেকেও বয়েসে কিছু ছোট, তাকে ধরে তার কাছ থেকে পড়তে লাগলাম। সে মাঝে মাঝে আসত, তখন আমি পড়া জিজ্ঞাসা করতাম, সে বোধ হয় বিরক্ত হতো। দুই একদিন এসে আর আসত না।

আমার মা ইংরাজি জানতেন না। মাকে বলতে লাগলাম যে কোনো একটা লোক ঠিক ক'রে দিতে, আমি একটু পড়া শিখব। মা হয়ত সুযোগ করতে পারলেন না, তাই বললেন, শিখে কি হবে, ওসব তো নাম করা বিদ্যা। নামের জন্য মানুষ শেখে, নচেৎ কাজে কিছু লাগবে না। তুমি তো চাকরি করতে যাবে না। যে কোনো কাজ নামের জন্য শিখলে শক্ত গোনাহ্ হয়। যশের জন্য অনেকে নামাজ, রোজা, জাকাৎ খয়রাত করে, তার যে কত গোনাহ্ হয় তার ইয়ত্তা নেই। তার জায়গা জাহান্নাম নয় হাবিয়া। বিদ্যাশিক্ষা খুব ভালো কাজ, ফরজ, কিন্তু যদি যশের জন্য শেখো তো গোনাহ্। নিয়েৎ ঠিক রাখতে হবে, যদি একখানা শাড়ি কি গয়না লোক দেখানোর জন্য পরো লোকে ভালো বলবে কি, বড় লোক বলবে—তা বললে শক্ত গোনাহ্। সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। লোকে যেন মনে না করে যে খুব গরিব। তোমাকে দান দিতে হবে, আবার খুব দামী দামী গয়না শাড়ি পরে অহংকারী হয়ো না, কাজ শিখবে নিজের জন্য। লোকে ভালো বলবে বলে নয়।

আমি সব শুনলাম, মুখে কিছু বললাম না। মনে মনে বললাম, লোক দেখানোর জন্য কিছু শিখছি না, আমার যে অনেক কাজে লাগবে। একদিন আমি পাশের বাড়ির জানলার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি পাশের বাড়ির মেয়েও জানলায় দাঁড়িয়ে কুরুশ দিয়ে উল বুনছে। দেখে আমি বললাম, আমাকে শিখাবে? ও বলল, তুমি উল আর কুরুশ নিয়ে এস। আমি বললাম, আমাকে তো যেতে দেবে না, তুমি যদি দয়া ক'রে আসো। ওর মার কাছে ওর বৌদির কাছে আমি হাত জোড় ক'রে মিনতি ক'রে বললাম ওকে যেন পাঠিয়ে দেয়। ওরা বলল, আচ্ছা একদিন যাবে, তুমি উল আর কুরুশ যোগাড় ক'রে রেখ। আমি উল আর কুরুশ কোথায় পাব, কত চাইলাম মার কাছে, ভাইদের কাছে, কেউ দিল না। কুরুশের দাম শুনলাম নয় পয়সা আর উলের দাম পাঁচ পয়সা; কিন্তু আমাকে

কেউ ছিল না। কত কাঁদাকাটা করলাম, মনে মনে খুব ঘৃণা হতে লাগল। এমনি ক'রে ফকিরের মতো চাওয়া, ওদের ইচ্ছা মতো ওরা আমাকে অনেক দিতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো কিছু দেবে না। যদি আমি কিছু কিছু শিখতে পারি, আর বাইরে বিক্রি ক'রে কিছু পয়সা করতে পারি, তা হলে আমার এই কষ্ট থাকবে না। বিক্রি করবার সুযোগ হবে, লোক দিয়ে বাইরে পাঠান যাবে; কিন্তু শিখবার সুযোগই তো হচ্ছে না!

একদিন সেই মেয়েটা এল, তার নাম তরু। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। ওর বাবা সাব ডিপুটি। আমার কিছুই যোগাড় হয় নি। আমার ভাবী তখন বাপের বাড়িতে। ভাবী থাকলেও বা কিছু সুযোগ হতো। ভাবীর পথ চেয়ে থাকতাম, ভাবী কবে আসবে। ভাবী কয়েক মাস পরে এল, ভাবীকে বলাম, ভাবীর উল কুরুস তো ছিলই, সে তরুকে ডেকে শিখতে লাগল, আমি শিখি আর না শিখি অন্তত দেখা তো হবে।

ক'দিন পরে দেখি বড় ভাই একটা খৃস্টান টিচার রেখে দিয়েছে সেলাই শেখার জন্য। সে আমাদের বাড়িতে সব সময় থাকত। এক সাথে খেতাম, শুতাম, গান করতাম, বই পড়তাম। আমরা তার বাইবেল পড়তাম, সেও আমাদের বাংলা তরজমা করা কোরান শরীফ পড়ত। যেন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেল। তিন চার রকম ফ্যাশনের শাড়ি পরা শিখাতে লাগল। কত রকম জ্যাকেট, ব্লাউজ ছাঁটা দেখাতে লাগল। তার ডিপ্লোমা ছিল সেলাইয়ে। ভাবী খুব সেলাই শিখতে লাগল, আর ছেঁড়াছোটা উল, সুতো, খারাপ কাঁটা কুরুস আমাকে দিত, আমিও শিখতে লাগলাম। বেঁচে গেলাম। খোদার কাছে শোকর করলাম।

একদিন আমি ভাবীকে বলতে শুনলাম, উনি তো অশোগও ওনাকে আবার কি শিখাবে। সেদিন আমি খুব কেঁদেছিলাম, আরো আগ্রহ ক'রে সবকিছু শিখতে লাগলাম। যত রকমের হাতের কাজ দেখলাম, খেজুরের পাতার পাটি থেকে আরম্ভ ক'রে শাখা, শিকে, নক্সিকাঁথা, আর কুরুসের কাজ। এমব্রোইডারি ক'রে দোকানে পাঠাতে লাগলাম। দুই একটা বিক্রয় হতো, যা হতো তাতে আমার সেলাই শিখবার উপকরণ কেনবার সাহায্য হতে লাগল। এমনি ক'রে আমার শৈশব আর কৈশোর জীবনের অবসান হল।

—

রচনা-পরিচয়

সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন ১৯০৯ সালের দিকে যশোর জেলায় এক রক্ষণশীল জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ মোনায়েম বখ্‌শ এবং মায়ের নাম তালে আফরোজ। তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মাজেদ বখ্‌শ এককালে বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেসদলীয় সদস্য ছিলেন। তাঁদের পরিবারে রক্ষণশীলতার পাশাপাশি ছিল বিদ্যানুরাগ এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। পরিবারের সকলেই যেমন আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় লিখিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ বিশ্লেষণ ক'রে পড়তেন, তেমনি বাংলা ভাষায় লিখিত নানাবিষয়ক প্রকাশনা যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ ও পাঠ করতেন। এই আবহাওয়ায় মনোয়ারা খাতুনও যেমন ধর্মের সকল নির্দেশের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তেমনি মানবিকতার আলোকে ধর্মকে বিশ্লেষণ করার মতো দৃষ্টিও আয়ত্ত করেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয় চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট শহরের সৈয়দ আশরাফ আলীর একমাত্র পুত্র সৈয়দ তাহের আলীর সঙ্গে। বিয়ের দশ বছর পর তিনি বিধবা হন পাঁচ বছরের ছেলে এবং গর্ভে মেয়েকে নিয়ে। শ্বশুর আগেই গত হয়েছিলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অবস্থায় একদিকে প্রখর আত্মসম্মানবোধ এবং অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে তিনি জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হন। সে-সময়ে তিনি নিজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করেন, মেয়ে হয়ে অবরোধের মধ্যে মানুষ হওয়ার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হন। প্রথমে তিনি শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এক গ্রামের স্কুলে আরবি ও বাংলার শিক্ষিকা হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। তখন তিনি বোরখা পরতেন। পরে তাঁর আত্মীয় ড. এ. কে এম. আবদুল ওয়াহেদের সহায়তায় কলকাতার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মেট্রোনের কাজ নেন। তখন থেকে তিনি বোরখা খুলে বাইরে আসার প্রয়াস পান। এরপর তিনি চাকরি নেন মহুজান হোস্টেলে। এ সময়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করতে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং নিজেও চেষ্টা করেন এসব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে। রজনী মুখার্জির স্ত্রী আরতি মুখার্জি এসব কাজে তাঁকে অনুপ্রেরণা দেন।

দেশবিভাগের পর তিনি চট্টগ্রামে ড. খাস্তগীর গার্লস স্কুলের হোস্টেলে মেট্রোন নিযুক্ত হন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাঁকে চাকরি করতে হয়। তারপর তিনি ঢাকায় এসে অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন এবং সমাজসেবামূলক কাজেও অংশ নেন। গৃহকর্মে নিযুক্ত লোকজন যত তিনি পেয়েছেন, সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তার উপরে, মেয়েদের সেলাই

শিখিয়ে ছেড়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে তাঁর উপহার হতো নিজের লেখা একটি কবিতা। কয়েকটি ছোটগল্প এবং আত্মস্মৃতিমূলক রচনাও তিনি লেখেন।

জিনাত আরা বেগম -সম্পাদিত ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'মহিলা' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩—২০ সংখ্যা ; ২৮ মে—১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২) ধারাবাহিকভাবে 'স্মৃতির পাতা' প্রকাশিত হয়।

১৯৮১ সালে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন ঢাকায় লোকান্তরিত হন।

২৭. ১২. ৮৮

—আনিসুজ্জামান

মীরা চৌধুরী

চাষীর মেয়ে

কলকাতা শহর। শীতের প্রকোপটা কমে গেল। বসন্ত বুঝি এল।

রোজ যেমন ভোর চারটে সাড়ে-চারটেয় ঘুম ভাঙে, আজও তেমনি জেগে শুয়ে আছি। চারিদিক অন্ধকার; নিস্তব্ধ। একটা কাক পাখিরও ডাক শুনতে পাই না।

কিন্তু—ও কি? নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে—বহুকাল পর—কোকিলের ডাক? এই ডাকটি নিয়ে গেল আমাকে কোন অতীতে। কত সুখস্মৃতি জেগে উঠল এই ডাকে। প্রাণভরে শুনতে লাগলাম এই মধুর ডাকটি।

তারপর এল কর্কশ কাকের ডাক; চড়াই-এর কিচির মিচির; শালিকের গান; পায়রার গুঞ্জন। এই আমাদের কলকাতা।

ধীরে ধীরে, নানান শব্দ কানে আসতে লাগল। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ; মোটরের হর্ন। আশে পাশের বাড়ি থেকে দরজা-জানলা খোলার শব্দ; কল থেকে বালতিতে জল পড়ার শব্দ; পাম্পে জল তোলার শব্দ। এদিক-ওদিক থেকে একটু হাঁকডাক। কলকাতা জেগে উঠল।

আমার সেবিকা আমার মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম নিয়ে এল—কারণ আজ দশ বছর ধরে পা ভেঙে আমি শয্যাশায়ী। এখনো দাঁড়াতেও পারি না। কাপড় চোপর পরে, তৈরি হতে হতে, আমার বিছানার পাশে রেডিওতে 'বন্দে মাতরম্' কানে এল। তার পর 'সুভাষিত', 'সংগীতাঞ্জলি', 'প্রাত্যহিকী', সংবাদ; পরে তিনটি রবীন্দ্র সংগীত।

আমার সেবিকার নাম আমি দিয়েছি 'অঞ্জলি'। সে আমার চা ও খাবার নিয়ে এল। ফেরিওয়ালাদের ডাক শুরু হল। এসব ডাক রোজই শুনে আমি অভ্যস্ত; বিশেষ গ্রাহ্য করি না। হঠাৎ কানে এলো 'খুদ চাই মা। চালের খুদ।' সে কি? খুদও কি বিক্রি হয়? যে খুদ আমরা চাল ঝেড়ে ফেলে দিই—সেই খুদ? আমি বললাম, 'শুনেছ অঞ্জলি? ওরা খুদ কিনতে চাইছে।' ও বলল, 'কিনবে না? ঐ

খুদ ওরা সস্তায় কিনে দেশে-ঘরে বিক্রি করে, গরিব লোকেরা ঐ খুদ সস্তায় কিনে ঘন্ট ক'রে খায়।' বললাম 'সে কি। তুমি কি ক'রে জানলে?' সে বলল, 'জানব না? আমি যে চাষীর মেয়ে।'

চাষীর মেয়ে? আমি অবাক। সে বলল, 'আমার বাবা চাষা ছিলেন। আমার স্বামীও চাষা ছিলেন। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি শহরে এসে চাকরি করছি। সে আজ বছর কুড়ি হয়ে গেল। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানান কাজ করেছি। শেষে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ডাক্তার বাবুরা আমাকে যেভাবে বলে দিয়েছেন, শিখিয়ে দিয়েছেন, তিন বছর ধরে আমি এই বুড়ো ভদ্রলোকের কাজ করেছি। তাঁর মৃত্যুর পর, দশ বছর আগে আমি আপনার কাছে এসেছি।'

এখন বুঝলাম, এর কাজ এত পরিপাটি, এত ভালো, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল কি ক'রে। আমি বললাম, অঞ্জলি, আমি শহরে মানুষ। গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার কিছুই নেই। আমাকে বলবে?'

সে তার অন্যান্য কাজ সেরে আমার কাছে এসে বসল। আমিও কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হলাম তার কথা লিখতে। তার জীবনে যেভাবে নিজের হাতে যে কাজ করেছে, তার অভিজ্ঞতার কথা, সে যেমন বলতে লাগল, আমি লিখে যেতে লাগলাম। তবে, এর কাহিনী বছর চল্লিশ আগেকার কথা।

এখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। আজকাল চাষবাস নিয়ে যা গবেষণা চলেছে, এমনকি এখনকার চাষীভাইরা যেভাবে নিজেদের উন্নতি ক'রে চলেছে, সরকার যেভাবে এদের সাহায্য ক'রে চলেছেন—নতুন নতুন সার-তত্ত্ব দিয়ে, জলের ব্যবস্থা ক'রে, নতুন নতুন পদ্ধতিতে চাষের আজ কত উন্নতি হয়েছে। এর তুলনায় চল্লিশ বছর আগে অঞ্জলিরা কঠোর পরিশ্রম ক'রে কিভাবে তখন চাষ করেছে, সেই কথাটুকুই বলব।

আমি অঞ্জলিকে বললাম, 'জান অঞ্জলি, আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই চাষাদের নিয়ে এক সুন্দর গান লিখে গিয়েছেন। গানটা হল—

আমরা চাষ করি আনন্দে,
আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে
সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে
হাওয়ায় হাওয়ায় পাতা নড়ে
বাতাস ওঠে ভরে ভরে
চষা মাটির গন্ধে
আমরা চাষ করি আনন্দে।'

গানটি অঞ্জলির খুব ভালো লাগল। বলল 'আমরাও চাষের গান শেখেছি।

আমরা চাষা, প্রাণটা খাসা
আমরা মায়ের সুসন্তান
বাহুর জোরে চষি মাটি
লক্ষ্মী ওঠে মাটি ফুটি
দু'হাত দিয়ে বিলাই মোরা
অন্নপূর্ণা মায়ের সমান।'

আমি বললাম, 'অঞ্জলি, গোড়া থেকে বল। তোমার ছোটবেলাকার কথা— যতদূর যা মনে আছে, বলে যাও। ঠিক যেমনটি ছিলে, বলে যাও আমি লিখে যাই। সে বলল—

'আমরা পাঁচ ভাই-বোন ছিলাম। আমাদের সংসারে ছিলেন—বাবা, মা, আমরা পাঁচ ভাই বোন, আমাদের ঠাকুরমা, আর বাবার পিসিমা। সব শুদ্ধ আমরা ন'জন ছিলাম।

'বাবার আট বিঘে জমি ছিল। সেই জমির মাঝখানে আমাদের মাটির একখানা ঘর। ঘরের চার পাশে চৌড়া বারান্দা। আর, বাবার আর তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের একটা পুকুর ছিল।

'বাবা জাল বুনতেন—সেই জাল দিয়ে পুকুরের মাছ ধরতেন। পুকুরে অনেক জাতের মাছ ছিল। তার মানে—কৈ মাছ, মাগুর মাছ, সিঙ্গি মাছ, শোল মাছ, পুঁটি মাছ, মৌরলা মাছ। জাল ফেলে এত মাছ ধরা হতো যে ঘরে লোকজন এলেও বাজারে মাছ কিনতে হতো না।

'তবে, বাবার আট বিঘে জমি থাকলে কি হয়, প্রতি বছর বন্যার জল এসে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। যদিও সেটা দোনো জমি, কিন্তু এই বন্যার জলের জন্য ধান বোনা যেত না। জমিতে চাষ করা যেত না। তাই বাবা এ জমি বিক্রি ক'রে, নিজে মজুর খাটতেন। আর ছিল দিনে তের পয়সা। সংসারে ন'জন আমরা। এই আয়ে কত কষ্ট ক'রে খেয়েছি। এই তের পয়সায় বাবা কিনতেন আধ সের চাল। সেই চালে তেলেজা মাটি ভরা থাকত। তেলেজা মাটি হল ছোট্ট ছোট্ট সর্ষের মতো মাটি; আর সেই মাটিতে কি দুর্গন্ধ। আমরা সবাই মিলে সেই চাল একটি একটি ক'রে বেছেছি। তারপর, সেই চালে মা বেশি ক'রে জল দিয়ে ঘন্ট করতেন। তাতে ভাতের চিহ্নও থাকত না। আমাদের সারা-দিনের খাদ্য ঐ ঘন্ট ভাত। দিনের পর দিন এই ভাবে চলেছে। এই চালকে বলা হতো রেঙ্গুন চাল।

'তারপর রেঙ্গুন চাল চলে গিয়ে এল বালাম চাল। বালাম চাল দেখতে মোটা মোটা আতপ চালের মতো। তবে এই চালের দাম বেশি।

'তখন আমরা একটু বড় হয়েছি। দাদার বয়স পনের বছর। জয়নগরে মিত্র

পাড়ায় (ব্রাহ্মণ পাড়া) দাদা বারমাস থেকে তাদের সব কাজ ক'রে দিত।

'আমিও বড় হলাম। দশ বছরের মেয়ে। একজনদের বাড়ি গরু চরাতে যেতাম, আর ফেরবার সময় এক কুড়ি গোবর নিয়ে আসতে হতো। বাড়ির বৌকে আমি মামী ডাকতাম। গরু চরিয়ে এক কুড়ি গোবর নিয়ে ফিরলে মামী আমায় খেতে দিত। একদিন, বোধহয় একটু দেরি হওয়াতে, গোবর পেলাম না। ফিরে দেখি, মামী দরজার পাশে বসে আছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—তুই গোবর এনেছিস তো? বলতেই হল গোবর আনি নি। শুনে মামী সেদিন আমায় খেতে দিল না।

'বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, আমি আর ওখানে গরু চরাতে যাব না। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বলতেই হল—গোবর আনি নি বলে মামী আমায় খেতে দেয় নি।

'বাবা মজুর খেটে বাড়ি এলে মা বাবাকে সব কথা বললেন। বাবা বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে, আমি আর ওকে পরের বাড়ি খাটতে পাঠাব না। বলে, আমাকে নিয়ে, ধান চালের ব্যবসায় নামলেন। আমার বয়স তখন এগার বছর।'

এ পর্যন্ত বলে। অঞ্জলি বলল, 'তখনকার চালের ওজনটা একটু বুঝিয়ে বলি।

'আড়াই সের চালকে এক পালি বলা হতো। ও রকম কুড়ি পালি হলে এক কুড়ি ধান হল। বাবা দশ পালি চাল আমার মাথায় চাপিয়ে বাকি ধান নিজে নতেন। এক কুড়ি ধানের দাম একটাকা। এরকম ক'রে আমাদের ধান-চালের ব্যবসা চলতে লাগল। এতে আমাদের অনেক সচ্ছলতা এল।

'আমি যখন বার বছরের হলাম। বাবা আমার বিয়ে দিলেন। আমার স্বামীও চাষা ছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছিল। আমি হলাম দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

'আমার বিয়ে হয়েছিল ফাল্গুন মাসে। ধানচালের চাষ হয় বৈশাখ মাস থেকে। তাই, মাঝের এই দু'মাস আমার স্বামী আমাকে নিয়ে প্রথমে শাক সবজির চাষ আরম্ভ করলেন। তারপর বৈশাখ মাস থেকে ধান চাষ শুরু হল।'

'এবার বলি ধান চাষের কথা। ধান চাষ বছরে আট মাস চলে। বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত।

'বৈশাখ মাসে মাঠে হাল হল।

'ধান আগে বেছে নিতে হতো। যে ধানে একটুও "সুর" থাকত সে ধান চলত না।

'যে জমিতে ধান ছড়ানো হতো তাতে চারটে চাষ দিতেই হতো। মানে প্রথম দিন সকাল বিকেল সারাদিন জমি হাল হল। এই ভাবে, চারদিন জমিতে

হাল হলে, তাকে চারটে চাষ বলা হতো।

'এইবার তাতে ধান ছড়ানো হল। ছড়িয়ে "মই" দেওয়া হল। মাটিটা সমান হয়ে গেল।

'বৈশাখের বৃষ্টির জলে গাছ বেরিয়ে যায়। বৃষ্টি না হলে সে ধান নষ্ট হয়ে গেল। বৈশাখের রোদের তেজে চালের অংকুর শুকিয়ে যায়। আর গাছ বেরোয় না। কিন্তু বৃষ্টির জল পেলে যে গাছ বেরোয়, তা খুব শক্ত হয়।

'জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে খুব বৃষ্টি হলে একটা বড় মেছলায় বা গামলায় ধান ভিজিয়ে নেওয়া হল। সেই ধান ছেঁকে তুলে জল ঝরতে দেওয়া হল।

'এবার একটা বড় ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে দিয়ে, তার উপর একটা বস্তা ফেলে দিতে হবে।

'তারপর, তাতে ধান তুলে দিয়ে বস্তা ঢাকা দিতে হবে। তার উপর আরো খড় বিছিয়ে, ঢাকা দিয়ে, রোদে ঝুড়িটা বসিয়ে দিতে হবে।

'গরমে ধানের অংকুর এল। যে জমিতে এর পর ধান ছড়াতে হবে সে জমি জলে কাদা কাদা করা হবে।

'এই অংকুর ওয়ালা ধান পাখিরা খুব খায়, তাই পাহারা দিতে হয়।—

'গাছ বড় হলে, তাকে বলা হয় "পেকে ধানের তলা"। পাঁক মাটিতে ধান ছড়ান হল বলে তাকে বলা হতো "পেকে ধানের তলা"।

'শুকনো মাটির ধান, যা বৈশাখের জলে হয়, তার নাম "কার্কড় ধানের তলা"।

'চাষারা হাল করে, তারপর "বেওন" করে। বেওন করা হল ধানের গাছ লাইন ক'রে রুইয়ে দেওয়া।

'বড় ঘরের চাষার মেয়েরা এতে হাত দেয় না। কিন্তু গরিব ঘরের মেয়েরা তাদের কাপড়টাকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, বেশ আঁটসাট ক'রে কোমরে জড়িয়ে, কাপড়টা একটু উঁচু ক'রে পরে, ছেলেদের সাহায্য করে। তারা ঘাস "খুইয়ে" দেয়, মানে ছেলেদের বেওন করতে সাহায্য করে। সকাল-বিকেল শুধু ছেলেরা কাজ করে, দিনে বিশ্রাম করে। সারা দুপুর মেয়েরা মাঠে কাজ করে।

'যাই হোক, রোয়া হয়ে গেল।

'ভাদ্র মাসে সেই রোয়ার ভিতরে ঘাস জন্মায়। তখন আবার সেই ঘাস উপড়ে দিতে হয়।

'আশ্বিন মাসে ধানে "থোড়" এল—মানে ফুল এল।

'অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকল।

'আমরা গরিব ঘরের মেয়েরা লোক ধরে মজুর খাটাতে পারি নি, তাই আমরা—স্বামী-স্ত্রী, দু'জনে ধানের বীজ ফেলতাম, ঘাস উঠিয়ে দিতাম; লোক-জন মাঠ থেকে উঠে এলে, তখন বিয়ন ভেঙে দিতাম—গাছগুলো আঁটি ক'রে

বেঁধে রাখতাম, লোকজন আবার মাঠে গেলে, আমরা ঘরে চলে আসতাম। এই ভাবে আমরা মেয়েরা সাহায্য করেছি।

'এই ভাবে চাষ হয়ে গেল।

'পৌষ মাসে আমার স্বামী ধান কেটে রেখে আসত, আমি দুপুরে গিয়ে সেই সব ধানের গাছ বাঁধতাম। স্বামী মাঠে গেলে বোঝা মাথায় তুলে দিতাম।

'ধান বয়ে বাড়ি আনলাম। বাঁশের আগড়ের উপর গাছ সুদ্ধ ধান পেটা হল। খড়গুলো একদিকে "বাইয়ে" দিলাম ; ধান নিচে পড়ে রইল।

'ধান "সারানো" : দামায় ক'রে একজন ধান উপর থেকে ঝুরঝুর ক'রে ফেলতে লাগল, আর একজন কুলো দিয়ে হাওয়া দিতে লাগল। এক দিকে ধান পড়ে রইল, আর একদিকে ধানের "কুটি" ও "আকড়া" পড়ে রইল।

'সেই ধান তখন আমরা গোলায় তুলে দিলাম। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিন মাস আমরা গোলায় হাত দিই না।

'বৈশাখ মাসে গোলায় পুজো দিয়ে আমরা গোলা থেকে ধান পাড়ি।

'এই গোলায় পুজো হল—হাত-পা ধুয়ে, কাপড় বদলিয়ে এক ঘটি জল গোলার সামনে রেখে দেওয়া হল। পরে, গোলার উপর উঠে, ধান পেড়ে, নেমে এলাম। ঐ ঘটির জলে গোলায় ছড়া দিলাম।

'এই হল মোটামুটি ধানের কথা।

'এই চাষে, এক এক বছর চাষীদের বড় বিপন্ন হতে হয়। যেমন, গরুর "এসে" হলে চাষীরা চাষ করতে পারে না। গরুর "এসে হওয়া" মানে তার পায়ের খুর পড়ে যায়। তারা কাদাজলে হাঁটতে পারে না। তারা তাই হালও করতে পারে না।

'চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চাষ আর হল না। যতদিন না তাদের পায়ের ব্যথা সারবে, ততদিন তারা চাষ করতে পারবে না। তাদের দুঃখের গান হল

কাকড়ি তলা আর ফোটে না,
পেকে ক্যামনে করি—
হল তার গরুর এসে, লাগল দিশে—
চাষা কেঁদে মরি।
কৃষানের আর হয় না জন্ম
জনম গেল মাঠে
গাইয়ের পেটে বলদ রইল
লাঙ্গল বিকায় হাটে।'

'সেদ্ধ চাল : প্রথমে হাঁড়ি ক'রে ধান ভাপিয়ে জলে ভেজানো হল। দু'দিন

পরে সেই ধান হাঁড়িতে সেদ্ধ করা হল। তারপর, রোদে শুকোতে দেওয়া হল। পনের মিনিট পর পর ঘড়ি ধরে সেই ধান শুকোতে দেওয়া হল। এই পনের মিনিটের উপর যদি পাঁচ মিনিটও বেশি হয় তাহলে উপরের ধানটা শুকিয়ে যায় ও নিচের ধানটা কাঁচা থেকে যায়।

'এই পনের মিনিট ঘড়ি ধরে নেড়ে চেড়ে শুকিয়ে গেলে, দাঁতে কেটে দেখতে হবে চালটা কটকটে হল কিনা। যদি উপরের ধানটি শুধু মুড়মুড়ে হয়, তা ঢেঁকিতে দিলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তখন সেই ধান আবার জলে ফেলে সেদ্ধ করতে হবে। তারপর শুকনো হলে ঢেঁকিতে কোটা হলে দেখতে হবে চাল আর ভাঙছে কি না।

'এই সেদ্ধ চাল করতে, বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে অসম্ভব খাটুনি। ছ'দিন আট-দিন বাদল হলে সেদ্ধ ধান শুকনো করা যায় না। সেদ্ধ চালের রং-ও তখন বদলিয়ে হলুদের রং আসে। উঠোনে বড় বড় কড়া বসিয়ে সে ধান ভাজা হয়। চাল কটকটে হলে বোঝা যায় ধান ভাজা হয়েছে।

ঢেঁকিতে সেই ধান কুটে চাল তৈরি হল। যদিও, এইভাবে চাল করলে, চালের একটা গ্যাস হয়। বড় মেছলায় ধান দিয়ে, সে জল না বদলিয়ে, বারবার যদি ধান দেওয়া হয়, তা হলেও জলে একটা গ্যাস হয়।

'আতপ চাল: এটা করতে হলে, অত কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। ঠাণ্ডা হলে, ধান শুকনো ক'রে ধানটা ঢেঁকিতে কোটা হবে। এইভাবেই আতপ চাল হয়।

'বছরে আট মাস—বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত—ধান চাষ হয়। বাকি চার মাস চাষীরা বসে থাকতে পারে না। তখন তারা শবজির চাষ করে।

'এবার, ধান চাষের পর, ফসল চাষের কথা বলব।

'এই ফসলের চাষ দু'রকম জমিতে হয়। একরকম চাষ হয় নিচু জমিতে, মানে ঐ বেনো জমিতে। অন্য চাষ হয় উঁচু জমিতে। বেনো জমিতে, মানে নিচু-জমিতে হয় পাশা, কুমড়ো, ঝিঙে, উচ্ছে, পুঁই শাক, ঝুটি, তরমুজ। চাষীরা এই সব ফসলকে বলে "রবি খন্দ"।

'মাঘমাস থেকে রবি খন্দর কাজ শুরু হয়।

'চাষের কথা: একটা জমিতে যে ক'টা ফসল দেওয়া হবে, তার একটা মাপ আছে। ভাগ ক'রে নিতে হবে যে ক'টা ফসল দেব, সেই অনুসারে।

এ ভাগগুলো আকারে চৌকো। মানে আড়াই হাত লম্বা ও আড়াই হাত চৌড়া। এর চার কোণে চারটে গর্ত করা হবে এবং এক একটা গর্তের মাটি খুঁড়ে, সেই মাটি পাশে রেখে দিয়ে, অন্য জায়গা থেকে শুকনো মাটি সেই গর্তে ভরে দেওয়া হল।

'এই ভাবে, সারা জমিটা ভাগ ক'রে, কোণার মাটি তুলে কেলে শুকনো মাটি ভরা হল।

'শশার চাষ সব চেয়ে সোজা।

'কোণার এক একটা গর্তে চারটে ক'রে বিচি দেওয়া হল শুকনো মাটিতে। এতে জল দিতে হবে না, কারণ আশ পাশের কাদা মাটির রসেই মাটিটা ভিজে যাবে।

'এবার, মাঝের মাটিটা কুপিয়ে উল্টো ক'রে দেওয়া হবে। মাটিটা যত শুকোতে থাকবে গর্তের গাছও বড় হতে থাকবে।

'এবার মাঝের কোপানো মাটি ভেঙে, গুঁড়ো ক'রে, সারা জমিতে সমান ক'রে বিছিয়ে দেওয়া হল। জমির চার পাশে এবার নালা কাটা হবে। এই নালা দিয়ে জল এলে গাছের ভাটিগুলো সব ভিজে যাবে।

'পরে চার কোণের গর্তে যে বিচি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো বড় হয়ে, জমিতে বিছিয়ে গেল।

'তিন দিন সেখানে যাওয়া হবে না। জমিতে পা পড়লে সেখানে গর্ত হয়ে যাবে।

'শশার চাষ হয়ে গেল।

'এই ভাবে, কুমড়ো, ঝিঙে, উচ্ছে, পুঁইশাক, ফুটি, তরমুজ এগুলোর চাষ হবে। রবি খন্দের চাষ শেষ হল।'

'উঁচু জমির চাষ উঁচু জমিতে নিচু জমির দ্বিগুণ চাষ হয়। তাই আমার স্বামী আগাম খাজনা দিয়ে, তিন বিঘে উঁচু জমির বাগান করলেন।

'জায়গাটা একটু নির্জন ছিল। কাছাকাছি কোনো বাড়ি ঘর নেই। ঐ তিন বিঘে জমির মাঝে বেড়ার ঘরে আমরা দু'জনে বাস করেছি। আশে পাশে লোকেজনও ছিল না, তাই আত্মরক্ষার জন্য আমরা বল্লম, সর্শি, টৈকি রাখতাম।

'এই ঘরের চার পাশে নানা রকম শবজির চাষ করলাম। বৈশাখে ধান চাষ তো শুরু হলই, এই উঁচু জমিরও চাষ হতে থাকল। এখানে শটল, বেগুন, ঢেঁড়স, মুলো, বরবটি, বীন, লংকা তো হলই, পাট চাষও বড় করেই করতাম। তিন বিঘে জমির এক-এক দিকে এক-এক রকমের শবজি লাগালাম।

'বেগুনের চাষ বেগুন পেকে গেলে, তার বিচি বার ক'রে নিলাম। বিচি রোদে শুকোলাম।

'যে জমিতে বেগুন চাষ করব, জমিটা কুপিয়ে তার মাটিটা গুঁড়ো ক'রে নিলাম।

'এবার মাটি সমান ক'রে নিয়ে তাতে বিচি ছড়িয়ে দিলাম। মাটিটা আবার হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে, সমান ক'রে তার উপর পাতা চাপা দিলাম।

'এবার তার উপর জল দিতে হবে।

'তিন দিন পরে, গাছ বেরুল। গাছ বেরোবার পর একটু উঁচু ক'রে ভারা বেঁধে, তার উপর পাতা দিয়ে, ছায়া ক'রে দেওয়া হল। পাতার উপর জল ছড়িয়ে দিলে, অল্প অল্প ক'রে গাছে পড়তে থাকে। রোদ পড়ে গেলে পাতা গুলো তুলে দিতে হবে। সারারাত শিশিরের জলে ঠাণ্ডা হবে। আবার, আগের দিনের মতো রোদের তাপ থেকে বাঁচাতে হবে — পাতা দিয়ে ঢেকে।

'গাছ খুব সরু সরু কাঠির মতো হয়ে বেরোয়। তার ডগায় দু টি ক'রে পাতা থাকে।

'এই গাছ বাঁচাবার জন্য, রোদে পাতার ছায়ায় আর রাতের শিশিরের ঠাণ্ডায়, ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

'এবার, এই চারাগুলো নতুন ক'রে বসাতে হবে। এক আঙুল গর্ত ক'রে এক একটি চারা লাগাতে হবে। তবে দূরে দূরে। মানে আড়াই হাতের মাঝে একটি ক'রে চারা। চারাগুলো বিকেল চারটে থেকে সন্ধে ছ'টার মধ্যে সব লাগিয়ে ফেলতে হবে।

'পরদিন সকালে সব চারায় জল দিতে হবে, আর গাছের গায়ে যেন রোদ না লাগে, এইভাবে ছায়া দিতে হবে।

'এইভাবেই লংকার চারাও করতে হয়। শুধু গাছ পোঁতবার সময় এক হাত দূরে দূরে লাগাতে হয়। এইভাবেই, উঁচু জমিতে বেগুন লংকা ছাড়াও ঢেঁড়স, বরবটি ইত্যাদি নানান শব্জির চাষ হতে পারে — বাঁধা কপি, ফুলকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, বীন, কলা, পাট চাষ —'

এই পর্যন্ত বলতেই আমি বললাম, 'পাট চাষ? এ কি তুমি নিজের হাতে করেছ?'

ও বলল, 'হ্যাঁ। আমার স্বামী আমাকে যেমন যেমন বলে দিতেন করেছি। সব আমার বেশ মনে আছে।'

আমি বললাম, 'তবে এবার পাট চাষের কথা বল।' ও বলল, 'পাট দু'রকমের হয়। এক ধরনের নাম "হেমাৎ গড়গড়ে" পাট। এগুলো নিচু জমি থেকে চাষ হয়। মাটি ভালো হলে পাঁচ হাত, ছয় হাত উঁচু হয়। পাতা তেতো। পাতার নাম "নালতে পাতা"। এ পাতা খুবই উপকারী। এ পাতা রাতে এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে, পরদিন সকালে খেলে, বুকে পিত্ত নাশ হয়। এর ফল আকারে গোল গোল। এরই বিচি দিয়ে আবার পরের বছরে চাষ হয়। এটা নিচু জমির পাটের কথা মোটামুটি বলা হল।

'আসল পাট হল যেটা উঁচু জমিতে হয়। বৈশাখ মাসে। উঁচু জমিতে হাল দেওয়া হল। আট দিন সে হাল হবে।

'প্রথমে মাটিটা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেওয়া হল। বেশ ভালো ক'রে গুঁড়ো হবে। তাতে একটাও ঘাস থাকবে না।

'পাটের বিচি আধঘণ্টা ভেজাতে হবে। এই বিচি ছোট্ট কালো জিরের মতো হয়। তাই একটা নেকড়ায় ছেঁকে তুলতে হয়, যাতে জলটা একেবারে ঝরে যায়। তারপর, যতটা বিচি ততটা একেবারে ধুলোর মতো গুঁড়ো মাটি মেশাতে হবে।

'যে জমিটা হাল হল, তাতে মই দেওয়া হল। মাটিটা সমান ক'রে দেওয়া হল।

'আবার হাল হবে। এবারকার হাল খুব শক্ত হাল।

'প্রথমে, হাল চলে গেলে মাটি দু'ধারে পড়ে যায়। হাল ওদিক দিয়েই আবার ফিরে এলে, দু'ধারের মাটি এবার মিশে যাবে। এই হাল, যেমন চলে যায়, তার পিছন পিছন, ঘাস তুলতে তুলতে যেতে হয়।

'হাল হয়ে গেলে আবার তাতে মই দেওয়া হবে, যাতে মাটি আবার সমান হয়ে যায়।

'তিনদিন পরে, বাগানে গিয়ে দেখা গেল ক্ষুদে ক্ষুদে গাছ বেরিয়েছে। তাতে দু'টো ক'রে পাতা।

'এখন বিচি ছড়ানোর পর যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে বিচি আর ফুটল না। মাটির ভিতর নষ্ট হয়ে গেল। তখন আবার হাল হবে; আবার ঐ ভাবে বিচি ছড়ানো হবে।

'বৃষ্টি না হলে মাটিগুলো বেশ আলগা আলগা হয়ে রইল, আর গাছ বেরিয়ে গেল। পাট চাষ হয়ে গেল।

'পরে, গাছ যখন এক হাত উঁচু হবে, তখন যদি ঘন হয়ে বেরোয়, তাহলে "পৌচে" দিতে হবে। অর্থাৎ ঘন হয়ে গাছ বেরোলে, তাকে পাতলা ক'রে দিতে হবে। ভিতরে ঘাস জন্মালে তাও বেছে বার ক'রে দিতে হবে।

'গাছ বড় হতে লাগল।

'এই পাট বাগানে পাহারা দিতে হয়। পাটের পাতা বিক্রি হয়। তাই, যদি চুরি করে তাহলে পাট বেশি বড় হয় না। ডাল বেরিয়ে যায়। নইলে, এই পাট গাছ এগার হাত থেকে চৌদ্দ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়।

'ভাদ্র মাসে পাট কাটা হবে। সরু আর মোটা পাট, দেখে দেখে, বেছে রাখতে হবে।

'তিন দিন সেই পাট "জ্যাক" দেওয়া থাকল। অর্থাৎ, পাতা ঝরবার সময় দেওয়া হল। এবার ডগাগুলো কেটে বাদ দেওয়া হল। যেখানে পাট পচানো হবে, সেইখানে জড় হল।

'জলে, একধারে মোটা পাটগুলো ভেজানো হল, আর অন্য ধারে সরু পাট ভেজানো হল।

'পাট সহজে ডোবে না ; ভেসে থাকলে উপরটা শুকিয়ে যায়। তাই বড় বড় কলাগাছ বা গাছের গুঁড়ি পাটের উপর ফেলে দিতে হবে।

'পাট পচতে থাকল। আট দিন পরে সেই পাট আবার উল্টে দেওয়া হল। দু'পাশই পচে উঠল।

'ছোট পাট আগে পচে উঠলে জলে কাপড়ের মতো কেচে, তাকে বাড়ি আনতে হবে। ভিজে থাকতেই পাট ছাড়াতে হবে। শুকিয়ে গেলে তুসি হয়ে যায়।

'মোটা পাট কাচা এত সহজ নয়। পাটটা পচে গেল। দু'পাশে দু'টো "স্থলো" বাঁধা হল। বাঁশের স্থলো।

'এটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলা দরকার।

'জলে দু'টো মোটা বাঁশ দু'দিকে পুঁততে হবে। মাঝে একটা বাঁশ দিয়ে দু'ধারের বাঁশের উপর বাঁধতে হবে। এই বাঁশ দু'টো পাঁচ হাত দূরে দূরে থাকবে—যাকে বলে দু'ধারে দু'টো 'স্থলো' বাঁধা হল।

'মাঝের বাঁশের উপর পচা পাট লম্বা ক'রে, মাঝের বাঁশের উপর একটা স্থলো থেকে অন্য স্থলোয় রাখা হল।

'এবার একটা পিটুনি কাঠ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পিটতে হবে—যাতে ছালগুলো গলে যায়।

'এবার মাঝখান থেকে পাট ভেঙে নিয়ে, ভিতরকার পাকাটিগুলো বার করা হবে।

'পাট হাতে জড়িয়ে নিলাম। পাকাটিগুলো আগা থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

'পাটটা মুড়ে রাখা হল, যাতে জল বেরিয়ে যায়।

'এই জড়ানো পাট বাড়ি এনে, একটার পর একটা তাল ক'রে রাখা হল।

'তিন দিন পরে পাটে একটা সোনালি রং এল। তারপর, মোটা দড়ি লম্বা ক'রে টাঙিয়ে তার উপর পাট শুকোতে দেওয়া হল। কিন্তু চুরি যাবার ভয়ে, সন্ধেবেলায় সেই ভিজে পাট ঘরে তোলা হল।

'পাট খুব সাবধানে দড়ি থেকে নামাতে হবে, যাতে পাটের রোঁয়া দড়িতে না লাগে। আর পাটের পাট নষ্ট না হয়। তুষি বা এলোমেলো হয়ে গেলে, পাটের দর বাজারে কমে যায়।

এই হল পাটের চাষের কথা। পাট হয়ে গেলে, সেই জায়গায় মূলোর চাষ হবে।

'মূলোর চাষ : জমিটা হাল দেবার সময়, হালের মুখে, পাটের গোড়াগুলো উঠে আসে। সেই সব গোড়া বার ক'রে দিয়ে—আট দিন হাল হবে। রোজই এই হালে গোড়াগুলো উঠতে থাকবে। একেবারে পরিষ্কার ক'রে বের ক'রে

দিতে হবে। একটুও ফুটোকাটাও থাকবে না।

'এইবার মই দিয়ে মাটি ধুলো হয়ে গেল—জমিটা সমান হয়ে গেল।

'এক বিঘে জায়গায় ৫০০ মুলোর বিচি ছড়ানো হবে।

'প্রথমে, মুলোর বিচিটা জলে আধঘণ্টা ভিজিয়ে দেওয়া হল। তারপর জল থেকে ছেঁকে তুলে—যতটা বিচি, তার দ্বিগুণ মাটির গুঁড়ো বিচির সঙ্গে মেশাতে হবে। তাহলে মাটি জল শুষে নিলে বিচিটা ঝরঝরে হয়ে গেল।

'এইবার এই বিচি ঐ জমিতে ছড়ানো হল। একটা শুধু হাল দেওয়া হল—মই দেওয়া হল। দু-তিনদিন পরে গাছ বেরোয়।

'একটা মুলো গাছে চারটে পাতা বেরোয়। গাছের গোড়াগুলো আলগা ক'রে দেওয়া হল, মানে "খুসে" দেওয়া হল।

'একমাস পরে, গাছগুলো খুব ঘন হয়ে গেলে মাঝে মাঝে তুলে দিতে হবে। গাছ ঘন হয়ে থাকলে মুলো মোটা হয় না।

'দু'মাস পরে, কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দেওয়া হবে। যার ফলে মাটি আলগা হয়ে গেলে মুলো মোটা হবে।

'তিন মাসে মুলো বিক্রির জন্ত তৈরি হয়ে যায়। এই মুলোর চাষ কার্তিক মাসে। তিন মাসে, মানে পৌষ মাসে মুলো বিক্রির জন্ত তৈরি হয়ে গেল।'

'চাষীদের ছড়া

'ষোল চাষে তুলো ; তার অর্ধেক মুলো
চার চাষে ধান— ; বিনা চাষে পান।
আঁক কেটে, পাক কেটে, বসালাম চারা
ফুল নাই—ফল নাই, পাতাতে ভরা।

'ব্যাখ্যা : ষোল দিন চাষ দিলে তুলো হবে। মাটি যত ফুলবে তুলো তত উড়বে। তার অর্ধেক মুলো—মানে আট চাষে মুলো। চার চাষে হাল দিলে ধান চাষ হবে। পান চাষে কোনো হালের ব্যাপারই নেই।'

কার্তিক লাহিড়ী

ননী ভৌমিক

গল্প-উপন্যাসে আধুনিকতা

মাত্র কয়েক মাস হল তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন লেখক হিসেবে বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়ার পর। ননী ভৌমিক নামটি বিস্মরণের অনেক অতলে হারিয়ে যায় পাঠকের, এমন কি ছ'দিকের সমালোচকও খেয়াল রাখেন না ঐ নাম অনেক অনেকদিন। দু-বছরের বেশ কিছু আগে 'ধুলোমাটি' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭) এবং এক বছরের উপর 'ধানকানা' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮) দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হলেও বই দু-টি তেমন গুরুত্ব পায় না পত্র-পত্রিকায়। পুনর্মুদ্রণ হলেই কি এই না-আলোচনা, উপেক্ষা নয় মোটে ও ? নাকি এর অন্য কারণ আছে সাহিত্য-বহির্ভূত ?

তবু প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর বই দু-টির নতুন সংস্করণ প্রকাশে আমরা আনন্দিত হই, কারণ এ-ও একটি চেষ্টা ননী ভৌমিকের রচনাসমূহ পাঠকের সামনে আনার। তাঁর প্রবাস বাস কিংবা পত্র-পত্রিকায় এখন তাঁর লেখা না দেখা বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার প্রয়োচনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব অথবা প্রকাশিত রচনাগুলি ঠিকমতো পরিবেশিত না-হওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোনটি বা একাধিক কারণ দায়ী পাঠকের স্মৃতির অতলে তাঁর নাম হারানোর, তা তুখোড় গোয়েন্দাও বের করতে পারবে না।

পাঠকের বেলায় তবু একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিছু চেষ্টায়, কিন্তু সমালোচক কেন ননী ভৌমিক সম্বন্ধে পাঠকের মনে সামান্য কৌতূহল উস্কে দেন না, তা ভাবার বিষয় হয়ে পড়ে। গল্প, উপন্যাস বিষয়ক আজ অবধি যে ক'টি বিশেষজ্ঞ গবেষণামূলক ও ছাত্র-পাঠ্য বই বেরিয়েছে তার দু-একটিতে ননী ভৌমিকের নাম থাকলেও সেই উল্লেখ দায়সারা গোছের খুবই। কতকটা উদাহরণ দেবার মতো অনেক নামের মধ্যে একটি নাম 'ইত্যাদি'র আগে হয়ত। আলোচনা থাকলেও নমো নমো ক'রে সারা হয় দু-তিন লাইনে, নেহাৎ না লিখলে বিশ্রী দেখায় তাই।

কিন্তু ননী ভৌমিক কি এমনই খুদে লেখক যে তাঁর লেখা চোখেই পড়বে না সমালোচকের ? যাই হোক, যে-কোনো কারণে সমালোচক তাঁকে খেয়াল করেন না তত মনোযোগে, নইলে 'ধানকানা'-র মতো তাদা নবীনত্ব সম্বন্ধে

চকিত করে না কেন ?

'ধানকানা'-র প্রথম গল্প 'একটি দিন ১৯৪৪'-ই তো চমকে দেবার মতো, যার শুরুটি হয়েছে এমনভাবে—

'সকালবেলাকার সূর্যের আলো লুকে নিলো হাওড়া ব্রীজের চূড়ো। ছাই রঙের জেটি ও ওয়ের-হাউসগুলো গাদাগাদি করে অদ্ভুত এক বক্তব্যে শুরু হয়ে রয়েছে। গঙ্গার ঘোলা জল দূর থেকে দেখায় শাদা আর শক্ত। কলকাতা।' [পৃ ১]

সেই কলকাতার একটি দিনের ছবি বিভিন্ন ফ্রেম-এ (ফ্রেম্) চলচ্ছবির মতো সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেন লেখক ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন কলকাতার আনাচে কানাচে তার সামগ্রিকরূপটি তুলে ধরতে। আরম্ভের চারটি বাক্যের প্রথম তিনটিতে লেখক ছবি ফুটিয়ে তুলছেন কতকটা সিনেমার শট্-এর মতো আলাদা আলাদা, আপাতদৃষ্টিতে যার মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য সংলগ্নতা নেই, তবু ঐ তিনটি ছবি সাজিয়ে পর পর চতুর্থ বাক্যে মাত্র একটি নিরেট শব্দ 'কলকাতা'-য় গড়ে তুললেন ছবির সামগ্রিক তাৎপর্য।

আর এইভাবে ছবি তুলতে তুলতে ফ্রেম সাজিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর গিয়ে কলকাতা-কে স্পষ্ট ক'রে দিলেন আমাদের সামনে এমনভাবে

১ দৃশ্য ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঘুরছে মিত্র শব্দের সৈন্য ছবি তুলতে
২ দৃশ্য : গাঁয়ের লোক আসছে চালের খোঁজে কলকাতায়
৩ দৃশ্য বিলিতি হোটেলের ওপর তলার মৌজ
৪ দৃশ্য : বৌবাজার স্ট্রীট, ইয়াসিনের অবিরত কাজ
৫ দৃশ্য বারুইপুরের কাছাকাছি এক গাঁ থেকে স্বামী-স্ত্রীর কলকাতা আসা সিনেমা দেখার জন্য
৬ দৃশ্য পথ-চলতি লোকজন ও তাদের সংলাপ

ইত্যাদি। এইভাবে ঘুরছে লেখকের কলম ক্যামেরার মতো, যেন মানুষজন পথ-ঘাট তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আঁকতে আঁকতে।

ঠিক এইভাবেই লেখক 'ক্যানিং স্ট্রীট,' 'একতলা', 'চোর' গল্পে কলকাতার নিষ্ঠুরতা, সহমর্মিতা, লড়াকু আবেগ তুলে ধরেন ছোট-ছোট ফ্রেমের মাধ্যমে। আবার ক্যানিং স্ট্রীট-এর নিচু তলার জীবন, 'একতলা'-য় নিম্নবিত্ত পরিবার এবং 'চোর' গল্পে নিম্নবর্গের হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রাম বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে, ইত্যাদিতে তিনি কলকাতার অন্য এক রূপ উপস্থিত ক'রে কলকাতার বৈচিত্র্যকে আস্কটে ধরতে চান।

এ-রকম ছবি তুলে তুলে সাজিয়ে দিলে তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার চেয়ে যান্ত্রিকতা কাজ ক'রে যাবে বেশি—তেমন আশংকা জাগে। ননী ভৌমিক যথা-যথের হুবহু অনুসরণ অনুকরণের কাছাকাছি গিয়েও সরে আসেন বাস্তবতার টানে

সৃষ্টিশীলতার কাছে। এলোমেলো এলোপাতাড়ি ছবির মধ্যে ঠিক ঠিক বেছে নিতে না পারলে সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠতে পারে না কখনো। আর সঠিক বেছে নেওয়াই হচ্ছে বাস্তবতা। তখনি লেখক প্রসঙ্গ-পদ্ধতির পারিপাট্য বুঝে নিতে পারেন ঘটনা ও বর্ণনার কাছে এসে, দূরে সরে গিয়ে—এই প্রক্রিয়ায় তখন বিষয়-মুখ ও আত্মমুখ দৃষ্টি যুগপৎ কাজ ক'রে চলে শব্দের, ছন্দের, বাক্যের, বিষয় ও রীতির দ্বন্দ্বে এবং মিলনে, তাতে আবিল বা নীরস হয় না তার দৃষ্টি ভাবালুতা শুষ্কতার প্লাবন ও খরায়।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নবী ভৌমিক এমন এক রীতি, করণ-কৌশল বেছে নিচ্ছেন কেন গল্পগুলির জন্য। সমাজের নানা স্তরের ছবি, একই স্তরে কাহিনী স্থিত হলে সেই স্তরের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের আলো ফেলে, তাদের পৃথক পৃথক আশা-আশংকার মধ্যে মিলিত আশা-আশংকার আবহ তৈরি ক'রে, কখনো একটি ঘটনা বা দিন হলেও তাতে ব্যক্তি—সমাজের জটিল সম্পর্ক বা ব্যক্তিরই সংকট প্রতিফলিত ক'রে যেসব গল্প লেখেন তার পটভূমি, প্রেক্ষিত থেকে যায় যুদ্ধ, আকাল, মড়ক, মহামারী অলংকরণে মণ্ডনে নয়, একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে। তাই কি তিনি বেছে নিচ্ছেন ঐ রীতি ও কৌশল, কারণ ঐ পটভূমি থেকে উৎসারিত গল্প তো তেমন হবেই—আপাতদৃষ্টিতে ছাড়াছাড়া, এলোমেলো অনেকটা, ভিতরে ভিতরে অবশ্য ভীষণ যুক্তি মেনে চলে, যদিও সেই যুক্তিকে পাঠকের সামনে সরলভাবে প্রদর্শিত করা হয় না কখনো। মনে হয় এইভাবে নবী ভৌমিক একটা বিশেষ সময়-কে নায়কের মতো ক'রে নেন গল্পের বাঁধনে—অবিভক্ত বাংলার আশ্চর্য এক দামাল সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আকাল, পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহামারী, মড়ক কাবু ক'রে ফেলেছে বাংলাকে—তার গ্রাম গঞ্জ শহরকে।

শহরের গল্পে যেমন টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে একটানে সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়, গ্রাম গঞ্জের গল্পে কখনো সখনো এক-দু'জনের কথা মূল হয়ে গেলেও সারা গ্রাম তবু হারিয়ে যায় না, বরং গোটা জীবনযাত্রা ধরার ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে ভরে দেওয়া হয় এক-দু'জনের কথা যে, শেষমেশ বিশাল আকাশ যেমন ফটকটে হয়ে ওঠে, তেমনি দু-একটি তারাও তাতে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় না, সমান জ্বলতে থাকে—

বৃষ্টি নামল না। তাই কাজ নেই। কোদাল ঘাড়ে করে বাগ্‌দীপাড়ার লোকেরা দু প্রহর বেলায় ফিরে ফিরে এল। তারপরে একদিন ধর্ম ঠাকুরের ভাঙা ঘরের সামনে উঁচু হয়ে বসে হাঁপালে সবাই। কানে গোঁজা শালপাতার তৈরী আধপোড়া চুরুট নিয়ে নিঃশব্দে ধরাল বসে বসে।

খাটালি মিলছেক নাই।

না গো, মিলছেক নাই।

ঘর থেকে মেয়েরাও এল; তাদের কোলের ছেলেরা আঁকুপাঁকু করে মাই

চুবছে। স্তাংটো স্তাংটো ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রইল রোগা পায়ে।
না সো খাটালি মিলছেক নাই ; মেয়েরা সুর করে গায় দেয়। ডাকো তাহলে গুণীনকে, ডাকো, কয়েকজন পুরুষ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কাজের তাড়া দিল ; বলুক দেখি গুণীন, কি হচ্ছে ?
হাঁ ডাকো কেনে ?
বুড়ো গুণীন এলো লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। কালো কোঁচকানো চেহারা। রুক্ষ শাদা চুলে মাথা ভর্তি। মহুয়া গাছের তলে দাঁড়িয়ে ছানি-পড়া চোখে এদিক ওদিক তাকাল গুণীন, বাতাস শুঁকল। [পৃ ৬৪-৬৫]

অবশ্য শহরের গল্পেও এমন ঘটে, সকলের সম্মিলিত ছবি থেকে কোনো একজনের কথায় যাওয়া, আবার মিলিত ছবি তুলে ধরা — সেরকম

আলগা আলগা অমনোযোগে গল্প চলে। সকাল সকাল রান্না হয়ে গেছে তাই। অনেক পুরনো, অনেক শোনা কথা। কিন্তু সিনেমার গল্প করতে ইচ্ছা করে না। সিঁড়ির মুখে তেতলার আইবুড়ো মেয়েটা যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে থাকে। আর তখন সাত-আটটি পরিবারকে পৃথক করে চেনা যায় না আবছা আলোয়। মনে হয় ভাড়া বৌথ পরিবার আবার যেন জোড়া লেগে গেয়েছে অন্য এক তাৎপর্য। কয়েকটা তারা মিট্ মিট্ করে। [পৃ ৮৪]

প্রত্যেকে এসে মিলছে এক সম্মিলিত ধারায়, আবার কখনো সেই মিলিত ধারার মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকে, ননী ভৌমিক সেই অন্য তাৎপর্য ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্বন্ধে, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির বিকাশের তাৎপর্য ধরতে চাইছেন গল্পে।

গ্রামের গল্প অবশ্য আরেক তীক্ষ্ণ মাত্রা পায় মড়কের তীব্রতায়। শীতলা বা ওলাবিবির দয়া কিংবা কোনো আধিদৈবিক কাণ্ড, ম্যালেরিয়া এবং নাম-না-জানা প্রাণঘাতী জ্বরের মতো বাস্তবিক ব্যাপার নমশূদ্র ও মুসলমান পাড়াকে সমান বিপাকে ফেলে। ইহলোকের কোনো শক্তি বা অন্যকিছু যখন সেই বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে পারে না, তখন জন্ম নেয় অগাধ বিশ্বাস করার প্রবণতা ও আবেগ, যা মানুষকে নিয়ে যায় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন সব কাণ্ড-কারখানার দিকে। ননী ভৌমিক সূক্ষ্মভাবে উভয় সম্প্রদায়ের অসহায়তা কীভাবে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হয় পরিত্রাণের আশায়, তা দেখান। অবশ্য বাঁচার আবেগ, অস্তিত্বের প্রশ্ন সংকটার্কীর্ণ হলেও ধর্ম, জাতপাতের গণ্ডি কেমন অবলীলায় ভেঙে যায় তখন, এস্তাজের নমশূদ্র পাড়ায় ডোবায় স্নান করার ঘটনাটিতে তার প্রমাণ মেলে, সেই সঙ্গে এস্তাজের আর্ত প্রশ্নটি খুব সংগত হয়ে ওঠে —

চান কর্যা আলাম ওই ডোবাডায়, ওই ডোবাডায় ; নমোদের অসুখ তো বালো অয় শুনি, আমার হোবে না ক্যান ? [পৃ ৩৪]।

ঐ একই ধরনের সংগত প্রশ্ন আকালের সময় খিদের প্রশ্নটি। খিদের জ্বালায়

ফুটাদ বিদেশীকে মেরে ফেলে, যদিও সে মারার জন্ত তাকে মারে নি, 'যেভাবে হাত দুটো কোন্ সময় সাপের জাপটের মতো এঁটে গিয়েছিল লোকটার গলায়।' [পৃ ৭৩]। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও লোকটি মুড়ি দিতে অস্বীকার করলে কাণ্ডটি ঘটে। এই হত্যার নাযাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমরা বিব্রত বোধ করব নিশ্চয়ই।

আকাল, মড়ক, অনাহারের মধ্যে দিয়ে অসহায়তা বাড়লেও প্রতিরোধের একটা ইচ্ছাও চাড়া দিয়ে ওঠে না যে এমন নয়, কখনো-সখনো তা রূপ পায় স্পষ্টভাবে, যেমন 'হটাবাহার' গল্পে—

> দু-একজন স্থির ভাবে তাকায় তারপর চলে যায় পাহাড়ের দিকে। চালের পাতা না—টুকরা ভরে ভরে পাথর নিয়ে আসছে মেয়েরা। ফুল দিয়ে রয়েছে কুলী লাইনের সামনে। হেরে যেতে হবে জানে—তবু। [পৃ ১৪২]

তবে বেশির ভাগ সময় হেরে যেতে হয় বা ঐ ইচ্ছা স্বপ্ন হয়েই থাকে। না হলে ঐ গল্পের শুকরাকে চলে যেতে হবে কেন বাগান ছেড়ে? লেখক খুব সহজ সরল সমাধানের রাস্তায় পা বাড়ান না, যেমন সেই সময়ের কেন এখনকারও অনেক গল্প হয়ে ওঠে আশাবাদের সলতে জ্বালিয়ে দলীয় মতের অকাট্য প্রমাণের ইস্তেহার, যেন দলের মতামত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, তাকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ ও কর্তব্য। তখন ভুলে যাওয়া হয় দলের ও শিল্প-সাহিত্যের নিজস্ব স্বশাসিত এলাকা ও তত্ত্ব আছে, যা একাকার হয়ে গেলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঝানভীয় দাপটের পর আজ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না আর।

তবু কি ননী ভৌমিক সেই সরকারী আশাবাদের নিগড় ছিঁড়তে পেরেছেন সব সময়? 'চোর' গল্পের শেষে পাচু-র উক্তিতে 'খলিল ভাই, উ গাড়ি কার আছে, তোমার আছে, না আমার আছে, না ইংরেজের আছে? তো জরুর খুলে নিয়ে আসব—তামাম গাড়ি ইঞ্জিন খুলে নিয়ে আসব···' [পৃ ১২৫] সেই সরকারী ছোঁয়া পাওয়া যায় না কি? পাচু চোর, সে ইঞ্জিনের পার্টস ভেঙে এনেছে মিলিটারি গাড়ির। যদি মিলিটারি গাড়িকে অত্যাচার ও বিদেশী শাসকের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে অবশ্য একে চুরি বলা যায় না, প্রতিবাদের একটি পরোক্ষ ব্যাপার বলে মনে করতে পারি, এবং পাচুও জানে, 'উ শালা খলিল খামকা গাল দিলে আমাকে, তো কি এটা চুরি করা হল?···' [পৃ ১২৪] তখন কি চুরিটা প্রতিবাদের রকম-ফের হয় না?

'ধানকানা-র' গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে। তখন দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হবার মুখে এবং শেষ হয়েছে। ৪০-এর মন্বন্তর বিগত, আকাল এসেছে এবং মহামারী ও মড়ক। নিজ বাস্তুভিটে গ্রাম ও জমি থেকে উৎখাত হয়ে বিপন্ন কৃষক পড়ে গেছে কলকাতার ফুটপাথে, সদর-মফস্বলের শহরে শহরে। জোতদার মহাজন ঠিকেদার বাগান-মালিকের বোলবোলাই বেড়েছে শ্রী ও সমৃদ্ধির,

তবু তার গর্ভের ভিতর থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন সাহস ও অধিকারবোধ গোপনে গোপনে, যার অংকুর দেখা যাচ্ছে সবেমাত্র—ননী ভৌমিক এ সবই ধরতে চাইছেন অন্তভাবে নতুন ধরনে অবশ্য। নতুন বিষয়, তাই বর্জন করতে হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ করণ-কৌশল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নতুন করণ-কৌশল নেন 'চিহ্ন' উপন্যাসে, 'এ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।'

'ধানকানা'-র গল্পে অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনা অতি দ্রুতগতিতে ঘটে না, তার চলন অনেক মন্থর, কাহিনী তার চারপাশের পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়ে চলে, ফলে গল্পগুলিতে সরল আলোকচিত্র সুলভ মাত্র ঘটমান ঘটনার ছবি থাকে না, ঘটমানের মধ্যেই একটা আবহ তৈরি হয়ে যায় লেখকের ভাষার একটা চোরা অন্তর্মুখী টানে, তাতে সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির প্রাতিস্বিক সত্তা অটুট থাকে বেশ। এভাবে লেখক আধুনিক সমাজবাস্তবতার কাছাকাছি চলে আসেন, তাই মানিকের মতোই তাঁর লেখাও বিজাতীয় হয়ে ওঠে না।

আসলে তাঁর সহানুভূতি থাকে নিম্নবর্গে, তাদের জীবনকেই তিনি করতে চান মুখ্য বিষয়। অবশ্য এই বর্গে সামিল হয়ে যায় মধ্যবিত্ত মানুষও, যদিও তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে উচ্চবর্গে অবস্থানের। আর যে লেখকের আবেগ ও ইচ্ছা থাকে ভূমিলগ্ন মানুষের কাছাকাছি থাকার, তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হতে থাকে যে ঐ মানুষদের যেখানে অবস্থান, সেখানে একক প্রচেষ্টার চেয়ে সম্মিলিত প্রয়াসের টান থাকে বেশি, কারণ তারা জানে—সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে আছে জয়ের আশা, লক্ষ্যে পৌঁছুবার সিদ্ধি, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে চলন ও গমন, তার অমোঘ সংকেত। আধুনিকতা সেই সংকেত উন্মোচনের মধ্যে নিহিত, আমি থেকে আমরা-র দিকে চলার নির্দেশ ও চলা।

ননী ভৌমিক ছোটগল্পের সীমিত পরিসরের মধ্যেও তার আভাস পেয়ে যান, তাই কলকাতা-ই তাঁর উৎসাহের একমাত্র বিন্দু হয় না। রাঢ়দেশ, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের মানুষদের দেখে নিতে চান পরিপ্রেক্ষিতের সামগ্রে। আর তাই এত দিনের ব্যবধানেও তাঁর ছোটগল্প কখনো প্রাচীন পৌরাণিক মনে হয় না সেই সময় ও কাল বিগত হলেও, আধুনিকতার সংকেত জানার ফলে।

তাঁর প্রথম গল্পের বই-এর পারিপাট্য ও ছাদ কি বদলে যায় 'ধুলোমাটি'-তে, ননী ভৌমিকের প্রথম এবং এখন অবধি শেষ উপন্যাসে? 'ধুলো', 'ঝড়ের দিন', দিনরাত্তের ঝড়', 'মাটি'—চারটি শিরোনামে পরিচ্ছেদ সংখ্যা অব্যাহত রেখে লেখক ধুলোর অস্থিরতা থেকে মাটির স্থিরতায় পৌঁছাতে চান যেন। 'ঝড়ের দিন'

ও 'দিনরাতের ঝড়'-এর মধ্যে তেমন ইঙ্গিত থেকে যায়।

'দূর জেলার বাঙালে টান' এক ভদ্রলোক রামচন্দ্র চৌধুরী চাকরির সূত্রে এসে যাঢ়ের এক শহরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান উনিশ শতকের শেষ পাদে। মাত্র সেটুকু ভূমিকা সেরে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই চলে আসেন মূল বিষয়ে। মূলত একটি পরিবারের কথা—রামচন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী, পূর্ণচন্দ্রের চাকরি পাওয়া, এই সব। তা জানিয়ে দিয়ে লেখক পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দেন মন্দার—এই শতাব্দীর একটি বড় দুর্দশা পৃথিবীময় অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের—সামনে।

এর মধ্যে শহরে ঢেউ তুলতে শুরু করে গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলন, আসে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের জোয়ার। অনেক ছেলে জেলে যায় এবং আন্দামানে কেউ কেউ। বিনা দোষে মিথ্যা মামলায় ফাঁসি হয় প্রাণের। অন্যদিকে জেলের মধ্যে ঘটতে থাকে রাজনৈতিক রূপান্তর, সশস্ত্রবাদীদের মধ্যে জাগতে থাকে সাম্যবাদ সম্পর্কে আগ্রহ, এমন কি একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মীর বিশ্বাসও টাল খায় ধর্ম, জাত, পাত, গ্রাম-শহরে বিভাজিত মানুষের মধ্যে ফাটল গভীর তীক্ষ্ণ হতে দেখে—'সতেরো বছরের অহিংসা মন্ত্রের পরেও এই অন্ধতা? এ-গহ্বর নিশ্চিহ্ন করে মিলিয়ে দেবে এমন মন্ত্র কি তিনি পেয়েছেন? কেউ কি সত্যিই পেয়েছে।...' [পৃ ২২৯]

অরুণ হয়ত বলতে পারে এর উত্তরে 'যারা পারবে তারা এখনো জাগে নি। কিন্তু তারা জাগবে প্রতিমা, হ্যাভ্-নটেরা জাগছে।' [পৃ ২৬২]। বিশ্বাসের বদল হচ্ছে, যে শিবু 'শেষ পর্যন্ত টেররিস্ট থাকতে পারব' বলে প্রত্যয়শীল ছিল তারও বিশ্বাসে চিড় ধরে, সে আরম্ভ করতে চায় সাধারণ মানুষের বিন্দু থেকে। আর এর মধ্যে শহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর এক খবরে—'...যুদ্ধ। অদ্ভুত একটা সত্য। অদ্ভুত একটা অবাস্তবতা! সাতসমুদ্রপারের একটা দপদপ, সাত-সমুদ্র পার হয়ে আসা একটা ছায়া।...' [পৃ ২৯৫]

কিন্তু যুদ্ধই শেষ উত্তেজক খবর নয়, আরো চমক ছিল লুকিয়ে যেন, আচমকা এসে পড়ে 'একটা মিছিল। মিছিল—কিন্তু এ শহরে আরো অনেকবার যে মিছিল দেখা গেছে, সে মিছিল নয়। যে মিছিল কোনো দিন দেখা যায়নি, সেই মিছিল, চাষীর মিছিল।...' [পৃ ২৯৬]। সেই মিছিলে ধ্বনি ওঠে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের এবং ওঠে শ্লোগান—'লাঙল যার, জমি তার।

ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে অবিভক্ত বাংলায় এসবই ঘটে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কয়েক বছর আগে—১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩৯-৪০ এর মধ্যে। গোড়ায় রামচন্দ্রের স্থায়ী বসবাসের ভূমিকাটুকুর কথা বাদ দিলে 'ধুলোমাটি' উপন্যাসের কালসীমা ধরে নিতে পারি ঐ কয়েকটি বছর স্বচ্ছন্দে।

এই সময়টি খুবই উত্তাল রাজনীতির নানা তরঙ্গে ঔপনিবেশিক আমাদের দেশে। বিশেষ ক'রে বাংলায় শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের আমলাতান্ত্রিক,

প্রশাসনিক, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনিক পরিবর্তীয় কর্মচাঞ্চল্যের মুখরতায়। এটি নিশ্চিতভাবে এক রাজনৈতিক সময় মধ্যবিত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে, যদিও তখন আস্তে আস্তে জন্ম নিচ্ছে কৃষক-শ্রমিকের নতুন রাজনীতি। তবু মনে হয় এই রাজনৈতিক সময়টি ধরতে চান ননী ভৌমিক তাঁর প্রথম ও একমাত্র উপন্যাসে, যদিও ঐ রাজনৈতিক সময় পারিবারিক ব্যক্তিক হার্দিক সবকিছুর উপর পরোক্ষ-ভাবে হলেও এক ছাপ ফেলে যায়, চট ক'রে অবশ্য বোঝা যায় না। যেমন আস্তে আস্তে বাঁক জড়িয়ে যায় রাজনীতির মধ্যে এবং প্রতিমা-ও, হয়ত মোহিনী দেবীও অপ্রত্যক্ষে। এমন কি রামচন্দ্র যে স্বপ্ন দেখেন প্রায়োগিক শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির, তার সফলতা কেন কার্যকরতাও নির্ভর করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপকদের মর্জির উপর। যদিও মনে হতে পারে দুইয়ের মধ্যে কোনোই যোগসূত্র নেই, এমন কি স্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে ঐ ব্যবস্থার যোগ সহসা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করাও যায় না, কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটিকে আর গুপ্ত রাখা চলে না রামচন্দ্র হেরে যান সেটা বুঝতে পারেন না বলে।

এগুলি উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠলে কাহিনীর স্তরে স্তরে উন্মোচন, বা চরিত্রের বিকাশ পরিণতির মামুলি গৎ, কিংবা একক ব্যক্তির অন্তর্বাহী চিন্তাস্রোতের লিপিকরণ ইত্যাদি চালু রীতি পরিহার করতেই হয় বিষয়ের টানে। কারণ ঐ বিষয়ই ঔপন্যাসিককে টেনে নিয়ে যায় নতুন করণ-কৌশলের দিকে, বা এ-ও হতে পারে যে সময়কে ধরার নতুন রীতিটি শেষে বিষয় ও বক্তব্যে নতুনত্ব আনে।

কিন্তু ঝটিতি চোখ বুলিয়ে গেলে চারটি শিরোনামে বিভাজিত উপন্যাসটিকে মনে হবে লেখক যেন ইট গেঁথে গেঁথে ইমারত গড়ে তুলবেন—এক একটি বিভাগ তার ভিত, দেয়াল লিনটেল ছাদ ইত্যাদি। তার মানে প্রথমে কাহিনীর বনিয়াদ পাকা ক'রে চরিত্রদের দৃঢ় জায়গায় দাঁড় করিয়ে পরিণতি দেবেন হয়ত। কিন্তু একটু খেয়াল ক'রে পড়লে দেখতে পাই, প্রতি খণ্ডে যা বিবৃত হচ্ছে তাতে কাহিনী থাকলেও তা নিটোল কাহিনী নয়, কাহিনীর সূত্রো মাত্র, লেখক কেবল সেইটুকু ব্যবহার করছেন ঐ সময়টিকে ধরার জন্য।

আবার অন্যদিকে লেখক বিস্তৃত সময় ধরতে চাইলেও কাহিনীর অকূস্থল বিস্তীর্ণ করেন না খুব। তাতে এটা স্পষ্ট হয় যে তিনি উপন্যাসটিকে মহাকাব্যিক ধাঁচে লিখতে চান না, যদিও তিনি পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনী নিয়েছেন, মহাকাব্যে যেমন পারিকী সংঘর্ষ বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ায়। কিন্তু মহাকাব্যে বিস্তীর্ণ স্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে—'ধুলোমাটি'-তে ঐ বিষয়টি আদৌ প্রণিধানের যোগ্য হয়ে ওঠে না।

আসলে 'ধুলোমাটি'-তে প্রজন্মের বিরোধ, বিশ্বাসের সংকট, সেই সংকটের মধ্যে থেকে নতুন বিশ্বাসের জন্ম—বিষয় হয়ে ওঠে। 'ধুলো' অংশে রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও শিবু পরস্পরের মুখোমুখি না দাঁড়ালেও প্রজন্মের বিরোধটি গুপ্ত রাখা

যায় না কিছুতেই—'...কিন্তু সে তর্কে একটুও উৎসাহ নেই রামচন্দ্রবাবুর।... আপনমনে ঝাপ্‌সা চোখে তাঁর তাঁতের তৈরী কাপড়গুলো পরখ করতে করতে বুঝি তাঁতটাকে উদ্দেশ করেই বলেন,—এ কালটা আমি বুঝি না—গান্ধীকেও নয়—ঐ শিবুদেরও নয়। বুঝি না—।' [পৃ ৭৮]

'ঝড়ের দিন'-এ সত্যবাবুর মনে প্রশ্ন জাগছে এবং সংশয়। সেই প্রশ্ন ও সংশয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে তাঁর বিশ্বাসে চিড় ধরাচ্ছে, '...শিবু-প্রাণেরা হেরে গেছে। সন্ত্রাসবাদ হেরেছে—কিন্তু তাঁরা তো জিতলেন না, অহিংসা তো জিততে পারল না। তবে জিতল কে?...' [পৃ ২২৪]। এখন আদি বিশ্বাস টিকিয়ে রাখাই দায় হয়, জ্যোতির কথায় 'বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়ে গেছে...'। তবু বিশ্বাস ভেঙে যাওয়াই শেষ কথা নয়, তার মধ্যে থেকেই জন্ম নিচ্ছে অন্য এক বিশ্বাস, 'শুধু কেমন করে যেন এসে গেছে কিছু বই—ভয়ানক ভয়ানক নতুন কথায় সে সব বই ভর্তি। ভয়ানক ভয়ানক নতুন নামে সে সব বই স্পর্ধিত: লেনিন, স্তালিন, মার্কস, এঙ্গেল্‌স। সেই বইকে নিয়ে শুধু জানা, শুধু বোঝা, শুধু ক্লাস...' [পৃ ২৭০]।

প্রজন্মের বিরোধ, বিশ্বাসের সংকট ও বিশ্বাস হারানো বা বদল—কোনো নতুন কথা নয়, কিন্তু এসব অতিক্রম করে যে বিশ্বাসের প্রত্যয়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই কথাটি নতুন আমাদের দেশে তখন। আর এগুলি আস্তে আস্তে জাগতে থাকে প্রায় বিশ্বের আর্থনীতিক মন্দার সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী অধ্যায়ে। নবনী ভৌমিক উপন্যাসটিতে বিরোধ সংকট পেরিয়ে সেই নতুন বিশ্বাসের আগমনী তুলে ধরছেন পাঠকের কাছে, সেজন্য কোনো একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাহায্য বা মাধ্যম নেওয়া হয় না, তার বদলে অনেক চরিত্র ঐ সময়বৃত্তের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ, ধ্বস্ত বা সরে যাচ্ছে কীভাবে কতটুকু, সেই প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে এখানে যে ছবি ফুটে উঠছে তা 'ধানকানা'-র প্রথম গল্পের মতো ক্যামেরা হাতে ভ্রাম্যমাণ লেখকের কলমের ছবি নয়, ছবির ঘেরও তৈরি করা হচ্ছে না তেমন, কারণ ঘের তৈরি হতে হতেই তাতে চরিত্রের আঁতের কথা বের করে আনার চেষ্টা চলছে। এ জন্যই বোধ হয় 'ধুলোমাটি'-র ভাষা আত্মমুখী ছোঁয়া লেগে ঘটনার বর্ণনার চেয়ে বিশ্লেষণের সহায়ক হয়ে উঠছে। অবশ্য তাঁর গল্পেও এই গুণটি ছিল। এতে উপন্যাসটির চলন তাঁর গৃহীত রীতির মসৃণ চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবে।

হয়ত ভাবার মধ্যে বিষয়মুখিতা আত্মমুখিতাকে বেশি ঠাঁই দিয়ে ফেলে বলে বীরুর চরিত্র যত আমাদের টানে, অন্য পুরুষ চরিত্রগুলি তত এক-বৈথিক হয়ে যায়। অবশ্য এখানে সম্পর্কের জটিলতা নির্ণয়ের প্রশ্নটিও এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

বীরুর চরিত্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেও, তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্বন তীক্ষ্ণ ও

স্বাভাবিক হলেও, বীরু তো উপন্যাসের একটি অংশ মাত্র, যেমন আর একটি উজ্জ্বল ছোট্ট অংশ দিদিমা, যিনি অবশ্য আমাদের মন কাড়েন অন্য কারণে—'পথের পাঁচালী'-র ইন্দির ঠাকুরণের মতো প্রায়। দিদিমা কৌলিন্য-প্রথাবিদ্ধ পুরুষ লাঞ্ছিত সামন্ততান্ত্রিক বিধানের শিকার বিশেষ এবং তিনি আমাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ঠিক সরাসরি ফসলও নন। তিনি যে ঘুসর জীর্ণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকেন, সারা জীবন স্বামীর লাঞ্ছনা ও উপেক্ষা ভোগ করেন, কেবল একটু স্বীকৃতি পাবার আশায় (যা তিনি পান পুলিশের উপর রামচন্দ্রের রোষের সময়)—তা আমাদের সমাজে বিগত ব্যাপার নয় মোটে। সেজন্য তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা সব জীবন্ত হয়ে ওঠে অতীতের ছোঁয়া লেগে। তখন আর ঐ চরিত্রটিকে দুঃখের বা নিপীড়নের প্রতীক বলে মনে হয় না, যেমন রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র বা শিবু হয়ে ওঠে যথাক্রমে ইচ্ছাপূরণ, হীনমন্যতা বা আদর্শবাদের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হবার জন্য ঐ সব চরিত্রের উপর সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। এজন্য চরিত্রগুলি একরকম তেমনই হয়ে ওঠে, কিংবা তেমন হয়ে থাকে।

উপরন্তু ধুলোর অস্থিরতা থেকে মাটির স্থিরতায় পৌঁছনো—অনেক মসৃণ-ভাবে হয়ে যায় যেন। রাজনৈতিক সংঘাত ও দ্বন্দ্বগুলি সরলভাবে বিবৃত হয় বলে নতুন বিশ্বাসের বীজ থেকে অংকুর হওয়াও প্রায় মেনে নেওয়া ব্যাপারের মতো হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এগুলি তো পাটিগণিতের অঙ্কের মতো ধাপে ধাপে সমাধানের পথে যায় না।

আবার ঘটনার চাপে যখন ঘনীভূত হতে চায় সংকট, লেখক তখন দ্বিধায় পড়েন বিষয়মুখ ভঙ্গির উপযুক্ত প্রয়োগ না করার জন্য। না হলে ছেলের জেল হওয়ার অপরাধে পূর্ণর চাকরি যাওয়ার পর তার আত্মিক আর্থিক সাংসারিক সংকটের কত সহজ সুরাহা হয়ে যায় মোহিনীর স্বোপার্জনের চেষ্টায় যেন—মোহিনী কিছু রোজগার করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অথচ কী দারুণই তীব্র হতে পারত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঐ অনটনের সময় নানা টানা-পোড়েনে। এমন কি তাতে ছেলেমেয়ের অবস্থান দারুণ জটিল ক'রে দিতে পারত সম্পর্ক। কিন্তু ঔপন্যাসিক মোহিনীকে উপস্থাপিত করেন আদর্শায়িত রূপে—পূর্ণর জমি কেনার ব্যাপারে (যে জমি কেনা শ্রাদ্ধ্য নয় পূর্ণর) তার নীরব আপত্তি, শিবুর রাজনীতির ব্যাপারে সাহায্য বা মেয়ে স্বামীকে একেবারে ছেড়ে এসে নিজের প্রিয়পাত্রের কাছে নার্সিং শিখতে চাইলে 'দান হিসেবে না পেয়ে, ভালোবাসা তোরা অর্জন করে নিতে শেখ' ইত্যাদি কথায় মত দেওয়া—মোহিনীর নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামের চিত্রটিকে উহ্য রাখে। আর তা উহ্য থাকে বলে খুকিও সেই অনুপাতে এক-বৈথিক হয়ে ওঠে এক সময়।

আবার কিছু ঘটনা উদাহরণ দেবার সামিল হয়, যেমন জগার দিদি ও ইয়াসিনের ছেলের ঘটনা। বাস্তবে এমন ঘটনাই হয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

লাগার পক্ষে যথেষ্ট, উপন্যাসে তার উপক্রমও হয়। কিন্তু ঐ ঘটনা 'ধুলোমাটি'-তে প্রাসঙ্গিক হতে গেলে তার সুদূরপ্রসারী ফলের কথা যেমন মনে রাখা উচিত, তেমনি তার উদ্ভবের কারণসমূহের প্রাসঙ্গিকতাও বিচার করা দরকার। তেমনি খানিকটা আচমকা মনে হয় যিনি-সুজিত উপাখ্যান। বিত্তবান জীবনের অন্তঃসার-শূন্যতা দেখানো কি উপন্যাসে জরুরি ছিল খুব? রায়বাহাদুরের রাস্তার লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া?

নবী ভৌমিক যেখানে সরাসরি ঘটনা আনতে চেয়েছেন, সেখানে তাঁর কলমের গতি স্খলিত হয়েছে অনেকখানি যেন। তাই 'মাটি' অংশের দ্রুত সংক্ষেপ উপন্যাসটির বিরাট সম্ভাবনা কহিল ক'রে দেয় খুব। তাই 'লাঙল যার জমি তার' ধ্বনি শুনে পূর্ণচন্দ্রের আমূল নাড়া খাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলা সহজ সরল বলে মনে হয়, '…কেরানিগিরি শেষ হয়েছে। জমিটুকু ছিল, আজকের মিছিল দেখে মনে হচ্ছে সে ভরসাও বোকামি। তাহলে কী নিয়ে শুরু?' তবু একান্ত নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত চাষীদের জঙ্গী মিছিল দেখে আর কী ভাবতে পারে স্বাভাবিকভাবে এর বেশি?

বরং এর উত্তর মোহিনী দেবী যা বলেন, 'ভালোবাসা নিয়ে। অন্যদের চেয়ে এই একটা দিকে আমাদের জিত। তাছাড়া আমিও তো রোজগার করছি, আপনিও খাটতে পারেন—' তা আশ্চর্য সরল বলে মনে হয়। মোহিনীর উক্তিতে সেই সরকারী আশাবাদের সহজ সমাধানের নিখুঁত সারল্য ধ্বনিত হতে শুনি। নিষ্পত্তি এত সহজ হলে কত সুখের হতো। অথচ নবী ভৌমিক বাস্তবকে চেনেন জানেন অনেক অন্তরঙ্গতায়, যেমন—

> সত্যবাবু অনুভব করেন কী একটা স্রোত যেন পাক খেয়ে চলেছে অনবরত। তিরিশ সালে সে স্রোতটার মুখ ছিল বাইরের দিকে, তার ঝাপট ছিল এক লক্ষ্যে। তারপর কানা নদীর মতো কখন ঐ মাথাতোলা ঢেউটা মুখ নামিয়ে নিজের মধ্যে পাক খেতে শুরু করেছে বোঝা যায়নি। শুধু তার টান গিয়ে পড়েছে আচমকা এক-একটা এলাকায়, হঠাৎ হাঁ করা এক-একটা ফাটলে।…[পৃ ২২৩]

বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে আসাই স্বাভাবিক ছিল, অনেকটা জীবনানন্দ দাশ যাকে বলতে চেয়েছেন 'ডাইভারসিফাইড অটোবায়োগ্রাফি' তেমন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের মজাই হচ্ছে এই যে তার ফসলকে ধরা-বাঁধা সূত্র বা নিয়মের মধ্যে এঁটে রাখা যায় না। আর যাঁর অভিজ্ঞতা আছে তেভাগার সময় সারা বাংলা দেশে ঘোরার, শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার তিনি কিভাবে সরে আসবেন সেই বিশাল সম্মিলিত মানুষের কাছ থেকে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস লেখার জন্য মাত্র—আধুনিকতার বিশাল প্রান্তর থেকে আদি-আধুনিকতার আত্মকেন্দ্রিক গণ্ডির মধ্যে?

তিনি তো দেখেছেন, বীরু যেমন দেখে তার আবাল্য শহরের দিকে ফিরে তাকিয়ে—সেই শহরকে ঘৃণা করতে করতে, তবু তার অন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে, অজস্র মুখ ভাসাতে ভাসাতে একটি রুচি নিষ্পাপ মুখ অকাল ধর্ষণে বীভৎস হয়ে শহরের ছায়ায় ছায়ায় হারিয়ে গিয়ে মিশে যায় 'এক অস্পষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে—সে সংজ্ঞার নাম বাঙলাদেশ।'

সেই মুখ নামিয়ে নিজের মধ্যে পাক খেতে শুরু করা ঢেউটা ছড়াতে ছড়াতে আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি কাটিয়ে মিশে যেতে থাকে সারা বাংলাদেশে। তাকে তুলে ধরতে গেলে ছাড়তে হয় পান-বাঁধানো প্রচলিত রাস্তা, নিতে হয় খুব সংকুল হলেও সেই পথ—আমি থেকে আমরার দিকে যা বাঁক নিচ্ছে সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশে দেশে, যার সংকেত আধুনিকতার দিকে। 'ধুলোমাটি' তারই সহযাত্রী হয়েছে অবশেষে, যদিও 'ধানকানা' অনেকখানি এগিয়ে আছে সেই সুবাদে—প্রসঙ্গ-প্রকরণ-সময়ের নিবিড়তায়।*

---

*'ধানকানা' ও 'ধুলোমাটি'র উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে প্রথম অরুণা সংস্করণ (যথাক্রমে ১৯৮৮ ও ১৯৮৭) থেকে

ননী ভৌমিক-গ্রন্থপঞ্জি

ধানকানা। কলকাতা, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, চৈত্র ১৩৫৯ [১৯৫৩]। ১৬৭ পৃষ্ঠা। ২·৭৫ টাকা। [১০ টি গল্পের সংকলন]
পুনর্মুদ্রণ কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮। ১৫·০০ টাকা।
আগন্তুক। কলকাতা, সাধারণ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬১ [১৯৫৪]। ১৫০ পৃষ্ঠা। ২·০০ টাকা। [৮ টি গল্পের সংকলন]
ধুলোমাটি। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৬৩ [১৯৫৭]। ৪০৭ পৃষ্ঠা। ৬·০০ টাকা। [ননী ভৌমিকের একমাত্র উপন্যাস]
পুনর্মুদ্রণ কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭। ৩০·০০ টাকা।
পূর্বক্ষণ। কলকাতা, আভারাণী মিত্র [পরিবেশক—সাহিত্য], কবিপক্ষ ১৮৭৯ শকাব্দ [১৯৫৭]। ১২৮ পৃষ্ঠা। ২·০০ টাকা। [৮টি গল্পের সংকলন]
চৈত্রদিন। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, অক্টোবর ১৩৬৫ [১৯৫৮]। ১৬৭ পৃষ্ঠা। ৪·০০ টাকা। [১০ টি গল্পের সংকলন]

—দেবাশিস মুখোপাধ্যায় -সংকলিত

সুচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কফি হাউস

কাউন্টারের ওপার থেকে

ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের ১৪ অক্টোবর, অর্থাৎ ঐ দিন আমি কফি বোর্ডের চাকরিতে যোগদান করি। কলকাতা তখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় একেবারে বিধ্বস্ত।

কফি বোর্ডের ব্যাপার বলতে গেলে একটু পিছনে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আগে এই কফি শুধু ধনীদের ঘরেই বিরাজ করত। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তরা চা পান করেই আরাম পেতেন। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে কফি চাষ হতো এবং সেখান থেকে কফি বীন্‌স বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য অংশে চালান যেত। ঐ বীন্‌স থেকে পাউডার বানিয়ে ব্যবসায়ীরা স্টল, রেস্টোরাণ্ট ও সৌখিন দোকানে সরবরাহ করতেন। মোটামুটি জিনিসটা একরকম চলছিল।

দক্ষিণ ভারতের অনেক অভিজ্ঞ লোক ভাবলেন এই জিনিসটাকে আরো ভালোভাবে সংগঠিত করলে তো ভালো হয়। তাঁরা একস্‌পান্সন মার্কেট তৈরি করলেন—'কফি বোর্ড' হল।

প্রথমে বোর্ড ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে প্রচার আরম্ভ করল। কলকাতার নামী রাস্তাগুলোর মোড়ে কফি বানানো ডিমনস্ট্রেশন করে বিনামূল্যে কফি খাওয়াতে লাগল। জিনিসটার প্রচার বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। কলকাতা, বম্বে, দিল্লিতে বোর্ডের কর্তারা ঘুরতে লাগলেন। মিঃ এম. জে. সাইমন ছিলেন প্রোপাগাণ্ডা অফিসার এবং অনেক ডেপুটির মধ্যে মিঃ কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন সাইমন সাহেবের ডানহাত।

কফির প্রচারকে আরো জোরদার করার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মিঃ কৃষ্ণমূর্তি কলকাতায় এলেন, সঙ্গে মিঃ জে. এন. চৌধুরী। চৌধুরী মহাশয় টাকির বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের লোক। ভাগ্যান্বেষণে নানা জায়গায় ঘুরেছেন, মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধে পর্যন্ত গিয়েছিলেন শোনা যায়। Eating Business-এ বিশেষ পরিদর্শিতা থাকায় দিল্লির কোনো এক হোটেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দিল্লিতেই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ। ফলে কফি বোর্ডে যোগদান করেছেন। বন্ধুসন্তান, উদ্যোগীপুরুষ। কৃষ্ণমূর্তির পাকা মাথা, লোক চিনেছেন এবং কলকাতায় মিঃ চৌধুরী প্রয়োজনে লাগবেন চিন্তা করেই সঙ্গে এনেছেন।

প্রথমে কফি প্রচারের সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্যও দেওয়া হতো, অবশ্য দক্ষিণ ভারতীয় খাবার—ছিল ডোসাই, ক্যাহুনাট ইত্যাদিও। প্রচারটা বিনামূল্য থেকে অবশ্য cheap rate system হয়েছিল।

নতুন পরিকল্পনায় বোর্ড পলিসি কিছু বদলেছে। কলকাতা, বম্বে, দিল্লিতে Eating House System-এ কফি প্রচার করবে—সঙ্গে ঐ খাবারগুলো থাকবে।

কলকাতায় এসে কৃষ্ণমূর্তি ও চৌধুরীর কাজ হল ঘর খোঁজা। একদিন সকালে তাঁরা বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর উল্টোদিকের বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেন। বাড়িটার উপরতলাগুলো হয়েছে, কিন্তু একতলাটা কিছু হয় নি, ফাঁকা। আশপাশের লোকেদের গরুগুলো বাঁধা, জাবর কাটছে। মিঃ চৌধুরীর বাস্তববুদ্ধি কৃষ্ণমূর্তি সাহেবকে প্রলোভিত করল, ল্যাণ্ডলর্ডের খোঁজ নিতে গ্রাউণ্ড ফ্লোরটার ভিতরে দু'জনেই ঢুকলেন। মিস্ত্রিরা কাজ করছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা তাদের কনট্রাকটারকে দেখালে। ভদ্রলোকের নাম শচীন বসাক। মিঃ চৌধুরী ল্যাণ্ডলর্ডের কথা জিজ্ঞাসা করতে বসাক বললেন, বর্তমান মালিক অভিরাম মল্লিক। ইনি রায়বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিকের একমাত্র পুত্র। [এই প্রমথনাথ মল্লিকই 'কলিকাতার কথা' বইয়ের রচয়িতা।] বিষয়টা জানতে পেরে শচীন বসাক বললেন, এসব বিষয়ে কথা ল্যাণ্ডলর্ডের সঙ্গে হবে না, কথা হবে ওঁর এস্টেট ম্যানেজার ও আইন পরামর্শদাতা প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মিঃ চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কলকাতার ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন।

প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিঃ কৃষ্ণমূর্তি ও মিঃ চৌধুরীর কয়েকটি বৈঠকের পর ৫ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে গ্রাউণ্ড ফ্লোরটি কফি বোর্ডকে লিজ দেবার চুক্তি হল কয়েকটি শর্তে। ঐ শর্তগুলির অন্যতম হল কলকাতার কফি হাউসের জন্য কিছু বাঙালি স্টাফ নিতে হবে। বোর্ড ঐ শর্তে রাজি হল। বলা বাহুল্য, প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতৃদেব।

১৯৪১—সুভাষচন্দ্র বসু সহসা অন্তর্ধান করেছেন। চারিদিকে হৈ হৈ। ঐ সময়ে ৫ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর একতলাটি কফি হাউসের উপযোগী ক'রে তৈরি করা হল। বোর্ডের চলতি কথা অনুযায়ী পরে ঐ বাড়িটিকে সংক্ষেপে আমরা ফাইভ সি. এ (5 C. A) বলতাম। কোনো এক শুভদিনে কফি হাউসের উদ্বোধন হল। কফি হাউসের প্রচার ও প্রসার বাড়তে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেই চল্লিশের দশকের গোড়ায় কলকাতার চেহারা অনেকেরই মনে আছে। রাত্তা সন্ধ্যায় ব্ল্যাক আউট। গ্যাসের বাতিগুলো টিম্‌টিম্ ক'রে জ্বলে। ব্যাফ্‌ল ওয়াল সরকারি ও বড় বাড়িগুলোর সামনে, যাতে শত্রুর বোমা বিফলে যায়। মাঝে মাঝে সাইরেনের আওয়াজ। চার্চিল তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। ওঁর চুরুট খাওয়া মুখের পোস্টারিং চারিদিকে, তাতে লেখা When siren goes take shelter। রাস্তার পাশে ট্রেঞ্চ খোঁড়া রয়েছে।

বাড়িগুলোর পাশিতে কাগজে আঁটা, যাতে বোমার টুকরোগুলো না আসতে পারে। কলকাতার রাস্তায় ব্রিটিশ আমেরিকান সৈন্যরা টহল দিচ্ছে।

সর্বত্রই একটা আতংকের ভাব থাকলেও কফি হাউস কিন্তু চলতে লাগল রম্‌রম্‌ করে। কলকাতায় এ ধরনের Eating House এই প্রথম। কাজের অবসরে একটা ছমছমে ভাব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এই আস্তানাটা কলকাতার মানুষের বেশ ভালো লাগল। রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশার নামী অনামীরা এখানে আসতে আরম্ভ করলেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা তো কফি হাউসটাকে ঘরবাড়ি ক'রে তুলল। ইতিমধ্যে আমার জেঠ্‌তুতো বড়দা, মেজদা এবং অন্যান্য পরিবারের কয়েকজন বাঙালি এখানে ঢুকে পড়েছেন।

এরপর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। সংক্রামক রোগের মতো দাঙ্গা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বাবার নির্দেশে এই ১৯৪৬-এরই কোনো এক সকালে আমি মেজদার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল সোসাইটিতে কিছু কেনাকাটা করতে গেলাম। এই ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি তৎকালে কলেজ স্ট্রিটের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে ছিল। এখন সেখানে University Sales Counter হয়েছে। বিরাট দোকান। জামা-কাপড়, সুট, শার্ট ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস পাওয়া যেত। ধনী-মধ্যবিত্ত সকলেই ক্রেতা ছিলেন। দরদামের একটা স্বাভাবিক রূপ ছিল। মেজদার সঙ্গে আমাকে এখানে যেতে বলার উদ্দেশ্য আমার কিছু পোশাক পরিচ্ছদ কিনতে হবে। বাবা বললেন, 'তোর কফি-হাউসে' চাকরি হয়েছে।' প্যান্ট-শার্ট-জুতো-মোজা-টাই কেনা হল, কারণ এটাই তখন কফি হাউসের পোশাক ছিল।

১৯৪৬-এর ১৪ অক্টোবর বৌবাজার শিবমন্দির স্টপ থেকে ট্রাম ধরে মেজদার সঙ্গে আমি কাইভ সি. এ-তে গেলাম। কলকাতায় তখন দু'টো 'কফি হাউস' চলছে। বিখ্যাত অ্যালবার্ট হল এই একই ল্যাণ্ডলর্ড কিনেছেন—অতএব বাবার তত্ত্বাবধানে। সে-কথায় পরে আসছি।

মিঃ আর্থার দক্ষিণ ভারতীয় খ্রীস্টান, কাইভ সি. এ-র ম্যানেজার। মেজদা আমাকে ওঁর সামনে হাজির ক'রে পরিচয় দিলেন। উনি আমাকে মামুলি দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভীরুস্বরে আমি উত্তর দিলাম। কাজ হয়ে গেল।

প্রথম দিন ডিউটি পড়ল এক নম্বর কাউন্টারে। জানি না কিছু। দু'জন ক'রে লোক থাকত তখন কাউন্টারে। একজন বাঙালি কাউন্টারে ছিলেন—নাম ছিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি আমার সঙ্গে খুব সহযোগিতা করলেন। দু'জন থাকার অর্থ, একজন বিল লেখে, অন্যজন ক্যাশ সামাল দেয়। ছিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় কফির টেবিলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে হয় খেতে পারেন, খাওয়াতে পারেন, পয়সা লাগবে না।

টেবিলে গেলাম, একটা বেয়ারাকে মেনু কার্ড দেখে অর্ডার দিলাম scrambled egg on toast আর কফি। কিছু পরে খাবারটা এল। টোস্টের উপর ডিম, দুধ, মাখন মিশ্রিত একটি পদার্থ। খাবারটা বেশ লাগল। খাওয়া শেষে আবার কাউন্টারে এলাম। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপটা বেশ জমে গেল।

বিকালে মিঃ চৌধুরী এলেন। আগে এই হাউসে মার্কেটিং অফিসার ছিলেন, এখন আলবার্ট হল কফি হাউসের ম্যানেজার। সকলে 'চৌধুরীবাবু' বলতেন। চেহারাটা তাঁর একটু অস্বাভাবিক ধরনের ছিল। মোটা, কুঁড়ি ছিল। চেহারার গঠন দেখে রসিক কাস্টমাররা বলতেন, ওঁর চেহারাটাই কফির প্রচার!

চৌধুরীবাবু আমার পরিচয় পেয়ে হাসলেন। একটু পরে আর্থার সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল। মেডিক্যাল পরীক্ষা। সেটা কিছুই নয়—দাড়ির নিচে কাটা দাগটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক চিহ্নিত হল। কাউন্টারে ফিরে এলাম। কফি হাউস তখন রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকত। দ্বিজেন আমায় আগেই ছেড়ে দিলেন। বৌবাজারের বাসাবাড়িতে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে এলাম।

দেওয়ালে সুধাংশু চৌধুরীর চিত্রাংকন। টেবিলের কাঁচগুলোর ভেতর থেকে ভেসে ওঠা সবুজ আভা। বসার টেবিলগুলো আরামপ্রদ। আলো-পাখার বৈশিষ্ট্য। তার উপর কফির কাপে লেখা—XL's all pick-me-ups। একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়। কফি হাউসের সে এক রমরমে রূপ। বাইরে দাঙ্গা হলেও কফি হাউসের ভেতরে ছিল 'এক জাতি এক প্রাণ' ভাব।

কাজটার ভেতর প্রথমে আমার ভয়-ভাবনার সঙ্গে একটা আনন্দের মিশ্রণও ছিল। ভয়—যদি ভুল হয়! ভাবনা—টাকা-পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে। ভিড় হতো খুব, ব্রিটিশ-আমেরিকান সৈন্যও কিছু ছিল তখন। কাউন্টারের সামনে বেয়ারাদের লাইন লেগে যেত। অত তাড়াতাড়ি সব কিছু করা দারুণ কষ্টকর ছিল। অভিজ্ঞ বেয়ারারা সাহায্য করত। আর আনন্দ—কাউন্টার স্টাফদের পদমর্যাদা ছিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলা হতো।

যাই হোক, কাজটা ধীরে ধীরে আয়ত্তে এল। পরে এমন হল ক্যাশ নেওয়া ও বিল লেখা কথা বলতে বলতে করতে পারতাম। কাস্টমারদের নানারকম কমপ্লেন শুনতে হতো। বোর্ড 'কমপ্লেন বুকে'র ব্যবস্থা করেছিল।

চিনি সংকট চলছিল তখন। আলবার্ট হল কফি হাউস সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল পরিমাণমতো চিনি না পাওয়ায়। যুদ্ধের সময়কার র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে তখনো। চৌধুরীবাবু কয়েকজন ক্লাস ফোর স্টাফ নিয়ে ঘাঁটি আগলে রয়েছেন ওখানে। Coffee seeds বেচাকেনা হতো ওখান থেকে।

চিনির অভাবে ফাইভ সি. এ-তে সৈন্যরা সুগার কিউব কিনে নিয়ে আসত চৌরঙ্গি পাড়া থেকে। বেয়ারাগুলোর হাতে বাক্সটা দিয়ে দিত। কফি খাবার সময় সেই বেয়ারার লাইনে এসে বসত। বেয়ারা জানত তার কাস্টমার ক'টা

কিউব খায়, সেইমতো পরিবেশন করত। বাক্সটা শেষ হলে আবার নতুন এনে দিত, সৈন্যরা বেয়ারাদের বিশ্বাস করত। বেয়ারারাও পানদানি মেজাজের ছিল।

শুনেছি মদমত্ত হয়ে সৈন্যরা অন্য হোটেলে হুল্লোড় করত, কিন্তু কফি হাউসে ওরা তেমন কিছু করে নি। এক বিষয়ে তবে ওরা হুল্লোড় করত, সেটা টিপ্‌স দেওয়া নিয়ে। এমনও দেখেছি, সহকর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আট আনার কফি খেয়ে আট টাকা টিপ্‌স দিয়েছে। বেয়ারারা খুচরোর চুড়ো সাজিয়ে ডিউটি শেষে আমাদের কাছ থেকে টাকা ক'রে নিয়েছে।

কলকাতার তখন এক অস্থিরভাব। দাঙ্গার জন্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থাটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যেখানে যারা গরিষ্ঠ হঠাৎ সেখানে 'হ্যা-রা-রা-রা' রব উঠে গেল। একটা আতংকের ছায়া নেমে এল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। কারফিউ জারি হল। পাঁচটার পর কারফিউ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোটা নড়বড়ে হয়ে গেল। অফিস-কাছারি করা, লোকের মাইনে পত্তর ঠিক সময়ে পাওয়াই দুই সম্প্রদায়ের লোকের সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

বাইরে এই হিংসার তাণ্ডব, কফি হাউস ছিল কিন্তু এর উল্টো। হিন্দু-মুসলমান দুই বন্ধু। কফি খেতে খেতে আড্ডা জমাতো। যুবক-যুবতী একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান। কফি খেত, আস্তে আস্তে কথা বলত। মনে হতো বাইরের তাণ্ডবে এরা যেন একে অপরের কাছে লজ্জিত। দিনের পর দিন কাউন্টারে বসে আমরা এই সব দেখতাম। পরস্পরের মধ্যে এত আত্মিক যোগ থাকা সত্ত্বেও এই হিংসার কারণ রাজনীতি, এটা সকলেই জানেন।

কফি হাউসের দুটি ভাগ ছিল। একদিকে ফার্স্ট ক্লাস, অন্যদিকে সেকেণ্ড ক্লাস। অনেকের লেখায় দেখেছি বা বলায় শুনেছি দুটি ভাগকে ওঁরা 'হাউস অব লর্ডস' ও 'হাউস অব কমন্স' বলেছেন। বোর্ডের অভিধানে কিন্তু ঐ আখ্যা ছিল না। আমাদের ডিউটি চার্ট ও মেনু কার্ডে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস লেখা থাকত। আর ঐ কথাগুলো কাস্টমারদের রচনা।

দু'টো ক্লাসেই আমাদের ডিউটি পড়ত। সেকেণ্ড ক্লাসে মধ্যবিত্তরা বেশি আসতেন। কফির দামটা কম হলেও খাদ্যদ্রব্যগুলো একই দামে বিকতো। পানীয়ের মধ্যে থাকত দুই কফি কোল্ড কফি হট্ ক্রিম কোল্ড ক্রিম আইসক্রীম ইত্যাদি। দুই ক্লাসেই কিন্তু বিক্রি হতো বেশি হট্ কফি, চিপ্‌স, নাট্‌স।

ফার্স্ট ক্লাসে আসতেন কলকাতার বিভিন্ন দিকের নামী ব্যক্তিরা। যেমন সুটেড বুটেড মধ্যবয়সী সুদর্শন এক ভদ্রলোক আসতেন। খুব স্মার্ট, অনর্গল কথা বলেন। যেখানে থাকেন জায়গাটাকে মাতিয়ে রাখেন। সামনের দাঁত দুটি একটু উঁচু বলে পাশের দাঁতে সিগারেটটা চেপে ধোঁয়া ছাড়েন। বেহালার সুবিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান, নাম বীরেন রায়। বীরেনবাবু তখন 'এরো ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, স্বাধীনতার পর এম. পি-ও হয়েছিলেন। শিক্ষিত ভদ্রলোক,

দেশী-বিদেশী দু'টো কালচারকে মিলিয়ে বীরেনবাবু নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ খাড়া করেছেন। বৈঠকী মেজাজের লোক। বন্ধুবৎসল। বীরেনবাবুর অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইমপ্রেসারিও ও নৃত্যবিদ্ হরেন ঘোষ। ইনি দেশ-বিদেশে নাচের দল নিয়ে যেতেন ডান্স ইমপ্রেসারিও হিসেবে। সেই সময় ওঁর নাম ছিল খুব।

বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়েছিল। একদিন দুপুরের দিকে তাড়াতাড়ি এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরেন ঘোষকে দেখেছেন?' ফার্স্ট ক্লাসে ডিউটি করছি, ওঁরা ঐ ক্লাসেই আসতেন। আমি বললাম, 'না।' উনি বললেন, 'যদি আসে আমার কথা বলবেন।' যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন ঐ ভাবে চলে গেলেন।

মেশামিশিটা ছেলেবেলা থেকে আমার বেশ ভালো লাগে। আড্ডা আমার অনেক ক্ষতি করলেও অনেক কিছু পাইয়ে দিয়েছে। বন্ধুভাগ্য আমার ভালো। কফি হাউসে আমায় দু'রকম ডিউটি করতে হতো। প্রথমটা চাকরি, দ্বিতীয়টা যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রয়োজনীয় কেউ অনুপস্থিত থাকলে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

বীরেনবাবু আরো একটু পরে ঘুরে এসে হরেন ঘোষের কথা আবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম আসেন নি। 'আপনি কাউন্টারে লিখে দিন, হরেন ঘোষ wanted!'—বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে দ্রুত চলে গেলেন।

বীরেনবাবু প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। গ্রন্থ রচনাও করেছেন ইদানীং কালে। জনপ্রিয়তা ওঁর আছে বলেই জীবিত অবস্থাতেই বেহালায় ওঁর নামে রাস্তা রয়েছে, 'বীরেন রায় ইস্ট', 'বীরেন রায় ওয়েস্ট'।

'কফি বোর্ড' দ্বাক্ষণ ভারতীয় সংস্থা। এর হেড অফিস বাঙ্গালোর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালি, সকলেই প্রায় কাইণ্ড সি.এ-তে যুক্ত। এর মধ্যে আমার বড়দা মেজদা ছাড়া আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বি. এম. কর, বিভাস রায়চৌধুরী, সোমনাথ মুখার্জি, পি. সি. ঘোষ, পি. সি. ভড় ও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁর নাম আগেই বলেছি) উল্লেখযোগ্য। মেজদা সুন্দর ব্যবহার ও কর্মকুশলতার জন্য একটা বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয়রা মেজদাকে খাতির করত। মেজদার বুদ্ধি, বিবেচনা ও যোগ্যতাকে আর্থার সাহেব, চৌধুরীবাবু ও অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা পর্যন্ত মূল্য দিতেন। দিল্লিতে এ. ডি. পি. থেকে রিটায়ার করার পর কয়েকবছর আগে মেজদা ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

দাদাটা তখন চলছে পুরো মাত্রায়। রাত আটটার পর থেকে কারফিউ বলবৎ। দিনের বেলা যেদিন কলকাতা শান্ত থাকত, কফি হাউসের সোরগোলটা তখন তুঙ্গে উঠত। লাঞ্চের সময়ে বেয়ারারা সার্ভিস করতে হিমসিম খেয়ে যেত।

এস. এন. রায় আসতেন। কফির অর্ডার দিয়ে ক্রস্ ওয়ার্ড নিয়ে বসতেন।

ইনি স্বল্পভাষী ছিলেন। এ. ডি. খান আসতেন। কফির অর্ডার দিয়ে গল্পগুজব করতেন। একবার ওঁর জামার কাঁধের কাছে একটু ফুটো ছিল, পরিচিত একজন বলায় উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, ঐটুকুর জন্য কি আমাকে এ. ডি. খান বলবেন না?' উত্তরের সৌন্দর্যটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

আর একদিন। সেকেণ্ড ক্লাস কাউন্টারে ডিউটি করছি। হলে হঠাৎ চেঁচা-মেচি। একজন মধ্যবয়স্ক লোক কাউন্টারে এসে বেয়ারার নামে নালিশ করলেন। তাঁকে স্লিট-এ পাঠিয়ে দিয়ে বেয়ারাটাকে ডাকলাম। সার্ভিসে ঢেরি হওয়ার জন্য ওঁর এত গরমভাব। কলকাতার পরলোকগত স্বনামধন্য এক ডাক্তারের একমাত্র পুত্র উনি। ঐ জন্যে মনে আছে অহমিকার ছোঁয়াচ। কিন্তু নিজে তিনি জীবনের সকল দিকেই ব্যর্থ, তাই অবচেতন মনে আছে একটা হীনমন্য ভাব। কোনো কিছুতে বিলম্ব ঘটলেই ভাবেন আমি অবহেলিত। ফ্রাসট্রেশন থেকে এটা আসে বোঝা যায়। বেয়ারাটাকে বললাম, ভালোভাবে সার্ভিস করতে।

থিয়েটার, সিনেমা, খেলাধুলোর নেশাটা আমার ছেলেবেলা থেকেই রয়েছে। শিশির ভাদুড়ীর আর্ট, অহীন্দ্র চৌধুরীর টিক, দুর্গাদাসের ডায়ালোগ বলা, নির্মলেন্দুর কণ্ঠস্বর তখন আমার মাথায় ঘুরছে। বন্ধু নরেন আসত কফি হাউসে। সেও থিয়েটার দেখতে ভালোবাসত। আমরা দু জনে অনেক থিয়েটার দেখেছি কফি হাউসে অর্ধেক ডিউটি করে। সহকর্মী আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কর (বি. এম. কর) এমনি আমার অনেক ডিউটির বাকি অংশটুকু নিজ দায়িত্বে ক'রে দিয়েছে। কর নীরব কর্মী, করের ঋণ শোধ করা যায় না। এখনো আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

কফি হাউস খুলত সকাল সাতটায়। ঘুম থেকে উঠেই আসতাম বলতে গেলে। একটায় ছুটি হলেও হিসেব মিলিয়ে বেরুতে দুটো হয়ে যেত। ব্রেকফাস্ট ক'রে নিতাম। বেলায় আবার কফির সঙ্গে হাল্কা কিছু খেয়ে নিতাম। এটাই তখন-কার স্টাফেদের রেওয়াজ ছিল।

দাঙ্গার রেশটা রয়েই গেছে। কোনোদিন হয়ত ভয়ংকর কিছু হতো না; আবার কোনোদিন বিরাট কিছু ঘটল। হাজি ভিন্নপ্রদেশের মুসলমান। আমাদের খাতির করত। ও ফার্স্ট ক্লাসের বাটলার ছিল। যেদিন বিরাট কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকত হাজি আমাদের তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলত। কি সকাল, কি বিকাল ফাইভ সি. এ থেকে অবাকুস্থম হাউস পর্যন্ত কফি হাউসের দারোয়ান ঠাকুরপ্রসাদ আমায় পৌঁছে দিয়ে যেত। অনেকদিন এমনও হয়েছে যে ইভনিং ডিউটিতে এসে বড়দা সকালের ডিউটিতে থাকা আমায় বলেছে, 'ভালো ক'রে খেয়ে যাস্, বাসায় ঠাকুর ভয়ে পালিয়ে গেছে, রান্না হয় নি।' একটা হুতোশ, একটা ছমছমে ভাব সব সময়ে থাকলেও কফি হাউসে যতক্ষণ থাকতাম নানাজনের সমাগমে মনে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধত। সেটাই সে বয়েসে হয়ত স্বাভাবিক।

অনেক ছোট ব্যবসায়ী সকাল থেকেই এখানে আসতেন। কফির অর্ডার দিয়েই তাঁরা ফাইলপত্তর নিয়ে বসতেন। কখনো বা একা, কখনো বা ক্লায়েন্টরাও থাকত সঙ্গে। বেশ বোঝা যেত এঁরা নিজেদের অফিস বলে কিছু করেন নি—কফি হাউসকেই সেন্টার প্লেস ক'রে কাজকর্ম চালাতেন।

লাঞ্চের সময় দু'টো ক্লাসই খুব জমজমাট থাকত আগেই বলেছি। স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী এক পুরুষ তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের নির্দিষ্ট সোফার ডানদিক ঘেঁষে বসতেন। ভদ্রলোক বসলেও তাঁর চেহারায় উচ্চতা বেশ বোঝা যেত। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ। কফি বা অন্য কিছু খেতেন আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে কথা বলতেন। বিভাসবাবু সহকর্মী, কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বড়। দেশ-বিদেশের অনেক খবর রাখেন। একদিন বিভাসবাবু ঐ দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমায় বললেন, 'উনি কে চেনেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'উনি সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ রায়। শিল্পী উনি—ডি. জে কীমার-এর সঙ্গে যুক্ত।' D. J. Keymer তদানীন্তন কালে এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপন-সংস্থা ছিল।

পরিচয় জানার পর থেকে সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। একটা পুরনো বনেদি ভাব তাঁর আচরণের মধ্যে আছে বোঝা যেত। সুকুমার রায়ের পুত্র এবং প্রচ্ছদ-শিল্পী—এই পরিচয়েই তখন তিনি পরিচিত। ওঁর ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটত। আমার সঙ্গে ওঁর কোনোদিন কথা হয় নি, কিন্তু কাউন্টারের সামনে দিয়ে ওঁর সেই ধীর স্থির পদক্ষেপে আনাগোনা আমায় আকৃষ্ট করত। এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে বোঝা যায়।

সাধারণত তিনটে নাগাদ কফি হাউস ফাঁকা হতো, কারণ লাঞ্চ শেষ, যে যার কাজে চলে গেছেন। হঠাৎ একদিন ঐ সময়ে শুনলাম হরেন ঘোষ দাঙ্গায় বলি হয়েছেন। সেই শান্ত মুখটা ভেসে উঠল মনে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার করাল গ্রাস নৃত্যবিদ্‌কেও ছেড়ে দিল না। হরেন ঘোষ চিরতরে চলে গেলেন। মনটা মুষড়ে গেল। কত দেখেছি। সময়বিশেষে কথা বলেছি। হঠাৎ বারেন রায়ের সেই কথাটা মনে পড়ল—'কাউন্টারে লিখে দিন হরেন ঘোষ wanted···।'

আর একদিন সন্ধ্যা। সেকেণ্ড ক্লাস কাউন্টারে কাজ করছি। হঠাৎ একটা চিৎকার। সামনের সিট্-এ বসে এক তরুণ দম্পতি। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর তর্কাতর্কিটা চিৎকারে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি চায় 'সেপারেশন'। ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেল। ঘনিষ্ঠ দু'একজনকে ডেকে দিনক্ষণ স্থির করা হল। এর একটু পরেই কফি হাউসে কেমন এক আতংকের আবহাওয়া সৃষ্টি হল। বাইরে 'কারফিউ' জারি হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। প্রত্যেকেই নিজের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই তরুণ দম্পতিটিও কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মেয়েটি থাকে মায়ের

কাছে, ছেলেটি নিজের বাড়িতে। কফি হাউস বন্ধ হয়ে যাবে। এবার উঠতেই হবে। বোঝা যায়, মেয়েটি একা যেতে চাইছে না, ছেলেটিও ওকে একা ছাড়তে চাইছে না।

সলিল দত্ত এবং তাঁর দলবল কফি হাউসে ছাপ রেখে গেছেন। সকাল বিকাল আসতেন ওঁরা এই কফি হাউসে। অন্যেরা বলতেন সলিল দত্ত কফি হাউসে এত টাকা খরচ করেছেন যে সেই টাকায় ছোটখাটো একটা ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে যেত তখনকার কালে। হাটখোলার দত্ত বাড়ির ছেলে সলিল দত্ত। ওঁর সঙ্গে থাকতেন বড় ভাই সর্বেশ্বর দত্ত—লালু দত্ত নামে যিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আমরা বলতাম লালুবাবু। কানুচন্দ্র (স্বনামধন্য নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র) এবং উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার অনেক নামকরা বাড়ির ছেলেরা আসতেন নিয়মিত। এঁরা শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিতে সজ্জন। কফি হাউসে আসাটা এঁদের শখ।

সকাল আটটার মধ্যেই আসতেন লালুবাবু। এসেই কফি খেতেন। বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে পরের কাগজ চেয়ে নিয়ে পড়তেন। অমৃতবাজার পত্রিকা নেওয়া হতো তখন। কানু চন্দ্র এবং অন্যান্যরা আসতেন ক্রমান্বয়ে। সলিল দত্ত আসতেন সকাল দশটা নাগাদ। যিনি যখন আসতেন, তিনি তখনই কফি খেয়ে নিতেন। সকলে একসঙ্গে হতেন বড়জোর একঘণ্টা। এবং সকল বিলই পেমেন্ট করতেন সলিল দত্ত।

সুপুরুষ, হৃদয়বান, স্পষ্টবক্তা সলিল দত্ত। শুধু পয়সা থাকার জন্যই বেয়ারারা সলিল দত্তকে খাতির করত না। সলিল দত্তর সুমিষ্ট ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করত। আমাদের সঙ্গে ওদের একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গে বিশেষ-ভাবে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল লালু দত্ত, সলিল দত্ত, এবং কানু চন্দ্রের সঙ্গে। বয়সে একটু বড় ছিলেন বলে ওঁরা আমাকে নাম ধরে ডাকতেন, আর আমি ওঁদের নামের শেষে 'বাবু' যোগ করতাম। ঐটুকু ছাড়া ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক।

লালুবাবু আমাদের সকলের খুব খোঁজ রাখতেন। কানু চন্দ্র বই পড়তেন আর সিগারেট খেতেন খুব। সুবিধে বুঝে আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমাতেন। ওঁর পরিমিতিবোধ ছিল খুব। সলিল দত্ত নাট্যানুরাগী ছিলেন। কানু চন্দ্রের বাড়িতে 'শনিবারের বৈঠক' নাট্যসংস্থা ছিল। সভাপতি ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রচিত 'শহরতলী' নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় ক'রে সলিল দত্ত নাম করেছিলেন খুব। এ ছাড়া সাধারণ মঞ্চেও তখন উনি কিছু অভিনয় করেছেন।

একসময়ে সাহিত্যজগতে দুই 'তারাশঙ্কর' থাকায় লোকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল। চিত্রজগতে দুই সলিল দত্ত হওয়ায় এখনো লোকের মনে সংশয় জাগে। ইনি চিত্র পরিচালক নন, অভিনেতা। এঁর অভিনীত চিত্রগুলি তখন সিংহের 'অঙ্কুশ' (দেওয়ান), রবীন্দ্রনাথের কাহিনী 'অতিথি' (জমিদার), কার্তিক

চট্টোপাধ্যায়ের (নিউ থিয়েটার্সের) 'বনহংসী' (নায়ক) প্রভৃতি।

চিনি-সংকট থাকা সত্ত্বেও করিতকর্মা চৌধুরীবাবুর প্রচেষ্টায় আবার অ্যালবার্ট হল কফি হাউস খুলল। ওখানে সবাই দক্ষিণ ভারতীয় কর্মী। বই পাড়া, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটির লোকজন ও মফঃস্বলের কিছু ছোট ব্যবসায়ীদের আনা-গোনা, এই নিয়েই চৌধুরীবাবু কফি হাউস চালাতে লাগলেন। অ্যালবার্ট হল-এর তলায় কফি গোডাউনের জন্য একটা ঘর নেওয়া হয়েছিল। আর চৌধুরীবাবু থাকতেন বউবাজার থানার পাশে।

এখন যে পদটাকে এ. ডি. পি. বলা হয়, তখন নাম ছিল এ পি. ও.; অর্থাৎ Asst. Propaganda Officer। মিঃ আসকাক ছিলেন এ. পি ও.। ইস্টার্ন জোনের অফিস কলকাতাতেই ছিল, ফাইভ সি. এ-সংলগ্ন একটি বাড়িতে।

আর্থার সাহেব কলকাতার বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে মেলামিশি করতেন। বুদ্ধিমান লোক, বুঝেছিলেন কলকাতায় ম্যানেজারি করতে হলে এখানকার সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। আনন্দবাজার সংস্থার একটা ইংরেজি দৈনিক ছিল, নাম 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'। সাংবাদিক কে.পি. টমাস তাতে ব্যঙ্গাত্মক কিছু লিখতেন—অনেকটা 'কড়চা' ধরনের। টমাসের সঙ্গে আর্থার সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল—উনি ফাইভ সি. এ-তে আসতেন খুব। টমাস সাহেবের লেখার ক্যাপশন ছিল Thoughts for Lowbrows by Homa—Thoma-এর T ও h কেটে দিয়ে।

বাইরের হানাহানি, রেষারেষি এবং কলকাতার উপর দিয়ে নানা ঘাত প্রতি-ঘাত সত্ত্বেও এখানকার কফি হাউসে বেশ একটা সাংস্কৃতিক ভাবের গন্ধ ভেসে বেড়াত। বিদেশী সাহিত্যিকরা এখানে আসতেন। শোনা যায় ওঁরা এখানে এসে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে গ্রাম বাংলা ও কলকাতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার চেষ্টা করতেন। ওঁদের অনেক রচনা এই প্রচেষ্টার ফল।

সে সময়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক করছিলেন। সকলের মনেই একটা জিজ্ঞাসা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ মিটিং এবং কাগজের মাধ্যমে শান্তি প্রস্তাবের বিবৃতি দিতে লাগলেন। 'পীস কমিটি'ও তৈরি হল, কিন্তু উভয় পক্ষের উগ্রতার গতিরোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হল না। কলকাতা এবং আশে পাশের অবস্থাটা তখন নোঙরহীন নৌকোর মতো, যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে।

কফি হাউসে ডিউটি করছি, বিকেল চারটে। কারফিউ হয়ে গেল। হাউস বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। বাড়ি যাবার জন্য সকলের সে কি ছড়োহুড়ি। একটা আতংক আমার মনেও বাসা বেঁধেছিল। ঠাকুরপ্রসাদকে না নিয়ে একা আমি মিশন রো-গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যুর যেখানে পেট্রল পাম্পটা রয়েছে ওখানে এসে দাঁড়ালাম। একটা প্রাইভেট ১৩ নং বাস রুট বদলে ঐ পথ দিয়ে বৌবাজারের

ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। বাস রুটটার স্টপেজ ঐ ফোর পয়েন্টে। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক ছুটে এসে আমাকে বকাবকি আরম্ভ করলেন—'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? একটু আগে এখানে স্ট্যাবিং হয়ে গেল।' আমি আমতা আমতা ক'রে ১৩ নং বাসটার কথা বললাম। একটু পরেই লোকভর্তি বাসটা ঐ স্টপ-এ দাঁড়াল। উনি ঠেলে আমাকে ঐ বাসে তুলে দিলেন। ভদ্রলোক আমার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়। কাছাকাছিই থাকেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার প্রতি তাঁর এই যে সহানুভূতি সেটা আমি ভুলি নি বলেই একথা বললাম। মাঝে মাঝে উনিও কফি হাউসে আসতেন।

বাঙ্গালোর হেড অফিস থেকে প্রায়ই চিঠি আসতে লাগল লোকসানের কথা বলে। ফাইভ সি. এ-তে লোকসান কোনোদিন হয় নি, হবেও না; বরঞ্চ এখানকার বিক্রি অন্য প্রদেশের অনেক হাউসের আর্থিক নির্ভরতার কারণ ছিল।

শান্থ শাল বন্ধুবান্ধব নিয়ে কফি হাউসে আসতেন। খরচ করতেন। ইনি বিখ্যাত রং-ব্যবসায়ী বিপিনবিহারী শাল মহাশয়ের বংশধর। শান্থবাবুর মনটা উদার। কেউ কিছু বললে 'না' করতে পারতেন না। এ কথাটা আমরা এখনো বুঝি। সেই সময় মাঝে মাঝে স্টাফ-দের পার্টি হতো, আমরা শান্থবাবুকে নিমন্ত্রণ করতাম। শান্থবাবু নিজের খরচে আরো খাবার এনে আমাদের পার্টির খাদ্যতালিকা বাড়িয়ে দিতেন। আমাদের বারণ উনি শুনতেন না। শান্থবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা আমার এখনো আছে।

প্যান্ট-কোট-টাই পরিহিত এক ভদ্রলোক ফাইভ সি.এ-র কার্ট ক্লাসে আসতেন—এঁকে বেশির ভাগ সময়েই দেখেছি হয় কিছু পড়ছেন, নয় লেখালিখি করছেন। ওঁর সঙ্গে তখন আলাপ হয় নি। জেনেছিলাম ওঁর নাম রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। পরবর্তী জীবনে উনি টাটা স্টিল-এর পি. আর. ও. হয়েছিলেন। R. P. নামে খ্যাত। পি. আর. ও থাকাকালীন অবস্থায় ওঁর সঙ্গে আমি পরিচিত হই।

কফি হাউসে বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেও মনে একটা ভাবনা ছিল চাকরি সম্বন্ধে। ঐ যে চিঠির কথা—Running at a loss।' যদি তুলে দেয়। একদিন ভাবনার অবসান ঘটিয়ে এক সার্কুলার এল। সকল বাঙালি স্টাফদের অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে বদলি করা হয়েছে। নিশ্চিন্ত হলাম চরম কিছু না ঘটায়। কিন্তু মনে একটা খুঁতখুঁতুনি ভাবও রইল। এখানকার অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখান থেকে চলে গেলে দেখা হবে না। কারণ এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা পদস্থ কর্মচারী ও নামী ব্যবসায়ী। এটা অফিস অঞ্চল। কলেজ স্ট্রিটে এঁদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া এখানকার ক্লাস ফোর স্টাফ আমাদের খাতির করে। একদিন মহম্মদ আলি কফি দেবার সময় বলেই ফেলল—'আপ্‌লোক অ্যালবার্ট হলমে কাহে যাতা হ্যায় সাব্‌, হামলোক্‌ তো হ্যায় ইধার।' মহম্মদ আলির দশাসই চেহারাটা আজও মনে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতীয় স্টাফ-রা ফাইভ সি. এ-তে থাকবে। এদের মধ্যে চাক্কু, ম্যাথুস, মূর্তি ও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। এরা এই অঞ্চলেই বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকে। কর্তৃপক্ষ বুঝেছে এদের দ্বারা কফি হাউস নিয়মমাফিক খোলা রাখা সম্ভব হবে।

ছেলেবেলায় এই অ্যালবার্ট হলে অনেক বক্তৃতা শুনেছি। বাড়িটা তৈরি বক্তৃতা হল হিসেবে। অ্যালবার্ট হলে ডিউটি করছি, মনে বেশ একটা গর্ববোধ হতো। এখানকার আবহাওয়াটা ফাইভ সি এ থেকে একটু অন্য ধরনের। এখানে যাঁরা আসতেন তাঁরা অভিভাবক বা অভিভাবকস্থানীয়। ওখানে একটা অফিস অফিস ভাব ছিল। কিন্তু অ্যালবার্ট হলে একটা ঘরোয়া ভাব। কারণ এখানে যাঁরা আসতেন তাঁরা বেশির ভাগই কলেজের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক বা শিক্ষক, কিংবা বই বাজারের কিছু লোক। ওখানকার হুল্লোড় আর এখানকার হুল্লোড়ের মধ্যে তফাত আছে। ওখানে একটা থিরথিরে গাম্ভীর্য, আর এখানে সবকিছু খোলামেলা।

কফি হাউসের চাকরিটা আমার বেশ ভালো লাগত নানা বৈচিত্র্য থাকায়। অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের বিক্রি ভালো হচ্ছে না। একে রায়ট চলছে, তার উপর এই অঞ্চলে অনেকগুলো মাঝারি ধরনের রেস্টোরাণ্ট রয়েছে। আবার হেড অফিসের সেই একঘেয়ে চিঠি—Running at a loss! চৌধুরীবাবু এই সময়ে বিব্রত হয়ে পড়তেন।

সকালে ডিউটি থাকলে বিভাসবাবুর ঘর থেকে কফি খেয়ে কাউণ্টারে আসতাম। বিভাসবাবু সপ্তাহের শেষে বাড়ি যেতেন বলে দোতলার কোণের ঘরটায় থাকতেন। একদিন ঐ রকম সকালে কাউণ্টারে এসে সবে পোছগাছ করছি, হঠাৎ দেখি ব্যালকনি থেকে ভদ্রলোক বেশ মেজাজে কয়েক কাপ কফি ওপরে নিয়ে যেতে বলছেন। ব্যালকনিটা সকালে খুলত না। র‍্যাকেল বেয়ারা তখুনি কয়েক কাপ কফি নিয়ে ছুটছে। আমি র‍্যাকেলকে যেতে দিলাম না। যিনি অর্ডার দিয়েছিলেন, উনি খুব নামী ব্যক্তি। আমি র‍্যাকেলকে যেতে দিই নি দু'টো কারণে প্রথমত আমাকে উপেক্ষা ক'রে বেয়ারাকে অর্ডার দেওয়া। দ্বিতীয়ত, হেড অফিসের অর্ডার কাপ ইত্যাদি বাইরে যাবে না।

ইতিমধ্যে ঐ ভদ্রলোক আমার কাছে বেশ মোলায়েম স্বরে বললেন, 'দেখুন, আমি কয়েক কাপ কফির অর্ডার দিয়েছিলাম, নিয়ে যায় নি।' আমি যেন জানি না এইভাবে বললাম, 'তাই নাকি! তাও হেড অফিসের অর্ডার জিনিসপত্তর বাইরে যাবে না। সে যাক, আপনি যদি আমায় বলতেন বা স্লিপ দিতেন, আমি অন্তত আপনার জন্য পাঠাতাম।' ইনি প্রখ্যাত অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। পরে শিবনারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল।

স্বনামধন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায়) র‍্যাডিক্যাল পার্টি অফিসে আসতেন, সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী মিসেস এলেন রায়। বিদেশী মহিলা। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ই এই আসরের মধ্যমণি ছিলেন। সদলবলে ওঁরা কফি ইত্যাদি খেতেন। শিবনারায়ণবাবু সমস্ত খরচ নিজে বহন করতেন। র‍্যালকনিতে আমার বেশির ভাগ দিন ডিউটি থাকত, আমিই বিল বানাতাম।

শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তখন 'নেশন' কাগজ চালাতেন। সত্য বকসী মহাশয় সম্পাদক, ইনিও সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই আসতেন এই অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে। কাউন্টারে বসে আমি এঁদের কথা শুনতাম।

সকালে সংবাদপত্র খুললেই দেখা যেত কোনো না কোনো অঞ্চলে দাঙ্গার ভয়াবহ বর্ণনা। গান্ধিজীর নোয়াখালি সফর, বেলেঘাটা আসা। জওহরলাল ও জিন্নার দুই সম্প্রদায়কে শান্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে বিবৃতি। প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞরা বলছেন, দেশটা এবার ভাগ হবে। ব্রিটিশরাজ চলে যাবার আগে দেশটাকে টুকরো করে দিতে চায়।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শরৎচন্দ্র বসু বক্তৃতায় অবিভক্ত বাংলার কথা বললেন, কেউ নিল না সে কথা। মানুষ তখন একটা নিষ্পত্তি চায়।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন চুপচাপ মানুষ, খুব নিয়ম মেনে চলতেন, বুঝতাম। সময়মতো আসতেন, এক কাপ কফি ও একটি ভেজিটেব্‌ল চপ খেতেন। অ্যালবার্ট হলে চপ কাটলেটের চল্ হয়েছিল। সুনীতিবাবু কারো টেবিলে যেতেন না, অন্য কেউ প্রয়োজন বোধ করলে ওঁর টেবিলে আসতেন। কিন্তু সুনীতিবাবু মিঃ গুপ্তার টেবিলে মাঝে মাঝে বসতেন। মিঃ গুপ্তা বিনয়ী, সজ্জন ভদ্রলোক। শুনেছিলাম তিনি ইউনিভার্সিটির হিন্দির অধ্যাপক। মুখে সবসময়ে বার্কলে সিগারেট (এই সিগারেটটা তখন খুব চলত)। মজলিসি মানুষ। ওঁর টেবিলে যিনি বসতেন তাঁর বিল উনি দিতেন। সুনীতিবাবুকেও অনেকসময় পেমেন্ট করতে দেন নি। র‍্যালকনিটা দু'টোয় খুলত, পাঁচটা পর্যন্ত টুকটাক কাস্টমার আসত। ঐ ভিড় কমের সময় মিঃ গুপ্তা আসতেন। মিঃ গুপ্তা অনেকসময় আমাকেও কফি খাইয়েছেন, বারণ করলে শুনতেন না, বলতেন এখন আপনি আমি বন্ধু।

দাঙ্গার ভয়াবহ রূপটা আমি দেখেছি, কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। রাজনীতি নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামাই নি। আমি শিল্প, সাহিত্য, নাটক ভালোবাসতাম। এখানে অনেক শিল্পী সাহিত্যিক অভিনেতা আসতেন। তাঁদের ভালো লাগত। এঁরা নিজেদের দলে বসতেন।

কখনো কখনো বিখ্যাত সমালোচক ও শনিবারের চিঠি-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস আসতেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, চেহারার ভেতর একটা গাম্ভীর্য ভাব বিরাজ করত। প্রথমে কথা বলতে ইতস্তত করতে হতো, কিন্তু দু'একবার কথা বলার পর জেনেছি বাইরের ভাবটা অমন হলেও ভেতরে একটা দরদী মন ছিল। সাহিত্য

সমালোচনা করতেন বলে ওঁর প্রতি অনেকে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু কত বড় মাপের লোক ছিলেন উনি, সে কথা আমার অনুভবে এসেছে ওঁর মৃত্যুর পর—পরবর্তীকালে শনিবারের চিঠি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন রমরমে অবস্থা। এক একটা বই বেরুচ্ছে, হট কেক্। বিকালে প্রকাশকদের কাছে এলেই অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে আসতেন। আমাদের ভিজিটার্স বুক দিলাম, ইংরেজিতে কয়েক লাইন লিখে দিলেন। কফি হাউসে আলাপ, কিন্তু ওঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলাম শনিবারের চিঠি-তে গিয়ে।

একদিন সজনীবাবুকে বললাম কিছু লিখতে। উনি উল্টে পাল্টে খাতাটা দেখলেন এবং তারাশঙ্কর বাবুর লেখাটাও দেখলেন। বললেন, আমি কিন্তু বাংলায় লিখব। কফি ও কফি হাউসের কর্মীদের প্রশংসা ক'রে উনি একপাতা লিখে দিলেন। ওঁর লেখাটা ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাইমন সাহেব এসব খুব পছন্দ করতেন। দু'জনেই ঠিক। তারাশঙ্করবাবু ইংরেজিতে লিখেছেন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলে। সজনীবাবুর ইংরেজিতে দারুণ ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলায় লিখেছিলেন বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করেন বলে।

বই পড়ার আমার সুবিধা ছিল বাড়িওলার লোক বলে। প্রকাশকরা আমায় প্রায় সকলেই জানতেন। বিল্ডিং কেয়ার টেকার সামসুদ্দিন আমায় বই এনে দিত। পড়তাম, ব্যালকনিতে ভিড় যখন কম থাকত। মাঝে মাঝে কানুচন্দ্র তিনটে নাগাদ এসে আমার কাছে বই চাইতেন।

দাঙ্গার জন্য কলেজ স্ট্রিট মাঝে মাঝে রণক্ষেত্র হতো—পুলিশ, মিলিটারি ছেয়ে থাকত। অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে কিন্তু কোনো আঁচ লাগত না। এ যেন সকলকার এক মিলনক্ষেত্র। এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই—নেই কোনো প্রাদেশিকতা। ঝগড়া বিবাদ যে হতো না তা নয়, তবে সে নিজেদের মধ্যে। অবশ্য সে ঝগড়া থামাতেও আমাদের ছুটে যেতে হতো। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন, সেই নিয়ে দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি, গেলাস ছোঁড়াছুঁড়ি। মিটমাট হলে বলতাম, সেদিন কী হল? ওরা বলত, 'ওটা আমাদের স্পোর্টস!'

সলিল দত্ত এবং ওঁর দলবল সকালে ফাইফ সি. এ-তে, বিকালে অ্যালবার্ট হলে আসতেন। সলিল দত্ত আসতেন সকলের শেষে, প্রায় বন্ধ হবার মুখে। আটটায় বন্ধ হতো কফি হাউস। সলিল দত্ত দু'বেলার বিল বহন করতেন। তাঁর সঙ্গে আজও আমার ঘনিষ্ঠতা আছে।

যুদ্ধের পর থেকে কলকাতার নাটকগুলোর ধারা পালটাতে লাগল। পেশাদারী রঙ্গালয়গুলো পুরনো নাটকগুলোর সম্মিলিত অভিনয় দিয়ে মঞ্চগুলোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। আর অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'র পর কিছু গ্রুপ থিয়েটারের আবির্ভাব হল। আর শেক্সপিয়রের নাটক ইংরেজিতে

অভিনয় ক'রে তখন নাম করেছিলেন উৎপল দত্ত। ইনি অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে খুব আসতেন। শীতকালেও পরনে থাকত ধুতি, পাঞ্জাবি, সিল্কের চাদর। এক হাতে জলন্ত চুরুট, অন্যহাতে একটা মোটা ইংরেজি বই। কথা বলতে বলতে অট্টহাস্য করতেন। ওঁর প্রথম সিনেমা মধু বসু পরিচালিত মাইকেল মধুসূদন আমি দেখেছি।

অ্যালবার্ট হল কফি হাউস কিন্তু আত্মনির্ভর হতে পারল না। হেড অফিস থেকে কেবলই লোকসানের চিঠি আসতে লাগল। চৌধুরীবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খরচ কি ক'রে কমানো যায় এই ভাবনাই তাঁকে পেয়ে বসল। অনেক ভেবেচিন্তে উনি অর্ডার দিলেন, চার কাপ কফি ছাড়া স্টাফরা আর কিছু পেতে পারবে না। এই অর্ডারে আমরা ক্ষুব্ধ হলাম। এটা আত্মসম্মানে লাগার মতো ব্যাপার। বেশ মনে আছে আমরা পয়সা খরচ ক'রে মির্জাপুরে পুঁটিরামের দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

আমরা পয়সা খরচ ক'রে বাইরে খেয়ে আসি, কিন্তু কোনো এক কর্তাব্যক্তির জন্যে বিকেলে টম্যাটো জুস যাচ্ছে প্যানট্রি থেকে! একদিন আমার এক সহকর্মী আমাকে তাতিয়ে দিল। বেয়ারাটা যখন টম্যাটো জুসের গেলাসটা নিয়ে অফিস-ঘরের দিকে যাচ্ছে। আমি তাকে আটকে দিয়ে প্যানট্রিতে পাঠিয়ে দিলাম। বেয়ারাটা আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। একটু পরে কোনো একটা কাজের অজুহাত নিয়ে ঐ কর্তাব্যক্তি কাউন্টারে এলেন। দু-একটা মামুলি কথাবার্তার পরে টম্যাটো জুসের কথা তুললেন। আমি একটু পরে বেয়ারাটিকে ডেকে টম্যাটো জুস নিয়ে যেতে বললাম। দু-একদিন পরে নোটিস হল, চার কাপ কফির সঙ্গে আমরা টিফিনটা খেতে পারি।

পরে অবশ্য আবার পূর্ববৎ অবস্থা চালু হয়।

একদিন গান্ধিজী ও মিঃ সুরাবর্দির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মিছিল বেরুল। মানুষের সে কি আনন্দ। অবশেষে এল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। স্বাধীন ভারত, তবে খণ্ডিত। দুই দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু কিছুই বুঝল না। স্বাধীন হওয়ার আনন্দ উৎসবে তখন তারা মাতোয়ারা।

কফি হাউসে তখন এক নতুন উদ্দীপনা। কফির কাপে তুফান উঠল।

স্বাধীনতার বেশ বেশ কিছুদিন থাকলেও অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের বিক্রি কিন্তু বাড়ল না। আমরা তো বটেই, কাস্টমাররা পর্যন্ত ভাবতে আরম্ভ করলেন। একজন সাহিত্যিক তো কাগজে লিখেই ফেললেন—কফি হাউস 'কলকাতার চণ্ডীমণ্ডপ'। কাস্টমারদের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি যেতে লাগল।

কর্তৃপক্ষ নানাদিক ভেবে হাউসের উপর আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন। মেনুতে আরো কিছু বাজার-চলতি খাবার যোগ হল। কফি হাউস বৈশিষ্ট্য হারালেও ব্যবসায়ী দিকটা বইল।

কিছুটা গতি এলেও বিশেষ সংগতি হল না। হাউসটা চলতে লাগল মাত্র।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (এই শব্দটা এখন থেকে প্রচলিত হল) হন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ইনি স্বল্পকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ওঁর সময়ে ইডেন গার্ডেনে এক প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা স্বদেশী যুগের নামী কংগ্রেস-কর্মী Lantern Lecture-বিশারদ জানাজন নিয়োগী। ঐ প্রদর্শনীতে কফি হাউসের স্টল হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। রাজ্যপালকে সম্বোধন ক'রে ডাঃ রায়ের নির্ভীক সম্ভাষণ আজও আমার মনে জলজল করছে। বক্তৃতা-মঞ্চটি হয়েছিল কফি স্টলের সামনে। ওঁরা কফি স্টল পরিদর্শন করেন। কফি হাউস বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির এক মূর্ত প্রতীক।

কারণটা ঠিক মনে না থাকলেও বেশ মনে আছে সর্বপল্লী ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একবার অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে এসেছিলেন। যতদূর মনে হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি একটা কনকারেন্সে উনি এসেছিলেন। উদ্যোক্তারা সেদিন অ্যালবার্ট হল কফি হাউস বুক করেছিলেন। ওঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমরাও বেশ সচেষ্ট ছিলাম। দুধে আলতায় রং, পরিধানে ওঁর সেই পরিচিত পোশাক। যাবার সময় উনি আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে গিয়েছিলেন।

কফি বোর্ড কলকাতাতে হাউস করায় বোর্ডের মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কলকাতার কফি হাউস এখানকার মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ চৌধুরীবাবু জামসেদপুর কফি হাউসে বদলি হলেন। এখানে পাঠানো হল যাঁকে তিনি তরুণ, নাম V. Nanjappan। কেন এমন হল বোঝা গেল না। চৌধুরীবাবু অভিজ্ঞ লোক। তার ওপর বলতে গেলে উনি না থাকলে বোর্ড দু টি হাউসই কলকাতায় করতে পারত না।

অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের ভিতরে ফাটল ধরেছে। কিন্তু বাইরের জমজমাট অবস্থা ঠিকই আছে। এ যেন ধনী যৌথ পরিবারের ভিতরে চিড় খাওয়ার মতো। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি! ভবিষ্যৎ যে কী, তা কে জানে!

ভিতরের অবস্থাটা কর্মী হিসেবে আমরা জানলেও বাইরের লোক বিশেষ জানতে পারছে না এবং office secret হিসেবে আমরাও তাঁদের বলছি না। এরই মধ্যে কিছু লোক কানাঘুষোয় জানতে পেরে গেছেন এবং কফি হাউসের জন্য চিঠিপত্তরও লিখেছেন।

যাই হোক, চৌধুরীবাবুর অভাব আমরা বোধ করতে লাগলাম। নান্‌জাপ্পান অনভিজ্ঞ। কলকাতায় আসার আগে ওঁর আরো কিছু শেখার ছিল। আর্থার সাহেব কৃতী ম্যানেজার। কৃষ্ণরাও বিরাট অফিসার। হেড অফিস থেকে এলেন ইন্‌স্পেকশন করতে। আসার আগে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন কর্ম-অদক্ষতায় নিজেকে কেমন খেলো ক'রে ফেললেন। ফাইভ সি. এ-তে মুদিরির স্টাফদের

প্রতি কদর্য ব্যবহার করেছিলেন, ইচ্ছে ছিল অ্যালবার্ট হল হাউসেও ঐরকম করবেন। অদৃষ্টচক্র কেমন প্রথম দিনেই ওঁর সঙ্গে আমায় মিলিয়ে দিলেন। খোঁচা মারতে এসে ব্যর্থ হয়ে প্রস্থান করলেন। এই অফিসারটি শেষে আমার সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন।

এইসব কথা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে তখন যাঁরা হেড অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরা বিশেষ বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারেন নি। পরিদর্শন করতে যাঁরা আসতেন, তাঁরা নিজেদের জাহির করতেন এবং স্টাফদের অসম্মান করার চেষ্টা করতেন। এইসব না ক'রে যদি তাঁরা দরদী মন নিয়ে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার দ্বারা নিজেদের কর্মকুশলতা দেখাতেন তাহলে অ্যালবার্ট হল কফি হাউস নিশ্চয়ই আত্মনির্ভর হতে পারত।

Right Of Admission Reserved, Others Are Waiting, ইত্যাদি বললেই বিক্রি বাড়ে না। একদিন বোর্ডই কফি প্রচারের জন্য Relax and Talk প্রথা চালু করেছিল। হঠাৎ ব্যবসার দিকে তাকিয়ে ও কথা বললে চলবে কেন? বিক্রি বাড়াতে গেলে অন্য পন্থা ছিল। তা ছাড়া এখানকার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয় নি!

কফি হাউসে বসে অনির্দিষ্ট আড্ডা মারা বা চুপচাপ বসে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়েছে কফি বোর্ডের কফি প্রচারের আদি যুগ থেকে—যখন স্লোগান তাঁরাই দিয়েছিলেন, 'Relax and Talk।' ক্রমে সেটাই কফি হাউসের একটা অলিখিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

শুনেছি বা বইয়ে পড়েছি বিদেশে 'পাব' আছে, যেখানে বহু মানুষের আনা-গোনা। এই আনাগোনা যোগাযোগের মধ্য দিয়ে নানা সম্ভাবনা উঁকি মারে। কফি হাউসের কাউন্টারে বসে আমি উপলব্ধি করেছি কফি হাউস থাকার প্রয়োজনীয়তা। পাঁচ তারা হোটেল বা জাঁকালো পার্টিতে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কফি হাউসে ছাত্রছাত্রী, মধ্যবিত্ত, সাহিত্যিক, রাজনীতিক সকলেই আসতে পারেন। সকলেই সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন। ভাবের আদান-প্রদান হয়—নতুন ভাবনার জন্ম ঘটে।

যাই হোক, ক্রমে হাউসের অবস্থা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। যে কোনো সময়ে উঠে যেতে পারে। স্টাফদের মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা দুলে দুলে উঠত, হঠাৎ সেখানে এক নৈরাশ্যের হাওয়া বইতে লাগল। কখন কী হয় ভাব!

আমাকেও কলকাতার বাইরে বদলি করা হল। আমার অবশ্য যাওয়া হয়ে ওঠে নি তখন আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য। রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েও যখন কাজ হল না, তখন রিলাইন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কফি বোর্ড ছাড়লেও দুই কফি হাউসে যাতায়াতটা আমার খুবই ছিল। দুই

হাউসের সহকর্মী ও ক্লাস ফোর স্টাফরা আমায় খুব খাতির করতেন। কাস্টমারদের অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ার কথাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া আমার টাকাপয়সা সেটলমেন্টের ব্যাপারটাও রয়েছে। সহকর্মী পি সি. ঘোষের (ওঁকে আমরা ঘোষ বলে ডাকতাম) নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় কয়েক বছর পরে আমি আমার টাকাকড়ি ঠিকভাবে পেয়েছি।

সিনেমা থিয়েটার নিয়ে মুখুজ্জের সঙ্গে আমার প্রায়ই আলোচনা হতো। একদিন দু'খানা পাস নিয়ে এসে বললে, ছবি দেখতে যাবি! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ছবি? ও বললে, পথের পাঁচালী।

পথের পাঁচালী বইটা জানা ছিল। কোনো প্রকাশকই যখন পথের পাঁচালী ছাপতে রাজি হচ্ছিলেন না, তখন সজনীকান্ত দাস পথের পাঁচালী ছাপতে রাজি হলেন। সজনীকান্ত শুধু প্রকাশকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। পথের পাঁচালী-র মেরিট উনি বুঝতে পেরেছিলেন। আগে টুকটাক্ দু'একটি বই ছাপলেও পথের পাঁচালী-ই রঞ্জন পাবলিশিং-এর প্রথম বই বলা যেতে পারে। এই কারণে পথের পাঁচালী সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা ছিল।

সেই পথের পাঁচালী-র চিত্ররূপ! এ-কাহিনী সিনেমায় হতে পারে, এ কথা কেউ ভাবতেও পারতেন না। তাই সত্যজিৎবাবু কোনো প্রোডিউসার পান নি।

ছেলেবেলায় গ্রাম বাংলা আমার কিছুটা জানা থাকায় পরিচালকের দৃষ্টিতে গ্রাম বাংলা আবার নতুন ক'রে দেখলাম। যাই হোক, তারপর পথের পাঁচালী-র কী হল, সবাই জানেন। ছবিঘর থেকে বেরিয়ে মনে ভেসে উঠল কাইন্ড সি. এ-তে লাঞ্চ টাইমে আসা সেই ধীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে। গুণী শিল্পী তিনি, তাই পথের পাঁচালী-র মেরিট তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, ক্যালেণ্ডারের হিসেবে দুই কফি হাউস মিলিয়ে আমার চাকরির মেয়াদ খুব বেশিদিন নয়, কিন্তু বোধ হয় জীবনের প্রথম চাকরি বলেই এই পর্ব আমার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশেল ফুকো

বা "মানুষে"র অন্তর্ধান

বর্তমানে পাশ্চাত্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী ভাবুক মিশেল ফুকো, যাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ইতিমধ্যেই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান। বস্তুত, আন্তর্জাতিক প্রভাবে, একমাত্র জাক দেরিদা ছাড়া ফুকো-র কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ফুকো-র খ্যাতি অবশ্য দেরিদার আগেই এসেছে—যেহেতু তিনি দেরিদার চেয়ে বয়সে কিছু বড়—যখন ষাটের দশকে স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন তিনি। অবশ্য এ-গোষ্ঠীর সঙ্গে ফুকো পরবর্তীকালে আর কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। যাই হোক, প্রথমে দার্শনিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কয়েকটি খবর।

জন্ম ১৯২৬-এ পশ্চিম ফ্রান্সের পোয়াতিয়ে (Poitiers) শহরে। সেখানেই বাল্য ও মাধ্যমিক শিক্ষা। ১৯৪৫-এ, যুদ্ধ থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, প্যারিসে আসেন ও ভর্তি হন বিখ্যাত স্কুল 'লিসে অঁরী কাত্র'-এ। তার পরের বছর 'একল নর্মালে' দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ছাত্র। কিছুদিন ফ্রান্সে, তারপর সুইডেন ও পোলাণ্ডে অধ্যাপনা। ১৯৬১-তে প্রকাশিত হয় তাঁর বিশাল ডক্টরাল থিসিস 'ঞ্চপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস'। প্রায় রাতারাতি বইটি তাঁকে বিখ্যাত করে। তারপর একটানা-অধ্যাপনা দেশে ও বিদেশে (ব্রেজিল, টিউনিসিয়া ও পরে জাপানে)। ১৯৬৯-এ প্যারিসের বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলেজ দ ফ্রান্সে যোগদান করেন 'চিন্তা পদ্ধতির ইতিহাসে'র অধ্যাপক হিসাবে। কলেজ দ ফ্রান্সে কোনো পরীক্ষা নেই; কোনো ডিগ্রি নেই। শুধু শোনার আনন্দে শ্রোতারা জমায়েত হন। ১৯৮৪-র ২৫ জুলাই মিশেল ফুকো-র মৃত্যু ঘটে।

এটা অবিশ্বাস্য তত্রাচ সত্য যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই প্রভাবশালী দার্শনিকের প্রথম প্রামাণিক রচনা 'ঞ্চপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস' (***Histoire de la folie a l'age classique***)-এর কোনো পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ নেই। অনুবাদ অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত।*

* Michel Foucault : ***Madness and Civilization : A History of Insanity in the Age of Reason.*** (Trans. R. Howard ; New York, Random House. 1965.

সাড়ে পাঁচশো পাতার (মূল ফরাসি সংস্করণে) এই বিপুল চিন্তা-স্রোতকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা এ-প্রবন্ধে সম্ভব নয়। উপরন্তু এটি ফুকো-র সর্বশ্রেষ্ঠ বা ফুকোপীয় চিন্তার সর্বাপেক্ষা নির্দেশক রচনাও নয়, যদিও এটিকে বাদ দিলে ফুকো সম্পর্কে যে কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রশ্নটা যুগ কী বস্তু? এ যুগের কী বৈশিষ্ট্য? সমগ্র সপ্তদশ শতককে ফরাসি ঐতিহাসিক ও ভাবুকরা আখ্যা দিয়েছেন *l'age classique*; কোনো কোনো ব্যক্তি এ-যুগকে বলেন 'মহা-শতাব্দী' বা *le grand siecle*। রেনেসাঁস শেষ হবার পর ও তার কেন্দ্র ইটালির সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লোপ পাবার পর, ফ্রান্সে জন্ম নিল আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শন—যার মূল কাঠামো হল যুক্তি বা যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিবদ্ধ আলোচনা বা বিশ্লেষণ। এই নতুন দার্শনিক পদ্ধতিকে ভূমিষ্ঠ করার যাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক তিনি রনে দেকার্ত (René Descartes, 1596-1650)। দেকার্তের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রচনা 'পদ্ধতি প্রসঙ্গে ভাষণ' (Discours de la méthode) শুরু হচ্ছে এই প্রত্যয় দিয়ে 'পৃথিবীতে শুভবুদ্ধিই একমাত্র বস্তু যা সমানভাবে (মানুষের মধ্যে) ভাগ হয়েছে' (Le bou sens est la chose du monde la mieux partage'e)[১]। তাঁর অন্য আর একটি বিখ্যাত রচনা 'অনুধ্যান' (Meditations)। এটি ল্যাটিনে লেখা। এতে দেকার্ত উন্মাদনাকে স্বপ্ন বা অন্য সর্বপ্রকার প্রমাদের সঙ্গে এক করেছেন। যেহেতু চিন্তা ও যুক্তি, দেকার্তের মতে, এক ও অভেদ, উন্মাদনার চিন্তার অস্তিত্ব তথা যুক্তিনির্ভর সত্যের সন্ধান অসম্ভব। প্রথমত, এ-প্রত্যয় ঠিক নয় যে শুভবুদ্ধি (যার অর্থ এখানে যুক্তি) সব মানুষের সমান। কারণ, সমাজে চিরকালই কিছু লোক ছিল, আছে বা থাকবে যারা যুক্তির এই বাঁটোয়ারা থেকে বাদ পড়েছে। এরা অবশ্য কেউই অন্ধ নয়, কিন্তু এরা রাত্রির মানুষ; এদের অনাবাদী চৈতন্যে কখনো সূর্যোদয় হয় না; এদের ভাষা কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তার বাহক নয়। এরা থাকে সীমান্তের ওদিকে এবং আমরা যারা এদিকে আছি বা আছি বলে মনে করি, আমরা তাদের আখ্যা দিই ব্যাক্ষিপ্ত উন্মাদ কিংবা পাগল।

ফুকো-র এই বিশাল গ্রন্থ ঐ উন্মাদদের বিষয়ে। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্মাদনা কী, বা তার প্রতিকার ইত্যাদি এ-রচনার মূল সমস্যা নয়। সপ্তদশ শতক বা যুক্তির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা কীভাবে এই উন্মাদদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং কীভাবে এই ব্যবহার ও প্রতিন্যাস (attitude)-এর আকৃতি ও কাঠামো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার চাপে সময়ে সময়ে বদলেছে এবং এই রূপান্তরের অন্তর্নিহিত অর্থই বা কী—এ-গুলোই ফুকো-র মূল অন্বেষণের বিষয়। এ-বই যখন লিখিত হয় তখনো পর্যন্ত ফুকো ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে কোনো অন্তর্নিহিত অর্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এ-বিশ্বাসে ছিন্নমূল হন। সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

তাঁর মূল আলোচনার শুরুতেই—এবং মূল আলোচনা শুরু হচ্ছে ক্ল্যাসি সংস্করণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—দেকার্তের Meditations-এর কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত ক'রে এটা দেখিয়েছেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক ও প্রপদী যুগের মহাকবিক এটা ধরে নিয়েছিলেন যে শুদ্ধ যুক্তি-নির্ভর চিন্তা ও সত্যোপলব্ধি থেকে উন্মাদনা সম্পূর্ণ পৃথক ও সরাসরিভাবে বিপরীত। অর্থাৎ যাকে দর্শনশাস্ত্রে বলা হয় 'অন্যত্ব' বা alterity তা যুক্তির পরিমণ্ডলে প্রথম প্রবিষ্ট হল। পাশ্চাত্য যুক্তি, জ্ঞান এগুলো ঠিক সেই যুগ থেকে এক ও অভেদ হয়ে দাঁড়াল ; বা পাশ্চাত্য এমন এক সভ্যতা বা জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত হল যার মধ্যে অযুক্তি বা অন্ধকারের আর কোনো স্থান রইল না। ঐ ধারণারই প্রসার ও প্রভাব পাশ্চাত্য চিন্তায় এখনো প্রবল। বস্তুত, ব্যাপারটা আগে ঠিক এরকম ছিল না। মধ্যযুগে তো বটেই, এমনকি রেনেশাঁস আমলেও যুক্তি ও অযুক্তির, স্বাভাবিক ও উন্মাদদের সহবাস সম্ভব ছিল ; ছিল অযুক্তি বা উন্মাদনার একটি নিজস্ব তাৎপর্য। যদিও ঐ যুগেও উন্মাদনার সঙ্গে পাপ (c mal) ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তথাপি উন্মাদনা আবির্ভূত হতো কোনো গুহ্য জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে, কোনো লোকোত্তর আলোর অধিকারী হিসাবে ; এঁদের মধ্যে অনেকে দেখতেন, যাকে ফুকো বলছেন, 'কাল্পনিক উত্তরণ (des transcendances imaginaires)। এটা অবশ্য ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ আমাদের দেশেও এক তান্ত্রিক কবি গেয়েছিলেন 'আমি পাগল মায়ের পাগল ছেলে'। এখানে পাগলামি অসুস্থতা নয় ; উত্তরিত হয়ে জননীর সঙ্গে একাত্মভূত হওয়ার এক মাধ্যম মাত্র।

প্রপদী যুগ আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমূল বদলাতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইয়োরোপের সর্বত্র ছিল কুষ্ঠাশ্রম (leprosium) ; ঐ যুগ শেষ হবার পর থেকেই কুষ্ঠরোগ অদৃশ্য হতে শুরু করে। যে বাড়িগুলিতে কুষ্ঠরোগীদের পৃথক রাখা হতো সেগুলি সপ্তদশ শতকে আর খালি পড়ে রইল না। পৃথকীকরণ বা অন্তরণের কাঠামো আবার ফিরে এল, যখন উন্মাদদের আলাদা করে রাখা হল নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে, পুরনো কুষ্ঠাশ্রম বা নবনির্মিত কোনো বাড়িতে। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য সেটা এই যে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে—১৬৫৭-র রাজাজ্ঞায়—এই ধৃত ও অন্তরীণ ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই উন্মাদ ছিলেন না ; এঁদের মধ্যে ছিলেন বহু দরিদ্র, ভিখারী, ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, ছোটখাট অপরাধী, লম্পট, যাদের পানাসক্তি অনারোগ্য, এমনকি নাস্তিক ও ঈশ্বরবিরোধী বা blasphemeurs-বৃন্দ। এই বিচিত্র সংমিশ্রণ, ফুকোর মতে, বিশেষভাবে তাৎপর্য-পূর্ণ। একাধারে বিদ্রোহী, বিপ্রলব্ধ মানুষের ঝাঁক ও অন্তর্ধানে অযুক্তির প্রতিরূপ রাশি রাশি উন্মাদ বা মানুষী জঞ্জাল—এ দুই-ই ছিল যুক্তি তথা হিউম্যানিস্টদের চোখে এক নিদারুণ লজ্জা। অতএব তাকে চোখের আড়ালে রাখার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। কারণ, 'অন্তরুল গোপন রাখে অযুক্তিকে আর প্রকাশ করে

লজ্জাকে, যা আসে অযুক্তি থেকে' (L'internement cache la de'raison, et trahit la honte qu'elle suscite)[২] ।

অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই এই মিশ্রিত মানুষদের ব্যবহৃত বাড়িগুলো এক প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে ওঠে। কারণ, নানাবিধ কলরব ও ঘুঁষোঘুঁষি তো আছেই এবং আরো আছে উন্মাদদের অহোরাত্র অকস্মাৎ হাহাকার। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে উঠল কোনো সংক্রামক ব্যাধির ভয়, যা যে কোনো মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মড়কের আকার নিতে পারে। এতাদৃশ ব্যাধি ইতিমধ্যেই কিছু দেখা দিয়েছিল। ফলত, আবির্ভূত হল দুই ধরনের মানুষ ; সংস্কারক ও চিকিৎসক। একথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে রোগ বা তার চিকিৎসা, বিজ্ঞানের প্রগতি বা মানবপ্রেমের প্রসার, এগুলো একেবারেই ফুকো-র আলোচ্য বিষয় নয়। বরং তার উল্টোটাই, অর্থাৎ কীভাবে চিকিৎসা তথা উপচিকীর্ষার আড়ালে সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থাকে দৃঢ় করা হয়েছিল, সেটাই ফুকো-র অন্যতম প্রতিপাদ্য। আগের যুগের কুষ্ঠের মতো, উন্মাদনা এমন এক রহস্যময় ভীতির সঞ্চার করেছিল যুক্তির সেই মহা-শতাব্দীতে যে 'চিকিৎসক' নামে এক প্রাণীর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, ফরাসি বিপ্লবের কিছু আগেই, উন্মাদদের পৃথক ক'রে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ঐ মিশ্রিত ভিড় থেকে। ফুকো এটা মানতে রাজি ন'ন যে কোনো হিউম্যানিটারিয়ান বা মানবপ্রেমের প্রেরণা থেকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফুকো-র রচনায় মানবপ্রেমীরা—অর্থাৎ যাঁদের হৃদয় অন্যের দুঃখে আবেগের রসায়নে দ্রব হয়ে ওঠে—অদৃশ্য। ঐ মিশ্রিত শৃঙ্খলিত মানুষদের পৃথক ক'রে দেওয়ার দু'টি কারণ ফুকো দিচ্ছেন। ঐ মানুষদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী, যাঁদের মধ্যে অনেকেই অভিজাত বাড়ির ছেলে এবং কিছু বুদ্ধিজীবী ; এঁরা দাবি করেন উন্মাদদের থেকে এঁদের আলাদা ক'রে দেবার জন্য। কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। দারিদ্র্য বা কর্মহীনতা, যা কিছুদিন আগেও ছিল নৈতিক শাসন ও লজ্জার প্রতীক, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াল অর্থনৈতিক লাভের একটি উপায়। দরিদ্রকে অন্ন বা নামমাত্র বেতনের শ্রমিকে রূপান্তরিত করা রীতিমতো লাভজনক, সুতরাং আর প্রয়োজন নেই তাদের রুদ্ধ রাখার। পাগলরা কিন্তু স্বস্থানে রয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৭৮৯-এর বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব এসে গেছে। মৈত্রী, স্বাধীনতা আর সাম্যের সমন্বিত নিনাদে নিখিল বিশ্ব তখন কম্পমান, আর সেই বিপ্লবকে ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে এসেছে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' ও রক্তস্রোত। উন্মাদদের প্রাপ্য ছুটি বাতিল হয়েছে, কিন্তু তখনো চলছে শিকল ভাঙার মহোৎসব। উন্মাদরা ইতিমধ্যে পৃথক হয়েছে ; এখন প্রয়োজন তাদের কোমরের শিকল ও পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়ার। এরই ফলে জন্ম নিল এক নতুন সামাজিক সংস্থার। এর নাম উন্মাদ-আশ্রম।

এই বিপুল গ্রন্থের শেষাংশে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদে—শিরোনাম 'উন্মাদ-আশ্রমের জন্ম' (Naissance de l'asile)—বিস্তারিত আলোচনা করে ফুকো দেখিয়েছেন যে এই মানবপ্রেমের ছদ্মবেশে সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির কী ভূমিকা ছিল।

দু'জন ব্যক্তি বা তাঁদের প্রয়াসের দীর্ঘ আলোচনা এই পরিচ্ছেদের মূল অংশ। এঁদের মধ্যে একজন সংস্কারক, ইংরেজ কোয়েকার (Quaker), স্যামুয়েল টিউক (Tuke) ও অন্যজন ফরাসি চিকিৎসক পিনেল (Pinel)। প্রথমে কোয়েকার টিউকের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই ব্যক্তি ১৭৯৩ নাগাদ উত্তর ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে 'দ্য রিট্রিট' নামে একটি উন্মাদ-আশ্রম স্থাপন করেন উন্মাদদের সংস্কার ও আরোগ্যের জন্য। প্রথমে তাদের শিকলমুক্ত ক'রে, তাদের প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশের মধ্যে রেখে মানবোচিত ব্যবহার ও হার্দ্যতার সাহায্যে কাজে নামলেন তিনি। কিন্তু ফুকো-র মতে, এ-প্রচেষ্টার পিছনে ছিল একটি নবজাত রূপকথা, যার থেকে জন্ম নিল উনিশ শতকের মনোচিকিৎসার • পদ্ধতি। সে-রূপকথাটি এই যে উন্মাদদের অন্তস্তলে কিছুটা যুক্তি ও শুভবুদ্ধির তলানি এখনো রয়ে গেছে, যাকে কিরিয়ে এনে সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজন একটি পারিবারিক পরিবেশের—যেখানে উন্মাদরা হবে 'আদিকৃত আদর্শে গড়া পরিবারের শিশু' (ils seront les enfants de la famille dans son idealite primitive, প্রাগুক্ত ফরাসি সংস্করণ, পৃ ৪৯৪)। অর্থাৎ উন্মাদরা যুক্তির পুনরুজ্জীবনে স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক হবে না; তারা শিশুই থাকবে বয়স্ক প্রহরী, শাসক ও সংস্কারকদের আজ্ঞাবহ হয়ে। ইয়র্কশায়ারের এই শান্ত শ্যামল ইউটোপিয়ার ভিত্তিতে ছিল, ফুকো-র মতে, এক মনগড়া প্রাকৃতিক ন্যস্ত বা ডায়ালেকটিক্স—কিন্তু ছিল না রোগের কোনো নিরপেক্ষ অন্বেষণ। এবং এই ইউটোপিয়া, যা গড়ে উঠেছিল সাধারণের চাঁদায় ও রোগীদের আত্মীয়দের খরচে, তার লাভের অংশটা নগণ্য ছিল না। ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত 'দ্য রিট্রিটে'র অংশীদারদের কতটা মুনাফা হয় তারও হিসেব ফুকো দিয়েছেন এ-প্রসঙ্গে।

পিনেল ধর্মভীরু কোয়েকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। বিসেত্র (Bicetre)-এ উন্মাদ-আশ্রমে তিনিও রোগীদের শিকলমুক্ত করেন। দু'টি 'কেস' বা আরোগ্যপ্রাপ্ত রুগীর কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। প্রথম জন এক ইংরেজ নৌ-ক্যাপ্টেন। এই বদ্ধ উন্মাদ এক এক সময় এমনই হিংস্র হয়ে উঠতেন যে একদিন তাঁর দুই হাতকড়াবদ্ধ হাতে একটি লোককে খুন ক'রে ফেলেন। একটানা সদুপদেশ ও সখ্যতার সাহায্যে পিনেল এ-ব্যক্তিকে নিরাময় ক'রে তোলেন। ঐ ক্যাপ্টেন আরোগ্যলাভের পর শিকলমুক্ত ও স্বাভাবিক তো হলেনই,

---

• শব্দটিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. প্রবন্ধ 'মনোচিকিৎসা', ছন্দক সেনগুপ্ত; এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৪।—স. এ.।

এমনকি বিসেত্র-এর পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নিলেন অন্য উন্মাদদের রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে। ফুকো-র মতে এই ব্যক্তি আরোগ্যপ্রাপ্তির পর একজন সুস্থ, স্বাধীন মানুষ না হয়ে হলেন একটি সামাজিক টাইপ। 'শিকল পাগলকে যে পশুত্বে বাধ্য করেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের মধ্যে ফিরে এলেন শুধু একটি সামাজিক টাইপ হয়ে।' [পৃ ৪৯৮]।

আর একটি রোগমুক্ত উন্মাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শর্ভাজে নামে এক ফরাসি সৈনিক অতিরিক্ত মদ্যপানে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আটক ছিলেন বিসেত্র-এ। এঁকেও স্বাভাবিক করেন পিনেল। কিন্তু কী অর্থে স্বাভাবিক? নিরাময় হওয়ার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তি পিনেলের বশম্বদ ভৃত্য হয়ে ওঠেন। এমন কি, প্রভুকে রক্ষা করার জন্য এ-ব্যক্তি তাঁর নিজের দেহকেও এগিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। 'শর্ভাজে যুক্তিশীল মানুষ হন নি; হয়েছিলেন চাকর' (Chevinge ne redevient pas homme raisonable, mais serviteur. পৃ ৪৯৯)। অর্থাৎ রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক এখানে স্বাভাবিক নয়। যদিও শর্ভাজে ও তাঁর চিকিৎসক উভয়েই শ্বেতাঙ্গ, ফুকো এই দুইয়ের সম্পর্ককে তুলনা করেছেন নিঃসঙ্গ দ্বীপে বিচ্ছিন্ন শ্বেতাঙ্গ রবিন্সন ক্রুশো ও তার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য ফ্রাইডের সম্পর্কের সঙ্গে। এখানে এটা উল্লেখ্য যে উত্তর-আধুনিক (post-modern) চিন্তায় ডফোর ঐ বিখ্যাত ও পৃথিবীর প্রথম পুঁজিবাদী উপন্যাসটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এর পুঁজিবাদী দিক বহু আলোচিত; এমন কি মাত্র কিছুদিন আগে ফরাসি টেলিভিশনের জন্য তোলা এর চিত্ররূপে এর অর্থনৈতিক বক্তব্যকে নির্মমভাবে দেখান হয়েছে। কিন্তু উত্তর-আধুনিক চিন্তায় মূল উৎসাহের কেন্দ্র রবিন্সন-ফ্রাইডের জটিল সম্পর্ক। এই কাহিনী নতুন ক'রে লিখেছেন ফ্রান্সের জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত, মিশেল তুর্নিয়ে; একে নতুন ক'রে লিখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ লেখক জে. এম কোয়েটৎসে। 'রবিন্সন ক্রুশো' নির্দোষ, শিশুভোজ্য আনন্দ নাদু নয়। ক্ষমতার কাঠামো (power-structure) বা অন্যকে দমনেচ্ছা, যা মিশেল ফুকো-র পরবর্তী চিন্তার প্রধান বক্তব্য, তা ঐ আপাত-রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে আছে এবং এটা ফুকো-ই প্রথম ধরেছিলেন।

টিউক কিংবা পিনেল কোনো বিজ্ঞানের জন্ম দেন নি। ফুকো-র মতে তাঁরা একটি নতুন পাত্র বা চরিত্রকে হাজির করেছিলেন—ডাক্তার বা মনোচিকিৎসক, যিনি তাঁর জ্ঞানলিপ্সা বা জ্ঞানের এষণা অর্থাৎ will to knowledge-এর মুখোসের আড়ালে সমাজের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কিন্তু কেন এই ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগের কী প্রয়োজন? যুক্তির যুগে যখন যুক্তিই একমাত্র ধ্রুব, তখন যাঁরাই এই যুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন সমাজের কিনারায় চলে গিয়ে এবং যুক্তির সার্বভৌম প্রাধান্যকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য ক'রে—ঠিক যেমন কিছু লোক সামাজিক 'টাইপ'

হতে বাজি না হয়ে আইনভঙ্গকারী, অসামাজিক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হন— তাঁদের শুধু সমাজের কিনারায় রাখলেই চলে না, তাঁদের দমনের জন্য ও যুক্তির স্বরাষ্ট্রত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন একটি আপাত-বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চিকিৎসা-প্রণালীর। এবং এই প্রয়োজনের চাপে জন্ম নিয়েছিল মনোচিকিৎসা, অপরাধ-বিজ্ঞান ইত্যাদির। অযুক্তিকে ক্ষমতার সাহায্যে আয়ত্তে আনার জন্য প্রথমেই যেটা অতি আবশ্যকীয় তা হল অযুক্তিকে অসুস্থতা বা রোগ হিসাবে ঘোষণা করা।

এই সংকল্প চরম রূপ নিয়েছে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষক পদ্ধতিতে। যদিও এক অর্থে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অংশত বৈজ্ঞানিক, কারণ তিনি প্রথম রোগীকে বিশ্লেষণকালে বাধ্য করেন— কিন্তু ক্ষমতার কাঠামো এতে কিছুই বদলায় নি, বরং তা আরো বিস্তৃত হয়েছে। কারণ, 'মনঃসমীক্ষকের যাদুকরী গুণকে উনি আরো বর্ধিত করেন' (Il a amplifié ses vertus thaumaturges. ফ্যাসিসং ; পৃ ৫২৯)। ফুকো-র এই বই প্রকাশ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক মনোবিশ্লেষক নিজেদের পেশা ও পদ্ধতির কার্যকরতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। ঠিক কতজন নারীপুরুষ আজ পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছেন এবং যাঁরা সত্যই রোগমুক্ত হয়েছেন তাঁদের ঐ মানসিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে— অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায়— হতে পারত কি না, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন অবশ্য ফুকো-র আগেই উঠতে শুরু হয়েছিল।

'প্রপদী যুগে উন্মাদনার ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যে রীতি-মতো আলোড়ন হয়েছিল। বিশেষত, সমাজতান্ত্রিকরা বইটিকে দু'হাতে লুফে নেন। বোধহয় তাঁরা সুকুমার রায়ের 'সোঠমামা'র মতো 'বাগিয়ে ধামা' অপেক্ষায় ছিলেন কখন ঐ পাখিটি পড়বে। 'পড়, পড়, পড়, পড়বি পাখী ধম্', এবং পাখি পড়েও ছিল ওঁদের ধামায়। বহুদিনের গবেষণালব্ধ তথ্য সমৃদ্ধ তথা বহুবিধ চিন্তার সম্ভারে গর্ভিণী এইরূপ বিশাল একটি বই পেলে কোন সমাজতান্ত্রিকই বা উল্লসিত না হবেন?

কিন্তু ওঁদের উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফুকো-র পরবর্তী রচনাগুলি প্রকাশিত হলে এঁদের অনেকেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে শুরু করে এবং যাঁরা যথাযথ এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই আস্তে আস্তে কেটে পড়তে শুরু করেন। প্রচলিত অর্থে ফুকো সমাজতান্ত্রিক নন। ফুকোপন্থীয় দর্শনে মূল সমস্যাটি অস্তিত্বের, যদিও 'অস্তিত্বকেন্দ্রিক' শব্দটি এখানে অপ্রযোজ্য, কারণ অস্তিত্বের কোনো কেন্দ্র আছে এ-ধারণায় ফুকো অবিশ্বাসী। জাক দেরিদার মতো মিশেল ফুকো-ও এসেছিলেন যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অস্তিবাদী পটভূমিকা থেকে। যদিও ফুকো-র প্রথম হাতে খড়ি হয় নব্য-কান্টীয় (Neo-Kantian)-দের টোলে, সেই হেতু সমাজতত্ত্বের জনক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) প্রমুখ নব্য-কান্টীয়দের সঙ্গে তাঁর সামান্য সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে— কিন্তু সেটা খুবই বাহ্যিক।

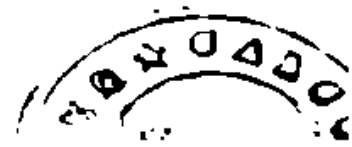

আমরা যাকে প্রাতিস্বিকতা বলতে অভ্যস্ত, যাকে আমরা ধরে নেই মানুষের অনড়, ধ্রুব চরিত্র বলে, সেটি মূলত কিছু সামাজিক ও নৈতিক বিধি নিষেধের প্রত্যাদেশে আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে, একজন সামাজিক প্রাণী তার নিজের কাছে বিদেশী ও বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ (alienation)-এর চিন্তা যা পাশ্চাত্যের আধুনিক, উত্তর-হাইদেগারীয় চিন্তাকে চরিত্রায়িত করেছে, তা থেকে ফুকো-র এই প্রথম, গুরুত্বপূর্ণ, রচনাটি একেবারেই মুক্ত নয়। উন্মাদনা এমন এক মানসিক অবস্থা যা মানুষকে আক্ষরিক অর্থে সত্তার মুখোমুখি এনে দেয়। সত্তা যেখানে শূন্য, নিরালম্ব, কেন্দ্রহীন, সেখানে উন্মাদদের কোনো নিজস্ব চরিত্র নেই ; তাদের ভাষায় নেই সমাজে ব্যবহৃত যুক্তির শৃঙ্খলা এবং তাদের ক্রিয়াকর্ম উদ্দেশ্যহীন। উন্মাদনার প্রতি ফুকো-র এই আকর্ষণ সে ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ।

'উন্মাদনার ইতিহাস'-এর (মূল ফরাসি সংস্করণে) তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে ফুকো এই বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ দার্শনিকভাবে আলোচনা করেছেন দিদেরো-র মৃত্যুহীন রচনা 'রামোর ভাইপো' (*Le Neveu de Rameau*) পাঠের মধ্য দিয়ে। দেনি দিদেরো-র (Denis Diderot) ঐ রচনাটির কোনো তুলনা নেই। বিশ্ব-সাহিত্যের বাজারে আমি সর্বত্রগামী এমন ভাণ অবশ্যই করতে পারি না, কিন্তু আমার জানা কোনো ভাষায় এমন কোনো রচনা নেই যার সঙ্গে 'রামোর ভাইপো'র ন্যূনতম সাদৃশ্য আছে। একাধারে ফরাসি মননশীলতার তীক্ষ্ণতা ও অন্য ধারে দিদেরো-র ভাস্বর প্রতিভা, এই দুইয়ের সন্নিপাতে এ এক আশ্চর্য রচনা। এবং এটাও এখানে বিশেষভাবে উচ্চার্য যে ফুকো-র বিশিষ্ট ফরাসি বা মার্কিন বা ইংরেজ টীকাকারেরা – অন্তত যে কয়জনের ভাষ্য আমি দেখেছি – সকলেই এই মূল্যবান আলোচনাটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও ফরাসি সাহিত্যের অধ্যাপক কার্লিস থমাসেভস্কি যিনি খুবই সম্প্রতি, মাত্র গত বছরে প্রকাশিত, একটি প্রবন্ধে ফুকো-র দিদেরো-পাঠের উপর একটি আলোচনা করেছেন[৩]। আলোচনাটি খুবই মনোজ্ঞ, কিন্তু তিনিও ফুকো ও হেগেলের দিদেরো-পাঠের মধ্যেকার পার্থক্য ও বৈপরীত্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি বা করার প্রয়োজন দেখেন নি।

জঁা-ফিলিপ রামো (Jean-Phillippe Rameau, 1683–1764) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসি সংগীতজ্ঞ। ইনি ছিলেন একাধারে গায়ক ও বিভিন্ন গীতিনাট্যের লেখক, অন্যধারে সংগীতের তত্ত্বে সুপণ্ডিত। এঁর সংগীত-প্রতিভা উঠেছিল কিংবদন্তির পর্যায়ে। এঁর ভাইপো জঁা-ফ্রাঁসোয়া (Jean-Francois) রামো ছিলেন সর্বতোভাবে বিপরীত চরিত্র। ইনি ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, চরিত্র-ভ্রষ্ট, খিস্তি-ভাষী, পরান্নভোজী – যাঁর একমাত্র প্রাত্যহিক কাজ ছিল প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান এবং মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্যভোজের একটু আগে কোনো সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে হাজির হওয়া আহারের সন্ধানে এবং তার জন্য ইনি যে কোনো

ভাঁড়ামি করতে প্রস্তুত ছিলেন। একটি উন্মাদ ব্যক্তি। এঁকে দিদেরো চিনতেন। এঁরই সঙ্গে দিদেরোর কোনো এক সন্ধ্যার কথোপকথনের বর্ণনা—যে বর্ণনা হয়ত বহুলাংশে কাল্পনিক—হল 'রামোর ভাইপো'র সংবাদ। দিদেরো-র কাছে ভাইপো জাঁ ফ্রাঁসোয়ার প্রধান মূল্য এই যে এ-ব্যক্তি সমাজের সব প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই অর্থে যে এঁর কোনো নিজস্ব চরিত্র, কোনো প্রাতিস্বিক সত্তা নেই। ইনি কখনো উন্মাদ, কখনো ভাঁড়, কখনো দার্শনিক, কখনো গায়ক কিংবা অভিনেতা, কখনো প্রগল্‌ভ, কখনো মৌন। এক কথায়, কোনো সামাজিক বা নৈতিক ছাঁচে এঁর জীবন প্রবাহিত নয়। এবং সমাজে যাঁরা তথাকথিত সম্মানিত, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী তাঁদের প্রতি এঁর গভীর অনুকম্পা; এঁর ধারণা আমরা যাকে ভালোমন্দ বা পাপপুণ্য বলতে অভ্যস্ত সেগুলো মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা লাভক্ষতির হিসাবের ফল। দিদেরো-র এই রচনাটির মধ্যে মিশেল ফুকো দেখেছেন 'অযুক্তির প্রচণ্ড শক্তি' (les profonds pouvoir de la déraison)। অবশ্য এই রচনার অন্য দার্শনিক পাঠও সম্ভব।

১৮০৫-এ দিদেরো-র এই রচনার জার্মান অনুবাদ করেন স্বয়ং গ্যোয়টে। ঐ বছরই ঐ গ্যোয়টেরই সুপারিশে হেগেল সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন ইয়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে। দিদেরোর এই লেখাটি অতিশয় যত্নসহকারে পড়ে হেগেল নিজস্ব পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা দেন তাঁর 'দা ফেনোমেনোলজি অফ মাইণ্ড'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, যেখানে আলোচ্যবস্তু নৈতিক জগৎ (The Ethical World), অভেদ (Identity) ও নির্ভেদ (Difference) এবং পরম সত্তা (Spirit) কীভাবে বিচ্ছিন্নতা (alienation)-র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। হেগেলের দিদেরো-পাঠ বহু অর্থে মূল্যবান, এমনকি আমরা যারা হেগেলীয় হবার সম্মান দাবি করি না তাঁদের কাছেও। হেগেলীয় চিন্তায়, তথা দিদেরো-র মূল রচনায়, ব্যাপারটা ঘটছে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে, সেই 'পুরনো আমল' (ancien régime)-এ, যখন এক অনাচারী অবক্ষয়ী সমাজ, সংস্কৃতির চরমে উঠেও, তার নিজের অভ্যন্তরীণ পচনকে রোধ করতে পারে নি। এখানে হেগেলের পরম সত্তা অর্থ ও অর্থজাত শক্তির মধ্যে অন্যত্বে রূপান্তরিত (alienated) এবং যেখানে মহান-চৈতন্য ও নীচ-চৈতন্যের পার্থক্য লুপ্ত। এই পচনশীল সমাজে মহান-চৈতন্য অর্থের বলে উদ্ধত দাতা ও মহত্ব-বর্জিত, কিন্তু নীচ-চৈতন্য যে প্রাপক সে ক্ষণিকের আত্ম-সচেতনায় মহত্বে উন্নীত।

বলা বাহুল্য, হেগেলীয় চিন্তায় পরম সত্তার এই বিকলন একেবারেই সাময়িক ব্যাপার; একটি বিশেষ যুগের বিশেষ অবক্ষয়ের চিহ্ন মাত্র। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ডায়ালেকটিক্স বা দ্বন্দ্বের ক্রমিক অগ্রগতিতে যুক্তি টেনে নেয় অযুক্তিকে, তার 'আউফহেবুং'-এর মধ্য দিয়ে। এখানে আউফহেবুং (Aufhebung)-এর অর্থ বিপরীতকে গ্রাস করে আরো উন্নত অবস্থায় উত্তরণ (transcendence)।

অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত যুক্তি বা পরম সত্তারই জিৎ অযুক্তির অস্তিত্বকে ধ্বংস ক'রে। এই চতুর, মিহি সুতোর মিস্টিসিজ্‌মের সঙ্গে ফুকো-র চিন্তার কণামাত্র সাদৃশ্য নেই। ফুকো যেটা দেখাতে সচেষ্ট সেটা এই যে যুক্তি অযুক্তিকে রেখেছে সমাজের কিনারায়, শেষ সীমান্তে এবং তাকে প্রতি মুহূর্তে দমন করছে তার সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ের অছিলায়। অর্থাৎ অযুক্তি বা উন্মাদনা বা যুক্তি নয়, তাকে শাসিত করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদ্ধতি তার চরিত্র নির্ণয় করা। এই পদ্ধতির এক দিকে আছে বর্জনের রাজনীতি (politics of exclusion) আর অন্যদিকে আছে জ্ঞান ও শক্তির অভেদ।

ফুকো-র ইতিহাস-চিন্তায় ডায়ালেকটিক্‌সের লীলা নেই। এই চিন্তায় জীবন ও সমাজের সব অভিজ্ঞতা বা সব উপাদান ঐতিহাসিক নিয়তির জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট নয়। ফুকো-র এই বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে, পরে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কেন তিনি মার্কসবাদের এত কাছে আসা সত্ত্বেও ঐ মতবাদ ও চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেন নি। এটা অবশ্যই সত্য যে হেগেলীয় মিস্টিসিজ্‌মের কণামাত্রও মার্কসবাদে নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়তি ও ডায়ালেকটিক্‌সের ক্রমিক গতি সেখানেও মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে।

এ-ব্যাপারে ফুকো নিঃসন্দেহ যে যেখানে আছে দমন বা দমনেচ্ছা সেখানেই থাকবে প্রতিরোধ বা resistence। অষ্টাদশ শতকের যুক্তি-ভজনার প্রথম বিষক্রিয়া উনিশ ও বিশ শতকের যুক্তি-বিরোধিতায়। কবি হোয়েল্ডারলিন ও দার্শনিক ফ্রিডরিশ নীচএ থেকে শুরু ক'রে এ যুগের আঁতোয়ান আর্তো কিংবা মেশঁ ফুসেল পর্যন্ত—এঁরা অনেকেই আক্ষরিক অর্থে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—একটানা এসেছে যুক্তি ও তার বৈধ সন্তান শজিটিভিজ্‌মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 'উন্মাদনার ইতিহাস' হয়ত ফুকো-র সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক যুক্তোত্তর চিন্তার ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় রচনা হয়ে থাকবে।

এই রচনা প্রকাশের দু'বছর পরে ফুকো লেখেন 'হাসপাতালের জন্ম' (*La Naissance de clinique*)। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র সীমিত থাকার ফলে ঐ গ্রন্থের আলোচনা আমরা পরিহার করছি; তাছাড়া, এর মধ্যেকার মূল্যবান বক্তব্যগুলির দু-একটি আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে ফুকো-র সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রচনা 'নজর ও শাস্তি'-র (*Surveiller et Punir*) মধ্যে, যা পরে আলোচ্য।

হেগেলের চিন্তার সঙ্গে ফুকো-র ব্যবধান যে দুরতিক্রম্য তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে তাঁদের দু'জনের দিদেরো-শাঁসের বৈপরীত্যে। এই বৈপরীত্য আরো বেশি প্রকট হল ফুকো-র আর একটি সাড়া তোলা রচনা 'শব্দরা আর বস্তুরা' (*Les Mots*

et les Choses)-র মধ্যে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ ১৯৭১-এ। * এর সহ-শিরোনাম 'মানবীয় বিজ্ঞানের একটি প্রত্নতত্ত্ব' (Une arche'ologie des sciences humaines)। এখানে এটা উল্লেখ্য যে এখানে sciences শব্দের অর্থ প্রচলিত অর্থে শুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। এটা, আমরা যাকে বলি আর্টস, অর্থাৎ ইতিহাস, দর্শন সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি।

'উন্মাদনার ইতিহাসে' গৃহীত পদ্ধতি ছিল উন্মাদ বা উন্মাদনার প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া ও তার অন্তর্নিহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এক কথায় বইটি ঐতিহাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের কাছাকাছি। কিন্তু এ-পদ্ধতি ফুকো সর্বাংশে পরিত্যাগ করেন তাঁর এই নতুন বইটিতে। এখানে তাঁর আলোচ্য বস্তু গত চারশো বছরের ইয়োরোপীয় চিন্তার ইতিহাস, যে-ইতিহাস একাধিকভাবে ফুকো-র কাছে ব্যর্থতার ইতিহাস। এই ইতিহাসের সামাজিক বা অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী সে-প্রশ্নে ফুকো অনীহ। যে-জ্ঞানচর্চা গত চার শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্য মননকে ব্যস্ত রেখেছিল তা কীভাবে মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছে সেটাই ফুকো-র মূল সমস্যা। সমস্যাটা এখানে জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) তথা মানুষী অস্তিত্বেরও বটে।

যদি হেগেলীয় চিন্তায় ইতিহাসের অর্থ পরম সত্তা বা মহাযুক্তির, আদিযুগ থেকে ক্রমবিবর্তন ও তার চরম পরিণতি—যে-চিন্তা উত্তর-হেগেলীয় ইতিহাসবোধকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করেছে—সে চিন্তাকে ফুকো শুধু বর্জন করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে তিনি সর্বাত্মকভাবে উল্টে দিয়েছেন। তথাকথিত ইতিহাসের মধ্যে কোনো অন্তঃশীলা অর্থ বা যুক্তির স্রোত নেই, নেই কোনো ধাপে ধাপে, দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেক্‌টিকাল ক্রমোন্নতির উল্লাস। ফুকো-র মতে যা আছে তা একধরনের সভ্যতা ও চিন্তাশৈলীর শেষে আর এক ধরনের বিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড চিন্তাশৈলী, যাকে ফুকো বলছেন জ্ঞানাংশ বা 'এপিস্টেমে' (*epistemc*')। একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে এই এপিস্টেমে সরে গিয়ে পথ খালি করছে আর এক এপিস্টেমের এবং সেই সঙ্গে শব্দরা পর্যন্ত, বস্তু থেকে আরো দূরে সরে গিয়ে, তাদের অর্থ বদলাচ্ছে। প্রচলিত, অর্থাৎ হেগেলীয়, অর্থে আর ইতিহাস সম্ভব নয়; তাই প্রয়োজন এক নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির। এই প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও এপিস্টেমে সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু এটাই বলা যেতে পারে যে যদিও এপিস্টেমে শব্দটি গ্রীক এবং এপদী গ্রীকে ঐ শব্দের অর্থ জ্ঞান, যার থেকে জ্ঞানতত্ত্ব বা epistemology শব্দের উদ্ভব, ফুকো-র চিন্তায় এপিস্টেমের অর্থ প্রচলিত অর্থে

---

* Michel Foucault, *The Order of Things : An Archaeology of Human Sciences* (Collective Translation) New York, Pantheon, 1971.

জ্ঞান নয়—যদি জ্ঞানের অর্থ হয় কোনো বস্তু সম্পর্কে সর্বতোভাবে নিশ্চিত ও সত্য ধারণা। একটি বিশেষ যুগে বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য শক্তির সম্পর্ক আমাদের ভাষণ—লিখিত, কথ্যভাষা—এর শৈলী বা তার গঠনের রীতিনীতিকে এক করে এবং যা ক্রমাগত আবিষ্কৃত হয় নানাবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ কালে—তাকেই ফুকো আখ্যা দিচ্ছেন 'এপিস্টেমে'।

'উন্মাদনার ইতিহাস'-এর মতো এই বইটিতেও ফুকো সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। ধ্রুপদী যুগ অর্থাৎ সমগ্র সপ্তদশ শতক—সেই সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের তিন-চতুর্থাংশ—এবং আধুনিক যুগ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত।

রেনেসাঁস আমলে যে কোনো শাস্ত্রচর্চার মূলে ছিল দু'টো বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্য নির্ণয় করার পদ্ধতি। ধ্রুপদী যুগে পদ্ধতি বদলাল। এল প্রদর্শন (representation)। চিন্তাকে পদ্ধতিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা (order)-র; এবং এই শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে গাণিতিক রূপ নিল এবং একে দাঁড় করান হল দু'টি প্রণালীতে, যাদের ফুকো বলছেন ম্যাথেসিস (Mathesis) ও তাক্সিনমিয়া (Taxinomia)—ইংরেজিতে taxinomy—এবং যে দু'টি প্রণালীর উপস্থিতি ধ্রুপদী যুগের জ্ঞান-চর্চায় প্রায় সর্বত্র লক্ষণীয়। ট্যাক্সিনমি, অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ করা, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে এখনো বহু ব্যবহৃত। ম্যাথেসিস শব্দটি অবশ্যই গ্রীক mathematikos-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু গণিত এটি নয়; এটি একটি প্রণালী মাত্র, যার সাহায্যে গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রদর্শনকে সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব। ফুকো-র মতে, 'যখন ব্যাপারটা সহজ সরল প্রকৃতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা তখন প্রয়োজন হয় ম্যাথেসিসের, যার সার্বভৌম পদ্ধতি হল বীজগণিত[৪]।'

বীজগণিতে ব্যবহৃত a বা b-র কোনো নিজস্ব মূল্য নেই। ঐ অক্ষর দু'টি মূল্যবান শুধু তখনই যখন তারা একটি সমীকরণের একটি রাশি অর্থাৎ অন্য এক মানের প্রদর্শন। অর্থাৎ, শব্দ ও বস্তুর পার্থক্য চিরস্থায়ী এবং শব্দরা—যার সাহায্যে বস্তুর প্রদর্শন সম্ভব তা—মূলত শূন্য। ব্যাপারটা প্রহেলিকা বলে মনে হবে না, যদি আমরা ক্যার্ডিনা সম্বন্ধের ভাষাতাত্ত্বিক বক্তব্যগুলো মনে রাখি। সহজ, সরল প্রদর্শন আর এক ধাপ এগোলে প্রয়োজন হয় বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ সারণীতে সাজিয়ে নেওয়ার—অর্থাৎ ট্যাক্সিনমির।

বেকন ও দেকার্ত থেকে এই পদ্ধতির শুরু। দেকার্তে এসে এই পদ্ধতি চরমে পৌঁছেছে; সত্যকে আয়ত্তে আনার জন্য চিন্তাকে প্রদর্শনের সাহায্যে, তুলনার সাহায্যে, একটি সারণী (table)-তে সাজিয়ে নির্দিষ্ট করা কোনগুলি এক ও অভেদ (identity) ও কোনগুলি পৃথক (different) ইত্যাদি। যেটা ফুকো-র মতে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য সেটা এই যে যখন এই প্রদর্শন-নির্ভর জ্ঞানচর্চা চলছে তখন প্রদর্শনের ক্রিয়া কিন্তু প্রদর্শিত হচ্ছে না। প্রদর্শনের বাক্তি (subject)—অর্থাৎ

মানুষ—তখনো গৌণ ও অনুপস্থিত। তখনো ঈশ্বর জীবিত এবং মানুষ নামক ব্যক্তিটি তখনো মঞ্চে আবির্ভূত নয়। সে তখনো নাদেখবে। মানুষ তখনো এক সংহত, সুষম বিশ্বে অন্য প্রাণী ও বস্তুর একটি অংশ মাত্র। তার ভূমিকা শুধু মাধ্যমের। সত্যিকারের কোনো মানবশাস্ত্র বা বিজ্ঞান এই অবস্থায় সম্ভব নয়, কারণ মানুষ তখনো তার নিজের কাছে জ্ঞানের বস্তু (object) নয়, ব্যক্তি (subject)-ও নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষে এই ভাবধারা বা চিন্তাশৈলীর আমূল পরিবর্তন হল ইমানুয়েল কান্টের আবির্ভাবের পর। কান্টই প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝলেন যে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা সর্বতোভাবে অনিশ্চয় ও আকস্মিক ; এক তাণ্ডব (chaos), যেখানে অনিয়ম এমনই প্রবল যে কোনো মানুষই জানে না যে ঠিক পরের মুহূর্তে কী ঘটবে। এমতাবস্থায় কোনো জ্ঞান আহরণ আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই প্রশ্ন। কিন্তু অন্বেষণকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করলে দর্শনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটবে, সুতরাং জ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে জিইয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন অন্য এক পদ্ধতির। যা অনিশ্চয়ের তাণ্ডব, যা অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) তাকে মননের সাহায্যে উত্তরণ (transcend) করে জন্ম নিল এক সংশ্লিষ্ট অনুমান (synthetic *a priori*) পদ্ধতির যার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হইল।

বলা বাহুল্য, এই কান্টীয় পদ্ধতিতে মানুষী অভিজ্ঞতার বিশৃঙ্খল চরিত্রের কিছু-মাত্র বদল হল না, কিন্তু চিন্তা বা কল্পনাকে জিইয়ে রাখার ফলে জন্ম নিল আর এক নতুন 'এপিস্টেমে'র যার প্রভাব বৈপ্লবিক এই অর্থে যে এখন থেকে ঈশ্বরহীন বিশ্বে মানুষ আর স্বীকৃত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে একটি প্রাণী নয়। মানুষ এখন একাধারে ব্যক্তি (subject), কারণ তারই চৈতন্যের সাহায্যে ঐ সংশ্লিষ্ট অনুমান সম্ভব এবং অন্য ধারে সে তার নিজের জ্ঞানের অন্বিষ্ট বস্তু (object)। এই ব্যক্তি ও বস্তুর সন্নিপাতের আলোড়নকারী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে সারা উনিশ শতক ধরে ; জন্ম নিয়েছে এমন কিছু শাস্ত্র যা আক্ষরিক অর্থে মানবশাস্ত্র বা Sciences humaines, যথা মানুষের শরীরের বিজ্ঞান বা জীববিদ্যা ; তার শ্রমের বিক্রয়-যোগ্যতা বা অর্থনীতি ; তার প্রতি মুহূর্তের ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের বিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব (linguistics)। এ শাস্ত্রগুলি সবই উত্তর-কান্টীয় উনিশ শতকের নরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য চিন্তার ফসল। চিন্তার ইতিহাসে কোনো ধাপে ধাপে ক্রমিক অনবচ্ছেদ অগ্রসরতা নেই, যেমন নেই মানুষের ইতিহাসে। যুগের পর যুগ শুধু চিন্তার কাঠামোটাই বদলাচ্ছে কোনো অদৃশ্য নিয়তি বা কোনো ধারাবাহিকতাকে স্বীকার না ক'রে। মিশেল ফুকো-র গভীর অবিশ্বাস মানবীয় বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের বিজ্ঞানম্মন্যতায় (scientism)। যদিও আধুনিক মানুষ এটা জেনেছে যে সে আর বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপিত নয়, তথাপি এই নরকেন্দ্রিকতায় বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আধুনিক জ্ঞানচর্চা। তাঁর মতে এই 'নরত্বারোপণ (anthropologisation)' আমাদের কালে জ্ঞানের অভ্যন্তরে এক বিরাট বিপদ। 'এটা

সহজে বিশ্বাস করা যায় যে মানুষ তার নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছে এটা আবিষ্কার করা মাত্র যে সৃষ্টির কেন্দ্র সে নয়, সে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলও নয়, সম্ভবত সে সবকিছুর শীর্ষেও নয় এবং নয় জীবনের শেষ ; কিন্তু যদি সে বিশ্বের প্রভু নাও হয়, যদি সে অস্তিত্ব কেন্দ্রস্থলে প্রভুত্ব না-ও করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-বিজ্ঞান সমূহের মধ্যস্থতা বিপজ্জনক। [কথাসি সংস্করণ, পৃ ৩৫৯]। আধুনিক পজিটিভিস্ট-হিউম্যানিস্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, ইদানীং কালে, এটাই বোধহয় সবচেয়ে বলিষ্ঠ আঘাত।

এটা ঠিকই যে আধুনিক চিন্তায় মানুষ তার সীমিতাবস্থা — যাকে ফুকো বলেছেন *l'finitude* — সম্পর্কে যদিও অবহিত, এই জ্ঞান তার চিন্তাপদ্ধতিকে খুব বেশি বদলায় নি। অভিজ্ঞতার তাণ্ডব, আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে কিছু যুগ্মভাব। একেই ফুকো তাঁর 'মানুষ ও তার যুগ্মতা' (L'homme et ses doubles) শিরোনামের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিন শ্রেণীর যুগ্মকে ফুকো আধুনিক (উনিশ ও বিশ শতকের) চিন্তায় নিরূপিত করেছেন এবং সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) ও উত্তরণ (transcendence)।

(খ) ভাবুক ব্যক্তিসত্তা (cogito) ও অচিন্ত্য (impense ')।

(গ) আদির পশ্চাদ্ধাবন ও প্রত্যাবর্তন (La retraite et le retour de l'origine)।

ক. অভিজ্ঞতার উদ্দাম বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে উত্তরণ কাণ্টীয় দর্শনে ঘটান হয়েছে তারই চরম পরিণতি হয়েছে কঁৎ (Comte)-এর পজিটিভিজ্‌মে এবং হেগেল ও মার্কসের ইতিহাস-চিন্তায় — যার মধ্যে স্বাক্ষরিত রয়েছে ইতিহাসের মধ্যে ধরে নেওয়া এক নিয়তি। একে ফুকো বলছেন এক ধরনের eschatology, খৃষ্টিয় ধর্মতত্ত্বে দেহত্যাগের পর আত্মার উদ্গতি বা অধোগতি।

খ. বিশ শতকের গোড়ায় এলেন হুসের্ল, যিনি তাঁর ফেনোমেনোলজি-তে অভিজ্ঞতার তাণ্ডবকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেও, ভাবুক সত্তা (cogito)-র অস্তিত্বকে কণামাত্র খর্ব না ক'রে, জ্ঞানকে লঘুকরণ বা reduction-এর সাহায্যে সম্ভব করতে প্রচেষ্ট হলেন।

গ. তৃতীয় যুগ্ম এক অর্থে সর্বাপেক্ষা উদ্দীপক ও তার প্রভাবও সার্বভৌম। ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার কালে এটা ধরে নেওয়া যে ইতিহাস কোনো এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে শেষ হল — যেমন, হেগেলের মতে প্রাশিয়ান রাষ্ট্রে পরম সত্তার চরম পরিণতি, বা স্পেংলারের চিন্তায় পাশ্চাত্যের মহাসমাপ্তি, কিংবা এক ইতিহাস শেষ হয়ে আর এক আদর্শ ও ত্রুটিহীন ইতিহাস — মার্কসীয় চিন্তায় শ্রেণীবিহীন সমাজের — শুরু। এখানে আদি বা origin তার চরম পরিণতিতে শেষ হল বা আবার ফিরে গেল। অন্য দিকে, যার মূলে আছেন নীচএ, হোয়েল্ডারলিন,

হাইদেগার প্রমুখেরা, এক কাল্পনিক আদি সভ্যতা—যথা, প্রাক্-সক্রেটিক গ্রীক সভ্যতাকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা, যেখানে এবং শুধুমাত্র যেখানে সর্বাপেক্ষা সফল ও সার্থক মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব।

অর্থাৎ মানুষের সীমিতাবস্থার যে বিশ্লেষণ গত দু'শো বছরের পাশ্চাত্য চিন্তা করেছে তার মধ্যে আসল রক্তমাংসের মানুষেরা ও তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জটিলতা, যার অপনোদন অসাধ্য, তার কোনো প্রদর্শন নেই। আছে রাশি রাশি বিমূর্তন (abstraction) কিংবা বিভিন্ন ধাঁচের ইউটোপীয় স্বপ্ন। এখন ফুকো-র প্রশ্ন এই যে 'মানুষ' নামে কোনো প্রাণী আদৌ আছে কিনা [তদেব, পৃ ৩৩২]। এই প্রশ্নে আমরা স্বভাবতই বিচলিত বোধ করতে পারি। তার কারণ, ফুকো-র মতে, 'আমরা মানুষের সাম্প্রতিক প্রমাণে এমনই অন্ধ হয়ে গেছি যে আমরা এটা মনে পর্যন্ত রাখি না যে সামান্য কিছুদিন আগে এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবী ছিল, ছিল তার শৃঙ্খলা, ছিল মানুষেরা, কিন্তু ছিল না মানুষ' [তদেব, পৃ ৩৩৩]। এবং এই দীর্ঘ, চাঞ্চল্যকর বইয়ের শেষে উচ্চারিত হয়েছে ফুকো-র সেই উক্তি যার বহু ব্যাখ্যা ও বহুবিধ অপব্যাখ্যা হয়েছে। 'মানুষ একটি আবিষ্কার, যার জন্ম-তারিখ—যা আমাদের চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব সহজেই দেখায়—সাম্প্রতিক। এবং সম্ভবত তার সম্ভাব্য সমাপ্তি আসন্ন' [তদেব, পৃ ৩৯৮]।

আর একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক, জিল্ দলজ (Gilles Deleuze), যিনি উত্তর-আধুনিক চিন্তাকে বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন, বছর তিনেক আগে একটি বই প্রকাশ করেছেন মিশেল ফুকো-র উপর। এই বই থেকে আমি জেনেছি যে যখন 'শব্দরা ও বস্তুরা' প্রথম প্রকাশিত হয়, অনেক ফরাসি মনোবৈজ্ঞানিক বইটিকে অ্যাডল্ফ হিটলারের কুখ্যাত বই 'আমার সংগ্রাম' (***Mein Kampf***)-এর সঙ্গে তুলনা করেন[৫] সম্ভবত এই কারণে যে এখানে মানুষের শেষ সম্বন্ধে উচ্চারিত হয়েছে। এই ধরনের হঠোক্তি আর কেউ করেছেন বলে শুনি নি। কিন্তু বইটি যে বহুলোকের আত্মসন্তোষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যারা 'উন্মাদনার ইতিহাস' পড়ে সশব্দে হাততালি দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই বইটি প্রকাশিত হবার পর নিশ্চুপ হয়ে যান।

যাই হোক, রক্তমাংসের মানুষ বা মানুষদের কোনো সমাপ্তির কথা ফুকো বলেন নি। এই উক্তির কদর্থ করা অযৌক্তিক। ফুকো-র বন্ধু ও সমালোচক মিশেল দ স্যার্তো এ-ব্যাপারে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ফুকো 'মানুষের শেষ ঘোষণা করেন নি। ঘোষণা করেছেন মানুষ সম্পর্কে একটি ধারণার শেষ, যে-ধারণা ভেবেছিল যে মানবীয় বিজ্ঞানের পজিটিভিজমের সাহায্যে মৃত্যুর সমস্যাকে সমাধান করা যাবে।'[৬]

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মন্তব্যও এখানে উল্লেখ্য। বস্তুত, এ প্রবন্ধে জঁা পোল সার্ত্র-কে টেনে আনার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ, 'কাহু।বনা

গীত হয়, কিন্তু এ-মুহূর্তে সেটা হচ্ছে না। [এ-প্রসঙ্গে, অনেকদিন আগে শোনা একটি উক্তি আমার মনে পড়ছে, যার উল্লেখ আশা করি মার্জনীয় হবে। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা ; আমি তখন প্যারিসে ছাত্র। সরবোনের এক অধ্যাপক একটু বংকিম হেসে আমায় বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ছাত্রছাত্রীরা প্যারিসে পড়তে আসেন (অর্থাৎ তখন আসতেন) তাঁদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা যেনতেন প্রকারেণ অন্তত একবার সার্ত্র-কে তাঁদের থিসিসে আনবেনই ; এমন কি যদি গবেষণার বিষয়বস্তু হয় কর্নেই-এর নাটক বা ভলতেয়ারের চিঠি বা কেনেল-র উপন্যাস 'তেলেমাক্', সে-ক্ষেত্রেও সার্ত্র-এর উল্লেখ প্রায় পবিত্র কর্তব্য। অবশ্য এটা কুড়ি বছর আগেকার কথা যখন সার্ত্র-এর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।] যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে সার্ত্র-এর উল্লেখ ঠিক বিধিনিহিত মন্ত্রপাঠ নয়। ফুকো সম্পর্কে সার্ত্রে-র এমন কিছু বক্তব্য আছে যেগুলি জানা না থাকলে ফুকো-র পরবর্তী রচনার দু'একটি বক্তব্য সহজে বোধ্য হবে না। ১৯৬৬-তে ফুকো-র 'শব্দরা ও বস্তুরা' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সার্ত্র এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন 'ল' আর্ক' পত্রিকায় (*L'Arc*, Oct. 1966)। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে সে-মুহূর্তে বুর্জোয়ারা ঠিক যা খুঁজছিলেন—অর্থাৎ ঐতিহাসিক চিন্তার মূল্যহীনতা—ফুকো ঠিক সেটাই তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সার্ত্র-এর ধারণা, ইতিহাসকে আক্রমণের আড়ালে যে-ব্যক্তি ফুকো-র মূল আক্রমণের লক্ষ্য তিনি মার্কস, কারণ বুর্জোয়াদের শেষ প্রতিরোধ মার্কসের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, ইত্যাদি। ভ্যাঁসাঁ দেকম্ব (Vincent Descombe) বা মিশেল দ সার্তো প্রমুখ ব্যক্তিরা, যাঁরা পরে ফুকো-কে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা করেন, তাঁরাও সার্ত্র-এর এই উক্তিতে মুগ্ধ হতে রাজি হন নি। কারণ, সার্ত্র-এর ইতিহাসবোধ অবিমিশ্রভাবে উনিশ শতকী, অর্থাৎ ইতিহাস এখানে প্রায় রূপকথার সামিল।

যুদ্ধের পর, অস্তিত্ববাদের বহুলাংশ পরিত্যাগ ক'রে সার্ত্র যখন মার্কসবাদী হলেন তখন প্রচলিত, প্রগতী মার্কসবাদ তাঁর হাতে বদল হয়ে অন্য এক রূপ নিল। প্রথমে সার্ত্র এর সঙ্গে মেলালেন হিউম্যানিজ্‌ম, যে মিশ্রণ সে যুগের অনেক মার্কসবাদীকে পুলকিত করেছিল। কিছুদিন পরে, ষাটের দশকে, তাঁর 'দ্বান্দ্বিক যুক্তির সমালোচনা'য় (*La Critique de la Raison Dialectique*) হিউম্যানিজ্‌-মকে পরিত্যাগ ক'রে সার্ত্র আঘাত হানলেন হেগেলীয়-মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে—কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন মার্কসীয় শ্রেণী-চৈতন্য ও শ্রেণী-স্বার্থের ব্যাপারগুলোতে। উক্ত রচনায়, সার্ত্র-এর কয়েকটি আশ্চর্য উক্তি আছে, যথা শ্রেণী-চৈতন্য এমনই যে তার থেকে মুক্ত হওয়া বা নিজেকে শ্রেণী-চ্যুত (declass) করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তাই অষ্টাদশ শতকের অভিজাত বাড়ির বিখ্যাত ও কুখ্যাত লেখক মার্কি দ সাদ্ যিনি ফরাসি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন বা উনিশ শতকের ফ্লোবেয়ার যিনি

১৮৩৮-এর বিপ্লবকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, এঁরা কেউই নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করতে সমর্থ ছিলেন না, ইত্যাদি। এই অভিমতগুলো এমনকি অনেক মার্কসবাদীর কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। সাত্রীয় চিন্তা যখন এই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, তখনই প্রকাশিত হয় মিশেল ফুকো-র 'শব্দরা ও বস্তুরা'।

১৯৬৯-এ ফুকো প্রকাশ করেন তাঁর পরবর্তী রচনা 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' (*L'Archéologie du savoir*)। শীঘ্রই এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। • ফুকো-র অন্যান্য রচনাগুলির তুলনায় বইটি কিঞ্চিৎ নীরস। এর কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগুণ নেই, যা ফুকো-র অন্যান্য রচনায় আছে এবং কোনো উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিষ্কার করার কোনো প্রয়াস নেই। মূলত, বইটি একটি ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহারের মতো। অর্থাৎ, উত্তর-আধুনিক চিন্তায়, কিভাবে ইতিহাসকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা উচিত তারই একটি খসড়া। এখানেও ফুকো-র আলোচ্য যুদ্ধ বা শান্তি, দুর্ভিক্ষ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস ঠিক নয়, চিন্তার ইতিহাস।

এই রচনার নান্দীমুখে ফুকো আমাদের জানাচ্ছেন যে ইতিহাস বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি তা শুধু ঘটনাস্রোতের বিবরণ নয়, তার ধারাবাহিকতা ও তার মধ্য থেকে একটা সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি, একাধিক মানুষের সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ চিন্তার একত্ব, একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য বা পরিণতিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। এই ইতিহাস-চিন্তাই উনিশ শতকে চরমে উঠেছিল। সাম্প্রতিক, উত্তর-আধুনিক চিন্তায় সে-ইতিহাসবোধের নাভিশ্বাস উঠেছে। যুদ্ধোত্তর ইতিহাস-চিন্তা ঘটনার ক্রমান্বয়ে আস্থাহীন ও তার অন্তর্নিহিত কোনো সামূহিক তাৎপর্যে অবিশ্বাসী। যেখানে প্রাচীনরা দেখতেন ধারাবাহিকতা, আধুনিকরা সেখানে দেখছেন একটি ছেদ (interruption)-এর পর আর একটি ছেদ, যার মধ্যে নেই কোনো গূঢ় তাৎপর্য, নেই কোনো ক্রমিক প্রগতির ইঙ্গিত। এমন কি এক ছেদ থেকে আর এক ছেদে পৌঁছানর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক (causality)-ও নেই। উত্তর-আধুনিক চিন্তার প্রধান প্রবক্তা ফুকো এই বক্তব্যকেই আরো বলিষ্ঠ করেছেন তাঁর 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বে' যেখানে ধারাবাহিকতা পরিবর্তে তিনি এনেছেন ধারাহীনতা বা discontinuity-র ধারণাকে। তাঁর মতে 'ধারাহীনতা ছিল কালগত স্থানচ্যুতির কলংক (stigmate de l'espacement temporel), যাকে চেপে দেওয়া ছিল ঐতিহাসিকের কর্তব্য। সেই ধারাহীনতা এখন ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রধান উপাদান।'[৭]

চিন্তার জগতে এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য ফুকো কোনো বিশেষ কৃতিত্ব অবশ্যই দাবি করছেন না, কারণ এ-পরিবর্তন ফুকো-র আগেই ঘটতে শুরু করেছিল।

• Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (Trans. M. Sheridan Smith); New York, Pantheon. 1972.

দু'জন ফরাসি ভাবুকের কথা ফুকো উল্লেখ করেছেন। গাস্তঁ বাশলার (Gaston Bachelard), যিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কোনো ক্রমিক জ্ঞানার্জন আর সম্ভব নয়—এবং জর্জ কাঁগিলেম্ (Georges Canguilhem), যিনি প্রথম মহা-ইতিহাস (Macrospic history) ও কণা-ইতিহাস (Microscopic history)-এর পার্থক্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এই মহা-ইতিহাসই বিশ্ব ইতিহাসের রূপ নিয়েছিল, যার সূত্রপাত উনিশ শতকে এবং যা এই শতকে হেচ্ জি ওয়েল্স, টয়েনবি বা নেহেরু-তে এসে শেষ হয়েছে। ফুকো অবশ্য এঁদের কারো নাম উল্লেখ করেন নি; এমন কি, এ-প্রসঙ্গে হেগেলেরও নয়। কিন্তু যারা অণু-ইতিহাস বা microscopic history-র অনুশীলক, যথা লরোয়া লাদুরি, ফার্না ব্রোদেল, মার্ক ব্লখ প্রমুখদের কথা ফুকো অন্য প্রসঙ্গে সোৎসাহে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস-চিন্তার এই পরিবর্তন যদিও ঘটেছে, কিন্তু সেটা রাতারাতি হয় নি।

ফুকো-র মতে আমরা অনেকেই পুরনো বিশ্বাসে প্রোথিতমূল; আমরা উৎসের সন্ধানে এমনই অভ্যস্ত, বিবর্তনের গতি ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যরূপ (teleology) আবিষ্কারে এমনই উন্মুখ যে আমাদের এক বিশেষ বিরূপতা আছে ইতিহাসের ধারাহীনতা, পার্থক্য ও বিক্ষেপণ (dispersion) লক্ষ করার ব্যাপারে। ইতিহাস এতদিন একাধারে ছিল নৃতত্ত্ব (anthropology) বা মানুষের বিজ্ঞান, ও অন্য ধারে ব্যক্তির (subject) প্রাতিস্বিক স্বরাটত্ব। ফুকো-র মতে নতুন ইতিহাস-চিন্তার ইঙ্গিত আছে কার্ল মার্কস ও ফ্রিড্রীশ নীচএ-র রচনায়। যদিও মার্কসীয় চিন্তা হেগেলীয় অধিবিদ্যা (metaphysics) থেকে মুক্ত নয়—এবং সেটা ফুকো জানেন—কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস-চিন্তাকে মার্কসই প্রথম কেন্দ্রচ্যুত (decenter) করেন উৎপাদনের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে। এখানে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে, যেমন ব্যাহত হয়েছে নীচএ-র ইতিহাসকে সরিয়ে দিয়ে বংশানুচরিত (Geneology)-এর প্রয়োগে। নীচএ তাঁর যৌবনে লিখিত 'ইতিহাসের শুভ ও অশুভ প্রয়োগ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে হেগেলীয় ইতিহাস-চিন্তাকে সমালোচনা করে এর অন্তর্নিহিত বিপদকে পরিস্ফুট করেন। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অসময়ের বিবেচনা' (Unzeitgemasse Batrachtungen) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ-সংকলনে। কিন্তু প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ খুবই সহজপ্রাপ্য[৮] এবং উত্তর-আধুনিক চিন্তায় উৎসাহী ব্যক্তিদের অবশ্যপাঠ্য, কারণ-এর সাম্প্রতিক প্রভাব প্রচণ্ড। মার্কস ও নীচএ-র চিন্তার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু তাঁরা দু'জনেই অষ্টাদশ শতকের বৈধ সন্তান যুক্তিশীল ব্যক্তির স্বরাটত্বকে ধূলিস্যাৎ করেছিলেন।

নীচএ-র চিন্তা যেমন তাঁর ভক্ত ও শত্রুদের হাতে পেয়েছে প্রচুর অপব্যাখ্যা, ঠিক তেমনই এখানে ফুকো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মার্কসকে সাজানো

হয়েছে 'সামূহিকতার ঐতিহাসিক' (historien des totalités) হিসাবে ও তাঁকে হিউম্যানিস্ট-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখানে সার্ত্র-এর কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে তিন বছর আগে, ১৯৬৬ তে, যে-আক্রমণ সার্ত্র করেছিলেন ফুকো-র বিরুদ্ধে, তারই জবাব এখানে মিলছে। মার্কসবাদ ও হিউম্যানিজ্‌মের সম্মেলন যে প্রায় অসম্ভব তার আলোচনা এ-প্রবন্ধে অবান্তর হবে। এঙ্গেল্‌স তাঁর 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বে' এটা পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন যে যদিও মানুষ যে কোনো মানবেতর প্রাণীর চেয়ে বুদ্ধি ও চৈতন্যের গুণে শ্রেয় হতে পারে, কিন্তু মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ও তার ইতিহাস প্রকৃতির ইতিহাসেরই একটা অংশ মাত্র।[৯] এঙ্গেল্‌সের বিরুদ্ধে সার্ত্র-এর দীর্ঘস্থায়ী উষ্মার কারণ নির্ণয় করা শক্ত নয়।

যদি উত্তর-আধুনিক চিন্তায় পুরাতন ইতিহাস-চিন্তা তামাদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজন এক নতুন চিন্তার ও পদ্ধতির। এই নতুন পদ্ধতিকেই ফুকো তাঁর এই বইয়ে আখ্যা দিয়েছেন 'প্রত্নতত্ত্ব'। প্রত্নতাত্ত্বিক কারা? যাঁরা প্রাচীন, অবলুপ্ত সভ্যতার সামান্য কিছু প্রোথিত ভাস্কর্য, স্থাপত্য, তৈজস খুঁড়ে বার করে ঐ সভ্যতার চরিত্র-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু মহেঞ্জোদারো থেকে সুমেরীয় সভ্যতা কিংবা মিশর থেকে রোমক সভ্যতার মধ্যে কোনো অন্তঃশীলা ধারা-বাহিকতা নেই। কিন্তু তাতে কিছুসংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের তাৎপর্যের সন্ধান বা ধারাবাহিকতার অন্বেষণ কিছু লোপ পায় নি এবং এটা ফুকো-র মতো শক্তিত ব্যক্তির কাছে অজানা নয়। আমি এ-কথা পূর্বেই বলেছি যে ফুকো-র এই রচনায় কোনো উদাহরণ নেই। কিন্তু কীভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে ঘুমড়ে, তাকে উনিশ শতকী ইতিহাস-চিন্তার কাজে লাগান হয়েছে তা পরিষ্কার করার জন্য নজির হিসাবে আমি এক বিখ্যাত ব্যক্তির একটি প্রসিদ্ধ বই থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি। এই বিশেষ বইটি বেছে নেওয়ার কারণ এই যে এক কালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এ-বইটি খুব পড়তেন ও আমাদের ছাত্রাবস্থায় বইটি কলকাতার যত্রতত্র বিক্রি হতে দেখেছি। খুব সন্তর্পণে এটা বলা যেতে পারে যে সেযুগে এই বইটি না পড়া থাকলে বুদ্ধিজীবী আখ্যা পেতে বিলম্ব হতো। বইটি গর্ডন চাইল্ডের ***What Happened in History***; এবং এর প্রারম্ভেই চাইল্ড অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর বক্তব্য ও অভিপ্রায় আমাদের জানাচ্ছেন :

> ***Aided*** by archeology, history with its prelude pre-history becomes a ***continuation*** of natural history.…And archeology can trace ***the same process*** in historical times, with the additional aid of written records as well in regions where

the dawn of written history has been retarded. *Without any change of method*, it can follow down to the present day the working out of trends discerned already in pre-history.[১০]

[বাঁকা হরফ আমার]।

বক্তব্যগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের কোনো স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা নেই। তার কাজ ইতিহাসকে সাহায্য করা; সে প্রাগেতিহাস ও ইতিহাসের মধ্যেকার একটা বিশেষ ধাপ মাত্র, বা সার্বিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ধারাবাহিকতা বা ক্রমায়াতের (continuation) অংশ মাত্র। অর্থাৎ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পদ্ধতি একই। গর্ডন চাইল্ড ছিলেন বিশ শতকের মানুষ, কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্যগুলি উনিশ শতকী, উত্তর-হেগেলীয় চিন্তার তলানি। এবার দেখা যাক ফুকো-র প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তা কি ভাবে ও কতটা বিপরীত।

এই পর্যন্ত এসে সাময়িকভাবে আমার প্রযুক্তি বদল করছি। এ যাবৎ আমি মিশেল ফুকো-র মূল ফরাসি রচনাগুলির উপর নির্ভর করছি এবং তার কারণ পণ্ডিতম্মন্যতা ভাবলে ভুল হবে। অনুবাদ সর্বদা আস্বাদযোগ্য ও নির্ভুল নয়। এমনকি, ফুকো-র চলতি ইংরেজি অনুবাদে মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়েছে।[১১] কিন্তু যেহেতু আমার নিজের বঙ্গানুবাদ সর্বদা সুষম নয় এবং যেহেতু গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন ইংরেজিতে, তাঁর সঙ্গে ফুকো-র পার্থক্য ও বৈপরীত্যকে দেখানর জন্য আমি শেরিডান স্মিথের ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি।

যে উনিশ শতকী পদ্ধতিকে চাইল্ড উপরোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে হাজির করেছেন তাকে সরাসরি উল্টে দিয়েছেন ফুকো। পরিত্যাগ করেছেন ঐতিহাসিক সময়ের অন্তর্নিহিত 'same process'-কে। ফুকো বলছেন : 'It might be said, to play on words a little, that in our time history aspires to the condition of archeology, to the intrinsic description of monuments.' [*The Archeology of Knowledge*। বৃটিশ সংস্করণ, পৃ ৭]। এই গ্রন্থের শেষার্ধে বক্তব্যটি আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। ফুকো-র মূল সমস্যা এখানে চিন্তার ইতিহাস এবং সেকথা ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। চিন্তা গড়ে ওঠে শব্দ, উচ্চারিত ও লিখিত উক্তি দিয়ে। খুঁড়ে পাওয়া ভাস্কর্যের মতো এই অতীত উক্তিগুলি গাঢ় ও অস্বচ্ছ। ফুকো-র মতে 'Archeology does not seek to rediscover the continuous, insensible transition that relates discourses on a gentle slope, to what precedes them---,' এবং এই প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির পশ্চাতে কোনো স্পন্দনশীল ব্যক্তি (subject)-র ভূমিকা নেই ; 'The authority of the creative subject, as the *raison d'etre* of an *oeuvre* and the principle of its unity, is quite alien to it.' [তদেব, পৃ ১৩৮–১৩৯]।

পার্থক্যটা শুধু গর্ডন চাইল্ড ও মিশেল ফুকো-র মধ্যেকার নয়, এটা গতকাল ও আজকের নতুন চিন্তার অসেতুসম্ভব পার্থক্য। আমরা যাকে জ্ঞান বলতে অভ্যস্ত তা সম্ভব হয়েছে ভাষণের (discourse) সাহায্যে। এখানে অবশ্যই 'ভাষণ' শব্দের অর্থ বক্তৃতা নয়। সুচারুভাবে লিখিত বা উচ্চারিত যুক্তিনির্ভর বক্তব্য। এই ভাষণ গড়ে ওঠে রাশি রাশি উক্তি (statement)-র সাহায্যে। এই গ্রন্থে মিশেল ফুকো উক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছেন তা খুব সহজবোধ্য নয়। ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে, কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ ফুকো যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন এবং যা পরে 'ভাষণের শৃঙ্খলা' (*L'ordre du discours*) নামে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে এই 'উক্তি'র ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়েছে।

যে কোনো সামাজিক মানুষকে নিয়ত রাশি রাশি বাক্য ব্যবহার করতে হয় জীবনধারণের জন্য। ধরা যাক এমন একটি বাক্য 'আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাব'। এটি এমন এক বাক্য যা শোনা মাত্র যে কোনো সমভাষী ও একই সংস্কৃতির শ্রোতা এর অর্থ বুঝবেন। এর কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই এবং এই বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার পর, এর অর্থ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এটি চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছে। এই ধরনের বাক্যকে বৃটিশ বা মার্কিন দার্শনিকরা বলেন 'বাচনিক ক্রিয়া' (speech act)। প্রতিটি বাচনিক ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য আছে; এমন কি আর এক ধাপ উপরে উঠলে, অর্থাৎ পুরাকালের যাগ-যজ্ঞ, হোম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রাজন্যবর্গ বা শাসকদের বিধিনিষেধ, এ সবই ছিল কোনো বিশিষ্ট ক্রিয়া বা আজ্ঞার বাহক। প্রাচীন গ্রীসের উদাহরণ দিয়েছেন ফুকো তাঁর এই উদ্বোধনী বক্তৃতায়[১২]। সেই সময়ে উচ্চারিত বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থের কোনো দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতো না, কারণ তা ছিল পুরোহিত, রাজন্য-শাসকদের বাক্য। কিছু দিন—এক শতাব্দী—পরে ঐ বাক্যগুলির শক্তি লুপ্ত হবার পর হয়ে দাঁড়াল উক্তি। যেটা এখানে ফুকো বোঝাবার চেষ্টা করছেন সেটা এই যে যাগ-যজ্ঞ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভাষা কিভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী কালে বিমূর্ত দার্শনিক বক্তব্যে রূপান্তরিত হয়ে অর্থহীন হয়ে ওঠে। হেসিয়োড থেকে প্লেটো পর্যন্ত ভাষার এই ক্রমিক চরিত্র-বদলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রথমে দর্শন ও পরে নানা জ্ঞান। এটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারতে বৈদিক যজ্ঞের ঋত্বিক ও শাসকবর্গের ভাষাও পরে বেদান্তের বিমূর্ত উক্তিতে বদলেছিল।

এক এক যুগে এই উক্তি কীভাবে কাজ করে তা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন সেই যুগের ভাষণের ক্রিয়া-পদ্ধতি—যাকে ফুকো বলছেন la pratique discursive (বা the discursive practice)—সম্পর্কে ধারণা। 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বের' এটা একটা প্রধান বক্তব্য। ইতিহাস সম্পর্কে কোনো সামূহিক জ্ঞান আর সম্ভব নয়, কিন্তু যা সম্ভব তা হল এক একটি বিচ্ছিন্ন যুগ বা কালের ব্যবহৃত ভাষণ সম্পর্কে

এক বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। এই ভাষণ পুরোপুরি নিরবলম্ব নয়; তা গড়ে ওঠে ঐ সময় বা যুগের অন্যান্য শক্তির—যথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির—সম্পর্কে। ভাষণের ক্রিয়া-পদ্ধতি ও ঐ শক্তিগুলির মিলনে প্রস্তুত হয়, যাকে ফুকো বলছেন 'এপিস্টেমে'। এক অর্থে, অন্তত আংশিকভাবে। ফুকো-র এই প্রত্নতত্ত্ব ঐতিহাসিক। কিন্তু প্রচলিত, অর্থাৎ উনিশ শতকী, অর্থে ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এর কারণ, এর থেকে যে কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, কার্যকারণ সম্পর্ক বা কোনো নিশ্চয়তা বিচ্ছিন্ন। মিশেল ফুকো এই পদ্ধতিকে তাঁর পরবর্তী রচনায় সর্বাংশে প্রয়োগ করেছেন কিনা সেটাই এখন আলোচ্য।

মিশেল ফুকো যখন 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' রচনার কাজে হাত দেন তখনই তাঁর এ-প্রত্যয় ছিল যে কোনো একটি নির্দিষ্ট যুগের 'এপিস্টেমে'-কে বোঝার জন্য শুধুই বাচনিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। জীবনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সমস্যা-গুলির—যথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির—সঙ্গে এই ভাষণের যোগাযোগ আবিষ্কার অপরিহার্য। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলোকে ফুকো ও তাঁর টীকাকাররা আখ্যা দিয়েছেন অ-ভাষণিক বা non-discursive উপাদান। বস্তুত, ভাষণিক ও অ-ভাষণিকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাই 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্বে' করা হয় নি—শুধু এর ইঙ্গিত আছে মাত্র। ফুকো-র সমালোচকদের এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে ফুকো-র এ-বইটি মূলত তাত্ত্বিক বা theoretical, সুতরাং উপলব্ধ প্রত্যয়ের যদি কোনো প্রয়োগ এ-বইয়ে না হয়ে থাকে তার জন্য বইটির মূল্যের কোনো হ্রাস হয় না।

তাঁর পরবর্তী রচনায় ফুকো তাঁর রীতি ও প্রযুক্তি বহুলাংশে বদলেছেন। ১৯৭৫-এ প্রকাশিত হয় ফুকো-র আর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই 'নজর ও শাস্তি' (Surveiller et punir) * যা অনেকের মতে এবং আমারও তাই ধারণা, ফুকো-র সবচেয়ে সমৃদ্ধ রচনা। এ-বইটি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করার আগে বইটির রচনাকালে ও ষাটের দশকের শেষের ফরাসি মননশীলতা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ফরাসি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মার্কস-বাদের প্রতি আকৃষ্ট হন; এঁদের মধ্যে আঁদ্রে জীদ ও আঁদ্রে মাল্‌রোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দ্বিতীয় যুদ্ধের গোড়ায় হিটলার-স্ট্যালিন চুক্তি ও স্ট্যালিন কর্তৃক কমিনটার্ন ভেঙে দেওয়ার পর এঁরা প্রায় সকলেই মার্কসবাদে আস্থাহীন

*Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of Prison* (Trans. A. Sheridan), New York, Pantheon, 1977.

হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যখন স্ট্যালিনের বহুবিধ পাপাচার ও নৃশংসতার কাহিনী পাশ্চাত্যে আসতে শুরু করল — যে-সকল কাহিনীর দলিল সোভিয়েট ঐতিহাসিকরা এখন খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করছেন — ফ্রন্সদী মার্কসবাদে নতুন ক'রে আস্থা ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয় নি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের আর্থিক অনটন, মার্কিন মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা ও তজ্জাত আমেরিকান ঔদ্ধত্য ও এবম্বিধ নানা কারণে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মার্কসবাদের প্রতি অন্তত আংশিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন ও নিজেদের বামপন্থী হিসাবে ভাবতেন। তখন থেকেই অনেকেই মার্কসবাদকে পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ক'রে বদল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জঁা পল সার্ত্র, মরিস মার্লো পন্তি প্রমুখেরা। যদিও ফুকো-র কমিউনিস্ট বন্ধু ছিল একাধিক ও যদিও সার্ত্র-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোনোদিনও খারাপ হয় নি, ফুকো কোনোদিনই এই নয়া-মার্কসবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন না এবং তাঁর যে সকল রচনা আমি এ-প্রবন্ধে এ-যাবৎ আলোচনা করেছি তার থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে মার্কসবাদের কয়েকটি মূল বা কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল দুস্তর।

১৯৬৮-তে ফ্রান্সে ঘটে বিরাট ছাত্র-আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে ফরাসি বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর অভ্যন্তরে কণামাত্র পরিবর্তন ঘটে নি, দ গলের পদত্যাগ সত্ত্বেও। যে সকল বিদেশী সে-সময় ফ্রান্সে ছিলেন বা যাঁরা ঐ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে সেখানে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের কাছে ঐ আন্দোলন একটা সাময়িক রাজনৈতিক প্রহসন ছাড়া আর কিছু ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ঐ আন্দোলন তৎকালীন ফরাসি বামপন্থী চিন্তাকে, অন্তত কিছুদিনের জন্য, গভীরভাবে নাড়া দেয়। ঐ আন্দোলনের ফলে একটা সত্য উদ্‌ঘাটিত হল যে সরকারী বা রাষ্ট্রিক দমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার শুধু সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীরই নয় — একমাত্র যে-শ্রেণীর কথা বারবার ফ্রন্সদী মার্কসবাদে বলা হয়েছে — এ-বিদ্রোহের অধিকার ও দায়িত্ব সমাজের অন্যান্য শ্রেণীভুক্তদেরও আছে। যথা — ছাত্র, শিক্ষক, আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী, এমন কি হাসপাতালের নার্স ইত্যাদিও, অর্থাৎ মার্কস-নির্ণীত ডায়ালেটিক্‌স বা দ্বন্দ্বের বাইরেও এমন কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটতে পারে যার কোনো তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রভাব সহজে প্রতীয়মান না হলেও যা অন্তত কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে নতুন সামাজিক বা রাজনৈতিক চিন্তায় প্রবুদ্ধ করতে পারে। র‍্যাল্ফ স্মার্ট, মার্ক পোস্টার প্রমুখ বৃটিশ ও মার্কিন বামপন্থীরা যাঁরা অন্তত সীমিত অর্থে এখনো মার্কসবাদী ও ফুকো-র অনুরাগী, তাঁরা ঐ '৬৮-র ছাত্র-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ও তাঁদের নয়া-মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে ফুকো-র শেষ রচনাগুলির ব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে দলে টানতে প্রচেষ্ট হয়েছেন। এ-ব্যাপারে কোনো বিস্তারিত আলোচনা

অবান্তর[১৩]। তাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লিখিত হল শুধু এই কারণে যে এটা খুবই সম্ভব যে মিশেল ফুকো ১৯৬৮-র আন্দোলনে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং যে নিস্পৃহ প্রত্নতাত্ত্বিকতা তাঁর পূর্ববর্তী রচনাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তা থেকে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্ত হন তাঁর পরবর্তী 'নজর ও শাস্তি'র মধ্যে। কিন্তু ফুকো প্রচলিত উদারপন্থী অর্থে বা মার্কসীয় অর্থে ইতিহাসে আর ফিরে যান নি। যে-পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এই নতুন লেখার চেষ্টা করেন তাকেই তিনি বলেছেন বংশানুচরিত (genealogy)। এ-পদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রথম অনুশীলক ফ্রিডরিশ নীচএ, যাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ প্রবন্ধ 'নৈতিকতার বংশানুচরিত'[১৪] ফুকো-র শেষ দিকের লেখার পদ্ধতিকে গভীরভাবে অনুপ্রেরিত করে। এ-পদ্ধতি যে কোনো—হেগেলীয় বা মার্কসীয়—ডায়ালেকটিকাল বা দ্বান্দ্বিক চিন্তা থেকে একেবারেই বিভিন্ন। ডায়ালেকটিক্সে আকস্মিকতা, দুর্জ্ঞেয়তা বা সন্দেহ, অবিশ্বাস বা কোনো আশাতীত দুর্বিপাকের স্থান নেই। এই চিন্তা এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ (teleology)-এর মধ্যে প্রনিহিত।

প্রতি যুগে এক একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের চাপে বহুলাংশে (কিন্তু সর্বাংশে নয়) ধ্বংস হয়ে আরো উন্নত কোনো অবস্থায় পৌঁছায়। ঐ উন্নত অবস্থা পুনরায়, নির্দিষ্ট সময়ে, তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিতে ভেঙে বদলায়। এই গতি নিরন্তর ও শাশ্বত, এর মধ্যে পার্থক্য বা বিভিন্নতার কোনো স্বকীয় অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তা অবশ্যম্ভাবী সংশ্লেষে (synthesis) সামূহিক বাস্তবের সঙ্গে একীকৃত হতে বাধ্য। বংশানুচরিত পদ্ধতিতে কোনো উদ্দেশ্যবোধ নেই; নেই কোনো ক্রমিক অগ্রগতির ইঙ্গিত। এখানে পার্থক্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। নীচএ-র গৃহীত পদ্ধতিতে বিশ্লেষক বর্তমান পরিস্থিতির বিচার দিয়ে শুরু ক'রে অতীতে ফিরে যান; পরীক্ষা করেন কীভাবে তথাকথিত অনগ্রসর, আদিম সমাজব্যবস্থায় একই ধরনের নৈতিকতা, বিধিনিষেধ, সামাজিক বা ধর্মীয় রীতিনীতির প্রয়োগ-পদ্ধতি ছিল; তিনি ফিরে আসেন আবার আধুনিক বা বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং চেষ্টা করেন এটা দেখাবার যে কীভাবে নৈতিকতা, আইন বা শাসন-পদ্ধতি একই—যদিও অতীত ও বর্তমানের পার্থক্য রয়েছে অটুট। এই পদ্ধতি অনেকের—বিশেষত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের—আত্মসন্তোষকে ভেঙে দিয়েছে এই কারণে যে যদিও যুগ ও সংস্কৃতির পার্থক্য অসীম, কিন্তু যাকে ফুকো বলছেন 'ক্ষমতার প্রয়োগ-পদ্ধতি' (technology of power) বহুলাংশে এক। এবার দেখা যাক, তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ, অস্বস্তিকর কিন্তু সুখপাঠ্য 'নজর ও শাস্তি'তে এ-পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি এ-ব্যাপারে কতটা সফল হয়েছেন তা পরে আলোচ্য।

১৭৫৭-তে ফরাসি নাগরিক (বা প্রজা) রবেয়ার ফ্রাঁসোয়া দামিয়াঁস (Robert-Francois Damiens) একটি শাণিত ছুরির সাহায্যে তৎকালীন ফরাসি রাজা

পঞ্চদশ লুই (Louis XV)-কে হত্যার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা সফল হয় নি, কিন্তু সে যুগের আইনের চোখে রাজহত্যা ও তার প্রচেষ্টা এ-দুইই এক। অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সঙ্গে দামিয়াঁসের দেহকে শারিক্ষিষ্ট ক'রে, তাকে জীবন্ত দাহ করা হয় প্যারিসে। এই দৈহিক উৎপীড়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে ফুকো-র 'নজর ও শাস্তি'। বিবমিষার উদ্রেককারী এই বর্ণনা — যা ফুকো উদ্ধার করেছেন একটি পুরনো দস্তাবেজ থেকে —অনেক আধুনিক ব্যক্তিকে হয়ত বিব্রত করবে। কিন্তু এই ঘটনা বা নিদারুণ শাস্তির মধ্যে আইনগত যুক্তির অভাব ছিল না। যদি রাজা হয় জাতির শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতীক ও সমাজ-কলেবরের রূপক, তাহলে সেই কলেবরের উপর আঘাতের শাস্তি হতে পারে অপরাধীর দেহকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ক্লেশ দিয়ে ধ্বংস করা। এ-যুগ অবশ্যই চিরস্থায়ী ছিল না। এল যুক্তির যুগ ও চোখ ধাঁধানো আলো ও ফরাসি বিপ্লব। আর সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হল রাজতন্ত্র ও নৃপতির প্রতীক-মূল্য। দার্শনিক, ভাবুক, সমাজ-সংস্কারকরা ইতিমধ্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন অপরাধীদের সাধারণ্যে শাস্তি না দিয়ে, তাদের ধ্বংস না ক'রে, ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনে, সংস্কৃত ক'রে, সমাজে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায়। লক্ষ করুন যে আইন-চিন্তার এই বদলের ফলে, শরীর থেকে গুরুত্ব সরে যাচ্ছে মনে, আধ্যাত্মিকতায়, যুক্তিতে।

রাজতান্ত্রিক আইনে শাস্তি, এমনকি প্রাণদণ্ড, হতো সাধারণ্যে। সেটা ছিল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, বা নৃপতির স্বরাটত্বের অনুষ্ঠান। কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্সে, যুক্তির প্রোজ্জ্বল আলোয়, সাধারণতন্ত্রের নতুন সংবিধানে কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতা তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বদলাল। বলা বাহুল্য, মিশেল ফুকো এখানে, এই গ্রন্থে, সাড়ম্বরে আইনের ইতিহাস লিখতে বসেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য নয় আইনগত চিন্তায় কোনো বিবর্তন আবিষ্কার করা। বরং উল্টোটাই ; অর্থাৎ বিবর্তনের অনুপস্থিতি। কীভাবে এক এক যুগে জ্ঞান ও চিন্তা, যার প্রকাশ হয় উচ্চারিত কিংবা লিখিত ভাষণে, সেই যুগের আইন ও ক্ষমতাকে সমর্থন জানায় এবং গড়ে তোলে এক একটি ক্ষমতার যন্ত্রকে। বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত — সেই যুক্তি ও মানব-হিতৈষণার যুগে, ক্ষমতার এক নতুন তন্ত্র গড়া হল, যার নাম 'প্যানঅপটিকন' (Panopticon), যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ 'সর্বদ্রষ্টা'। এই যন্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন মহাপ্রাণ জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham, 1748-1832)। এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না যে পথভ্রষ্ট, আইন ভঙ্গ-কারী, হতভাগাদের দুঃখ ও দুর্দশায় এঁর হৃদয় সতত বিগলিত থাকত ; কীভাবে এই দুর্ভাগা অপরাধীদের ক্ষমতার আয়ত্তে এনে তাদের আবার সমাজে ফিরিয়ে এনে নতুন জীবন দেওয়া যায়, সম্ভবত এটাই ছিল ঐ বরেণ্য পুরুষের শিরঃপীড়া। অষ্টাদশ শতকের শেষে, ইংরেজ বেন্থাম 'প্যানঅপটিকন' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। সমগ্র রচনাটি একটি নতুন ধাঁচের কারাগারের পরিকল্পনা। ফুকো-র

রচনায়, বেন্থামের পরিকল্পনার যে-চিত্র পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে এই : একটি বিশাল গোলাকৃতি কারাগার ; ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি মিনার, যাতে থাকবে অনেক জানলা যা দিয়ে দেখা যাবে গোলাকৃতি অংশ বা বৃত্তের ভিতর দিকের সবকিছু। বৃত্তাকার বাড়িতে থাকবে রাশি রাশি শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট ঘর বা 'সেল'। প্রতিটি সেল-এ দু'টি জানলা—একটি মিনারের দিকে, অপরটি বাইরের দিকে—সূর্যালোকের জন্য। এই সেল বা ছোট ঘরগুলিতে থাকবে অপরাধীরা, আর মিনারে থাকবে এক বা একাধিক লোক যে বা যারা নজর রাখতে পারবে প্রতিটি সেল-এ, জানতে পারবে কোথায় কী ঘটেছে, কিন্তু যাদের কেউ দেখতে পাবে না। এক বা কয়েক জোড়া চোখ, ক্ষমতার প্রতীক, অন্তহীন-ভাবে আয়ত্তে রাখবে সমাজবিরোধী, আইনভঙ্গকারীদের উপর। বেন্থামের রচনায় একটি নক্‌শাও ছিল, যা ফুকো অন্য কিছু নক্‌শার সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর বইয়ে —যার ফোটো কপি আমি এ-সঙ্গে দিলাম।

নক্‌শা 'ক' দেখুন। এই পরিকল্পনার প্রতীকত্ব গভীর এবং এর তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নজরদাতা ক্ষমতা এখানে অদৃশ্য ও আকারহীন। ফুকো বলেছেন যে 'ব্যবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ক্ষমতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক করে' (automatise et désindividualise) [১৭]। ক্ষমতা থেকে ব্যক্তির উপস্থিতিকে সরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে ফুকো একটি ইন্টারভিউয়ে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন, যা আমরা কিছু পরে বিবেচনা করব ; যেটা এ ক্ষেত্রে এখন লক্ষনীয় তা এই যে যুক্তির যুগ অষ্টাদশ শতকে যা মানবপ্রেমের প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তা মূলত একটা বিশাল দানবীয় যন্ত্র মাত্র। এবং বেন্থামের ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা উনিশ শতকব্যাপী ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কারাগার প্রস্তুত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বেন্থামের আদি পরিকল্পনা ধীরে ধীরে আরো উন্নত, আরো কার্যকর শাসন ও নজরের যন্ত্রে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে গঠিত একটি প্যানঅপটিকনের পরিকল্পনা এখানে দেওয়া হল। নক্‌শা 'খ' দেখুন। এটি ১৮৪০-এ আরু রমঁ্যা (Harou Romain) কর্তৃক প্রকাশিত একটি বইয়ে ছাপা প্যানঅপটিকনের নক্‌শা। দেখলেই বোঝা যায় কীভাবে বেন্থামীয় কল্পনার সারাংশ উনিশ শতকেও অটুট ছিল। কোন সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থার চাপে রাজতন্ত্রের মৃত্যুর পর বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে অপরাধীদের শাস্তির এই ভয়ানক ও সর্বগ্রাহী ব্যবস্থা নেওয়া হল তার কোনো বিশদ ব্যাখ্যা ফুকো-র এই রচনায় নেই।

ফুকো সহজ ব্যাখ্যাকরণে অনীহ, এ-অভিযোগ বারবার ফুকো-র বিরুদ্ধে এসেছে এবং সে অভিযোগ সর্বাংশে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু যে কোনো ব্যাখ্যার কাজে অতি জটিল সমস্যা বিপজ্জনকভাবে সরল হয়ে উঠতে পারে, আর সেই সঙ্গে দেখা দিতে পারে সমূহকরণের (totalising) প্রলোভন। যদিও ফুকো সে-প্রলোভন পুরোপুরি

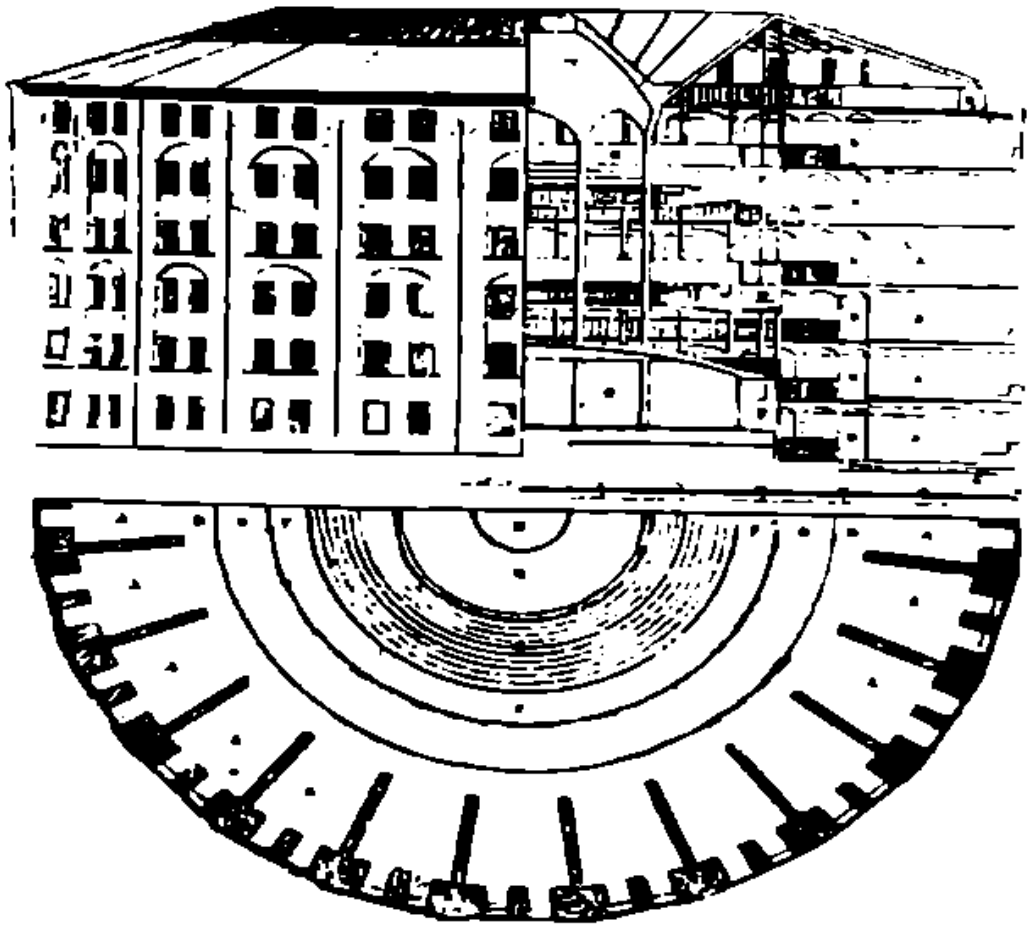

নক্‌শা 'ক' / জেরেমি বেন্থামের সমগ্র রচনাবলির (বাউরিং সংস্করণ)
চতুর্থ খণ্ডে প্রাপ্য 'প্যানঅপ্‌টিকন'-এর নক্‌শা।

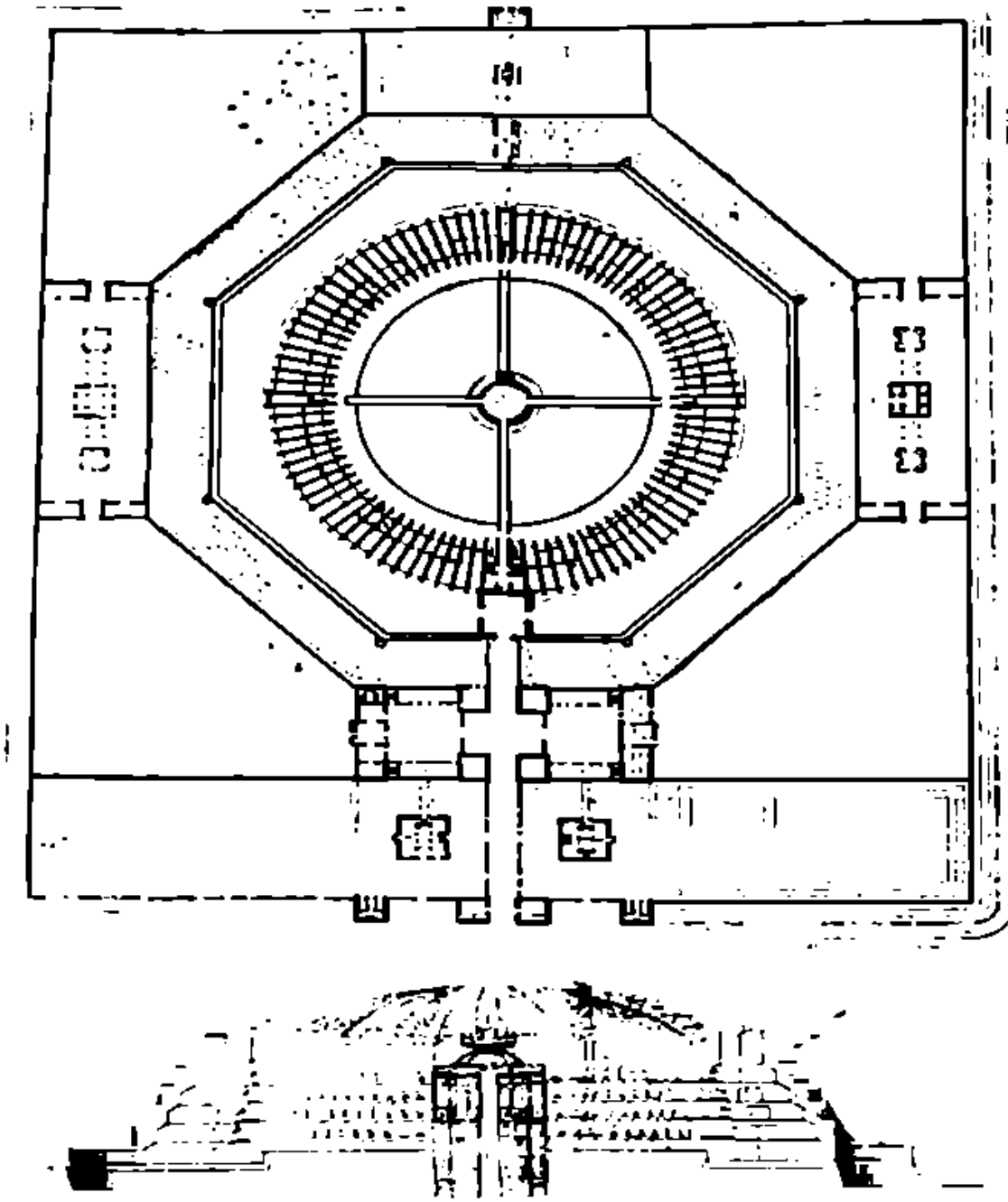

নকশা 'খ' / আঁক-রম]1-র Projects de Pénitenciers (1840)-এ
প্রস্তাবিত কারাগারের নকশা।

এড়াতে পারেন নি এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত যে তাঁর এই রচনায় নেই তাও নয়।

রাজতান্ত্রিক শাস্তির উন্মুক্ত অনুষ্ঠান থেকে বুর্জোয়া শাসন-পদ্ধতির গোপন মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচারে রূপান্তরকে ফুকো পুঁজিবাদী অর্থনীতির আরো উন্নত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক সামূহিকতা দেখা দিয়েছে দু-একবার। যেমন ধরুন ফুকো-র নিম্নলিখিত মন্তব্য। বেন্থামের প্যানঅপটিকন বা সর্বদ্রষ্টা কাঁভাবে আমাদের আধুনিক সমসামাজিক সমাজের মানুষদের ক্রমাগত শাসনে রাখছে এবং সমাজে সার্বিকভাবে গৃহীত তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে মেনে নিতে বাধ্য করছে সে সম্পর্কে ফুকো-র মত : 'স্বাভাবিকতার বিচারক এখানে সর্বত্র বিরাজী। আমরা বসেছি শিক্ষক-বিচারক, অধ্যাপক-বিচারক, সমাজসেবী-বিচারকের সমাজে। এদের সকলেরই কাজ স্বাভাবিকতার সার্বভৌম রাজত্ব চালিয়ে নিয়ে যাওয়া' (tous font régner l'universalité du normatif)[১৬]।

এইভাবে ফুকো-র এই রচনায় প্রচলিত ব্যাখ্যার রীতি (hermeneutics) মাঝে মধ্যে ফিরে আসছে। ফুকো-র কিছু ইন্টারভিউ ও খুচরো রচনার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন *Power/Knowledge* শিরোনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। ফুকোপন্থী চিন্তায় উৎসাহী যে কোনো ব্যক্তির কাছে সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান। 'নজর ও শাস্তি' প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে যখন বেন্থামের 'প্যানঅপটিকনে'র আর একটি আধুনিক ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন এর ভূমিকা স্বরূপ ফুকো-র ইন্টারভিউও প্রকাশিত হয়। এটি *Power/Knowledge*-এ মিলবে এবং এর মধ্যে ফুকো আরো কয়েকটি নতুন কথা যোগ করেছেন, যেগুলি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বেন্থাম জানতেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার সহজ ও কার্যকর অনুশীলন। সে যুগের অর্থনীতিবিদ্‌রা চিন্তা করেছিলেন সম্পদ সম্পর্কে। এবং মানুষ এক অর্থে সম্পদ, সে সম্পদের স্রষ্টা ও ভোগী। বেন্থাম কিন্তু প্রশ্নটিকে দেখেন ক্ষমতা ও দমনের পরিপ্রেক্ষিতে। সেই দৃষ্টিকোণে রুশো ও বেন্থাম ছিলেন পরস্পরের সম্পূরক। রুশো-র প্রধান চিন্তা ছিল স্বচ্ছতা বা স্বচ্ছ সমাজ (transparent society), কারণ ভাবনা থেকে যেভাবেই হোক তমসাকে দূর করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। বেন্থামের চিন্তায় সবকিছুকে দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যই ছিল মূল, কিন্তু তার অন্তিম পরিণতি হল দমনকারী শক্তিকে সহায়তা করা—এর সঙ্গে রুশো-র চিন্তার কোনো মিল নেই।

তাহলে কেন এই যন্ত্রের মধ্যে সে যুগের লোকেরা খুঁজে পেয়েছিলেন মানব-প্রেম? এ-প্রশ্নের উত্তরে ফুকো বলছেন যে সেই যুগটাই ছিল আদ্যন্ত আঁধার-বিদ্বেষী। অন্ধকারের প্রতি জন্মেছিল এক গভীর আতংক। প্রচেষ্টা ছিল সমাজের সব তলা থেকে আঁধারকে সরিয়ে দেওয়া, ধ্বংস করা নিষ্প্রদীপ ঘরকে, যেখানে চলছে

অহোরাত্র রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো নিষিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর কোনো কুটিল চক্রান্ত। প্রাচীন তমসালিপ্ত ভেঙে পড়া দুর্গ, কনভেন্ট, বাস্তিল, এ সবই ছিল তীব্র ঘৃণা ও সেই সঙ্গে কুসংস্কারী ভয়ের প্রতীক।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বা একটু আগে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সে যুগের ইংরেজি বা জার্মান গোথিক (Gothic) উপন্যাসগুলি। ফুকো অবশ্য একমাত্র শ্রীমতী অ্যান্ র্যাডক্লিফের নাম করেছেন। এই উপন্যাসগুলি সৃষ্টি করেছিল এক কাল্পনিক, রহস্যময় জগৎ, যার মূল উপাদান ছিল বিধ্বস্ত দুর্গ ও তার পাথরের দেওয়াল, গুপ্তপথ, চোরা সিঁড়ি, অদৃশ্য ব্যক্তিদের চাপা কণ্ঠস্বর, অস্ফুট পদধ্বনি, বড় চৌকো কুলুঙ্গিতে শুইয়ে রাখা বাসি মৃতদেহ ; অরণ্য, গুহা, মধ্যরাত্রে অরণ্যপথে পথভ্রষ্টা অসহায়া নায়িকা ইত্যাদি। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে ফুকো-র এই বক্তব্যগুলির একটি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে। কিন্তু মূল বক্তব্য আসলে এখানে এই যে সেই তীব্র উজ্জ্বলতার দিনে, স্বচ্ছ যুক্তির মধ্যাহ্নে—যে যুগকে ইংরেজরা বলেন 'এন্‌লাইটেনমেন্ট', ফরাসিরা বলেন 'এক্ল্যারসিস্‌ম', আর জার্মানরা আখ্যা দেন 'আউফ্‌ক্লেরুঙ'—সেই যুগে অন্ধকারের প্রতি এই শিউরে ওঠা আতংক, এর ফল পাশ্চাত্য চিন্তায় সর্বতোভাবে শুভংকর হয় নি। অন্তত ফুকো-র তাই ধারণা।

প্যানঅপটিকন বা ক্ষমতার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। যা আপাতদৃষ্টিতে ছিল মানব-হিতৈষণা, তার মূলে ছিল আরো অনেক উন্নত ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ-পদ্ধতি বা technology of power। এ ব্যাপারে ফুকো-র চিন্তায় কোনো সন্দেহের অস্তিত্ব নেই। '…no doubt Bentham is one of the most exemplary inventors of technologies of power.'।[১৭]

এখন প্রশ্ন এই যে ক্ষমতার এই অনুশীলনে লাভবান হচ্ছেন কে? কার এই ক্ষমতা? এ-প্রশ্নের জবাবে ফুকো যা বলেছেন সেটাই তাঁর শেষ জীবনের মূল ও প্রধান বক্তব্য। বস্তুত, আধুনিক জগতে ক্ষমতা এমনভাবে কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে যে তার আর কোনো বিশেষ স্বত্বাধিকারী নেই ; সমাজের সকলেই এই যন্ত্রের মধ্যে এক-একটি অংশ।

> It is a machine in which everyone is caught, those who exercise power just as much as those over whom it is exercised. …Power is no longer substantially identified with an individual who possesses or exercises it by right of birth ; it becomes a machinery that no one owns. Certainly everyone does not occupy the same position ; certain persons preponderate and permit an effect of supremacy to be produced. This is so much the case that class domination can

be exercised just to the extent that power is dissociated from individual might. [১৮]

যদিও শ্রেণীগত ক্ষমতার কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, ফুকো-র ক্ষমতা-বিষয়ক চিন্তা যে একেবারেই মার্কসবাদী নয়, তা উদ্ধৃতির ঐ উক্তি থেকে সহজেই বোধ্য হবে। কারণ, ক্ষমতা এখানে কোনোভাবেই কেন্দ্রীভূত নয়। যদি ক্ষমতার যন্ত্রের কোনো স্বত্বাধিকারী না থাকে, তাহলে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীকে সরিয়ে দিয়ে এ-যন্ত্রের বিলুপ্তিসাধন অসম্ভব। এবং শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে ফুকো-র ধারণাও অ-মার্কসবাদী।

The power of the bourgeoisie is self-amplifying in a mode not of conservation but of successive transformations. Hence the fact that its form is not given in a definitive historical figure as is that of feudalism. [তদেব, পৃ ১৬০]।

অর্থাৎ, হেগেলীয়-মার্কসিস্ট চিন্তা থেকে এই ফুকোনীয় চিন্তা একেবারেই আলাদা, বহুলাংশে সরাসরি বিপরীত।

তাঁর শেষ ও বিশাল রচনা 'যৌনতার ইতিহাস' (*Histoire de la sexualité*)-এ মিশেল ফুকো তাঁর ক্ষমতা-বিষয়ক চিন্তাগুলিকে আরো গাঢ় করেছেন। এরই প্রথম খণ্ডের সহ-শিরোনাম 'জ্ঞানের এষণা' (La volonté de savoir)• সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি মন্তব্যের প্রয়োজন বোধ করি। পাশ্চাত্যের নরনারীর যৌনজীবনের বিশ্লেষক ব্যাখ্যা এ বই নয়—যে-ধরনের বই ক্রাফ্‌ট-এবিং বা হ্যাভলক এলিস লিখে গেছেন। এই দীর্ঘ রচনার—বিশেষত প্রথম খণ্ডের—মূল বক্তব্য-বক্তব্য হল কীভাবে ক্ষমতার বহুবিধ প্রয়োগে মানুষের যৌনজীবনকে আয়ত্তে আনা হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর একটি প্রচলিত ধারণাকে আঘাত হেনে ফুকো শুরু করেছেন তাঁর এই নিবন্ধ। ধারণাটি ফ্রয়েডীয়। যৌন অবদমনের (repression) ফলে মানবিকতার যে লোপ ও বিকৃতি হয়েছে বলে ফ্রয়েডের ধারণা হয়েছিল, সেই ধারণাকে মার্কসীয় মোড়কে ঢালবার প্রচেষ্টা করেছিলেন ভিলহেল্‌ম রাইখ (Wilhelm Reich)। যদি রাইখ ও হর্বার্ট মারকুজা প্রমুখদের প্রতীতি হয় যে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার যৌনব্যর্থতা, ফুকো সে-ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন, প্রায় উল্টে দিয়েছেন। যৌনব্যর্থতার কোনো লক্ষণই আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে প্রতীয়মান নয় বরং প্রতি মুহূর্তে এই যৌনজীবন ক্ষমতা প্রয়োগের বহু বিচিত্র মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। ফুকো-র মূল

• Michel Foucult, *The History of Sexuality*, Vol. I. An Introduction (Trans. R. Hurley); New York, Pantheon, 1978.

উদ্দেশ্য অবশ্যই এখানে ঐ ক্ষমতার রূপকে আলোচনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। এই আলোচনার প্রাক্কালে বা উপক্রমণিকায়—ফুকো যে-কয়েকটি উক্তি করেছেন সেগুলো ভেবে দেখবার মতো।

প্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন, জাপান, হিন্দুভারত ও ইসলামীয় দেশগুলিতে 'কামশিল্প' (*Ars erotica*) নামে একটি বস্তু ছিল। এই শিল্প ইয়োরোপেও অবশ্য মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোনোদিনও গুরুত্ব পায় নি। কারণ, মধ্য-যুগের পর থেকেই সেখানে এসেছে যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান (Scientia sexualis)। এর সূত্রপাত খৃস্টীয়দের স্বীকারোক্তি বা Confession থেকে। রিফরমেশন ও কাউন্টার-রিফরমেশনের পর এই স্বীকারোক্তির মধ্যে প্রবেশ করল আরো তীব্র এক পাপবোধ। যৌনক্রিয়া সম্পর্কিত স্বীকারোক্তিতে উঠল নানাবিধ মানসিক বিকৃতির প্রশ্ন। এই ঐতিহ্যেরই চরম পরিণতি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে, যা ইতিহাসেরই একটি অংশ মাত্র। এ-কথাটা অবশ্য কিছু নতুন নয়।

তাঁর 'উন্মাদনার ইতিহাসে' ফ্রয়েডকে ইতিমধ্যেই আর একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রনিহিত করেছেন ফুকো। কিন্তু এই গ্রন্থে ফুকো-র মূল অন্বেষণ কীভাবে সামাজিক ক্ষমতা মানুষের যৌনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছে। আবার বলছি, সমস্যাটা এখানে অবদমন বা repression-এর নয়। অষ্টাদশ শতক থেকেই জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো রাষ্ট্রীয় দুশ্চিন্তা। এবং এখানেই উপস্থিত হচ্ছে যাকে ফুকো ক্রমাগত আখ্যা দিয়েছেন 'ক্ষমতার প্রয়োগ-পদ্ধতি' (les techniques de pouvoir)। কারণ, জনসংখ্যা শ্রম ও সম্পদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; জনসংখ্যার মারাত্মক হ্রাস ও বৃদ্ধি, এ দুই-ই সম্পদের সৃষ্টি ও ভোগকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক সমস্যা ও উৎপাদনের প্রশ্নের কেন্দ্রে পৌঁছানর জন্য চাই প্রত্যেকটি খবর, জন্মের হার, বিবাহের বয়স, বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্ঞান। ফুকো-র মতে জ্ঞান ও ক্ষমতা এক ও অভেদ। এ-দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অন্তত জ্ঞানচর্চার যে-পদ্ধতি এ-যাবৎ চলে এসেছে। তাঁর এই রচনার এই অংশে ফুকো অবশ্যই ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন রাষ্ট্রে।

অষ্টাদশ শতকের পর থেকেই যৌনতার উপর লিখিত রচনা বা ভাষণের প্লাবন শুরু হল এবং এ-ব্যাপারে ফুকো-র মন্তব্য 'যৌনতার উপর এই ভাষণ ক্ষমতার বাইরে কিংবা তার বিরুদ্ধে বৃদ্ধি পায় নি; বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক যেখানে ক্ষমতার অনুশীলন চলছিল এবং তার মাধ্যম হিসাবে [১৯]।'

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্যের বুর্জোয়া সমাজে শুরু হল এমন কিছু যৌনাচার যা প্রথাসিদ্ধ সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশে কৃত যৌনক্রিয়া নয়। এক কথায় বিকার বা perversion, যার কয়েকটি উদাহরণ ফুকো দিয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বারা অবদমিত না হয়ে, কল্পনার সাহায্যে যৌনক্রিয়াকে আরো মুক্ত ও বহুমুখী করার

চেষ্টা। এইখানে ফুকো ক্ষমতা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা উপস্থিত করছেন। ক্ষমতার প্রয়োগমাত্রই দমন ও ক্ষয় নয়। তার একটি সদর্থক (positive) দিকও আছে। ব্যাপারটা অনেকের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত তা নয়। যেখানেই আছে শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার সেখানেই থাকবে প্রতিরোধের অদম্য স্পৃহা। যখন আদিষ্ট হচ্ছে যে এই যৌনাচার অন্যায়, গর্হিত, ধিক্কার তখনই আদেশের বিরুদ্ধে অমান্যতার প্রেরণা।

বেন্থামের প্রসঙ্গে ফুকো ইতিমধ্যেই বলেছেন যে প্যানঅপটিকনের মূল উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল হয় নি, কারণ সর্বদ্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়াস এসেছে। এক কথায় ক্ষমতা শুধু নঞর্থক (negative) নয়; তার একটি সৃজনশীল চরিত্র আছে। এটা মূলত ক্রিডরিশ নীচএ-রই বক্তব্য। যদি ফুকো সর্বতোভাবে মৌলিক না-ও হন, তিনি আমাদের ক্ষমতা-সম্পর্কিত কতকগুলো প্রচলিত ধারণাকে বদলাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর 'যৌনতার ইতিহাসে'।

ক্ষমতার যে আইনগত ও নঞর্থক রূপ আমরা সহজে গ্রহণ করেছি, সেটা উল্টে দিয়ে ফুকো এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ক্ষমতা মানেই শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, কারণ নিষেধাজ্ঞাকে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষাও একধরনের ক্ষমতা। সাধারণত আমরা ক্ষমতা বলতে বুঝি একটা বিশেষ গুণ বা অধিকার যার অধিকারীর প্রয়োজন আর এক ব্যক্তির যার উপর এই ক্ষমতা আরোপিত হতে পারে। 'ক' নামক ব্যক্তির ক্ষমতার কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি 'খ' নামক ব্যক্তিকে আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারছেন। কিন্তু ফুকোশীয় চিন্তায় ক্ষমতার রূপ অন্য। ক্ষমতা এখানে রাজাহীন (le pouvoir sans le roi)। ওঁর মতে ক্ষমতা চারদিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে; এর উপস্থিতি ও প্রয়োগের রূপ সর্বত্রব্যাপী। এটা রাষ্ট্রের করায়ত্ত নয়; এটা কোনো শ্রেষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতেও নেই। বস্তুত, ক্ষমতা রাজাহীন কেন্দ্রহীন এবং এই ক্ষমতাই জীবনকে সম্ভব করছে। ক্ষমতা গড়ে উঠছে শক্তির সম্পর্কের বৃদ্ধিতে, নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা নিচের তলা থেকে আসতে পারে, অর্থাৎ একমাত্র শাসক-শাসিতের যুগ্ম (binary) সংঘর্ষেই এর ব্যাখ্যা হয় না। উৎপাদনের যন্ত্র, পরিবার, ছোট সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, নানাবিধ ছোটবড় সংস্থার একটানা বহুরূপী সংঘাতে সমাজের মধ্যে অহোরাত্র সৃষ্টি হচ্ছে যাকে ফুকো বলেছেন clivage বা বিদারণ। ফাট্ বা চিড়। অর্থাৎ ফুকো, তাঁর এই শেষ রচনায় ক্ষমতাকে শ্রেণী-সংঘর্ষ, মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ বা অন্য কিছুতেই কেন্দ্রীভূত করতে নারাজ। ক্ষমতাকে কেন্দ্রচ্যুত করে বলেছেন: 'ক্ষমতাকে কোনো কেন্দ্রবিন্দুর প্রাথমিক অস্তিত্বের মধ্যে সন্ধান করা উচিত হবে না' (il ne faut pas la chercher dans l'existence premiere d'un point central)[২০]। ক্ষমতার ভিত্ শর্বদাই গতিশীল (le socle mouvant)।

ফুকো শুধু ক্ষমতাকে কেন্দ্রচ্যুতই করেন নি, ডায়ালেকটিক্সের অপ্রমেয় উদ্দেশ্য-

বোধ ও তার অনিবার্য প্রগতি থেকে ফুকো-র চিন্তা একেবারেই মুক্ত। একাধারে ক্ষমতাকে বিক্ষিপ্তরূপে দেখেছেন তিনি, শুধু শ্রেণী-স্বার্থের লড়াইয়ের মধ্যে সীমিত না রেখে। অন্য ধারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজের সংখ্যালঘুদের উপর। এক অর্থে এই চিন্তা খুবই নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ফুকো-র দর্শনের ব্যাখ্যা সম্ভব, যেমন মার্ক পোস্টার দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কীভাবে প্যানঅপটিকনের নব্যতম রূপ দেখা দিয়েছে কমপিউটার-নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে খবর রাখা সম্ভব[২১]। ক্ষমতার রূপকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজের প্রায় প্রত্যেক স্তরে ও সংস্থায়।

ধরা যাক, পরিবার বা family একটি সামাজিক সংস্থা। এই পরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার সংঘর্ষ ও দমনেচ্ছা চলছে নিয়ত। সারা উনিশ শতক ধরে যখন ইয়োরোপীয় সমাজ কতকগুলো গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল, এক নতুন ধরনের—পরিবার-বিরোধী বা পিতাপুত্রের ক্ষমতার সংঘর্ষকে সম্বল ক'রে—রচনা আবির্ভূত হতে শুরু করে। এর নজির মিলবে স্তাঁদালের 'আঁরী ব্রুলারের জীবন' (*La vie de Henri Brulard*) থেকে শুরু ক'রে ঐ শতকের শেষে লেখা স্যামুয়েল বাট্‌লারের মৃত্যুহীন ইংরেজি উপন্যাস 'দা ওয়ে ওফ অল ফ্লেশ' পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক রচনায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই ও মারাত্মক পারস্পরিক ঘৃণাও চিত্রিত হয়েছে বহু উপন্যাসে। এ-ব্যাপারে, জর্জ সিমেনঁ (Georges Simenon)-র 'বিড়াল' (*Le Chat*) উপন্যাসটিও উল্লেখ্য।

স্বামী-স্ত্রীর শক্তি প্রয়োগ ও তজ্জাত ঘৃণার কিছু নজির আছে ভারতীয় বাংলা সাহিত্যেও। পঞ্চাশের দশকে, যখন বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া এক ভাঙনের মুখোমুখি হন, যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণাম দেখা দিতে শুরু করে, যখন বাড়ির মেয়েরা বা কুলবধূরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকুরি-জীবী হয়ে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করেন, তখনই হিন্দু বিবাহ বা বিবাহিত জীবনের সনাতন ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারণার মধ্যে বা সাতপাকে বাঁধা রূপকথায় ফাট্‌ ধরে—যাকে ফুকো বলেছেন clivage। ঐ পঞ্চাশের দশকেই একটি অতিশয় জনপ্রিয় সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল, নাম 'অগ্নিপরীক্ষা'; বহুবিধ নান্দনিক গুণ থাকা সত্ত্বেও এ-ছবিটির উদ্দেশ্য ছিল এটা কণ্ঠকণ্ঠে প্রচার করা যে হিন্দু বিয়ে কখনো ভাঙে না; তা শাশ্বত ও অ-ভঙ্গুর। বস্তুত, ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার এটা শেষ প্রচেষ্টা।

কিন্তু সমস্যটা ছিল আরো জটিল। পশ্চিমবঙ্গে স্বামীর আর এক নাম 'ভাতার' অর্থাৎ যে ভাত দেয়; স্বামীর এই অন্নদাতা রূপ পঞ্চাশের দশকেই বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন আর্থিক সমস্যায় পড়ে অনেক স্ত্রীই নিজের অন্নের সংস্থান

করছেন। ঐ দশকের এক বিশেষ শক্তিমান লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার নূপুর'-এ শয্যাশায়ী স্বামী—যার ভাতারত্ব বিনষ্ট হয়েছে—রোজগারী স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ, আর্থিক স্বাধীনতায় বিব্রত হয়ে একটি ঝকঝকে ক্ষুরের সাহায্যে আত্মহত্যায় উন্মুখ। ঐ একই লেখকের 'সমুদ্র' নামক ছোটগল্পে, স্বামী অসময়ে বা অক সিজনে স্ত্রীকে এনেছে পুরীর এক নির্জন হোটেলে তাকে হত্যা করার মানসে। পঞ্চাশের দশকেই লেখা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্পের যে-চিত্ররূপ সত্যজিৎ রায় দিয়েছিলেন 'মহানগর' নামে তার মধ্যে এই পারিবারিক ক্ষমতার যুদ্ধ বেশ ভালোভাবেই চিত্রিত হয়েছে; চাকুরিজীবী পুত্রবধূর স্বাধীনতা সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ শ্বশুরের পরিণামী প্রতিক্রিয়ায়।

কোনো সাংস্কৃতিক সামগ্রীই আকাশ থেকে পড়ে না; তার শিছনে থাকে, যাকে ফুকো বলেছেন বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। 'অগ্নিপরীক্ষা'র মতো প্রতিক্রিয়াশীল ছবির প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, কারণ হিন্দু বিবাহ যে কোনো ঝড়কে প্রতিরোধ করতে পারে এ-বিশ্বাসে আস্থাশীল ব্যক্তির সংখ্যা আজ খুব বেশি নয়। কিন্তু এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ বিবাহ ও পরিবারকে পবিত্র ঘোষণা করা আবার দেখা দিতে পারে যদি সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে কোনো রদবদল হয়। হলিউডের আর্থিকভাবে সফল ছবি *The Fatal Attraction* যখন তিন বছর আগে প্যারিসে মুক্তি পেয়েছিল, ফ্রান্সের বিখ্যাত দৈনিক 'ল মঁদ্' (*Le Monde*)-এর চলচ্চিত্র-সমালোচক লিখেছিলেন যে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল ছবির জন্ম সম্ভব রোনাল্ড রীগানের আমেরিকায়।

মানুষের জীবনে ও সমাজের ছোট ছোট অংশে বা ইউনিটে যে ক্ষমতা ও দমনের লড়াই চলছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নেই ডায়ালেক্টিকাল চিন্তায়। মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্সে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষই প্রধান; বাকি সবই গৌণ। ডায়ালেকটিক্সের এই সর্বগ্রাসী ঐতিহাসিক প্রবাহ থেকে মিশেল ফুকো আমাদের নজর সরিয়ে এনেছেন; গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাত্যহিক জীবনের বহুরূপী দ্বন্দ্বের উপর, সমাজের কিনারায় নির্বাসিত জঞ্জাল, যথা উন্মাদ কিংবা অপরাধীদের উপর। এই দর্শন সামাজিক সমস্যার প্রতি উদাসীন নয় আদৌ। শুধুমাত্র দৃষ্টিকোণ বদলেছে। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে পাশ্চাত্যের অনেক বামপন্থীই ধীরে ধীরে ফুকো-র রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন।

মিশেল ফুকো-র রচনা অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধ। রাশি রাশি কাহিনী, উপাখ্যান, ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল এবং ক্রমাগত বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার উল্লেখ ফুকো-র দার্শনিক চিন্তাকে অতিশয় সজীব ও সরল রেখেছে। এ সবই আমি বর্জন

ক'রে, শুধুমাত্র তাঁর মূল বক্তব্যগুলোকে উপরের অংশে যথাসম্ভব সহজ ক'রে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ভাবুক হিসাবে ফুকো সহজ ও সরল নন। বড় দার্শনিকরা—যথা প্লেটো থেকে মার্কস—সকলেই একই বক্তব্য নানাভাবে ঘুরিয়ে পেশ করেছেন। কিন্তু ফুকো-র চিন্তা ক্রমাগতই বদলেছে এবং এ-চিন্তার মধ্যে কোনো প্রাগতিক ঋজুতা বা linearity নেই। বলা যেতে পারে এ-চিন্তা বৃত্তাকারে এগিয়েছে। মিশেল ফুকো-র বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে প্রচণ্ড সমাজসচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তায় সমাজকে বদল করার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ-ছাড়াও আরো কিছু সমালোচনা ফুকো-র বিরুদ্ধে হয়েছে যার দু'একটির উল্লেখ এখানে আবশ্যকীয় বোধ করি।

বছর পাঁচেক আগে, বৃটেনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা শ্রীমতী জিলিয়ান রোজ 'বিনাশবাদের দ্বন্দ্ব' বা *Dialectic of Nihilism* নামে একটি ভারী বই বাজারে ছাড়েন। বইটিতে আধুনিক ইয়োরোপীয় (অর্থাৎ অ-বৃটিশ) ভাবুকদের প্রায় সকলকেই আক্রমণ করা হয়েছে; হাইদেগার, লেভি স্ত্রস্, জাক দেরিদা, জিল্ দলজ কেউই বাদ যান নি। যে কোনো বিদেশী চিন্তার প্রতি বৃটিশদের সনাতন ভীতি ও অবিশ্বাসের ভালো নজির এ-বইটি। এই বইয়ে ফুকো-র বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তার সব কিছুই এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। উত্তর-আধুনিক ফরাসি চিন্তা ইনি খুব ভালো বুঝেছেন বলে মনে হয় না। ধরা যাক তাঁর ফুকো সম্পর্কে এই উক্তিটি

> To transcribe experience into terms of the body as Foucault does is to rob persons of experience altogether.[২২]

এখানে ইনি অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? যদি অভিজ্ঞতা হয় নিষ্ঠুরতা, সমাজের কিনারায় নির্বাসিত করা, বলপ্রয়োগ বা চাতুর্যের মাধ্যমে সামাজিক 'টাইপ' গড়ে তোলা, তাহলে সেই অভিজ্ঞতা ফুকো-র রচনায় সর্বত্র আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যদি অভিজ্ঞতা হয় বিদেহী আধ্যাত্মিকতা, মনের কাল্পনিক স্বাধীনতা, ভাবুক মন বা cogito-র প্রাতিস্বিক স্বরাটত্ব ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে মিশেল ফুকো-র বা সমগ্র উত্তর-আধুনিক চিন্তার, কণামাত্র বিশ্বাস নেই সেই অভিজ্ঞতায়। এই রমণীর আর একটি উক্তি উল্লেখ্য :

> The refusal to develop a theory which explicitly involves juridical concepts results in an insinuated set of unexamined juridical concepts. [তদেব, পৃ ১৭৯] ।

এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য হয়ত আছে; যেমন আছে এঁর আর একটি উক্তির মধ্যে :

> Yet his (Foucault's) rules bid him present the 'mask' of this

new power, its 'exorbitant singularity' as 'panopticism' and as 'medico-judical treatment' and to leave unexamined the bearer of the mask. [তদেব, পৃ ১৭৫]।

অভিযোগগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বুর্জোয়া বা শ্রেণীস্বার্থ কথাগুলো ফুকো বারবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু প্যানঅপটিকনের মুখোশধারী বুর্জোয়াদের চরিত্র ফুকোশীর্ষ চিন্তায় অপরীক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুকো-কে বিচার করা উচিত হবে না। যদি ফুকো কোনো তত্ত্ব বা থিয়োরি খাড়া করতে গররাজি হন তার একমাত্র কারণ এই যে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিন্তাকে বর্জন করে তিনি বংশানুচরিত পদ্ধতি নিয়েছেন, যার মধ্যে কোনো আদি ও ক্রমবিকাশের প্রশ্ন উঠতে পারে না। যে কোনো আধিবিদ্যক (metaphysical) নিশ্চয়তার হাত থেকে চিন্তাকে মুক্ত করাই ফুকো-র মূল উদ্দেশ্য; এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য উত্তর-আধুনিক ফরাসি ভাবুকদের, বিশেষত জাক দেরিদা-র সাদৃশ্য সহজেই প্রতীয়মান। সমস্যার সহজ সুনিশ্চিত কোনো সমাধান না খুঁজে তাকে আরো বেশি সমস্যায়িত (problematize) করাই এঁদের উদ্দেশ্য।

দুই মার্কিন টীকাকার, ড্রেফুস ও র‍্যাবিনো, যাঁরা ফুকো-র রচনা তথা সমগ্র উত্তর-আধুনিক চিন্তার অন্তস্তলে পৌঁছেছেন, তাঁরাও তাঁদের মূল্যবান বইয়ে দু'একটি প্রশ্ন রেখেছেন। যদি জ্ঞান ও ক্ষমতার অনুশীলন সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে তাহলে কি নির্দোষ জ্ঞান—যথা গণিত, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি—বলতে কিছু নেই? মানবসমাজ মাত্রই এক অর্থে শাসক সমাজ (disciplinary society) এবং একে বোঝবার পদ্ধতি দিয়েছেন ফুকো; কিন্তু এর পরিবর্তনের কী উপায়? প্রতিরোধ, বিশেষত দমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে সদর্থক বা positive করার কী পদ্ধতি?[২৩] এ প্রশ্নগুলো ফুকো তোলেন নি; স্বভাবতই এদের কোনো উত্তর নেই তাঁর দার্শনিক চিন্তায়। ফুকো-র ব্যবহৃত পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা এসেছে মিশেল দ স্যার্তোর একটি ফুকো-সম্পর্কিত প্রবন্ধে। স্যার্তো নিজেও একজন আসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ফুকো-র বন্ধু। বেন্থাম-প্রবর্তিত প্যানঅপটিকন উনিশ শতকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে কারাগারের স্থাপত্যশৈলীকে প্রভাবিত করেছিল এবং এ-ব্যাপারে স্যার্তোর কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটাই একমাত্র গঠনপদ্ধতি ছিল না। এ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে কারাগার গঠিত হয়েছিল যার কোনো আলোচনা ফুকো করেন নি। আধুনিক সমাজে প্রত্যেকটি কারাগারে প্যানঅপটিকন নেই। স্যার্তো লক্ষ করেছেন যে ফুকো এখানে জাতিতাত্ত্বিক (ethnologist)-দের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপারটা একটু বেশি তাত্ত্বিক করেছেন। জাতিতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি কী? কোনো দূর দেশের, বিভিন্ন সংস্কৃতির, কোনো জাতি বা উপজাতির কিছু বিশেষ রীতি-

নীতি এঁরা বেছে নেন গবেষণার বস্তু হিসাবে এবং এই রীতিনীতিগুলির মধ্যে এঁরা গড়ে তোলেন 'তত্ত্বের উজ্জ্বল কেন্দ্র' (Centre lumineux de la the´orie) ; এটা এক ধরনের সমূহকরণ (totalization), যাকে ফুকো তত্ত্বগতভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু যা ফুকো-র নিজের রচনায় ফিরে এসেছে। অবশ্য তার্তো এটা স্বীকার করেছেন, এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে অতীতের এই স্থাপত্যরীতির আলোচনার সাহায্যে ফুকো বর্তমান সমাজের 'ভঙ্গুর নিশ্চয়তাকে উপদ্রুত করেছেন' (de´ranger nos fragiles surete´s) [২৪]। ফুকো-র চিন্তার এই সমালোচনাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

আমি এ কথা পূর্বেই বলেছি যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় ফুকো-র প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তার দু একটি নিজস্ব এখানে দেওয়া যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদীয়মান দার্শনিকদের মধ্যে এখন রিচার্ড রর্টি (Richard Rorty) অগ্রণী। রর্টির সাম্প্রতিক রচনায় যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্দেহবাদ (scepticism) ও সেই সঙ্গে সামাজিক প্রাণীদের পারস্পরিক সহানুভূতির প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার উৎস এপদী কান্টীয় সন্দেহবাদে নয় ; তার উপর ফুকো-র প্রভাবই প্রধান। দুরূহ দার্শনিক চিন্তার বাইরেও, সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার উপরেও ফুকো-র প্রভাব সহজেই প্রত্যক্ষ। ১৯৭৯-তে প্যারিসের প্রকাশক Unio General d'Editions কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের এক সংকলন প্রকাশ করেন এই শিরোনামে, *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, অর্থাৎ 'ইতিহাসে যারা কিনারায় থাকে এবং যারা বর্জিত'। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলোচিত বস্তু যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইণ্ডিয়ানরা, সার্দিনিয়ার ডাকাত শ্রেণী, মধ্যযুগে ইয়োরোপে অপরাধী ও তাদের শাস্তিদান পদ্ধতি, প্রাচীন গ্রীসের ক্রীতদাস ও কারুশিল্পী (artisans)-রা ও প্লেটোর রচনায় তাদের স্থান ইত্যাদি এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ যার বিষয় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বিহারের মাঘাইয়া ডোমদের অপরাধ-প্রবণতা ; লেখক জাক্ পুশ্পাদাস (Jacques Pouchepadass)। এরা সবাই কিনারার অধিবাসী। সমাজ এদের বর্জন করেছে। ডোমরা উপজাতি নয়। তারা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে তলায় বাসিন্দা ; অস্পৃশ্য। এই সুলিখিত প্রবন্ধগুলি যিনি সম্পাদনা করেছেন তিনি তাঁর ভূমিকায় ফুকো-র কোনো উল্লেখ করেন নি এবং তাতে অবশ্য ফুকো-র আন্তর্জাতিক সম্মানে কোনো আঁচড় পড়ে না, কিন্তু ফুকো-রপ্রভাব এখানে সন্দেহাতীত। হঠাৎ ১৯৭৯-তে এই প্রবন্ধগুলি — যার অনেকগুলিই পুরনো — পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন হল কী কারণে ? ঠিক যখন পাশ্চাত্ত্যের বৌদ্ধিক সমাজে ফুকো-র প্রভাব গভীর ও সর্বত্রব্যাপী হতে শুরু করেছে, এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পিছনে ফুকো-র প্রভাব লক্ষ করা বোধহয় অন্যায় হবে না। কারণ ফুকো-ই প্রথম ভাবুক যিনি সমাজের কিনারায় নির্বাসিত মানুষ বা মানুষরূপী অজ্ঞালদের উপর পদ্ধতিবদ্ধভাবে চিন্তা

করেন ; এই মানুষেরা অবশ্যই তারালেকটিক্সের মূলর ভোজসভায় আপাঙ্‌ক্তেয়, কিন্তু সে কারণে এদের অস্তিত্ব বা তার সমস্যা কিছু লোপ পায় না। মার্কসবাদী-দের হাতে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং সে-বিপ্লবের ফলে ঐ দেশের সমূহ পরিবর্তনও ঘটেছে। সে দেশ আজ দ্বিতীয় মহাশক্তি, ইত্যাদি। কিন্তু তথাকার কিনারার মানুষদের, অর্থাৎ ইহুদি, আর্মেনিয়ান বা ইউক্রেনীয় ক্যাথলিকদের সমস্যা আজও মেটে নি। ঐ সমস্যাগুলি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে, বাংকোর প্রেতের মতো ভোজসভা ভণ্ডুল করে দেবার জন্য। এগুলো বুজোয়া প্রেসের প্রোপাগ্যাণ্ডা নয়। ওঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন ও ওঁদের টেলিভিশনে দেখাচ্ছেন, বিনা দ্বিধায়।

মিশেল ফুকো-র চিন্তায় সমাজ পরিবর্তনের কোনো সরাসরি নির্দেশ নেই, যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিনাশবাদের অভিযোগ এসেছে। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু নতুন চিন্তার সংকেত আছে যা আগামী কাল অর্থাৎ প্রায় আগত একবিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় এক নতুন বিপ্লবের উপাদান হতে পারে। এটা ইতিমধ্যে অনেকেই বুঝেছেন। ধরা যাক, বামপন্থী মার্কিন বুদ্ধিজীবী টমাস ফ্লিন (Thomas Flynn)-এর কথা। ইনিও ফরাসি সাহিত্যের অধ্যাপক ও এক কালে সার্ত্র-এর উপর অনেক লিখেছেন। বর্তমানে ফুকো-র অনুরাগী। টম্ ফ্লিন-এর মুখেই শেষ কথা দেওয়া যাক :

> The subtle questioning stance casts suspicion ; it does not settle issues. But that is all Foucault intends. For in weakening our confidence in homogeneous reason and univocal truth, he has opened the door to new alternatives, other creativities, further 'revolutions. [২৩]

প্রথাসিদ্ধ বিপ্লব-চিন্তার অন্য এক নতুন বিকল্প আছে বা থাকতে পারে, এটা যাঁরা মানতে রাজি এবং যাঁরা এ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে প্রস্তুত, তাঁদের কাছে মিশেল ফুকো-র রচনা এক নতুন অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

উল্লেখপঞ্জি

Rene´ Descartes, *Discours de la me´thode*, Paris, Vrin, 1966, পৃ ৪৪।

২. Michel Foucault, *Histoire de la folie a´ l'age classique*, Paris, Gallimard, 1972, পৃ ১৬২।

৩. Karlis Racevskis, 'Michel Foucault, *Rameau's Nephew* and the question of identity' in James Bernauer and David Rasmussen (Ed.) *The Final Foucault*, Massa-

chusetts, MIT Press, 1988, পৃ ২১–৩২।
৪. Michel Foucault, *Les Mots et les Choses*, Paris, Gallimard, 1966, পৃ ৮৬।
৫. Gilles Deleuze, *Foucault*, Paris, Les Editions de Minuit, 1986, পৃ ১১, পাদটীকা।
৬. Michel de Certeau, *Histoire et psychanalyse entre science et fiction*, Paris, Folio / Essais, 1987, পৃ ৩৩।
৭. Michel Foucault, *L'Archéologie du Savoir*, Paris, Gallimard, 1969, পৃ ১৬।
৮. Friedrich Nietzsche, *The Use and Abuse of History* (Tr. Adrian Collins), Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1957.
৯. F. Engels, *Dialectics of Nature* (Trans. C. Dutt), Moscow, Progress, পৃ ২৫।
১০. Gordon Childe, *What Happened in History*, Pelican Books, 1968, পৃ ১৩।
১১. দ্রষ্টব্য Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Brighton The Harvester Press, 1986, পৃ ৫২, পাদটীকা।
১২. M. Foucault, *L'ordre du discours*, Paris, Gallimard, 1971, পৃ ১৭।
১৩. এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য Mark Poster, *Foucault, Marxism and History*, Cambridge, Polity Press, 1984.
১৪. Friedrich Nietzsche, On the *Genealogy of Morals* (Trans. W. Kaufman), New York, Vintage, 1969.
১৫. Michel Foucault, *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975, পৃ ২০৩।
১৬. ঐ, পৃ ৩১১।
১৭. Michel Foucault, *Power / Knowledge*. Selected interviews and other writings. New York, Pantheon, 1980, পৃ ১৫৬।
১৮. ঐ, পৃ ১৫৬।
১৯. Michel Foucault, *Histore de la sexualité : La Volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976, পৃ ৪৫।
২০. ঐ, পৃ ১২২।

২১. Mark Poster, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬-১৬৯।
২২. Gilian Rose, *Dialectic of Nihilism*, Oxford, Basil Blackwell, 1984, পৃ ১৮০।
২৩. Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫-২০৭
২৪. Michel de Certeau, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪-৪৭।
২৫. James Bernauer and David Rasmussen (Ed.) প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

গ্রন্থপঞ্জি

যাঁরা মিশেল ফুকো সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি বিশেষভাবে অনুমোদনীয়

ফরাসি

Michel de Certeau, *Histoire et psychanalyse entre science et fiction*, Paris, Folio / Essais, 1987.

Gilles Deleuze, *Foucault*, Paris, Les Edition de Minuit, 1986.

Angele K. Marietti, *Michel Foucault, Archéologie et Généalogie*, Paris, Le Livre de Poche, 1985.

ইংরেজি

James Bernauer and David Rasmussen (Ed.) *The Final Foucault*, Massachusetts, The MIT Press, 1988.

Mark Cousins and Athar Hussain, *Michel Foucault*, London, Macmillan, 1984.

Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Michel Foucault : Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Brighton, The Harvester Press, 1986.

J. G. Marquior, *Foucault*, London, Fontana Modern Master Series.

Mark Poster, *Foucault, Marxism and History*, Cambridge, Polity Press, 1984.

John Rajchman, *Michel Foucault, The Freedom of Philosophy*. Columbia, 1985.

Barry Smart, *Foucault, Marxism and Critique*, London, Routeledge, 1983.

Barry Smart, *Michel Foucault*, London, Tavistock. 1985.

সুধীর চক্রবর্তী

বাংলা চালচিত্রের পট

এদেশে কালীঘাটের পট আর বীরভূম-মেদিনীপুরের জড়ানো পট বা সেই সব পটুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক আলোচনা, সংগ্রহ, লেখালিখি হয়েছে। দু'চার-খানা বই বা অ্যালবামও সে সম্পর্কে বেরিয়েছে, এমনকি তার দু'য়েকখানা আবার খোদ সাহেবদের লেখা। এ তো আমাদের পক্ষে খুব উত্তম কথা, গর্বেরও ব্যাপার। ঐসব পট সম্পর্কে এত কমিঠতার কারণও আছে। একটা কারণ তো গুরুসদয় দত্ত-র মতো শিল্প-জহুরী আমলার চোখে-পড়ে-যাওয়া, আরেকটা কারণ ইংরেজ সাহেবদের গুণগ্রাহিতা। এ সব কিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় কারণটা অবশ্য শিল্পগত। বিশেষত কালীঘাট পটের বিষয় ও রচনাগত অভিনবত্ব, রেখার চাতুর্য ও দৃষ্টিকোণ এবং এমনকি গূঢ় অনেক সমাজবীক্ষা তাকে প্রসিদ্ধি দিয়েছে। তুলনায় জড়ানো পট বা যাদুপট আর যমপট শিল্পগতভাবে একটু নিচু পর্যায়ে স্থান পেলেও গুরুত্ব কম পায় নি। বিশেষত সেই বিশেষ পটুয়া সম্প্রদায়, তাদের ধর্মগত দোলাচল এবং পটুয়া গান খুবই টেনেছে শিল্পরসিক আর সমাজবিজ্ঞানীদের। অথচ আমার যেটা আশ্চর্য লাগে সেটা এই যে, শত শত বছর ধরে বাংলার দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রে যে পট আঁকা হয়ে আসছে তার সম্পর্কে শিল্পরসিক ও কলা-সমালোচকদের লেখনীর বিস্ময়কর কার্পণ্য। প্রশ্ন হলো চালচিত্তির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সুদীর্ঘ ও বেদনাবহ নির্বিকারত্বের কারণ কী হতে পারে? 'ও সব ঠাকুর দেব্‌তার ব্যাপার' কিংবা 'কোনো সোশ্যাল রেলেভেন্স নেই' কিংবা 'বড্ড ধর্ম-ধর্ম গন্ধ' এমনতর নাক-উঁচু মন্তব্য থাকলেও থাকতে পারে। জানি না।

এখন কথা হলো, পৃথিবীটা তো দ্রুত পালটাচ্ছে, সেইসঙ্গে ধারণাগুলোও। তাই ঠাকুর দেবতার ব্যাপার স্যাপার কিংবা ধর্ম-ধর্ম গন্ধের মধ্যেও হালের সমাজ-বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন। এক-একটা দেশের বিশিষ্ট ধর্ম-ধারণার মধ্যে (যেমন বাংলাতেই) লুকিয়ে-থাকা নানা সমাজ-ভাবনার অনুশীলন যোজনা আজকাল খাঁটি মার্কসবাদীদেরও ভাবাচ্ছে। 'সাব-অলটার্ন' চিন্তা-ভাবনা তো খুবই মর্যাদা দিচ্ছে এসব ব্যাপারে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, অলৌকিকের সঙ্গে লোকায়তকে মিলিয়ে দেখলে হয়তো বাংলা সংস্কৃতির একটা জ্যান্ত ছবি ফুটতে পারে। তার একটা হলো চালচিত্র।

তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, চালচিত্রের চিত্রকলা সম্পর্কে আমরা যে এতটা উদাসীন ও অচেতন তার কারণ অনেক সময় চালচিত্রের ছবি ভালো ক'রে দেখাই যায় না। দেবীমূর্তির সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার আড়ালে কিংবা দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতীর বুলেনের-কাজ-করা মুকুটের ফাঁকে ফোকরে ও নক্সা করা জেল্লাদারী কল্কার নিচে চাপা পড়ে যায় চালচিত্র পটের বর্ণবিন্যাস তথা বিষয় বিভাজন। দেবীমূর্তির বিশেষ ক'রে মুখের ওপর যে-তীব্র আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করা হয় পূজামণ্ডপে তার ফলে মূর্তির পিছনে অন্ধকার ছায়া পড়ে। তাতেও অনেকটা ঢেকে যায় চালচিত্রের চিত্রমহিমা।

তাহলে, প্রশ্ন উঠবেই যে কেন এত ঘটা ক'রে চালচিত্রের পট লেখা? সে কি শাস্ত্রকে মান্য করতে, নাকি ত্রিমাত্রিক প্রতিমার উপরে আরেক ধরনের রঙে রেখায় অন্য একটা সংগতি বা ব্যালেন্স আনতে? পিঠোপিঠি এই প্রশ্নও ওঠে যে চাল-চিত্রের এমন চিত্রীকরণের কাজ কতদিন থেকে চলছে অর্থাৎ কত শতক ধরে? আঁকছেনই বা কারা? খুঁজলে দেখা যাবে, গড়পড়তা হিসেবে ঠাকুর যাঁরা গড়েন, চালচিত্তির আঁকেন তাঁরাই অর্থাৎ কুমোররা। তবে ব্যতিক্রমও প্রচুর। যেমন হাতের কাছেই দু'টো নমুনা রয়েছে। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার ১৯৩২ সালের নভেম্বর সংখ্যায় একটি চালচিত্রের পটের প্রতিলিপি রয়েছে যেটি এঁকেছেন পূর্ববঙ্গের একজন গ্রহাচার্য-শিল্পী। আবার অন্যত্র দেখছি, 'বারোমাস' পত্রিকার ১৯৮৫ সালের শারদীয় সংখ্যায় শ্যামলী চক্রবর্তী তাঁর 'শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র' নিবন্ধে লিখেছেন :

> দশভুজা দুর্গার চালচিত্র সমন্বিত বিগ্রহের ছবির উপকরণ বঙ্কিম তাঁর পৈতৃক গৃহের বার্ষিক দুর্গোৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিমা থেকেই সরাসরি নিয়েছেন। কৃষ্ণনগর-ঘূর্ণির পটুয়া শশী পাল তাঁদের বাড়ির ঠাকুর গড়তেন সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে। উৎকৃষ্ট পট-চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর আঁকতেন চাল-চিত্রের পটগুলি অপূর্ব শিল্পকুশলতায়।

উল্লিখিত দু'টো নমুনা থেকে একটা কথা খোলসা হলো যে, কুমোর ছাড়াও অন্তত দু'টো জাত চালচিত্রের পট এঁকে থাকে—গ্রহাচার্য ও সূত্রধর।* কথাটা আজো সত্যি। তবে কুমোররাই যে প্রধানত পট আঁকে তাও সত্যি। যদিও মনে রাখতে হবে, সাধারণত কুমোররা অন্য জায়গা থেকে পট কিনে চালচিত্রে সেঁটে দেন। সে-পট পাওয়া যায় সাজের দোকানে, কুমোরটুলিতে কিংবা দশকর্মা ভাণ্ডারে। তবে এটা ঠিক যে এইসব দোকানে যেসব চালচিত্র-পট (দু'হাত, তিনহাত বা পাঁচহাত) কিনতে পাওয়া যায় তা কুমোরদেরই লেখা। বর্ষার সময় যখন কুমোরদের হাতে ঠাকুর গড়ার তেমন কাজ থাকে না তখন একশ্রেণীর

* অনেকে মনে করেন সূত্রধর কোনো বিশেষ জাতি নন। এটা একটা generic term। যাঁরাই কারুশিল্পী তাঁরাই সূত্রধর পদবী ব্যবহার করতেন।

কুমোর তাঁদের বউ বা মেয়ের সহায়তা নিয়ে পট এঁকে পাইকারদের বেচে দেন।

কিন্তু বীরভূমের হাটসেরান্দি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদের কান্দী বা কাগ্রামে কিংবা আরো অনেক গৌড়জনপদে প্রধানত সূত্রধররাই চালচিত্র আঁকেন এখনও। এর মধ্যে হাটসেরান্দি গ্রামের শিল্পীদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা দরকার। কেননা সে গ্রামে দশ-বারোখানা দুর্গাপ্রতিমা চালচিত্র সমেত আগা-গোড়া হাতে এঁকেই পুজো হয়। মূর্তি গড়া হয় না। অর্থাৎ যাকে বলে 'পট বিগ্রহ'। এ সব পট আঁকেন হাটসেরান্দির কালীপদ ও গুরুপদ সূত্রধর। এখানে

হাটসেরান্দির চালচিত্র

মনে রাখতে হবে খোদ শান্তিপুরে, যেখানে কুমোর আর মৃৎমূর্তির ছড়াছড়ি, সেখানেও বাসের সময় চালচিত্রসমেত আগাগোড়া হাতে-এঁকে পটেশ্বরী বলে এক কালীপুজো হয়। যাই হোক, সার কথা হলো বাংলায় চালচিত্রের দুর্গা-মূর্তির সঙ্গে পট আঁকার একটা অন্যান্য ঐতিহ্য আছে বহুদিনের। অঞ্চল বিশেষে সে ছবি লেখেন কুমোর বা সূত্রধর কিংবা অন্যজাতিও (এমনকি রাজবংশী ও মালাকর)।

এবারে প্রশ্ন হলো এই চালচিত্রে প্রতিমা সন্নিবেশ আর পট আঁকার কাজ আন্দাজ কবে থেকে শুরু হলো? তার জবাবে আমাদের সর্বাগ্রে মূল একটা কথা মনে রাখা চাই। ভারতবর্ষে পট আঁকার ইতিহাস খুব পুরোনো। সংস্কৃতে পট্ট বা পট বলতে বোঝায় কাপড়। গুরুসদয় দত্ত এবং দেবপ্রসাদ ঘোষের বই পড়লে জানা যায়, কাপড়ের ওপর রং বুলিয়ে তাতে নানা পৌরাণিক বিষয় এঁকে একদল শিল্পী তা জনসমক্ষে দেখিয়ে (এমন কি সময় বিশেষে সঙ্গে গেয়ে বা নেচে) অর্থ রোজগার করতেন। তাঁদের বলে পটকার বা পটিকার। এই প্রাচীনতম পটকারের উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন ভারতে। সে সময়ে আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোশাল মঙ্খলিপুত্ত ছিলেন নালন্দা গ্রামের একজন সামান্য

পটকার মন্খের সন্তান। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখ আছে গ্রামশিল্পী ও রাজশিল্পী দুই বর্গের। গ্রামশিল্পী মানে পটকার। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লেখ আছে, লোকশিল্পী রাস্তার ধারে লোকজনকে আঁকা পটের সাহায্যে কংসবধের পালা দেখাচ্ছে। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই ধরনের পথ-পটুয়াদের বলা হয়েছে শৌভিক বা শৌভনিক। এছাড়া খৃষ্ট-পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তররামচরিত, হর্ষচরিত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতিতে পটকারদের ভূরিভূরি বিবরণ আছে।

বুঝতে অসুবিধে নেই, দীর্ঘবাহিত পটুয়া-ঐতিহ্য কালক্রমে বাংলা পটেরও সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পথে পথে ঘোরার পাশাপাশি দেবস্থানের আশেপাশে পটুয়ারা কলোনি তৈরি ক'রে নিয়েছে বিক্রিবাটার সুবিধের জন্যে। চৌকো পট বা জড়ানো পট যেমনই হোক তার চিত্রবস্তু ছিল পৌরাণিক বা লোকায়ত ধর্ম-বিশ্বাসের কোনো রূপ। জয়ন্ত চক্রবর্তী তাঁর 'Kalighat Painting' (১৯৮৬) বইতে লিখেছেন

> This pata painting is known to have definitely flourished only after the present Kali temple at Kalighat, on the bank of Adi-Ganga, was built. The new lanes and streets such as Amrita Banerjee Lane, Nakuleswartala etc., were made specially to lead people to the temple, and patuas set up their stalls in these lanes and streets. The artists began to make brisk business with their patas which the pilgrims would carry home as mementos or relics.

কালীঘাটের এই পটুয়ারা অবশ্য বেশ অর্বাচীন কালের মানুষ, ধরতে গেলে উনিশ শতকের। কিন্তু বেশ পুরোনো পটুয়া ঐতিহ্য রয়েছে বীরভূমের। সেখানকার শিল্পীসম্প্রদায়ের আঁকার বিষয়বস্তু ও ভাবনায় একটা উদার ধর্মসমন্বয় বা বৌদ্ধ সমাপত্তন লক্ষ করেছেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিকন্তু তিনি তাঁর 'বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া' (১৯৭২) বইতে জানিয়েছেন

> বীরভূমের নানা পীঠস্থানে, বিশেষ করে তারাপীঠ ও নলহাটিতে দূর অতীতে পটুয়ারা সমাগত তীর্থযাত্রীদের কাছে···হাতে আঁকা চৌকো পট বা ছবি বিক্রি করতেন।

পরবর্তীকালের ইতিহাস অবশ্য বিচিত্র ও করুণ। কালীঘাটের পটুয়া সম্প্রদায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সস্তা ছাপাই ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে। আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বীরভূম আর মেদিনীপুরের পটুয়ারা আজ নিরন্ন ও হতশ্রী। এই সমৃদ্ধ শিল্পীগোষ্ঠী আজ নিজ বৃত্তি ছেড়ে কেউ ভ্রাম্যমাণ গো-বৈদ্য কিংবা রাজমিস্ত্রি, কৃষক বা বড়জোর মৃৎশিল্পী।

চালচিত্রের পট যাঁরা লেখেন তাঁদের অবস্থাও এমন কিছু ভালো নয়। বেশির ভাগ পটকার আজ প্রায়নত ঠাকুর গড়েন। কেননা চালচিত্তির এঁকে পোষায় না। কেন পোষায় না তা বোঝাতে একটা সারণীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখনকার মূল্যমান অনুসারে—

আড়াই হাত চালচিত্র	সাড়ে তিন হাত চালচিত্র :
১ দিনে আঁকা যায় ৪টি	১ দিনে আঁকা যায় ৩টি
খরচ রং বাবদ ২ টাকা	খরচ রং বাবদ ৩ টাকা
বিক্রয়মূল্য পাইকারের কাছে ৬ টাকা	বিক্রয়মূল্য পাইকারের কাছে ৭ টাকা

প্রথম হিসেবে দৈনিক রোজগার দাঁড়াচ্ছে ২২ টাকা. দ্বিতীয় হিসেবে ১৮ টাকা। এবারে মনে রাখতে হবে চালচিত্রের পট লিখতে পরিবারের সব সদস্যের (নারীপুরুষ) কিছু না কিছু অংশ থাকে। তার মানে ২২ টাকা বা ১৮ টাকা একটি গোটো পরিবারের একদিনের যৌথ রোজগার। তাই বাধ্য হয়ে পট-লেখার সিজন এখন দাঁড়িয়েছে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ চারমাস। বাকি আটমাস ঠাকুর গড়া বা অন্য ধান্দা। তার ফলে ছবির শিল্পিতা কমছে, বাড়ছে অর্ধ-মনোযোগের শৈথিল্য। অথচ এককালে চালচিত্র পট-লেখার রমরমা ছিল খুব।

স্বর্ণি-কৃষ্ণনগরের অসামান্য পোটো শ্যামাপদ পাল আমাকে বলেছিলেন আগে এখনকার মত ছাড়াছাড়া স্থিতিমে হতো না। সবই ছিল চালারীতির ঠাকুর। বারোয়ারীর চেয়ে বনেদী বাড়ির পুজো ছিল বেশি। যেমন ধরুন, শোভাবাজারের রাজবাড়ি. হাটখোলা কিংবা কাশিমবাজার বা কেষ্টনগরের রাজবাড়ির পুজো। বিশাল চালি বারো হাত পনেরো হাত। সেখানে এখনকার মতো কাগজে ছবি এঁকে সাঁটা যেতো না। সরাসরি আঁকতে হতো।

কীভাবে আঁকতেন?

দুর্গাপ্রতিমার পুরো কাঠামোটাকে বলে 'মেড়ে'। সেটা পাটাতনের ওপর বানাতে হয় বাঁশ আর বাখারি দিয়ে। মেড়ে-র ওপরদিকে অর্ধবৃত্তের মতো বাখারি দিয়ে বাঁধতে হয়। তার ওপরে টান টান ক'রে কাদা মাখানো মোটা কাপড় আটকে নিতে হয়। পট আঁকতে হতো সেই কাপড়টার ওপর। কাজেই আগে তাতে খড়িমাটি দিয়ে জমিন তৈরি ক'রে নিয়ে পরে শুরু হতো ছবি লেখা।

সব চালচিত্তিরে ওপরটাই কি অর্ধবৃত্তের মতো হতো?

না, মোট তিনরকমের চালচিত্তিরের ধাঁচা হতো, এখনও হয়। একরকম হলো সাবেক রীতির যা সচরাচর দেখেন। আরেকরকম হলো চালারীতির, দু'দিকে মূর্তি ছাড়িয়ে নেমে যায়। কেষ্টনগরের রাজবাড়ি আর রায়পাড়ার প্রতিমায় এই চালারীতি দেখবেন। আর তৃতীয় রকম কাঠামো হলো রথের মতো তিন-চুড়ো। এর নমুনা পাবেন কলকাতার পাথুরেঘাটার কৃষ্ণেন্দু ঘোষ মহাশয়ের

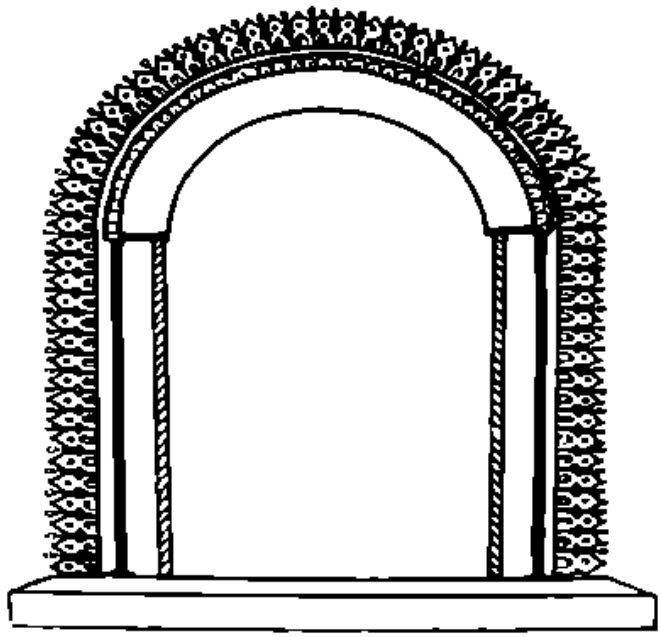

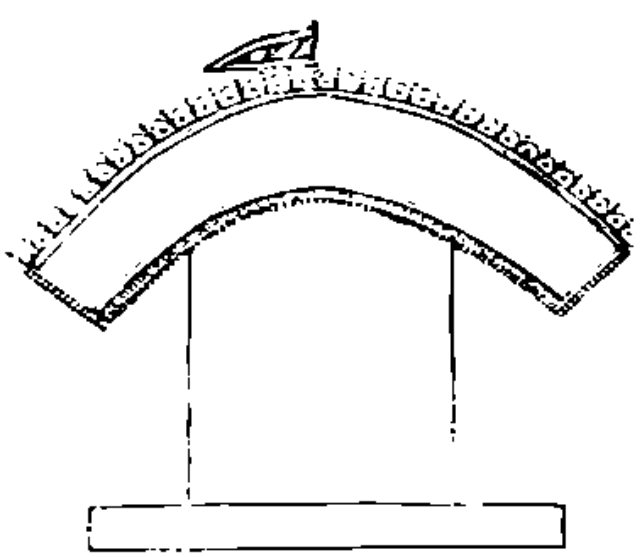

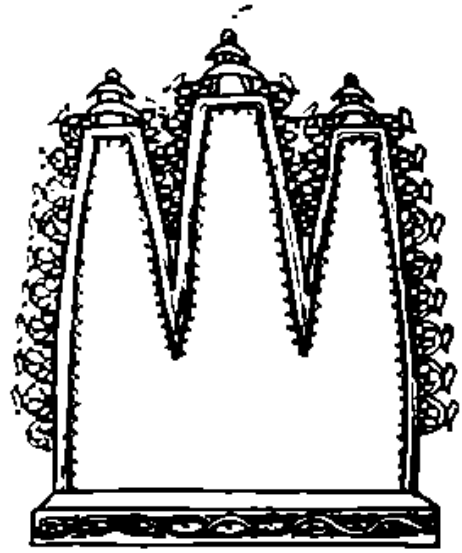

তিন ধাঁচার চালচিত্র

বাড়িতে কিংবা বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের ঠাকুরে।

এই তিন ধাঁচার কারণ কি ?

বৈচিত্র্য তৈরি করা একটা কারণ। আরেক কারণ পটের ছবির কম বেশির ব্যাপার। যেমন ধরুন রঘুরীতির মেড়েতে চিত্তির থাকে নামমাত্র। কিন্তু চালা-রীতির পটে অনেক চিত্র লেখা যায়।

যেমন ?

যেমন বলতে গেলে আগে আপনাকে জানতে হবে গড়পড়তা চালচিত্রে

আঁকা হয় কি কি পুতুল। হিসেব ক'রে নিল। একটা দুই আড়াই হাতের চালচিত্র পটে সচরাচর আঁকা হয় মাঝখানে শিব আর নন্দী, শিবের বাড়ি আর গণেশ জননী। এবারে পটের বাঁ প্রান্তে আর দক্ষিণ প্রান্তে থাকে দু'টো লড়াইয়ের ছবি। একদিকে রক্তবীজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে সিংহবাহিনী দেবীর যুদ্ধ, আরেক দিকে শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে মা দুর্গার যুদ্ধ। এখন ফাঁক থাকলো শিবের দু'দিকে। তার একটা ভরাট হবে রামাভিষেকের দৃশ্য দিয়ে। তাতে থাকবে সিংহাসনে বসা রাম-সীতা, পায়ের কাছে হনুমান, দু'পাশে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন আর বিভীষণ। শিবের আরেক দিকে ফাঁকা পট ভরাট হবে বৃন্দাবন লীলা দিয়ে। কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ আর সখাবৃন্দ। ব্যস, চালচিত্র শেষ। না না, বলতে ভুলেছি, শিবের পাশে আরো আঁকা হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু নারদ ইন্দ্র আর ছাগমুণ্ড দক্ষের ছবি। হ্যাঁ, এইবারে গড়পড়তা চালচিত্র লেখা শেষ হলো।

আর গড়পড়তার বাইরে?

ওঃ সে তো অনেক রকম চিত্তির হতে পারে। নমুনা চান? শুনুন তবে— দশমহাবিদ্যা, দশাবতার অষ্টনায়িকা, নবদুর্গা, নবনারীকুঞ্জর, কৃষ্ণলীলা, ভীষ্মের শরশয্যা, সপ্ততালভেদ, সপ্ততালুভেদ···

আলাপচারী এখানে থামিয়ে পাঠকদের চট ক'রে মনে করিয়ে দিতে চাই বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিবরণ। সেখানে দেবীরানীর কামরায় বিস্মিত ব্রজেশ্বর প্রবেশ ক'রে দেখে :

> কামরার কাঠের দেয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্ট নায়িকা; সপ্ত মাতৃকা; দশ মহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী-কুঞ্জর; বস্ত্রহরণ; সকলই চিত্রিত।

লিখিত আকারে দুর্গাপ্রতিমার এই চালচিত্র-পটের বিবরণ একশো বছরেরও পুরোনো, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র এ-উপন্যাস লেখেন ১৮৮২ সালে। এখানে লক্ষ করবার ব্যাপার এইটাই যে বঙ্কিমের বর্ণনা আর শ্যামাপদ পালের বর্ণনা প্রায় একরকম। তার মানে শতখানেক বছর আগের বাংলার চালচিত্র-পটে বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল বিপুল। বিষয়গুলি যে নিছক পুরাণ-আশ্রয়ী তা নয়, বাঙালী ভক্তিরস আর সরল লোকায়ত বিশ্বাস অনেক চিত্রের বিষয় বানিয়ে তুলেছিলো। সাধারণভাবে বাঙালীর পটশৈলীতে ও বিন্যাসে পটুয়াদের স্বাধীনচিত্ততা ও শাস্ত্রছুট ভাবনা বরাবর কাজ করেছে। 'পটুয়া সঙ্গীত' (১৯৩৯) বইতে গুরুসদয় দত্ত তাই বলেছিলেন :

> বাংলার গণজাতির হিন্দুধর্মের রূপ চিরকালই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণ্য ধর্মের রূপ হইতে

পৃথক হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাবতঃ অদম্য স্বাধীন আত্মা ধর্ম্মাচরণ-ক্ষেত্রে ও দেবমূর্ত্তি-পরিকল্পনায় শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের খুঁটিনাটি দাসের মত মানিয়া লইতে পারে নাই।···পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী।

কথা কটির প্রসারণে আমরা মনে করতে পারি কমল মজুমদারের মন্তব্য, যা তিনি লিখেছিলেন 'বঙ্গীয় শিল্পধারা' (এক্ষণ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) নিবন্ধে

বাঙলা দেশের সমস্ত দিক হইতে নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। সমস্ত দিক হইতে বাঙলাদেশ স্বতন্ত্র।···বাঙলাদেশে আবির্ভাব হইয়াছে নূতন নূতন বিশ্বাসের এবং বাস্তবতার। ধর্ম্ম, কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত – ইহাদের সহিত বাঙালীর নাড়ীর যোগ রহিয়াছে।···বাঙলাদেশ শিল্পকে কোন নামেই জীবন হইতে বাদ দেয় নাই। সমস্ত সময় শিল্পকে আলিঙ্গন করিয়া ছিল। এমনভাবে থাকা তখনই সম্ভব যখন তাহার মধ্যে কিছু বাস্তবতা থাকে এবং সেই বাস্তবতা তাহাকে রাত্রদিন আনন্দ দেয়।

এবারে সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই যে, শিল্পের মধ্যে নিত্যজীবিত বাঙালীর সৃষ্টিশীল সত্তা এককালে কৃষ্ণের পাশে রাধা-চরিত্রের কল্পনা করেছিলো দ্বাদশ শতকে, সেই সত্তাই আঠারো শতকে উমা-মেনকা-গিরিকে নিয়ে কেঁদেছিলো আগমনী-বিজয়ার গানের আর্দ্রতায়, তারই তৈরি ঊর্ধ্ববাহু কাঠের গৌরাঙ্গ বা লক্ষ্মীঘটের পেচা। আবার একই বাস্তবাশ্রিত ভক্তিভাবনা গড়ে নিয়েছে মহিষাসুর-মর্দিনীর বদলে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ ঘেরা মেড়ের মধ্যে স্নিগ্ধ এক পারিবারিক কাঠামো।

কথাটা পাকাপোক্ত হয় এই তথ্য মনে রাখলে যে, রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ, বেণীনাথ প্রভৃতির লেখা দুর্গাপুজো সংক্রান্ত গ্রন্থে যে-ধ্যানরূপের উল্লেখ আছে তাতে লক্ষ্মী সরস্বতী বা কার্ত্তিক গণেশ নেই। পুরানো ভাস্কর্যেও মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তি ছাড়া অন্য কোনো সন্তানের অনুপুঙ্খ নেই। তাই আশ্চর্য হয়ে শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' (১৯৭০) বইতে মন্তব্য করেছেন :

অথচ ইহাদের প্রতিমা দেবী প্রতিমার সহিত সর্বত্র যুক্ত হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এইরূপ হইতেছে বলা যায় না। ইহাদের অবস্থান সর্বত্র একরূপ নহে। পশ্চিমবঙ্গে দেবীর দক্ষিণে গণেশ বামে কার্ত্তিক – পূর্ববঙ্গে ইহার বিপরীত। আবার লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থানে জয়া বিজয়া বা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কমলকুমার তাঁর রচনায় বাঙালী জীবনে ধর্ম-কাব্য-চিত্র-সংগীতের যে অভেদ্য সম্পর্কের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন তার সূত্র ধরে সিদ্ধান্ত করতে পারি, সকল বাঙালী ধর্মবোধ থেকে দুর্গামূর্তি যবে থেকে মৃত্তিকল্পনায় বিশেষত্বে সন্তান পরিবৃতা

হয়েছেন তখন থেকেই সম্ভবত চালচিত্রের উদ্ভব। আঠারো শতকের আগমনী গানে আমরা এ-বিবরণ পাই যে দুর্গাপুজোর ক'দিন মা পিত্রালয়ে আসেন পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। সেই সময়কার ব্রাহ্মণ অনুশাসনের গৌরীদান প্রথার কালে অসহায় কন্যার পিত্রালয়ে ক্ষণিক অবস্থান তো সত্যিই করুণ বাস্তব ছিল। সেই বেদনাই হয়তো শ্যামা-বিষয়ক গানে এনেছে কারুণ্যের মাধুর্য আর দুর্গামূর্তির নিত্য পারিবারকতায় এনেছে বর্ণময়তা। এই চিন্তা আরেকটু এগিয়ে নিলে এমনও মনে হতে পারে, মূল দেবীচালে মাটির মূর্তিতে যাঁদের ধরানো যায় নি তাঁদের রূপ ও উপস্থিতির জন্য বরাদ্দ হলো পট। তাই মনে হয়, নিছক নান্দনিকতা বা বিন্যাসের খাতিরে হয়তো চালচিত্রের পট গড়ে ওঠে নি। এর পিছনে চার আনা শাস্ত্রনির্দেশ যদি থেকে থাকে তবে বারো আনাই বাঙালীর সরল ভক্তিবিশ্বাস। এটা ঠিকই যে চালচিত্রে আঁকা পৌরাণিক দেবদেবীদের বলা হয় 'চিত্রস্থ দেবতা' বা 'অঙ্গদেবতা', তাঁদের উদ্দেশে এজমালিভাবে সচন্দন গন্ধপুষ্পও বর্ষিত হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এক গ্রামের পটকার প্রভাকর সূত্রধরকে যখন জিজ্ঞাসা করি, 'দেবীর চালচিত্রে সর্বদাই শিব থাকেন কেন?' তখন প্রভাকর হেসে বলেন, 'দেবী মর্ত্যে এসে কেমন পুজো পাচ্ছেন তা দেখতে এসেছেন শিব। সঙ্গে এসেছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু নারদ ইন্দ্র আর দক্ষ। কোনো কোনো চালচিত্রে দেখবেন একটা পালকী আঁকা থাকে, অর্থাৎ পালকী চড়ে কৈলাস থেকে মর্ত্যে এসেছেন তেনারা। তাঁদের বসার জন্যে চাঁদোয়া আঁকা থাকে দেখেছেন? মহামান্যমান ব্যক্তি তো সব, না কি বলেন?'

কিছু বলি না, কেবল মনে পড়ে কমলকুমারের উক্তি যে, 'ভক্তি হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, একমাত্র ভক্তিই সমস্ত সামঞ্জস্য রাখে। যে শিল্পচেতনা একটি মহৎ প্রাণের নামান্তর, শুধু সরলতা, আমাদের ভক্তিরসের চিত্ররূপ সরলতা ছাড়া অন্য কিছু নহে।...জগতের বিষয়কে বাঙলাদেশ শুধু ভক্তির জন্যই বাস্তব করিয়া দেখিয়াছে।'

এমন ক'রে ভাবের দিক থেকে বুঝতে পারলে আমাদের দুর্গাচালের চিত্রলতার রহস্য আর অভিনবত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন আর এই কেঠো জিজ্ঞাসা জাগে না যে, ঠিক কবে থেকে চালচিত্রে পট আঁকার চল হয়েছে। যবে থেকেই হোক না কেন, হয়েছে বড় প্রাণস্পর্শিতার গৌরবে আর ভক্তিভাবের সরলতা থেকে। এই ভক্তিভাবের সরলতা থেকেই বাঙালী কল্পনা করেছে একঅঙ্গে হরহরি কিংবা কৃষ্ণকালী কিংবা ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি। বাঙালী শিল্পীই একেছেন ওঁ-য়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

কিন্তু তবু বাস্তব তথা পরিবেশনের একটা দায় থেকেই যায়। ইতিহাস ব্যাখ্যাতাকে মাঝে মাঝেই একটা কঠিন কাজ করতে হয়, তা হলো ভাবালুতায়

মূলে আঘাত করা। সেইদিক থেকে দেখলে পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর 'দুর্গাভাবনা' নিবন্ধের (দিব্যালোক, শারদ সংকলন ১৩৯৫) অন্তর্গত একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। তিনি লিখেছেন

> কালী কৃষ্ণবর্ণা, দুর্গা গৌরবর্ণা বলিয়া গৌরী। এই কালী ও গৌরীর সঙ্গে বেদের নক্ত ও উষাদেবীর সাদৃশ্য আছে। গৌরী দুর্গা উষা হইতে এবং কৃষ্ণবর্ণা কালী নক্ত হইতে কল্পিত হইতে পারে। পর্বতের গুহার মধ্যে অন্ধকার—উহা কালী এবং গুহার বাহিরে উষা—আলোকস্বরূপা গৌরী। গুহারূপ দুর্গের দ্বারের দেবতা বলিয়া দুর্গা দ্বারবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া অভিহিত। পর্বতের গুহারূপ দুর্গদ্বারে অবস্থান করিয়া দশদিক উদ্ভাসিত করেন বলিয়া দুর্গা গৌরী দশভুজা। দুর্গদ্বারের প্রতীক রূপে দেবীর চালাচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার নীচে দশভুজা দুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ-মন্তব্য মেনে নিলে বাঙালী পটকার ও মৃত্তিকারদের মৌলিক সৃজনশীলতা ও নন্দনবোধকে একেবারে অস্বীকার করতে হয়। বাঙালীর নিজস্বতাবোধ খুবই আঘাত পায়। বিশেষত আমাদের মনে থাকে যে, বাঙালী মূর্তিশিল্পী বড় একটা শাস্ত্রাদেশ মানে নি কোনোকালেই। মানে নি যে তার প্রমাণ হিসেবে আমার সামনেই রয়েছে শ্যাম পালের আঁকা একখানা দশাবতার পটের নমুনা। কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু শ্যাম পাল মৎস্য কূর্ম বরাহ আঁকতে আঁকতে এসে বুদ্ধ মূর্তির আদলে একটা বড় মোচড় দিয়েছেন। কী আশ্চর্য যে তাঁর ভাবনায় বুদ্ধ মানে সর্বত্যাগী প্রশান্ত-আনন গৌতম বুদ্ধ নন, বুদ্ধ এ-পটে দীর্ঘকেশ দাড়িগোঁফযুক্ত

দশাবতার বুদ্ধ

গৌরবর্ণ শৈশবে পরা ব্রাহ্মণ। পরনে ধুতি। এর কারণ জানতে চাইলে শ্যাম পাল বলেছিলেন সরল হেসে, 'পাথুরে মূর্তি যেমন দেখি বুদ্ধের, সে রকম আঁকবো কেন? ওটা তো বৌদ্ধদের বানানো। আমার বুদ্ধ হলেন হিন্দু রাজপুত্র। দশ

অবতারের মধ্যে একজন। ঠিক কিনা ?'

ঠিক কিনা কে বলবে তবে কথাটা নতুন খুব। এ ধরনের চিন্তা কল্পনার মধ্যে খাঁটি বাঙালীয়ানার সুস্থ স্বাদ আছে বৈকি। এর থেকে বুঝে নিতে হবে, খুব বেশি শাস্ত্রগতভাবে পথ খুঁজলে বাংলা চালচিত্র পটের ইতিহাস বা রূপরীতির সঠিক হদিশ হয়তো নাও মিলতে পারে। বরং সমাজ-ইতিহাসের ধূলিধূসর পথে কিছু দিশা মিললেও মিলতে পারে।

এই সূত্রে প্রণব রায়ের লেখা 'সেকাল একালের দুর্গোৎসব' (দেশ, ২২ অক্টোবর ১৯৭৭) রচনা থেকে কিছুটা তথ্যের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সেখান থেকে জানা যায়, মল্লভূম বিষ্ণুপুরের জগৎমল্ল নামে এক প্রাচীন রাজা বাংলায় প্রথম মাটির প্রতিমা পূজা প্রবর্তন করেন। এই শৈলীর নাম 'বিষ্ণুপুরী'। এতে দুর্গার মেড়ে কার্তিক গণেশের বিগ্রহ থাকে দুর্গার পাশে, আর লক্ষ্মী সরস্বতী বিগ্রহ থাকে নিচের থাকে। আরেক রীতির নাম হলো কংসনারায়ণী। তাতে আমাদের চেনা বিন্যাসটি থাকে অর্থাৎ ওপরের থাকে লক্ষ্মী-সরস্বতী আর নিচের থাকে কার্তিক-গণেশ। প্রণববাবুর মতে ষোলো শতকের শেষাশেষি তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এই রীতি চালু করেন। বোঝা গেল, জগৎমল্লের সময়কাল অজানা হলেও কংসনারায়ণী রীতির বিগ্রহবিন্যাস ষোলো শতকের। কেননা ১৫৮০ সালে পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর নির্দেশে কংসনারায়ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের বিকল্পে দুর্গোৎসব করেন ৯ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে।

কালক্রমে বাংলার নানা জনপদে বিষ্ণুপুরী বা কংসনারায়ণী রীতিতে বিগ্রহ রচনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই রীতিতেই চালচিত্র-পট ছিল। তবে সাম্প্রতিক সরেজমিন খোঁজখবরে আমি জানতে পেরেছি সারাদেশে চালচিত্র পট চালু ছিল না, আজও নেই। যেমন এখনকার উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ কোচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে পট থাকে না। লোলার অলংকরণে চালি সাজানো হয়। বরিশালে ঢাকায় বা ফরিদপুরে পটের কাজ ছিল আবশ্যিক, কিন্তু ময়মনসিংহ, শ্রীহট, বা চট্টগ্রামে পট ছিল না। পট দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা বিরল. পুরুলিয়ায় ক্ষীণভাবে যোজিত। সবচেয়ে জমজমাট পটের ব্যবহারে প্রখ্যাত ছিল কলকাতার নানা বনেদী বাড়ির পুজো। তাছাড়া হুগলী-বর্ধমান-হাওড়া-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর আগে এবং এখনও চালচিত্র পটে সমৃদ্ধ। তার কারণ পটুয়া সমাজ এসব জেলায় বরাবর সক্রিয়। দারুতক্ষণ শিল্প এবং পোড়ামাটির মন্দিরের কাজে এসব জেলায় ভ্রাম্যমাণ সূত্রধর সম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরে সজীব। অধিকাংশ চালচিত্র পটে এঁরাই চিত্রণ করতেন। কুমোর আর ছুতোরদের লেনদেনের কিছু ফলাফল আমরা এখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। যেমন, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির চালারীতির দুর্গাপ্রতিমার সম্পূর্ণ এক প্রতিরূপ চালচিত্রসমেত দেখতে পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার ভট্টবাটি বা ভট্টমাটি

গ্রামের একটি টেরাকোটা মন্দিরের প্যানেলে।

ভট্টবাটির এই টেরাকোটা মন্দিরের কোনো প্রতিষ্ঠালিপি বা কালনির্ণায়ক ফলক নেই। তবে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদ' বইতে জানিয়েছেন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন 'বঙ্গাধিকারী' মহেন্দ্রনারায়ণের ছেলে কালীনারায়ণ, যিনি আলিবর্দীর সমকালীন। তার মানে দু'শো বছরেরও পুরানো এই মন্দির। এই চালচিত্র সমন্বিত রিলিফ দুর্গা মূর্তি দেখে আমরা অকাট্য সিদ্ধান্ত করতে পারি যে অন্তত রাঢ়বঙ্গে চালচিত্র অঙ্কনের রেওয়াজ গড়ে উঠেছিলো দু'শো বছরেরও আগে। কোনো কোনো চালচিত্র পটে যে শিবের বাড়ি আঁকা থাকে তার শৈলী অনুসরণ করলে বোঝা যায় তাতে বিলাতি অঙ্কনরীতির স্পষ্ট ছাপ আছে। তার মানে সেগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের চিহ্ন বহন করছে। কোনো কোনো পটে কাংড়া শৈলী ও জৈন চিত্রকলার অনুসরণ আছে। সেগুলি প্রাচীনত্বের দ্যোতক। পটে সমস্ত ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হলে তুলির সাহায্যে সাদা ফুটকির অলংকরণ করা বীরভূমের রীতি মনে করেন কেউ কেউ। নদীয়ার পটে এ-রীতি আকছার দেখি। এ সব নিয়ে ফুটকচালি ক'রে আমরা বড় কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারবো বলে মনে হয় না। বরং চালচিত্র-পটের বিষয়বিন্যাস থেকে কোনো ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছোতে পারি কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।

এ প্রসঙ্গে দিক্‌নির্দেশী কিছু চিন্তার আভাস পাই সুধাংশুকুমার রায়ের বই 'The Ritual Art of the Bratas of Bengal' (১৯৬১) থেকে :

> With the political and religious progress in the country, anthropomorphs gradually replaced the theriomorphs, thus converting the animals into mere clan-symbols, now known as vehicles or *vahanas* — a changeover which can be interpreted as the triumph of 'man over animal'. This stage of imagery ultimately ushered in the epoch of full-figure drawings of the human body in our traditional art.

পশুমূর্তি কেমন ক'রে নরমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আরাধ্য হলো এবং পশু হয়ে গেল দেবদেবীর বাহন তথা গোষ্ঠী-প্রতীক তা বুঝে নিয়ে এবার পরবর্তী ধাপটা বোঝা সহজ হবে। এবারে জানা যাচ্ছে :

> The first stage of the sculptural art of *Puja* is marked with god-heads. When developed further into the second stage, it began to record and illustrate important historical and political events that took place in the country from time to time. The main event we find, is depicted dramatically in three dimensionally modelled figures and the related story is

drawn separately in a two-dimensional painting on the background arch called *chalchitra*, fixed invariably at the back and above the modelled images.

চালচিত্র পটের সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে একটি অভিনব সিদ্ধান্ত এখানে আমরা পাই। সেই ভাবনার সম্প্রসারণে উদাহরণত তিনি লেখেন

For example, the goddess Durga of the lion-clan kills the demon of the buffalo-clan in a fierce battle ; the goddess Kali dominates over the fallen Emperor-god after the great slaughter of her foes ; Lord Shiva, the Great-god, receives 'free 'gifts' of foodgrains from the goddess Annapurna at the time of a great famine in the country ; these are the main themes that are adopted in modelling the foreground ; and the corresponding histories are presented in painting as the background. Such 'composite images' were originally invented to commemorate officially, and stabilize magically the conquests, coronations, marriages and other important events of life of a ruler-god, which continued afterwards in the rigid form of festival, or *Puja*.

সুধাংশু রায়ের বিশ্লেষণে বাংলার মূর্তিশিল্প এক ব্যাপক সমাজ চিহ্নসমেত স্পষ্ট ভূমিকা লাভ করে। অবশ্য তাতে দেশকালগত এক সুদূরতার বোধও এসে পড়ে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, অসুরদলনী কালী কিংবা ভিক্ষারত শিব ও ভিক্ষাদাত্রী অন্নপূর্ণার যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষা তিনি দিতে চান তা চমকপ্রদ। আবার এসব ত্রি-মাত্রিক মূর্তির পশ্চাদ্‌ভাগে আঁকা দ্বি-মাত্রিক চালচিত্র কলার যে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ যুদ্ধঘটনা, অভিষেক, বিজয়লাভ) তাও চমৎকৃতি সম্পন্ন কিন্তু বিতর্কিত। ঠিকই যে, চালচিত্র পটে রক্তবীজ বা শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধচিত্র থাকে, থাকে রামাভিষেক চিত্র, এমনকি ভীষ্মের শরশয্যা বা দশাবতার, কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সর্বথা এসব কাহিনী মেলাতে গেলে বিড়ম্বনা ঘটবে। বরং তার ফলে বাংলার দেবদেবী মূর্তি পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে আমরা হয়তো এড়িয়ে যাবো। সেটা এই যে, এদেশের স্মার্ত ব্রাহ্মণ সমাজ একসময়ে দেবদেবীর ধ্যানরূপ প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁদের নির্দেশে কুম্ভকার বা সূত্রধাররা তার বিগ্রহ গড়েছেন। পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও ভালো কুম্ভকার ছিল না বলে গ্রহ-বিপ্ররা নিজেরাই মূর্তি গড়তেন। কাজেই ব্রাহ্মণ্য ভাবনায় সৃষ্ট স্মার্ত মতের নানা দেবদেবী বিগ্রহের সামাজিক ভাষ্য যেমন দেন সুধাংশু রায়, তেমনই পুরোহিত সমাজ দিতে পারেন তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। মনে রাখা জরুরি যে,

আঠারো শতকে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের অপ্রতিহত সমাজশক্তি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের স্মার্ত ব্রাহ্মণসমাজের ভাবনা সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলো নানা ধরনের ঠাকুর দেবতার মূর্তি। কথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্রের আনুকূল্যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা ঠাকুর গড়ার উৎসাহ পান। নবদ্বীপের রাসে পট-পূর্ণিমায় যে বহুরকম শাক্তমূর্তি (শবশিবা, ভদ্রাকালী, গৌরাঙ্গিনী, মহিষ-মর্দিনী, মুক্তকেশী, রণকালী) গড়ে পুজো হতো এবং আজও হয় তাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে উৎসাহ ও পারিতোষিক দিতেন এমন তথ্য পাই কান্তিচন্দ্র রাঢ়ির 'নবদ্বীপের মহিমা' বইতে। এসব তথ্য বিচারের সঙ্গে আরেক সত্য বিবরণ বিবেচ্য। তা হলো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সমৃদ্ধ চালচিত্র-পটের শিল্পী পরম্পরা পাওয়া যায় কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে। কুমোরটুলি অঞ্চলে যত কুমোর বংশগতভাবে দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই উৎসভূমি কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ শান্তিপুরে। এমনকি বৃহত্তর কলকাতায় যত চালচিত্র সমন্বিত দুর্গা প্রতিমা পুজো হয় তার পট আঁকেন এখনও কৃষ্ণনগরের পোটোরা। এ সব পোটোদের শাস্ত্রজ্ঞান তথা শাস্ত্র-লঙ্ঘনের শক্তি ধরা আছে চালচিত্র-পটে। তথ্য হিসেবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, চালচিত্র-পট কেবল যে দুর্গার বেলা-চালেই তা নয়। অঞ্চল ভেদে কালীমূর্তির মেড়ে, জগদ্ধাত্রী বিগ্রহ এবং এমনকি মনসা ও শীতলা প্রতিমার শীর্ষে চালচিত্র সংযোজন হয়ে থাকে। এই সংযোজনকে খানিকটা প্রচল বলা চলে।

কিন্তু কথা হচ্ছিলো ঠাকুর গড়ার কারিগর বা চালচিত্রের পটকারদের শাস্ত্রজ্ঞান বা লোকজ্ঞান সম্পর্কে। তাঁদের চিন্তার উদারতা ও ধর্মসমন্বয়ের উন্নত বোধ মাঝে-মাঝে আমাদেরও চমকে দিতে পারে। যেমন নবদ্বীপের অনিল পাল পট আঁকতে আঁকতেই আমাকে বললেন, 'দেবী দুর্গা তো শাক্তদেবী, এদিকে দেখুন চাল-চিত্তিরে রাধাকৃষ্ণও আঁকচি। কথা হলো শাক্তদের পটে বোষ্টমদের দেবতা কেন? এর জবাব কি? তবে শুনুন, যে কৃষ্ণ সেই কালী। শাক্ত বৈষ্ণবও এক। কৈলাস আর বৃন্দাবন দু'টোই পুণ্যস্থান, ঐজন্যে দু'টোই লিখেচি পটে। আর একটা কথা কি জানেন যে শাক্তবংশের আর বোষ্টমবংশের দুর্গামূর্তিতে সিংহের তফাত হয়? তফাতটা কি জানতে চান? শাক্তদের বাড়ির দুর্গায় থাকে সাধারণ সিংহ আর বৈষ্ণব বাড়িতে গড়তে হয় ঘোড়ার মত দেখতে শাদা রঙের সিংহ, তাকে বলে নরসিংহ। দেখেছেন?'

আমি বলি, 'দেখেছি তো। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতেই দেখেছি। কিন্তু কৃষ্ণ-নগরের রাজপরিবার তো শাক্ত।'

'কে বললে?' অনিল পাল হেসে বললেন, 'রাজবাড়িতে বারোখানা কৃষ্ণমূর্তি নিয়ে বারোদোলের মেলা হয় বোশেখ মাসে খেয়াল আছে?'

খেয়াল করতে গিয়ে শরৎ মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও

প্রথা' (১৯৭৫ সংস্করণ) বইতে পড়া গেল

কলকাতার অনেক বাটিতে দুর্গাপূজা হইত। শাক্তের বাটীতে দুর্গার সিংহ সাধারণ ভাবে এবং গোঁসাই-এর বাড়িতে সিংহ ঘোড়ার মুখ হইত। সম্ভবত শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভিতর এই প্রভেদ রাখিত।

দুই সিংহ

খেয়াল করতে গিয়ে আরো মনে পড়লো বৈষ্ণবীয় বংশের দুর্গার দেবীচালে শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে ও রক্তবীজের সঙ্গে দুর্গার যে যুদ্ধদৃশ্য থাকে তাতে দুর্গা থাকেন সিংহবাহিনী। সেই সিংহও কিন্তু সাধারণ সিংহ নয়, ঘোড়ার মত শাদা সিংহ। তার মানে পট যিনি আঁকবেন, বিশেষত কোনো পারিবারিক পুজোর চালচিত্র-পট, তাঁকে নিখুঁতভাবে সিংহের ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে আরো অনেক দিকে। যেমন শ্যাম শাল আমাকে বুঝিয়ে দেন দুর্গা মূর্তিতে কেন অসুর থাকে। তার কারণ নাকি এই যে, শক্তি দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তিনবার। একবার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডারূপে, আরেকবার চতুর্ভুজা উগ্রতারারূপে, আর সবশেষে দশভুজা দুর্গারূপে। শেষ হত্যা-দৃশ্যটিই কেবল মৃন্ময় রূপ পায়। এইখানে আমি প্রশ্ন ক'রে বসি, 'দেবীচালে দশমহাবিদ্যা আঁকা হয় কেন?'

দশমহাবিদ্যা শুধু দেখলেন? অষ্টনায়িকা দেখলেন না?

অষ্টনায়িকা কে?

: দেবীর ধ্যানে বলা হয়েছে আটরকম শক্তির দ্বারা দেবী সর্বদা শক্তিময়ী হয়ে আছেন। তাঁদের নাম—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা। এদের অষ্টসখীও বলে। এই দেখুন অষ্টসখীর পট।

সেই পটচিত্র মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। নীল জমির উপর নিখুঁত জ্যামিতিক বিন্যাসে আঁকা আটজন নারী। একজনের হাতে তীরধনুক, অন্যজনের হাতে উন্মুক্ত অসি। এই ক্রম-বিন্যাসে আটটি চিত্রণ। একই রকম ভঙ্গী, একই রকম মুখাবয়ব, একই পোষাক। কেবল ওপর থেকে চাপানো সাদা ফুটকির অলংকরণে একজনের সঙ্গে

অন্যজনের শাড়ির তফাত ঘটে গেছে। চমৎকার। জানতে চাইলাম, এই সব শিখলেন কার কাছে?

এসব বংশপরম্পরার কিস্যে। জাতিবিদ্যে। সেই ঠাকুর্দামশাই ৺ গদাধর পাল আঁকতেন দেবীচাল। তারপরে পিতা ৺ যোগেন্দ্রনাথ পাল। তাঁর কাছেই শিক্ষা। তা বাদে ধরুন কত রকমের দেবীচাল হতো আগে। কলকাতায়, চুঁচড়োয়, কালনায়, নবদ্বীপে। আবার এদিকে নাসপুরের রাজবাড়িতে, জঙ্গীপুরে, জিয়াগঞ্জে, লালবাগে, বহরমপুরে। সব ঘুরে ঘুরে দেখতাম। পোটোদের সঙ্গে লতায় পাতায় সম্পর্কও তো আছে। ভাবনাচিন্তার লেনদেনও চলতো।

কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান? ঐ সব উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা সব শিখলেন কোথা থেকে?

মুখে মুখে। শুনে শুনে। তবে মাঝে মাঝে বিস্মরণ হয়ে যেতো। তখন ছুটতাম নবদ্বীপের স্মৃতিরত্ন মশায়ের কাছে। অগাধ পণ্ডিত।

স্মৃতিরত্ন বলতে কে? নাম কি?

নাম মনে নেই।

সেকি? এত সব কথা মনে আছে আর মানুষটার নাম মনে নেই?

মানুষের নাম মনে রেখে কি হবে? আজ আছে কাল নেই। শাস্ত্র ধর্ম থাকবে চিরকাল। শাস্ত্রের কথাগুলো থেকে যাবে। আর এই যে শ্যাম পাল। একদিন ঠিকই মরে যাবো। তখন কি থাকবে?

আছে অবশ্য। আমার কাছেই রয়েছে শ্যাম পালের দেবীচাল আর অষ্টলক্ষ্মীর পট। মানুষটা অবশ্য সত্যিই বেঁচে নেই।

শ্যাম পাল বেঁচে নেই। তাঁর সহোদর ষষ্ঠীচরণ বেঁচে নেই। কিন্তু শ্যামের খুড়তুতো ভাই ধর্মদাস বেঁচে আছেন। বয়স হয়েছে, চোখে ঠুলির মত চশমা, ক্যাটারাক্ট। দেবীচাল আঁকতে পারেন কিন্তু আঁকেন না। উৎসাহ পান না, ন্যায্য দাম পান না কাজের। নিজেও বাউণ্ডুলে স্বভাবের। বিয়ে থা করেন নি, পিছুটান নেই। তাই বছরের বেশির ভাগ সময় শ্রীরামপুরের চাতরার কুমোর পাড়ায় ঠাকুর গড়েন। উদাসীন টাইপ। চালচিত্র-পট আঁকার হাতখানা কিন্তু পাকা। যেমন বুনোট তেমনই শেডের কাজ। রেখায় টানটোনও খুব স্বচ্ছন্দ। কিন্তু বড্ড গেঁতো ধরনের মানুষ। কিছুতেই হাতে তুলি ধরানো যায় না। ধরলে কিন্তু ঘুন্সুমার কাণ্ড। শাস্ত্রজ্ঞানও প্রখর। মুখে অবশ্য বিনয়বচন, 'আমি তো তেমন কিছু জানি না। জানতো আমার দাদা শ্যাম পাল। আপনি তো দেখেছেন তাকে। শুদ্ধাচারে পট লিখতো উপোষ ক'রে। আগে নিয়মকানুনও ছিল কড়া। যে সব বনেদী বাড়িতে দাদা কিংবা আমার বাবা ৺নগেন্দ্রনাথ পাল

পট লিখতে যেতেন সেখানে মান্যতা ছিল কত। আমি তো তাঁদের পেটেলি করেছি কিনা। 'এই ধম্মো, তুলিখান দে', 'লণ্ঠনখানা ধর্ ভালো ক'রে' কিংবা দিলেন হয়তো একটা ফাঁকা জায়গা রঙে ভরাট করতে। তো যা বলছিলাম। সে সব বনেদী বাড়িতে পট লেখার সময় উপবাসে থাকবার নিয়ম ছিল। তারপরে সায়ংসন্ধ্যায় নিরিমিষ খাওয়া।

কেন আমিষ খেলে কি ক্ষতি?

দাদা বলতো আমিষ খেলে স্বভাবে উগ্রতা আসে, অহংভাব জাগে, ভক্তি কমে যায়। তা সাত্ত্বিকভাবে ছবি লেখা হলে পেটপুরে মিষ্টি দই খাওয়াতেন বাবুরা। ভালো টাকা দিতেন। তাছাড়া ধুতি গামছা, পরিবারের জন্যে শাড়ি।

: শুনেছি পটলেখার নাকি কীসব নিষেধ আছে?

একেক পরিবারে একেক রকমের নিষেধ। যেমন আমাদের কোনো কোনো কুটুম্ববংশে বামাকালী কখনও গড়ে না বা লেখে না। বামাকালী বুঝলেন না? সাধারণত শিবের বুকে মায়ের ডান পা থাকে। তাকে বলে দক্ষিণাকালী। সেটাই বেশি গড়া হয়। আর যেখানে শিবের বুকে মায়ের বাম চরণ সেই হলো বামাকালী। কেউ দশমহাবিদ্যা লিখতে গিয়ে ধূমাবতী বা বগলা লিখবে না। আমরা ছিন্নমস্তা লিখি না।

: কেন?

বংশের সংস্কার বলতে পারেন। বাপ-ঠাকুর্দা কখনও লেখেন নি। আমাদেরও নিষেধ ক'রে গেছেন। ওতে নাকি বংশ থাকে না।

বংশের আর কী আছে আপনার? শ্যাম পালের সন্তান নেই, আপনিও বিয়ে করেন নি।

জিভ কেটে ধর্মদাস বলেন, 'বালাই ষাট। শ্যাম পালের সহোদর ৺ষষ্ঠীচরণের সন্তান স্বপন রয়েছে না? তাদের ছেলেমেয়ে? তাদেরও একটা হিত-অহিত আছে। আমি কি ঝস্ ক'রে বংশধারা ছেড়ে ছিন্নমস্তা লিখতে পারি?'

আমি তর্কের খাতিরে বললাম, 'কিন্তু ধরুন আপনাকে কোনো কারণে বাধ্য হয়ে দেবীচালে দশমহাবিদ্যা আঁকতে হলো, তখন কি হবে? ছিন্নমস্তা বাদ দিয়ে কি দশমহাবিদ্যা হতে পারে?'

ধর্মদাস সহজ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, 'সে খুব সহজ ব্যাপার। মনে করুন, দশমহাবিদ্যের মধ্যে ন'খানা ছবি আমি লিখলাম, বাকি রইলো গিয়ে আপনার ছিন্নমস্তা। তো সেটা স্বপন এঁকে দেবে। মিটে গেল।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'সে কি? স্বপন কি আপনার বংশের কেউ নয়?'

ধর্মদাস বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু স্বপন তো দশমাবিদ্যের অন্য ছবি লেখে নি। শুধু ছিন্নমস্তা লিখেছে। তাতে দোষ অর্শাবে না। মোট কথা একটানে একজন দশমাহিদ্যে লিখবে না। এবারে বুঝলেন?'

বুঝলাম যে চালচিত্রের পটের শীর্ষ বিন্দুতে অলৌকিকের সঙ্গে মিশে আছে কত লোকায়ত ভাবনা ও বিশ্বাস। নীরব পটে মুখর জীবনের অন্তর্লেখা।

তার সম্পূর্ণ সুলুক সন্ধান যে এতবছরে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছি তা বলতে পারি কই? আমার জানা তাই ফুরোয় না। যেমন ধরা যাক ধর্মদাস পাল আমাকে বললেন চালচিত্রে আগে নাকি থাকতো অষ্টনায়িকা। এখনকার দেবীচালে কোথাও সে-পট পাওয়া অসম্ভব। ধর্মদাসের বাবা নগেন্দ্রনাথ মুর্শিদাবাদের এক জমিদারবাড়ির প্রতিমায় আঁকতেন অষ্টনায়িকা। ধর্মদাস কখনও আঁকেন নি অষ্টনায়িকা। শুধু বাবার আঁকা ছবির একটা রূপময় আভাস স্মৃতিতে ভাসে আজও। আমিও লেগে যাই তার পুনরুদ্ধারের কাজে আর তাগাদায়। তাগাদা বলে তাগাদা। মাসের পর মাস চলে যায়, বছর ঘোরার মুখে, তবু গেঁতো ধর্মদাসকে পটের সামনে বসাতে পারি না। কাগজ রং তুলি কিনে দিলে কী হবে? মানুষটার ভেতরে-বাইরে হতাশার তাপ লেগেই আছে। অবশেষে দিনকতকের শ্রমে উঠে আসে আটখানা ছবি। উজ্জ্বল গোলাপি জমির ওপর অষ্টনায়িকা এসে দাঁড়ান বিচিত্র লোককল্পনা আশ্রয় ক'রে। নামগুলোও তেমনই—বরাহানী, হংসানী, ইন্দ্রাণী, নারায়ণী, ব্রহ্মাণী, সিংহানী, কাত্যায়নী আর শিবানী। এঁরাও সব দেবী। তবে কোন লোকপুরাণে যে এঁদের বসবাস আর কীর্তিকলাপ কে জানে। ধর্মদাসকে জিজ্ঞেস করলে বিহ্বলভাবে হেসে বলেন, 'আমি অনেক কষ্টে স্মরণ ক'রে ক'রে তবে আঁকলাম। এঁদের কী যে মহিমে তা তো জানিনে বাবু। এঁদের নিয়ে একটা ক'রে কাহিনী ছিল নিশ্চয়ই। আজ আর নেই। হারিয়ে গেছে। বলার মত মানুষ নেই। পোটোদের ঘুগ ফর্সা।'

আসলে যা হারিয়ে গেছে তা হলো বাঙালী জীবনের উপচিতি আর জীবনযাপনের ছন্দ। হারিয়ে গেছে শ্রী আর কল্যাণ। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ,

অর্থনৈতিক মন্দা আর রাজনীতির অতিরেক বাঙালী মনের ঔদার্য আর জ্বায়মান জীবনের সুষমাকে বড় নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে। মুছে দিয়েছে তার শিল্প-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার এক একটা উজ্জ্বল পর্ব। তাই দেখি বাংলার চালচিত্র,

যা ছিল শাস্ত্রের সৌন্দর্য আর লোকধর্মের উৎসাহ, আজ তা সাঁটা ছবির প্রথাগত হীনতায় বিশীর্ণ ও অবনয়নমুখী। খবরের কাগজে খড়িমাটির পলেস্তারা দিয়ে যেমন-তেমন সস্তায় কেনা রং আর জ্যাবড়া রেখা টেনে চালচিত্তির বিকিকিনি চলছে।

মানও নেই, দামও নেই। সমঝদারি তো একেবারেই নেই। বাংলার চালচিত্র-পট তাই ধর্মদাসের স্মৃতিপটের মত ধূসর ও নিরুদ্যম। অথচ তার ছিলো একটা সুসমৃদ্ধ অতীত। বর্ণময় বিচিত্র ও সুন্দর।

অষ্টনায়িকা

এখনও দেবীচালের সেই সমৃদ্ধ অতীতকে ক্ষণিকের জন্য ছুঁয়ে আসা যায়, যদি ইচ্ছা থাকে। যেতে হবে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় সংগ্রহশালায়, যেখানে রয়েছে পনেরো হাত এক সুদীর্ঘ দেবীচাল। কালো জমির ওপর হলুদ-লাল সবুজ নীলে আঁকা অজস্র চিত্র। অসংখ্য দৃশ্য ও চরিত্র। ঘটনার পর ঘটনা। অর্ধবৃত্তাকার পটের ওপর চরিত্রগুলি বিভিন্নভাবে ও ভঙ্গিমায় আনুভূমিক পদ্ধতিতে সাজানো। ঘটনা-গুলি পরপর গায়ে গায়ে আঁকা, কোনো বিভাজন রেখা নেই তবু গঠনগত কাঠামোর কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না। রং লাগানোতেও রয়েছে সমতলীয় গুণধর্মিতা অথচ প্রতিটি বস্তুর আলাদা আলাদা ধরন স্পষ্ট।

কিংবা যেতে হবে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে, যেখানে রয়েছে হাতির দাঁতে খোদাই করা দেবী মূর্তি এবং তার অনুপুঙ্খ চালচিত্র। ঐ গ্যালারির পাশেই রয়েছে জয়পুরী পাথরে তৈরি এক দুর্গামূর্তি, যার দেবীচালে মিনে করা আশ্চর্য চিত্রণ। ব্যাপারটা সত্যিই ভাবিয়ে দেয়। সে ভাবনাটা এই যে, বাংলার চালচিত্র-পট কত রকম মাধ্যমকেই না উদ্বুদ্ধ করেছে। পট থেকে পাথর, হাতির দাঁত, কাঠখোদাই, টেরাকোটা এবং এমনকি বাঁকুড়ার উমেশ কুণ্ডে দেখেছি অষ্টধাতুর এক নিত্য-পূজার দুর্গামূর্তি যার দেবীচালে রয়েছে অষ্টধাতুর রিলিফ কাজ। পটের এতরকম রূপান্তর?

এসব দেখে মনে হয় বাংলার চালচিত্র-পটের প্রস্তাবনা যদিও ঘটেছিলো দুর্গা মূর্তিকে রূপমন্ত করতে, কিন্তু পরবর্তীকালে তা প্রভাবিত করেছে নান্দনিক আরও বহুরকম কলাকুশলতাকে। আমাদের শাস্ত্রছুট মনের কত লোকায়ত স্বপ্ন কল্পনা পথ ক'রে নিয়েছে দেবীচালের অলংকৃত অর্ধবৃত্তে। এই তো আমার সামনেই রয়েছে হাতির দাঁতে খোদাই করা এক দেবীচালের মিনি মডেলের

ফোটোগ্রাফ। কৃষ্ণনগর। রাজবাড়ির কালেকশন। কী বিপুল তার আয়োজন ও সম্পূর্ণতা। এই দেবীচালে রয়েছে মাঝখানে পঞ্চানন দশভুজ শিব, দুই প্রান্তে যথারীতি দুই যুদ্ধদৃশ্য। বাকি প্যানেল বিভাজন রেখায় দুই স্তরে সাজিয়ে

হাতির দাঁতে তৈরি চালচিত্রের অনুপুঙ্খ (১৯ শতক)

একদিকে ওপর থাকে দশাবতার নিচের থাকে কৃষ্ণলীলা খোদাই করা, আরেক দিকে ওপর থাকে দশমহাবিদ্যা নিচের থাকে অষ্টনায়িকা। সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট, জটিল অথচ সুন্দর। সব ছাপিয়ে এক অনবদ্য শিল্পিতা ও উৎকর্ষের আনন্দ। চালচিত্র এতটাই নয়নমনোহর ও শিল্পকৌশলসম্পন্ন ছিল আগে। আগে বলতে মাত্র দু'শো বছর। এখন তাই হাতির দাঁতে খোদিত চালচিত্র দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রত্নকালের জীবাশ্ম দেখছি। এত সুদূর? এত অপ্রাপনীয়? বুঝতে পারি সুন্দরের সামনে দাঁড়ালে, কত শ্রীহীন আর কেজো হয়ে গেছে আমাদের জীবন।

ভট্টবাটির টেরাকোটা মন্দিরের রিলিফ চালচিত্র (১৮ শতক)

আজকের কেজো জীবনে আমরা আহরণ করি শুধু সেই সব জ্ঞান ও তথ্য যা কেবল আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে বা পরীক্ষা জয়াবে। আমাদের চেতনাকে যা উন্নত করবে, দেশকে চেনাবে, খুলে দেবে শিল্পসংস্কৃতির অলিন্দ তা

আমরা বড় একটা জানতে চাই না আর। তাই যখন অনিল পালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আঁকা পটে নবদুর্গা বলে একটা ছবি দেখলাম, সেটা কে?' তখন অনিল পাল বললেন, 'লক্ষ করেছেন কি যে আসলে একই সিংহবাহিনী বিভুজা দেবী তারধনুক হাতে মোট ন'খানা?' সেটা অবশ্য তেমনভাবে দেখি নি। দেখে নিয়ে তারপরে জানতে চাই কে এঁরা?

: এঁরা হলেন কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্র, ধাত্রিতা আর বৈষ্ণবী। এঁরা সবাই দুর্গার অংশ, নাম আলাদা হলেও স্বরূপত এক। তাই একই রূপে এঁদের লেখা হয়।

কথা শুনে আমি অবাক হয়ে অনিল পালের দিকে চেয়ে থাকি খানিক। কী আশ্চর্য স্মরণশক্তি আর পুরাণের জ্ঞান। বসে আছেন নবদ্বীপের প্রান্তিক পল্লী অন্নপূর্ণা কলালী পাড়ায় আধভাঙা এক মাটির হস্তশ্রী মেঝেতে। ভগ্নস্বাস্থ্য, মাদকাসক্ত, হতাশ এক পোটো। পেট ভরে খাওয়া জোটে না। ঘরে নেই তৈজসপত্র। অশিক্ষিত প্রবীণ মানুষটি। কিন্তু নিজের জাতিবিদ্যায় পরাক্রান্ত গুণী ও তাত্ত্বিক। গড় গড় ক'রে বলে দিতে পারেন শবশিবার সঙ্গে ভদ্রকালীর পার্থক্য কোথায়, শ্যামা কালী আর রণকালী কোথায় ভিন্ন। আমি অবশ্য তাঁকে টেনে আনি বাস্তবে। বলি, 'কী ভাবে দেবীচালে ছবি লেখেন?'

: প্রথমে কাগজ জুড়ে জুড়ে অর্ধচন্দ্রের মতো মেঝেতে মেলে ধরি। তাতে খড়ি-মাটি বোলানো থাকে।

খবরের কাগজ কেন? সস্তা বলে?

সেটা একটা কারণ বটে, তবে আসলে খবরের কাগজের ওপরটা খসখসে তো, রংটা কামড়ে ধরে। তাতে কাজ সহজ হয়।

তা বেশ, অর্ধচন্দ্রের মতো দেবীচালের পটের একটা ধাঁচা সামনে রইলো। সাদা রংয়ের। তারপরে?

এবারে ধরুন ঐ কাগজে ভাগ ক'রে নিতে হবে মনে মনে দু'টো—জমি আর আকাশ। আকাশটা ওপরে। ফিকে নীল তাতে ছানা কাটা সাদা মেঘ।

মেঘ তো থাকে না সাধারণত।

আমার চালে থাকে। নীল আকাশে সাদা মেঘ। কেন? না শরৎকাল। ব্যাস। এবারে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ফিগার ছকে নিয়ে লিখে যাওয়া। কেবল শিব আর শিবের বাড়ি ঠিক মাঝখানে খেয়াল রেখে পুতুল লিখে যেতে হবে। রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল। কেন? ডাকের সাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তো।

বুঝতে পারি একেই নিখুঁত বস্তুজ্ঞান বলে এবং সেই সঙ্গে চোখ কান খোলা। নীল পটভূমির কারণ হলো দূরত্ব বোঝানো। অবশ্য অনেক চালচিত্রের পটে জমির রং দেখেছি গোলাপী। তবে নীলটাই বেশি চলতি। পটে সাধারণভাবে প্রাইমারি কালারগুলিরই ব্যবহার ঘটে, সঙ্গে থাকে দ্রুত রেখার টান। শিবের

মূর্তি চালচিত্রভেদে আলাদা। কোথাও বীণাবাদক শিব, কোথাও গঙ্গিকাসেবী ঊর্ধ্বনেত্র, কোথাও নৃত্যরত, কোথাও বৃষভবাহন শূলা। হাটসেরান্দির পটে একেবারে মাদকাসক্ত শ্মশান মূর্তি শিবের। বিষ্ণুপুরের চালচিত্রে শিব যেন আদিবাসী। মেদিনীপুরের কোনও কোনও দেবীচালে দেখা যায় শিবের বুনোট আর রেখাবিন্যাস ভেঙেচুরে একেবারে লোকশিল্পের আদল নিয়েছে। মোট কথা বাংলার নানা জেলার চালচিত্র-পটে আঁকা শিবের ছবির একটা প্রাতত্তুলনার প্যানেল বানালে পটকারদের শৈলী আর দৃষ্টিকোণ অঞ্চলভেদে কত তফাত বোঝা

শিবের প্যানেল

যাবে। তেমনই অঞ্চলভেদে পুরো চালচিত্রের অর্থবৃত্ত ভালো ক'রে আগাগোড়া খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কলকাতা-হুগলী-২৪ পরগনা-নদীয়া-বর্ধমানে চালচিত্র খুব নিখুঁত ড্রইংয়ে আঁকা। অন্তপক্ষে বীরভূম আর মুর্শিদাবাদের চালে জড়ানো পটের নিভুল সংক্রাম। শিবানুচর বা শুম্ভ-নিশুম্ভের সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে আদুপটের

দৈত্যদানব ঢুকে গেছে। বর্ধমানের নন্দীগ্রাম থেকে পাওয়া একটা চালে দেখছি ফিগারগুলি একেবারে লোকশিল্পের ধাঁচে আঁকা, অলৌকিক। যেন সব উদ্ভট মূর্তি। বাঁকুড়ার একটি চালে রয়েছে হাল্কা নীল জমির ওপর লাল আর গাঢ় নীল রেখার বিভাজন। বিভাজিত আলাদা আলাদা খোপে এক একটা এক এক ফিগার—শিব-নারদ-নারায়ণ-ব্রহ্মা-চন্দ্র। চালের দুই প্রান্তে যুদ্ধ নেই, শুধু অসুরের

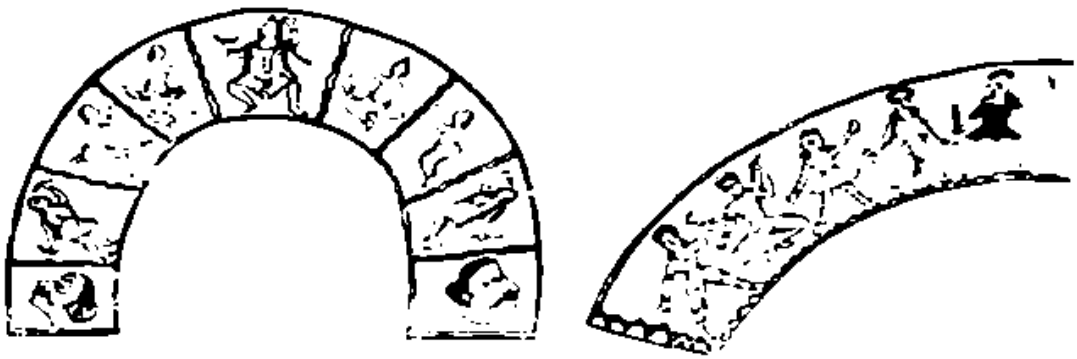

লোকায়ত চালচিত্র

ছিন্ন মুণ্ড। তার ঠিক ওপরের খোপে দু'দিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী মুক্তকৃপাণ শক্তি মূর্তি। সবই যেন আদিম ও সহজ। স্পষ্ট আর রহস্যহীন। দেখতে দেখতে খেদের সঙ্গে মনে হয়, দেশে এত তো আর্ট গ্যালারি, এত প্রদর্শনী, এত স্পনসর, কেবল চালচিত্রের সংগ্রহ আর সংরক্ষণ নেই। সব জেলার দেবীচালের নমুনা যদি এক জায়গায় থাকতো!

আসলে চালচিত্রের শোটোদের যেমন সে রকম সামাজিক মর্যাদা, সম্ভ্রম বা অর্থকৌলীন্য নেই, তেমনই এই শিল্পরীতির মূল ভিতের মধ্যেই একটা বিনাশের লক্ষণ রয়ে গেছে। কেননা চালচিত্র তো জড়ানো পট বা কালীঘাটের পটের মত স্থায়ীভাবে রাখার কথা ভাবা হয় না। তার আয়ু নিতান্তই পুজোর চারদিন। ঠাকুরও বিসর্জনের সময় জলে ভাসলো, দেবীচালের আঁকা পুতুল আর রূপরেখারও ঘটে গেল সলিল সমাধি। পটকারদের এঁকে তেমন টাকা জোটে না, শিল্পী বলেও যশ মেলে না, শিল্পপ্রতিভার নমুনাটুকুও টেঁকে না—তাহলে কীসে উৎসাহ পাবেন তাঁরা? সেই সঙ্গে ভক্তিভাব আর সাত্ত্বিকতার বদলে একটা প্রথা ঠেকানোর মনোভাব এসে গেছে বলে চালচিত্র এখন সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছে। ফলে তাতে সুন্দরের স্পর্শ লাগে। তার রেখার টানে যেমন গোঁজামিল, ফিগারে তেমনই স্থূলতা, রঙেও নেই উজ্জ্বলতার জলুশ।

রঙের প্রসঙ্গে কপালীশাড়ার অনিল পালের মন্তব্যটুকু অবধান করবার মত। বললেন, 'আমাদের ছোটবেলায় বাবা ৺শিবচন্দ্র পালের আমলে দেখেছি শাদা রং হতো কাঠখড়ি দিয়ে। লাল রং হতো হিঙ্গল দিয়ে। একরকম লাল টুকটুকে

রং ছিল খুবই দামি, এখন আর চলন নেই, তাকে বলতো মিনে। হীরাকষ থেকে নীল। সাধারণ হলদে হতো শিউরি বা হরিতাল দিয়ে। আর গাঢ় হলুদের জন্যে সেকালে আশি টাকা ভরি গাম্বুজ বলে একরকম জিনিস পাওয়া যেতো। এ সব রং পোটো বাড়ির মেয়ে-বউরা শিলে গুঁড়ো ক'রে মেটে সরায় গুলতো। ঐ দেখুন ঘরের কোণে রয়েছে সাবেক কালের রং গুঁড়ো করবার শিল। কতকাল ব্যবহার হয় না। এখন দপ্তরীর দোকান থেকে সস্তা গুঁড়ো রং কিনে চালিয়ে দিই আমরা। কেই বা দেখছে, কেই বা বুঝছে। একখানা বারো-হাত চালে আঠাশখানা কিপার এঁকে তিনদিনের মেহনত ক'রে পাঁচ রকমের রং লাগিয়ে পাওয়া যায় কুল্লে কুড়িটা টাকা। ফুঃ।'

সেইজন্যেই মনে হয়, বারোয়ারী পুজোর আঁক যেমন বাড়ির পুজোকে ম্লান ক'রে দিয়েছে, আলাদা আলাদা মূর্তিপুজোর চলন এসে যেমন মেড়ের চালচিত্রকে সংখ্যায় শোচনীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছে তেমনই দেবীচালের পোটোদের আদর আপ্যায়ন রোজগারও ঘুচেছে। শ্যাম পাল, অনিল পাল, ধর্মদাস পাল, শ্রীধর মাইতি, হাত সূত্রধরদের মত জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন পোটো এখন সারাদেশ চুঁড়লে হাতে গোনা যাবে। নতুন ছেলেরা যেমন তেমন ক'রে আঁকছে, অবসরে ঠাকুর গড়ে কিংবা চাকরি। ঘূর্ণিপাড়ার বেবা পালের মত কুমোর বাড়ির অদক্ষ তুলির কাজের গৃহবধূ বা তার প্রাথমিক শিক্ষিত কন্যা এখন পট লেখে। প্রশ্ন করলে দেখা যায়, কী আঁকছে জানে না, কেন আঁকছে বোঝে না। চালচিত্রের পট ট্রেডল মেশিনের হ্যাণ্ডবিল ছাপার মত নিষ্প্রাণ বেরিয়ে আসছে। যেন বেখাম্বিক রঙের অপচয়।

এতে সবচেয়ে যা খারাপ ফল হচ্ছে তা হলো দেবীচালের পটে যে-একটা বিপুলতা আর অসংখ্য ভঙ্গীর কিপারের বৈচিত্র্য ছিলো তা সীমায়িত হয়ে আসছে। সাধারণ মেধা ও মাপের চালচিত্রকর যে সব থিম পুরাণ বা লোকায়ত ভাবনা থেকে আঁকছেন তা নিজেই গভীরভাবে জানেন না। ফলে নানা চরিত্রের ছবিগুলির দাঁড়ানোর ধরন বিশেষত মুখের ভাবে ব্যঞ্জনা থাকছে না। 'নবনারী কুঞ্জর' ছবিতে ন'টি নারীমূর্তি বিশেষ বিন্যাসে সাজিয়ে যে-কুঞ্জর বা হাতীর আভাস আনতে হয় তাতে ড্রইংয়ের পাকা জ্ঞান লাগে। কিংবা ধরা যাক 'সপ্ততালভেদ' ছবি। বিষয়টা কি? নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র একটি মাত্র তীর নিক্ষেপ ক'রে পরপর সাতটি তালবৃক্ষ ছেদন করছেন। এখানে লক্ষ রাখতে হবে রামের তীর ছোঁড়ার ভঙ্গীর দিকে. সেই সঙ্গে মুখে ফোটাতে হবে গর্বিত হাসি। এসব আমাকে বোঝাতেন শ্যাম পাল। এখন এমনতর আলেখ্য এত ধরে ধরে আঁকবে কে? সেই ভক্তি, সেই রেখার সবলতা কই? কাজেই এখনকার চালচিত্রে এ ধরনের থিমেটিক ছবি বা অ্যালিউসিভ ছবি বর্জিত হচ্ছে। তাতে বঙ্গীয় চিত্র-ধারারই একরকম ক্ষতি হচ্ছে।

অ্যালিউসিভ ছবি বলতে মনে পড়ে গেল বর্ধমানের বনকাপাশী গ্রামের সুবোধ মালাকরের কথা। সম্বৎসর দেবদেবীর সোলার সাজ বানান। কিন্তু চালচিত্রকর হিসেবেও দক্ষ। কথায় কথায় এঁকে দেখালেন 'সপ্ততালুভেদ' বলে এক ছবি। আগে নাকি চালচিত্রে থাকতো। ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'সপ্ততালুভেদের একখানা কাহিনী আছে জানেন?'

কত কীই যে জানি না। এ সব সরল গ্রামীণ মানুষের কাছে নিরতিশয় লজ্জা পাই। লজ্জাজনিত নীরবতা থেকে উদ্ধার ক'রে সুবোধ মালাকর বলেন, 'দ্রোণাচার্য কেমন ক'রে মারা গেলেন বলুন তো? তাহলেই সপ্ততালুভেদ বুঝবেন।'

এবারে গর্বিতভাবে বলি, 'সেটা জানি। কুরুক্ষেত্রে যখন দ্রোণাচার্যকে কিছুতেই পরাজিত করা গেল না তখন ভীম মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে হাতীকে বধ ক'রে এসে যুদ্ধরত দ্রোণকে সে খবর দেন। দ্রোণের নিজের সন্তানের নামও অশ্বত্থামা। তাই বিহ্বল ও শংকিত দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে খবরটির সত্যতা বিষয়ে জানতে চাইলেন, কেননা তিনি জানতেন যুধিষ্ঠির কখনো মিথ্যা বলেন না। যুধিষ্ঠির তখন কৌশল ক'রে জোরে বললেন 'অশ্বত্থামা হতঃ' এবং অনুচ্চস্বরে বললেন 'ইতি গজঃ'। খবরের এই পরের অংশ দ্রোণের কানে গেল না। তিনি হতোদ্যম হয়ে অস্ত্রত্যাগ ক'রে যোগাসনে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হলেন। তখন দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন রথে উঠে এসে দ্রোণের মাথা খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করলেন।'

সুবোধ মালাকর বললেন, 'উঁহু, ওভাবে তাঁর মরণ হয় নি। তাঁর গায়ে অস্ত্রাঘাত করবে এমন কি কেউ জন্মেছে? ব্যাপারটা হয়েছিলো এই রকম। অশ্বত্থামা হত শুনে তিনি ধনুকের জ্যা, যাকে বলে ধনুষ্কোটি, তাতে চিবুক রেখে দারুণ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিদারুণ পুত্রশোক বলে কথা। ঝরঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।'

: তারপর?

তারপর সেই চোখের জল গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে ধনুকের ডগা বেয়ে ধনুকের ছিলে ধরে তির তির ক'রে নামতে লাগলো। কৃষ্ণ আর অর্জুনের রথ থেকে সেই জলের ধারা দেখে যেন মনে হচ্ছিলো ধনুকের জ্যা বেয়ে নেমে যাচ্ছে একটা সাপ। অন্তর্যামী কৃষ্ণ সবই বুঝলেন। তবু কৌশল ক'রে অর্জুনকে বললেন, 'এ কি অর্জুন? তোমার অস্ত্রগুরুর জ্যা-তে সাপ চরছে আর তুমি দেখছো? এখুনি যে সর্পাঘাতে প্রাণ যাবে দ্রোণের। বাণ মেরে সাপটাকে বধ কর।' ব্যাস্। অভ্রান্ত লক্ষ্য অর্জুনের। এক বাণে সর্পভ্রমে জ্যা ছিন্ন করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বেগে ধনুষ্কোটি চিবুক ভেদ ক'রে দ্রোণের মাথার তালু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। দ্রোণ দেহত্যাগ করলেন। বুঝেছেন? এই হলো মূল বৃত্তান্ত। একেই আমরা লিখেছি সপ্ততালুভেদ পটে।

দেখলাম সেই ছবি দু'চোখ ভরে। দ্রোণের মাথার উপরিভাগ আর চিবুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নীল জমির আস্তরণে রক্ত রঙের কি মহিমা। পীতাভ দ্রোণের মুখমণ্ডলে আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তির সে কি চকিত চমক।

দেখতে দেখতে আমার অন্য একটা কথাও মনে হলো। এ তো কেবল ছবি নয়, এতে ধরা রয়েছে পুরাণের পুনর্নির্মাণের একটা বাঙালী ছক। চালচিত্রের পটে গাঁথা আছে অলৌকিকের কিছু কিছু লোকায়ত ভাষ্য। সেই ভাষ্য দ্রুত নেমে যাচ্ছে ভাষাহীন অতীতের অতলে॥

[স্কেচ : সুশোভন অধিকারী (শান্তিনিকেতন) অভিজিৎ রায় (বরোদা) । ফটো : সত্যেন মণ্ডল ।]

ঋণ স্বীকার সুবলচন্দ্র মৈত্র (শান্তিপুর), ডঃ জয়ন্ত চক্রবর্তী (শান্তিনিকেতন), শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম), ডঃ শ্যামল রায় (জিয়াগঞ্জ), রণজিৎ চৌধুরী (মেদিনাপুর), কণিকা বিশ্বাস (বিষ্ণুপুর), কুন্তল মিত্র (কৃষ্ণনগর), ডঃ প্রদ্যোৎ গোস্বামী (নবদ্বীপ)।

মালিনী ভট্টাচার্য

ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক শিল্পী

(১৯৪২-১৯৪৮)

ভারতীয় গণনাট্যসংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এলাহাবাদে, ১৯৪৯ সালের ৪-৯ ফেব্রুয়ারি। সংগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে এই সম্মেলনে বলা হয়েছিল

> বর্তমান অবস্থা এই যে, সাত বছর আন্দোলনের পর গণনাট্যসংঘকে ঘিরে কেবল কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জড়ো হয়েছেন। সংগঠনের নানা ত্রুটি ও বিভ্রান্তির ফলে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংঘকে গড়ে তুলতে তাঁরা অনেকেই অক্ষম, এবং এই আন্দোলন এখনো এমন এক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় নি যার মধ্যে তাঁরা মিশে যাবেন, আবার এমন অনেকে রয়ে গেছেন যাঁরা এই আন্দোলনে আসার কোনো সুযোগই পান নি।[১]

এই সমস্যার নিরসনে এলাহাবাদ সম্মেলন থেকে যে কার্যক্রম ঠিক করা হয়েছিল, তার কোনো বিশ্লেষণে বা সমালোচনায় এই প্রবন্ধ যাবে না। যদিও সেই কার্যক্রমে গুরুতর গলতি ছিল, ঐ সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা হয়, তার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪৯ সালের এই পর্যালোচনার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে তার প্রাক্-ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করা— বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য এইটুকুই।

উপরের মন্তব্যগুলোকে যদি কিছুটা তির্যকভাবে—উক্তির ফাঁকে ফাঁকে অনুক্ত যা থেকে যাচ্ছে তার দিকে খেয়াল রেখে—পড়বার চেষ্টা করি, তাহলে দেখা যাবে এখানে প্রচেষ্টা ও সাফল্যের মধ্যে একটা ফারাকের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সাফল্যের সীমাবদ্ধতা প্রচেষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ ক'রে দেয় না। যেমন, বলা হয়েছে 'সংঘকে ঘিরে কেবল কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জড়ো হয়েছেন।' কিন্তু তার মানে কি এই যে এঁদের জড়ো করাটা গণনাট্যসংঘের মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী ছিল? না কি দলিলটি বলতে চাইছে, এ পর্যন্ত গণনাট্যসংঘ যে শুধু এইটুকুই করতে পেরেছে, এঁদের মধ্যেই যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সেখানেই তার সীমাবদ্ধতা। যদি নাট্য আন্দোলন আরো বড় গণ-আন্দোলনে পরিণত

হতো, তাহলে এঁদের অস্তিত্ব তার মধ্যে ভিন্ন অর্থ নিত। তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন বলেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগঠনকে গড়ে তুলতে পারেন নি এরকম কথাও বোধহয় বলা হচ্ছে না; এইটুকুই বলা হচ্ছে যে সাংগঠনিক ত্রুটি ও বিভ্রান্তির ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের 'অনেকেই' আয়ত্ত করতে পারেন নি। এঁদের জায়গায় যদি গোড়া থেকেই শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকত, 'এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি' তাহলে তাঁদেরও আয়ত্ত করতে হতো। কিন্তু, সর্বোপরি, এই দলিলটি উপর-উপর পড়ে যদি আমরা এরকম ধারণা ক'রে নিই যে গণনাট্যসংঘ মধ্যবিত্ত শিল্পীদেরই সংগঠন ছিল এবং এ-আন্দোলন মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জীবনের গণ্ডির বাইরে কখনো যায়ও নি, যাবার চেষ্টাও করে নি, তাহলে সেই ধারণায় আন্দোলনের বহুধাবিস্তৃত জটিল টানাপোড়েনের ছবিটি একেবারেই চাপা পড়ে যাবে। তার আদি যুগেই গণনাট্যসংঘ বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে নানাদিক থেকে যে যোগাযোগসূত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, তাকে আগে স্বীকৃতি দিয়ে তবেই তার সমস্যা ও শিছুটানগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

১৯৪২ সাল থেকে 'জনযুদ্ধে'র তত্ত্বের পটভূমিকায় যখন 'জননাট্য' বা 'গণনাট্য' কথাটি বামপন্থী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, তখন এ-ব্যাপারে তাঁদের দ্বিধা ছিল না যে 'জনগণ' একটি 'multi-class entity' বা 'বহুশ্রেণীয় সমবেত সত্তা'।[২] তাই জননাট্যসৃষ্টির আয়োজনেও শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সঙ্গে সমাজের অন্যান্য স্তরের কোনো কোনো অংশ—প্রধানত মধ্যবিত্তরা—যোগ দেবেন, এমন কি বিপুল সক্রিয়তায় এগিয়ে আসবেন, এই সম্ভাবনাকে কখনো অস্বীকার করা হয় নি, বিশেষত যেখানে নাট্য-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শহর ও মফস্বলে ছাত্ররা একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু 'জনগণ' এই ধারণাটির প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ছাত্র ইত্যাদির সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির আদান-প্রদানের ও সংহতির কথাই শুধু আসছে না, অধিষ্ঠিত সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবেই 'জনগণে'র সংস্কৃতি ও একটি নতুন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এই সম্ভাব্য বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই একটা রাজনৈতিক চরিত্র আছে। তার মাধ্যমে সেই শ্রেণীগুলি আরো কাছাকাছি আসবে, যাদের 'জনগণ'—এই সাধারণ অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

'জনযুদ্ধ-নীতি'র যে মূল উদ্দেশ্য 'people's initiative' বা জনগণের নেতৃত্ব সৃষ্টি করা[৩], ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের বিকল্প শক্তি গড়ে তোলা, জনগণের সংস্কৃতির ধারণার ভিত্তিতেও সেই একই রাজনীতি। ১৯৪১ সালের পরে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 'জনযুদ্ধে'র ডাক শ্রমিক, কৃষক বা মধ্যবিত্তের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

আসে নি, তার উৎস ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে এই নীতি এইসব শ্রেণীর 'নিজস্ব' দৈনন্দিন আন্দোলনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক ছিল, বা সেটা নিছকই বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া একটা বোঝা ছিল। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণের পর থেকে, ফ্যাসি-বিরোধী জনযুদ্ধই প্রকৃত দেশপ্রেমিক যুদ্ধ[৭]—এই যৌক্তিক সংযোগকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ক'রে তোলা এবং দেশের মানুষের জীবনের মধ্য থেকে এই সূত্রটিকে বার ক'রে আনা—এটাকেই জনযুদ্ধ-নীতির প্রবক্তারা এই সময়ে নিজেদের প্রধান কাজ বলে ধরে নিয়েছিলেন। এই সঠিক তত্ত্বকে কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে কী ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়েছিল তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ১৯৪৮ সালে করা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচারের ক্ষেত্রে, তথা সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে নানা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তাও খুলে গিয়েছিল গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস থেকেই তার উদাহরণ পাওয়া যায়।

১৯৪৫ সালে নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক উৎসবে পি. সি. যোশী দেখেছিলেন দুই ধরনের সাংস্কৃতিক দল যে দলগুলিতে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য এবং যে দলগুলি প্রধানত গ্রামীণ কৃষক শিল্পীদের। যোশীর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন প্রথমোক্ত দলগুলির তুলনায় কৃষকদের দলগুলি কতটা সাফল্যের সঙ্গে নতুন চিন্তাভাবনা তাদের শিল্প-মাধ্যমের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারছে, এবং তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'I was pleasantly surprised'[৮]। মনে রাখতে হবে যে এই দুই ধরনের দলকে যে গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় একত্রে দেখা যাচ্ছিল, এটাই সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা নতুন জিনিস। দুই ধরনের শিল্পীদল যে গান, নাচ বা নাটক তৈরি করছিলেন, তার মধ্যে তফাতটা অবশ্যই পরিষ্কার, কেন না যাঁরা শহরের মধ্যবিত্ত দর্শকের জন্য প্রধানত অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের প্রয়োজনের সঙ্গে যাঁরা গ্রামের কৃষকদের জন্য অনুষ্ঠান করেন তাঁদের প্রয়োজন মেলে না। এমন কি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' ভাটিয়ালির আঙ্গিকে রচিত হলেও তার সঙ্গে নেত্রকোনার তিনি যে আউলিয়া গায়কদের দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন[৯] তার মৌলিক প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই দৃষ্টি-ভঙ্গিগত পরিবর্তনের যে প্রয়োজনবোধ কাজ করে, তারই ভিত্তিতে একটা মেলবার জায়গা তৈরি হতে পারে এবং এই বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই 'জনগণের সংস্কৃতি'র অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করার একটা যুক্তি হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

১৯৪২ সালের ৮ মে চট্টগ্রামে প্রথম জাপানি বোমা পড়ে এবং তাতে একজন

ডক-শ্রমিকের মৃত্যু হয়—এই ঘটনাটির পর থেকে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিপদ নিদেনপক্ষে ভারতের পূর্বাঞ্চলে তেমন কিছু দূরের জিনিস ছিল না। পার্টিগত প্রচারে, যেমন, 'স্বাধীনতা'র পৃষ্ঠায়, সাধারণ মানুষের জীবনে এর সম্ভাব্য ফলাফলের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছিল। যেমন, কলকাতায় ১৯৪৩ সালের ১৫ জানুয়ারি শ্রমিক-এলাকায় বোমা পড়ার পর 'সামান্য কয়েকজন কুলি হতাহত হয়েছে'—এই সরকারি রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় খবরের শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছিল 'জাপানি বোমা গরিবের কুঁড়েই ভাঙে।' খড়ের গাদায় জলন্ত আগুনের ছবি দিয়ে বলা হয় 'জাপানিকে না রুখিলে ধানের গোলাও জ্বলিবে।'

সাংস্কৃতিক প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছিল ফ্যাসিবাদের যে বিপদ সাধারণ মানুষের জীবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপদের মতো প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়ায় নি, তাকে নাটকে নাচে গানে একটা ধরাছোঁয়ার মতো রূপ দেওয়া। এ কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই শহুরে মধ্যবিত্ত শিল্পী নন। কৃষিজীবী ও শ্রমিকদের মধ্যে এই রাজনৈতিক ধারণাগুলিকে নিজস্ব ক'রে নিয়ে কিছু প্রতিভাশালী শিল্পী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯৪২ সালের ২৯–৩০ মে বিহারের বিহ্‌টাতে কিষানসভার যে সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়, সেখানে জনৈক কৃষক কবি হলধরজীর 'কেকরা কেকরা নাম বাতাউ' গানটি প্রথম পরিবেশিত হয়। ঐ সম্মেলনে গানটি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার ফলেই তা মুখে মুখে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, এবং কলকাতার রং-কারখানার শ্রমিক লিয়াকৎ ও জনৈক ট্রাম-কর্মী গানটিতে আরো পংক্তি যোগ করেন, আরো সাম্প্রতিক কিছু উল্লেখ তার মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য।[৭] কোন অংশগুলি পরে যোগ করা হয়েছে তা না জানা থাকলেও অনুমান করা যায় 'সিংগাপুর লুটা রঙ্গুন জ্বালায়া ছিন্দ্‌পর কিয়া ধাবাইয়া হো'-তে সিঙ্গাপুর-রেঙ্গুন পতনের পর চট্টগ্রামে প্রথম বোমাবর্ষণের ইঙ্গিত আছে, যা বিহ্‌টা সম্মেলনের অব্যবহিত আগের ঘটনা। আবার 'সোভিয়েট জিতা জার্মান হারা···'থেকে 'জাপান লুটে, চীননে রোকা'-তে আরো পরের ইতিহাসের উল্লেখ—১৯৪২-এর অক্টোবর-নভেম্বরে স্তালিনগ্রাদ-সেবাস্তোপোলের লড়াইয়ের পর থেকে নাৎসিদের যে পশ্চাদপসরণের খবর এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের যে-কাহিনী এদেশে পৌঁছতে শুরু করেছিল তাকেই হয়ত লিয়াকৎ ও অপর ট্রাম-কর্মী শিল্পীটি ঐ জনপ্রিয় গানটির মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন। কিন্তু এই গানটি আর তার বিবর্তনের এই ইতিহাস থেকে হয়ত কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় সবচেয়ে নিকটবর্তী অভিজ্ঞতাকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রে কীভাবে তুলনায় দূরবর্তী বিষয়কে বোধগম্য ক'রে তোলা যেতে পারে। মালিক, মহাজন, ঘুষখোর, মিলওয়ালা জমিদার, পাণ্ডা, পূজারী প্রভৃতি চেনা 'লুটেরা'দের উল্লেখের সূত্রেই আরো বড় লুটেরাদের

খবর গানের মধ্যে আসছে, 'ফাসিস্ট গুণ্ডা'র উল্লেখ গানের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'জনযুদ্ধের গান'-এর ৩য় সংস্করণের (মে, ১৯৪৩) ভূমিকায় বলা হয়েছে আগের সংস্করণে 'কেকুয়া কেকুয়া' বাদে বাকি সব গানই ছিল 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের রচনা'; কিন্তু পরে 'শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন নতুন নতুন গায়ক ও গান রচয়িতা।' এই সংস্করণটিতে এরকম দু'জন শিল্পীর মোট ছ'টি গান পাওয়া যাচ্ছে—একজন কৃষক কবি ও কিষানসভার এক একনিষ্ঠ কর্মী নিবারণ পণ্ডিত, অন্যজন হলেন ট্রাম-শ্রমিক রহমান। রহমানের গানগুলি 'হিন্দি বিভাগে'র অন্তর্গত। এর মধ্যে কাওয়ালী সুরে রচিত গানটিতে (উঠ্ জাগ্ মরীবো, তুঝে লাল ঝাণ্ডা পুকারা তুঝে লাল ঝাণ্ডা পুকারা) 'ফাসিস্ট গুণ্ডা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু এই ফাসিস্ট গুণ্ডাকে অতি পরিচিত দেশী চেহারা দেওয়া হয়েছে; দেশের গরীবের চেনা শত্রুরাই সাধারণভাবে এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত :

মা, বহিনো কি আঁসুকা নেহি তুঝকো হ্যায় খ্যাল,
বচ্চো কি তড়পনে, বিলখ্‌নেকা নাম আলাল,
ইয়ে কাসিস্টো গুণ্ডোনে ঘর তেরা উজাড়া
ঘর তেরা উজাড়া।

রচয়িতা জানাচ্ছেন, এই শত্রুদের হাত থেকেই সোভিয়েত রাশিয়াকে বাঁচিয়েছেন 'মজদুর-কিষাণ রাজ' প্রতিষ্ঠা ক'রে। 'জাপানি সোলামি'র বিরুদ্ধে চীনের লড়াইকে অভিনন্দিত করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে অধিষ্ঠিত সরকারের মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে, যে সরকার :

ইয়ে সরকার উওহি হ্যায় জো মিরজাফর কো মিলাকর
ঔর দেশ মেরা লেলিয়া, শর উনকো চঢ়াকর
ফের উন্‌কো যায় হম্ সব্‌কো বনায়া সরবহারা,
বনায়া সরবহারা।

'জাপ-বিরোধী' বা ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার কীভাবে চেতনার সেই কেন্দ্রবিশ্লিষ্টতে পরিণত হয়, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও তার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যেতে পারে সে উদাহরণ আমরা এ-গানটি থেকেও পাই। এই শ্রমিক-শিল্পীরা কোথা থেকে দেশদেশান্তরের খবর সংগ্রহ করতেন, কোন ইশ্‌তেহারগুলি তাঁদের হাতে এসেছিল, সংবাদপত্রগুলি কতটা প্রচলিত ছিল তাঁদের মধ্যে, গান রচনা কীভাবে হতো—এসব বিষয়ে যদি আরো বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা যেত তাহলে হয়ত আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারতাম চেতনার বিকীরণ বা dissemination, সংবাদের ব্যাপ্তি কীভাবে ঘটে, শিল্পীরা কীভাবে শ্রোতা-দর্শকদের সঙ্গে সমঝোতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-

ঐতিহাসিক 'মীথ্' বা কালের সংহত মূর্তি গড়ে তোলেন।[৮]

আবহমান কাল থেকে লোক-আঙ্গিকগুলির অন্যতম কাজ শ্রুতিভিত্তিক সাংবাদিকতা। এই সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম, যেহেতু তা সাক্ষরতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাঁদের অক্ষর পরিচয় নেই তাঁদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

'জনযুদ্ধ'-নীতি প্রচারের কাজ যখন শুরু হয় তখন ময়মনসিংহের কৃষককবি এবং কৃষকসভার কর্মী নিবারণ পণ্ডিত ছিলেন তাঁদেরই একজন, যাঁরা এই ডাকে সাড়া দিতে দেরি করেন নি। স্থানীয় 'কবিগানে'র ধরনে লেখা তাঁর 'জনযুদ্ধের ছড়া' তিনি ছাপিয়ে তাঁর আঞ্চলিক হোয়াডের ছফিরউদ্দিন, জহুর আলি, অতুল মজুমদার প্রভৃতির সাহায্যে পয়সায় একটি ক'রে ৭৩০০০ কপি বিক্রি করেন, এছাড়া অন্যত্রও এ ছড়া অন্যেরা ছাপিয়ে বিক্রি করেছেন।[৯] 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ১ জুলাই, ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত এই ছড়াটিতে লৌকিক সাংবাদিকতার আঙ্গিক ব্যবহার ক'রে চীনা চাষাদের উপর জাপানি ফৌজের বর্বর অত্যাচারের ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু নিছক সাংবাদিকতায় তিনি থেমে থাকেন নি, 'কবিগানে'র বিবৃতিমূলক কাঠামোর বাইরে গিয়ে চীনে যে যুদ্ধ চলছে তার সঙ্গে পরাধীন ভারতের মানুষের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রোতার চিন্তাশক্তিকে উস্কে দিয়ে বলেছেন 'মোরা বেশ বুঝেছি, স্বাদ পেয়েছি, বিদেশী শাসন, /২০০ বৎসর ভারতবাসী হয়ে পরাধীন॥ / কত দেশের ছেলে, মরছে জেলে, ফাঁসী গেছে কত, / ৫০ বছর ধরে সংগ্রাম করছে অবিরত॥ ···কেহ বলে, জাপান এলে মন্দ হইত না, / পুরাতন প্রভুতে আর রুচি ধরে না॥'

এখানে নিবারণ পণ্ডিত পঞ্চম বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব এনেছেন, যা পরবর্তী সময়ে কম্যুনিস্টরা বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ঐ নামে চিহ্নিত করবেন না বলেই বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিবারণ পণ্ডিতের এই কাব্যিক বিশ্লেষণ ফ্যাসি-বিরোধী চেতনাকে দেশপ্রেমিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করে। এখানে তিনি আরো বলেন, কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সক্রিয়তা ও স্ব-নির্ভরতা জাগিয়ে তোলার কথা, তাকে বলেন 'ঐক্যে শক্তি পাবেন, লড়ে যাবেন, পাবেন হাতিয়ার / বিরাট শক্তি আছে একটি মিছে আপনার॥' নিবারণ পণ্ডিতের লেখায় এটা খুবই পরিষ্কার যে এই 'বিরাট শক্তি' জনগণের নিজেরই শক্তি।

উল্লিখিত শিল্পীরা ছাড়াও এই সময়কার অন্যান্য শ্রমিক ও কৃষিজীবী শ্রেণীর শিল্পীর সৃষ্টিতে লড়াই, চীনের প্রতিরোধের কাহিনী সমকালীন ইতিহাসের প্রতীকের মতো উচ্চারিত হতে থাকে। মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় বীরগাথা পোয়াড়ার রীতিকে অনুসরণ ক'রে বোম্বাইয়ের তথাকথিত 'নাচুজাতে'র শ্রমিক আন্নাভাউ সাঠে যে 'স্তালিনগ্রাদ-পোয়াড়া' রচনা করেছিলেন, গণনাট্যসংঘের প্রথম দলিলেও তার উল্লেখ আছে।[১০] সম্ভবত একই সময়ে বাংলায় হুগলি জেলার কৃষি-শ্রমিক পরিবারের কবি দুলালচন্দ্র রায়ও কীর্তনের আঙ্গিকে রচনা করেছিলেন

স্তালিনগ্রাদের লড়াই নিয়ে গান

আজি রাশিয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে সকলে সাজিছে রণে,
সারা দুনিয়ার মুক্তি আনিতে সকলে সাজিছে রণে।

দুলাল রায় আরো আগে থেকেই ছিলেন কিষান সভার একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি স্কুলে কিছুদূর পড়াশুনো করেছিলেন। বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত দরিদ্র হলেও বাবা-কাকাদের মধ্যে ছিল কীর্তন ও তর্জার রেওয়াজ। রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে কীর্তন ও তর্জার নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন বিজয় মোদক এবং দয়াল কুমার। বিজয় মোদক জানিয়েছেন, ১৯৪২-৪৩ সালে গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অন্যতম সংগঠক হারীন চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলাতে আসেন। দুলাল রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক দেহভঙ্গি ও তাঁর পরিবেশনার ধরন দেখে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে ঐ 'গণকীর্তন' উপস্থাপনার ব্যাপারে পরামর্শ ও উৎসাহদান করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধের কাহিনী অন্যের কৃষক শিল্পীদেরও নাড়া দিয়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সেখানে গণনাট্য আন্দোলনের শুরু থেকেই মুমূর্ষু লোক-আঙ্গিকগুলিকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা ছিল বেশ ব্যাপক। বিশেষত 'বুরাকথা' আঙ্গিকটি নিয়ে তাকে রাজনৈতিক প্রচারের কাজে ব্যবহার করছিল অনেকগুলি দল, যাদের মধ্যে কৃষক শিল্পী এবং মধ্যবিত্ত শিল্পীরা ছিলেন। বেজওয়াদায় ১৯৪৪ সালে যে সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন হয়, সেখানে রুশ বীর-কিশোরী জোইয়ার ছবি হাতে হাতে ঘুরেছিল। এ তথ্য শিল্পী চিত্তপ্রসাদ 'পীপ্‌লস ওয়ার' পত্রিকায় একটি স্কেচে ধরে রেখেছেন (৯ এপ্রিল, ১৯৪৪, পৃ ৮)। একই সঙ্গে খবর পাওয়া যায়, ঐ সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের স্কোয়াডটি 'জোইয়া'কে নিয়েই একটি গান পরিবেশন করে। কিশোর-কিশোরীদের সম্মিলিত 'কোলাটাম্' নৃত্যের বিষয়বস্তু ছিল মস্কোর প্রতিরক্ষা। এর পরে 'বিধি ভাগবতম্' পথ-নাটিকাটিতে হিটলারের অবশ্যম্ভাবী পতনই ছিল বিষয়বস্তু। দু জন ধনী চাষী এবং তাদের দুই স্ত্রী—এই চরিত্রগুলিকে হিটলারের সঙ্গী হিসেবে দেখানো হয়েছিল। হিটলারের প্রতিটি কথার পুনরুক্তি ক'রে তারা দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল তুলেছিল। পরাজিত তোজো ও মুসোলিনিকে দেখানো হয় হিটলারের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে। 'পীপ্‌লস ওয়ারে'র এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তা পুরোপুরি মেটায় না। এসব নাটিকার রচনায় এবং উপস্থাপনায় কৃষক শিল্পীদের কতখানি অংশ ছিল এই বিবরণে তা পরিষ্কার না হলেও হয়ত ধরে নিতে পারি যে পরবর্তী নেত্রকোনো সম্মেলনের মতোই এখানেও লোক-আঙ্গিকের ব্যবহার যৌথ-রচিত 'সোশ্যালিস্ট বুদ্ধিজীবী' ও 'গ্রামীণ কৃষক শিল্পী'দের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের একটা রাস্তা দেখাতে পেরেছিল।

মনে রাখতে হবে এখানে দর্শকরাও ছিলেন প্রধানত কৃষক। বাংলায় আমরা

দেখতে পাই যেখানে যেখানে সংগঠিত কৃষক-আন্দোলন ছিল, সেখানে সেখানে এ ধরনের অনুষ্ঠান হলে স্থানীয় মানুষরাই আবার উদ্যোগী হতেন নিজেরাও অনুরূপ অনুষ্ঠান করতে। 'অন্নাণ'তে ফুলবাড়ি সম্মেলনের রিপোর্টে দেখা যায় ট্রেনের কামরায় কৃষকদের সঙ্গে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিবেদক ব্যর্থ হন. কিন্তু যেই নিবারণ পণ্ডিতের 'ওরে কিষান ভাই' জারি গানটি ধরা হল, অমনি 'দেখতে পাইলাম হাটুর মধ্যে গোঁজা কৃষকের মাথাগুলি এক এক করিয়া উঁচু হইতেছে।···কিছুক্ষণ পরেই প্রশ্ন হইল, এই গানের বই কোথায় পাওয়া যায় বাবু?' (১৭ মার্চ, ১৯৪৪, পৃ ৪৫৭-৫৮)। রংপুরের নগেন সাহা যখন পালা-কীর্তনের ঢং-এ 'আমন বাঁচাও' এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি ক'রে গান রচনা ক'রে বদরগঞ্জে সর্বদলীয় সম্মেলনে তা পরিবেশন করেন, তখন স্থানীয় কৃষক-কর্মীরা যন্ত্রের সঙ্গে পালার প্রতিটি পদ টুকে রাখেন, যাতে কিষানসভার স্থানীয় ইউনিটগুলির মাধ্যমে এরকম অনুষ্ঠান তাদের পক্ষেও করা সম্ভব হয় ('পীপ্‌লস ওয়ার', ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, পৃ ৪)। নতুন ধরনের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে কৃষক শিল্পীদের নিজেদের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সৃষ্টি হওয়া—সীমিতভাবে হলেও এরকম ঘটনা বাংলার মতো অন্যত্রও ঘটেছিল, এই সম্ভাবনা পুরো নাকচ ক'রে দেওয়া যায় না।

স্তালিনগ্রাদের লড়াইএর পর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াতে নাৎসিবাহিনী পিছু হঠতে শুরু করে ও ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশেষ হবার পর থেকে ১৯৪৬-এর প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী গণ আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়েও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার করতে গিয়ে শিল্পীরা দেখেছিলেন সরকারের দুষ্ট খাদ্যনীতির ভয়াবহ পরিণতি, দেশীয় জমির মালিক এবং মজুত-দারদের লোভ। এই অবস্থার উদ্‌ঘাটন করতে তাঁরা যে পেছ্‌পা হন নি ময়মন-সিংহের ঘোষা সুরে রচিত নিবারণ পণ্ডিতের গানেই তার পরিচয় আছে :

> 'মানুষ মারে ভাই কন্‌ট্রোল বুঝে না রানতে গেলে কান্‌তে বসে লবণ ছাড়া রান্‌ধে না ' (আহারে) কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম / কত বাবুর পায়ে ধরলাম / ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে ও আহারে—আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি / মেঘ না হইতে পড়ে পানি / টেপটেপানি গেল না রে আমার টেপটেপানি গেল না।'

যুদ্ধের পর উত্তাল গণ আন্দোলনের আবহাওয়াতে শিল্পীদের সৃজনীশক্তির আরো নতুন পরীক্ষা হয়েছে। নিবারণ পণ্ডিত হাজং চাষীদের টংক আন্দোলনের কাহিনী নিয়ে পুঁথিপড়া সুরে গান রচনা করেছেন। তেভাগার লড়াইয়ের সময়েও কৃষক-কর্মী এবং শিল্পীরা এই নতুন অভিজ্ঞতায় অনুপ্রেরিত বোধ করেছিলেন

এমন অনুমান করা যায়, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গানগুলি হারিয়ে গেছে। দিনাজপুরের খাঁপুর থেকে অসীম বসু-সংগৃহীত কালা সরকারের রচিত তেভাগার আমলের একটি 'জংগান' কৃষক-শিল্পীর তৎপরতার সাক্ষ্যই দেয়।[১১] শহীদ চিয়ারসাইয়ের লড়াইয়ের উদ্দীপক বিবরণটি এইরকম

'ছুটিল চিয়ারসাই হস্তে মোটা লাঠি জোয়ান মর্দ বাপের ব্যাটা আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি দোহাত্তা বাড়ি মারে সৈন্তের মাথায় বাপ ডাক ছাড়ি সৈন্ত টলে পড়ে যায়···ঘর হতে চিয়ারসাই শাবল এক আনিল সবলে ট্রাকের চাকা কাটিতে [কাড়িতে ?] লাগিল আরেক গুলি চিয়ারসায়ের বুকে ফোটে / আন্ধার হইল দুনিয়াদারি চেতন গেল টুটে ক্ষণে অচেতন মর্দ ক্ষণেতে চেতন লাফ দিয়া ট্রাকে ওঠে সিংহের মতন···'

এই গানটি রাজসাহী জেলে রচিত হয় ও নানকিং বিজয় উৎসব উপলক্ষে বন্দীদের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। পূর্বোল্লিখিত দুলাল রায়ও কীর্তন-কথকতার আঙ্গিকে গেঁথেছেন ভুবির ভেড়ির শহীদদের কাহিনী।

চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও মুর্শিদাবাদের শেখ গোমানিকে সচেতনভাবেই সামনে নিয়ে এসেছে গণনাট্যসংঘ। তর্জায় আঙ্গিকে যে রাজনৈতিক মাত্রা তাঁরা যোগ করেছেন তাতে মুখবন্ধের প্রথাগত দেববন্দনা পরিণত হয়েছে দেশপ্রেমিক মানুষের বন্দনায়। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সমাবেশে 'বাংলা কীভাবে বাঁচবে' এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক রূপকে তুলে ধরেছেন প্রবীণ কবিয়াল রমেশ শীল।[১২] হিন্দুমুসলিম ঐক্যের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নেত্রকোনায় কৃষক সমাবেশে সতীশ মণ্ডলের গম্ভীরার দল মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এই জনপ্রিয় মাধ্যমটিতে সঞ্চারিত করেছেন।

শ্রমিক-শিল্পীরা যখন নিজেদের মতো ক'রে গান রচনা করেছেন, অনুষ্ঠান করেছেন, প্রায়শই তাঁরাও ব্যবহার করেছেন তাঁদের শিকড়ে যা রয়ে গেছে সেই গ্রামীণ লৌকিক জীবনের সুরের রেশ। যেহেতু বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তাঁরা শহরে আশ্রয় নিয়েছেন, তাই তাঁদের এই অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যসৃষ্টির ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিনয় রায়ের লেখা 'জনযুদ্ধে'র প্রতিবেদনে আমরা জানতে পারি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নতুন প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় তৈরি হয়েছিল কর্পোরেশন মজুরদের ও ট্রাম-শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক স্কোয়াড (৩ অক্টোবর, ১৯৪৩, পৃ ৩)। বোম্বাইতেও এই সময়ে ধাঙড় মেয়েদের একটি গানের স্কোয়াড ছিল, যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শহীদ ভগৎ সিং বিষয়ে একটি গান করেছিলেন।[১৩]

বিনয় রায়ের এই রিপোর্টে শ্রমিক-শিল্পীদেরও একটি তালিকা পাওয়া যায়— তাতে আছেন চটকল শ্রমিক বিশদ, ট্রাম ইউনিয়নের নেতা দশরথলাল ও চতুর আলী, হাওড়ার শ্রমিক কবি আলী হুসেন, আছেন পূর্বোল্লিখিত (টীকা নং ৫) এবলাদ, আছেন মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক-কর্মী গুরুদাস পাল। এঁদের অধিকাংশেরই উল্লেখ রয়েছে গীতিকার হিসাবে। অন্যসূত্রে আমরা জানি দশরথলাল ঢোলবাদনেও পারদর্শী ছিলেন, তাঁর লেখা একটি নাটক ১৯৪৩ সালেই গণনাট্যসংঘের প্রথম সেক্রেটারি অনিল ডি সিলভার উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। [১৫] এ ছাড়া কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের প্রথম অনুষ্ঠানে 'ভারতের মর্মবাণী'র সঙ্গে যে 'রামলীলা' পরিবেশিত হতো তাও তাঁরই রচনা বলে জানা যায়।[১৫]

গুরুদাস পাল পরে আরো ঘনিষ্ঠভাবে গণনাট্য আন্দোলনে যোগ দেন। যাত্রা আঙ্গিকে রাজনৈতিক বাণীর বাহক হিসাবে ব্যবহার করার প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই, যদিও ঐ পালাটির পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায় নি।[১৬] ১৯৪৩-এর রিপোর্টটিতেও তাঁর উল্লেখ আছে নাট্যকার হিসাবে—'উৎপাদন বাড়াও' এই ধ্বনিকে ভিত্তি করে ছিল তাঁর নাটক, স্থানীয় শ্রমিকরাই তা মঞ্চস্থ করেন। রিপোর্টটিতে গীতিকার হিসাবে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন জনপ্রিয় কাজরী ও কাওয়ালির সুর। ঢোলক, খঞ্জনি ও হাততালির সাহায্যে সঙ্গত করা হতো। ১৯৪৪ সালে 'জনযুদ্ধ'-পত্রিকায় মাহেশে সুতাকল ও বেলটিং মজুরদের যে প্রথম প্রাদেশিক সমাবেশের বিবরণ আছে, তাতে বলা হয়েছে সভার মাঝে মাঝে ও সম্মেলনের শেষে হচ্ছিল গান আর অভিনয়। অধিকাংশ গানই মজুরদের লেখা। কুষ্টিয়ার সুতাকল মজুরদের জারিগান ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের 'দেশপ্রেমিক গানে'র উল্লেখ আছে। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধর্মঘটের বিষয়ে একটি নাটিকাও স্থানীয় সুতাকল মজুররা অভিনয় করেন। (২১ জুন, ১৯৪৪, পৃ ৬)।

সীমিতভাবে হলেও শ্রমিক-শিল্পীদের এই প্রচেষ্টা কলকাতার বাইরে জেলা-গুলিতেও কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছিল। আসানসোলে ১৯৪৬ সালে গণনাট্য-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই শহরের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন—যেটি ধাঙড়দের ছিল—নিজস্ব 'মজদুর গণনাট্য' গড়ে তোলেন। তাঁদের লিখিত স্ক্রিপ্ট্ ছিল না, 'যেমন তেমন স্টেজে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে যখন তখন নিজেদের জীবনের ঘটনা নিয়ে নাটক' হতো। তাঁদের দলে গায়ক এবং বাদক ছিলেন, নিজেরা গীত রচনা করে নিজেরাই তাতে সুর দিতেন।[১৭] এঁদের নিশ্চয়ই চিরাচরিত বিনোদনের নানা আঙ্গিক ছিল, কিন্তু 'নিজেদের জীবনের ঘটনা নিয়ে নাটক' একটা সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগের আভাস দেয়। জলপাইগুড়ি জেলার চা-শ্রমিকদের মধ্যে থেকেও এই সময় পাওয়া যায় লাল তরফা ওঁরাও-এর মতো জনপ্রিয় গীতিকারের নাম। চা-বাগান থেকে বিতাড়িত হয়ে মাথাচুলকায় বাবমা ধুরাতে তিনি আশ্রয় নেন এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে সাদ্‌রি ভাষায় গান রচনা

করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর তেভাগার লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন সেই গান যা তিনি ও তাঁর বোন পোকো ওঁরাওনি সেসময়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়িয়েছেন

মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী খানা রে
শুনা ভাই—স্বাধীন দেশ কা গানা রে।
এক বিঘা পেট লিগিন
গিলি জেলখানা রে
শুনা ভাই—স্বাধীন দেশ কা গানা রে।[১৮]

হাওড়া জেলার বামপন্থী নেতা জয়কেশ মুখোপাধ্যায়ের লেখাতে পাওয়া যায় রাজগঞ্জ জুটমিলের শ্রমিক সুরেন নস্করের নাম, যিনি স্থানীয় ঘেঁটু গানে পারদর্শী ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের আওতায় আসার পরে 'তাঁত ঠেলতে ঠেলতে সুরেন নস্কর যখন ঘেঁটু রাজার গান গাইতো তখন প্রায়ই নতুন নতুন কলি বের হতে লাগল যা আগে কেউ শোনে নি বা লেখে নি। এটা ঘেঁটু রাজার গান কিন্তু ঠিক ঘেঁটু রাজার গান নয়। নতুন যুগের গান—শ্রমিক কৃষকের গান। অস্পষ্ট কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের গান।' সুরেনের গানগুলি গাইতেন তাঁর ভাই ললিত নস্কর—একই কারখানার শ্রমিক। '১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল জুড়ে এই গানে নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন কলি যুক্ত হয়—হিটলার হয় রাবণ, নতুন নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে মাচিশাখা আলমপুর মঙ্গলপুর প্রত্যন্ত গ্রামে।'[১৯]

বোম্বাইতে এই সময়েই গড়ে ওঠে 'লাল বাওতা কলাপাঠক' যা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির বোম্বাই কমিটির সাংস্কৃতিক স্কোয়াড। 'পীপ্‌লস এজ'-এ প্রকাশিত তার শিল্পী-পরিচিতিতে দেখা যায় তার মধ্যে ছিলেন তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতের শ্রমিক আন্নাভাউ সাঠে, এবং অমর শেখ বা মেহবুব হাসান শেখ, যিনি কৃষি-মজুর পরিবারের ছেলে এবং আন্নাভাউ-এর মতোই বহু বিচিত্রভাবে জীবিকা অর্জন করতে করতে গণনাট্যসংঘের সংস্পর্শে আসেন; ছিলেন প্রতিভাবান নাট্যকার গভঙ্কর যিনি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন। আরো ছিলেন ভূমিদাস পরিবারে জোন্দি সুভাষা, এবং গণপৎ—তিনিও 'অস্পৃশ্য' কৃষিমজুরের ছেলে। আগে ছিলেন বোম্বাইয়ের এক 'দাদা', পরে সাবানের কারখানায় ঢোকেন ও কালক্রমে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন (৯ নভেম্বর, ১৯৪৭, পৃ ১৩)। মূলত শ্রমজীবী শ্রেণীর এই শিল্পীরা এই সময়ে শুধু বোম্বাই শহরেই নয়, মহারাষ্ট্র ও সংলগ্ন এলাকায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এঁদের মধ্যে প্রধানত আন্নাভাউ সাঠে এবং গভঙ্কর 'পোয়াড়া' এবং 'তামাশা' এই দুই বহুপ্রচলিত লোক-আঙ্গিককে ব্যবহার ক'রে দ্রুত পরিবর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নতুন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

'জনযুদ্ধে'র যুগে যখন নানা আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে এমনিতেই লোক-আঙ্গিকগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, তখন রাজনীতি-সচেতন নন এমন শ্রোতারাও হয়তো এ-ধরনের সংবাদ গ্রহণ করার মতো কিছুটা প্রস্তুতি ঘটেছিল, যে কৃষক ও শ্রমিক-শিল্পীরা আন্দোলনের আওতায় এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতেন রাজনীতি-সচেতন মানুষের সমাবেশে, সেখানে তাঁদের অনুষ্ঠানের মতাদর্শগত ভিত্তি কিছুটা তৈরিই থাকত—এইটুকু খবর তৎকালীন বামপন্থী পত্রপত্রিকা থেকে আমরা পাই। কিন্তু রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়া অন্যত্র তাঁরা এইসব অনুষ্ঠান আদৌ পরিবেশন করতেন না, সরাসরি রাজনীতিতে বা গণসংগঠনগুলিতে জড়িত আছেন এমন মানুষ ছাড়া আর কেউ এসব অনুষ্ঠান দেখেন নি, বা তাতে সাড়া দেন নি, এরকম কোনো সিদ্ধান্তে তাই বলে আসা যায় না। যেমন, ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের 'স্বাধীনতা'র সংবাদে আমরা জানতে পারছি পূজা বা ঈদের প্রীতি সম্মিলনী উপলক্ষে কবিয়াল রমেশ শীল ও শেখ গোমানি কখনো আলাদা আলাদা, কখনো একত্রে মজুতদার ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেস-লীগ নেতাদের আপোসের নীতি, সাম্রাজ্য-বাদের ধাপ্পাবাজি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য নিয়ে কবিগান ক'রে বেরিয়েছেন। শেখ গোমানি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গান গেয়ে বহরমপুরে হিন্দু দর্শকদের কাছ থেকে পদকও পেয়েছেন (১৬ অক্টোবর, ১৯৪৬, পৃ ৩ : ২ নভেম্বর, ১৯৪৭, পৃ ১)। একইভাবে বোম্বাইয়ের 'লাল বাওটা কলাপাঠক' অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে দশেরা এবং গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে, এবং অনুষ্ঠানের প্রকৃতিই বদলে দিয়েছে ('পীপ্‌লস এজ', ৯ নভেম্বর, ১৯৪৭, পৃ ১৩ ; ১২ অক্টোবর, ১৯৪৭, পৃ ৮-৯)। ১৯৪৮ সালের গণশক্তি পূজা উৎসবে 'লাল বাওটা কলাপাঠকে'র সব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এ সংবাদ থেকে এটাই মনে হয় যে তার আগে আগে তাঁরা এই উৎসবেও নিজেদের অনুষ্ঠান দেখিয়েছেন ('পীপ্‌লস এজ', ২৬ সেপ্টেম্বর, '১৯৪৮, পৃ ৮)। আগে থেকেই মানসিক-প্রস্তুতি নিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক সমাবেশে আসতেন, তাঁদের মধ্যেই শুধু নয়, তার বাইরেও গণনাট্য আন্দোলনের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তত কিছুটা প্রসার ঘটার সম্ভাবনাকে তাই সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে দেওয়া যায় না আজকের বিচারে।

আন্দোলনের পরিধিতে এমন অনেক শিল্পী ছিলেন যাঁরা মূলত তাঁদের নিজস্ব আঙ্গিকের প্রথাগত রূপটিকেই ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু আবার কোনো বিশেষ রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য বিশেষ গানও রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে করা যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস উল্লিখিত আউলিয়া গায়ক মজিদ (জামসেদউদ্দিন) ও রসিউদ্দি-নের কথা, যাঁরা নেত্রকোনা সম্মেলনে এসে গেয়েছিলেন পঞ্চাশের মন্বন্তর বিষয়ক গান : 'সুখের স্বপন ভাঙল রে চুরাইবাজারে'। একই ভাবে হাটগোবিন্দপুরের প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে বাউল মন্মথ দাস গেয়েছিলেন

শোনাই মোদের ইতিহাস
হালের হেসে ভাসল জলে / ঘুচল মোদের চাষ।
…ঘরে যত ছিল কাঁথা বালিশ
বাঁশের ডগায় পেল স্থান…
ভেঙে অজয়, দামোদর জমি হল বালির চর,
খড়, কুমুর, বাঁকা ভেসে উঠল হাহাকার।
('জনযুদ্ধ', ২২ মার্চ, ১৯৪৫, পৃ ৮)

বর্ধমান জেলায় ঐ সময়ে কিষানসভা বাঁধ বাঁধার যে আন্দোলন চালাচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য পেয়ে যায়, যদিও মন্মথ দাসের গানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি কিছু ছিল না। এমনও হতে পারে সাধারণভাবে হয়তো তিনি প্রথাগত বাউল গানই গাইতেন। বস্তুত কৃষিজীবীশ্রেণীর শিল্পীদের অনেকেই গণনাট্য আন্দোলনের আওতায় এসেছেন চিরাচরিত শিল্পকলারই পুঁজি নিয়ে। তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই লোকশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার পুনরুজ্জীবনকে গণনাট্যসংঘ অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল. তাই এই শিল্পকলাগুলিকে একটা নিজস্ব মূল্যও দেওয়া হয়েছিল।

এই কারণেই নেত্রকোনার সর্বভারতীয় কৃষকসম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীদের মধ্যেই যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিবারণ পণ্ডিত. গম্ভীরা-রচয়িতা সতীশ মণ্ডল, রমেশ শীল, রংপুরের নগেন সাহা, হুগলির দুলাল রায় প্রভৃতি যেমন লোক-আঙ্গিকের কাঠামোর মধ্যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই আঙ্গিকের থেকে অভাবিত সম্ভাবনা বার ক'রে এনেছিলেন. তেমনি অন্যদিকে রংপুরের টগর অধিকারীর দোতারা বাদনে, মণিপুরী দলের নৃত্যপরিবেশনে বা নাগাশিল্পীর শিকারীনাচে রাজনীতি-প্রভাবিত নতুনত্ব না থাকলেও তাতে লোকজীবনের যে নান্দনিক উৎকর্ষ, দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের যে জীবনীশক্তি প্রকাশ পায়, তা ছিল গণনাট্য আন্দোলনের লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি-পূর্ণ। ('পীপ্‌লস ওয়ার', ৬ মে, ১৯৪৫, পৃ ১২)। ১৯৪৭ সালের মে মাসে শিলচরে যে প্রথম সারা-আসাম গণনাট্য সম্মেলন হয় সেখানে গুরু কামিনী সিং নিয়ে এসেছিলেন মণিপুরী ধ্রুপদী নাচের দল ('পীপ্‌লস এজ', ২৯ জুন, ১৯৪৭, পৃ ১৬)। 'খুরাকপ্পৈশৈ', 'লাইহারোবা' প্রভৃতি অন্যান্য প্রথাগত নাচের অনুষ্ঠানও এই কৃষক-শিল্পীরা করেছিলেন। নাগা শিকারী-নৃত্য এখানেও প্রদর্শিত হয়। 'মিরি' জাতির মেয়েরা উৎসবে অংশ নেন। খাসিয়া দলটিতে ছিলেন কাড়ুদার, কটি-ওয়ালা ও অন্যান্য কর্মী, তাঁরা গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত, তাতেও রাজনীতির বিশেষ চিহ্ন ছিল না [২০]। কিন্তু এই বিভিন্ন শিল্পীদের একই মঞ্চে উপস্থিত করা, যোগাযোগের রাস্তা খুলে দেওয়া—এখানেই ছিল গণনাট্য আদর্শের

অনেকখানি অভিব্যক্তি।

গণনাট্যসংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অনেকেই পরে বলেছেন যে ঘোষী-কথিত 'সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী'দের সাংস্কৃতিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি কৃষক জনসাধারণের মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি; 'নবান্ন' নাটক যদি তাঁরা বুঝেও থাকেন তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনে তার কোনো প্রভাব পড়ে নি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান লৌকিক সুর ব্যবহার করেও কৃষকের দৈনন্দিন জীবনে মিশে যেতে পারে নি। একথার সত্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রভাবের তত্ত্বটিকেও হয়ত এক্ষেত্রে নতুন ক'রে ভেবে দেখা দরকার। প্রভাব বলতে যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ নাটক বা গানকে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুকরণ করাটাই বোঝাই, ওপর থেকে ক্ষমতা বিস্তারই যদি 'প্রভাব' কথাটির অর্থ হয়, তাহলে বলতেই হবে গণনাট্য আন্দোলনের এমন প্রভাব কৃষক-শ্রমিক শিল্পী ও দর্শকের ওপর ছিল না। কিন্তু হাটগোবিন্দপুরে কিষান সভার প্রাদেশিক সম্মেলনে 'নবান্ন' নাটক করতে শুরু করার উদ্দেশ্য কি ছিল এই যে তা দেখে কৃষকরাও স্বস্থানে 'নবান্নে'র মতো নাটক করবেন? নাকি নাটকের অনুষ্ঠানটি ছিল যোগাযোগ স্থাপন করার একটা প্রাথমিকপ্রচেষ্টা? 'নবান্ন' বা 'অবানবন্দী'তে আঞ্চলিক গ্রামের মানুষের সম্পূর্ণ অচেনা ছিল, কিন্তু তাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেতনার একটা সাযুজ্য অনুমান করেই বোধহয় নাটকগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। কৃষক বা শ্রমিক নিজে যখন তাঁর নতুন চেতনাকে রূপ দেবেন, তিনি তা অবশ্যই করবেন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে। কিন্তু একই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপুষ্ট অন্যরকম সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংঘাত তাঁকে তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে সাহায্য করবে, গণনাট্যসংঘের চিন্তায় এ কথা হয়ত ছিল। 'নবান্ন', 'অবানবন্দী' দেখা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বা বিনয় রায়ের গান শোনা—আলাদা আলাদাভাবে দেখলে কৃষক শিল্পীর কাছে এর তাৎপর্য যৎসামান্য; কিন্তু এগুলিকে যখন একটা বৃহত্তর পরিবেশের অংশ হিসাবে দেখা যায়, দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের গণ আন্দোলনের মধ্যে কৃষক বা শ্রমিকের জড়িয়ে থাকার পরিপূরক হিসাবে, তখন বোঝা যায় আদানপ্রদানের একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কৃষক ও শ্রমিক শিল্পীরা গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে এসেছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' গানটি কৃষকরা নিজেদের সংগীত হিসাবে আজও রক্ষা করেছেন কিনা সেটা আসল কথা নয়, কৃষক-শিল্পীর নিজস্ব সক্রিয়তা সৃষ্টির ব্যাপারে পরোক্ষভাবে এবং যৌথভাবে এ-ধরনের গান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের যে ভূমিকা, সেটাই আসল।

এই ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে ফাঁক ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিশ্চয়ই কম ছিল

না ; নইলে ১৯৪৯ সালের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন হতো না। গণনাট্যসংঘের সংগঠনের ভেতরের কারণ ছাড়াও ১৯৪৬-৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বে কম্যুনিস্ট পার্টির আংশিক অপ্রস্তুত অবস্থা, তীব্র হয়ে-ওঠা গণ-আন্দোলনের সুযোগ নিতে না-পারা[২১] — এই সাধারণ পরিস্থিতিও নাট্য আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে গণ আন্দোলন যেখানে যেতে পারে নি, নাট্য আন্দোলন সেখানে পৌঁছবে কী করে? সেখানে তাই কৃষক ও শ্রমিক-শিল্পীদের তুলে ধরার কাজটি ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছিল। পঞ্চাশের দশকেও এই শ্রেণীগুলি থেকে প্রতিভাবান্ শ্রমিক বা কৃষক-শিল্পী গণনাট্যসংঘে এসেছেন। কিন্তু ঘটনা তাঁদের নিজস্ব প্রতিভারই স্বাক্ষর, সমাজের ঐ স্তরগুলিতে নাট্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার চিহ্ন নয়।

গুরুদাস পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন শিল্পী হিসাবে প্রথম জীবনে তাঁর আত্মবিশ্বাসহীনতার কথা, জানিয়েছেন কৃষক-সংগঠনের নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরী কীভাবে তাঁকে ঐ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন।[২২] একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, প্রথম যখন গণনাট্য অফিসে তিনি বিনয় রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন বিনয় রায়ের ভাবভঙ্গিতে তিনি কতটা তাচ্ছিল্য দেখতে পেয়েছিলেন, যে কারণে 'আই. পি. টি. এ সম্পর্কে একটা অতি উচ্চ ধারণা' তাঁর ভেঙে গিয়েছিল ; অবশ্য পরে গণনাট্যসংঘে তিনি এসেছিলেন। বিনয় রায়ের মতো সংগঠকের সঙ্গে গুরুদাস পালের মতো শিল্পীর, হয়তো নিতান্ত কাকতালীয় কারণে, এই প্রাথমিক সমঝোতার অভাবের কাহিনী এটাই প্রমাণ করে যে গণনাট্যসংঘ যে কাজে হাত দিয়েছিলেন তা কত কঠিন ছিল। অথচ এই কঠিন ধাপগুলো পেরিয়ে শ্রেণীগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে সেতু তৈরির কাজটি শুরু করেছিল গণনাট্যসংঘই। শুধু পারস্পরিক শুভেচ্ছায় এটা হয় নি, এর একটা পরিকল্পনাভিত্তিক, সাংগঠনিক দিকও ছিল।[২৩] আবার যেখানে যেভাবে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেখানে সংগঠন সেইভাবে নিজের অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করেছে। যতদূর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া ঘটা সম্ভব ছিল, শ্রমিক ও কৃষক-শিল্পীরা গণনাট্যের আদর্শকে তাঁদের জীবন্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে বাস্তবায়িত করেছেন, আবার যেখানে এই প্রক্রিয়া ঘটল সেখানে অনেকে আদৌ এর আওতায় আসেন নি, কেউ বা সংগঠনের যথোপযুক্ত মনোযোগ না পেয়ে কালক্রমে দূরে সরে গেছেন। গুরুদাস পাল বা নিবারণ পণ্ডিতের মতো সচেতন শিল্পীরা কিন্তু সরে যান নি। এছাড়া গণনাট্য আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক সংকটের দরুন যে ভ্রান্তি এসেছিল, শ্রমিক-কৃষক গণনাট্যকর্মীরাও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের মতোই তার অংশীদার হয়েছেন। যেমন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর একটি প্রবন্ধে উদাহরণ দিয়েছেন শ্রমিকের রচনায় 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে'র প্রভাবের।[২৪] কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে এই ভ্রান্তি ঘটেছে যান্ত্র-

নৈতিক সংগঠনের গাম্ভোয়ারিতে, আর অন্যদিকে শ্রমিক বা কৃষক যেখানে তীব্র শ্রেণীবাস্তবকে তাঁর রচনায় সার্থকভাবে নিয়ে আসতে পেরেছেন, সেটা তাঁর কোনো স্বাভাবিক অসাংগঠনিক শ্রেণীগত অভিজ্ঞতত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বরং উপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, যেখানে শিল্পী সংগঠনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত সেখানে নয়, সংগঠিত প্রচেষ্টাকে যেখানে তিনি পরোক্ষ ও গভীরভাবে মজ্জাগত করতে পেরেছেন, শিল্পী হিসাবে তাঁর সৃজনশীলতাও সেখানেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়॥

উল্লেখপঞ্জি

১. *Marxist Cultural Movement in India. Chronicles and Documents*. ed. Sudhi Pradhan, vol. II, Calcutta, 1982 p. 58.

২. *Communism in India, Unpublished Documents, 1935–1945*, ed. Subodh Roy, Calcutta, 1976 p. 298.

৩. ঐ, p. 334.

৪. 'জনযুদ্ধ-বিষয়ক পার্টি স্কুলের জন্য নোট্স্', পি.সি. যোশী আর্কাইব্স্, জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি (পাণ্ডুলিপি) ১৯৪২/৩২।

৫. 'পীপ্‌লস ওয়ার', ৬ মে, ১৯৪৫, পৃ ১২।

৬. লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ ১১।

৭. *Marxist Cultural Movement*, Vol. I. p. 131.

৮. 'জনযুদ্ধ', ৬ অক্টোবর, ১৯৪৩, পৃ ৩। শ্রমিক-কবি এরসাদ 'কাজরী' সুরে রচনা করেন :

স্টালিনগ্রাড কো কহানী, সব কো ইয়াদ হ্যায় জো বাণী
খানা না মিলে হরগিজ পানি দেশ কা রক্ষা করতা থা।
মিশালে ইস্টালিনগ্রাড, করেঙ্গে দুষমন কো বরবাদ
ইসিসে হোঙ্গে হম আজাদ হম ইয়ে ওয়াদা করতে হ্যায়।

এখানে স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের বিবরণের সঙ্গে স্বাধীনতার আকৃতি মিলে মিশে গেছে। 'জনযুদ্ধে'র ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ সংখ্যায় (পৃ ৮) 'মায় ভূখা হুঁ' নাটকের শেষে সাধনা গুহের গাওয়া 'শুনো বাংলা কি খবরিয়া' নামক গানটির রচয়িতা হিসাবে 'ইর্শাদে'র নাম উল্লিখিত আছে। তিনি এই একই শিল্পী হতে পারেন।

৯. 'পূর্বস্মৃতি হইতে', নিবারণ পণ্ডিত, 'গণনাট্য', জুলাই, ১৯৬৯, পৃ ২৩।

১০. সুধী প্রধান, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৭।

১১. 'গণনাট্য', অক্টোবর ১৯৭২, পৃ ১৫৮–৬৬।

১২. 'পীপ্‌লস্ ওয়ার', ১ এপ্রিল, ১৯৪৫, পৃ ১২।

১৩. 'জনযুদ্ধ', ২৩ জুন, ১৯৪৩, পৃ ১২।

১৪. 'তরী হতে তীর', হীরেন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৪৭ পৃ ৩৫৩।

১৫. 'গণনাট্যসংঘের এক অধ্যায়', রেবা রায়চৌধুরী, 'গণনাট্য', শারদীয় ১৯৮৫ (১৩৯২) পৃ ৭২।

১৬. সুধী প্রধান, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৯। এখান থেকে আমরা জানতে পারি পালার নাম ছিল 'সংঘাত' এবং তা ১৯৫৪ সালে বদরতলার ইউনিট – একটি 'শ্রমিক ইউনিট' – কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গুরুদাস পালের স্মৃতিচারণ ('জীবন ও শিল্প', গণনাট্য, জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃ ৮৯, পৃ ৯৪) থেকে জানা যায় ১৯৪২ সালেই জনযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি 'মুক্তির ডাক' নামে একটি যাত্রা-পালা রচনা করেন, বামপন্থী নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর উৎসাহে বদরতলা রথতলার মাঠে হাজার খানেক দর্শকের সামনে তা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালেও তিনি আর একটি যাত্রা লেখেন, যার একটি গান ঐ স্মৃতিচারণে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। এবং তা অনুষ্ঠিত হবার পর দিনই তাঁকে জেলে যেতে হয়।

১৭. 'আসানসোলে গণনাট্যসংঘ ও প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের আন্দোলন', রামশঙ্কর চৌধুরী, 'গণনাট্য', অক্টোবর ১৯৭৫, পৃ ৬৭-৭০।

১৮. 'লাল শুকরা ওঁরাও ও তাঁর কথা', জগৎ সাহা, জলপাইগুড়ি লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা।

১৯. 'হাওড়া জেলা গণনাট্যসংঘ প্রথম যুগ', অম্বিকেশ মুখার্জি, 'গণনাট্য', জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ ৩৫।

২০. ঐ দলটির যিনি নেতৃত্ব দিতেন সেই Jesse Peter Shulai একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁরা ওখানে গেয়েছিলেন 'A Soug of Bees', খাসিয়া ভাষায় একটি গান।

২১. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ এই সময়ের বিভিন্ন গণ আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন :

> 'Yet each of these streams passed through little channels and finally petered out···the leftist parties including the Communist Party were not strong enough to unify them and comprehend them into a single comprehensive revolutionary upsurge.' ***A History of Indian Freedom Struggle***, Trivandrum, 1986, pp. 185-6.

২২. 'জীবন ও শিল্প', 'গণনাট্য', জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃ ৯০ 'আমার বোগনা বোগনা চেহারা আর গেঁইয়া গেঁইয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে লোক হো হো ক'রে

হেসে উঠল। আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে মুখখানা কাঁচুকুঁচু ক'রে উইংস-এর পাশ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছি। বেগতিক দেখে কমরেড চৌধুরী আবার মাইক ধরলেন। জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "আপনারা হাসবেন না। শ্রমিক শিল্পী, আপনাদের গৌরব, কম্যুনিস্ট পার্টির গৌরব—" সমগ্র সভা নিস্তব্ধ। "গাও আমি রয়েচি ভয় কী?" বললেন কমরেড চৌধুরী। আমি গান ধরলাম।'

২৩. যেমন সুধী প্রধান লিখেছেন 'শ্রমিক-কৃষক নেতারা···দেশের অবস্থার কথা, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্লোগানগুলির ব্যাখ্যা দিতেন এবং শহরের মধ্যবিত্ত তরুণ শিল্পীদের গ্রামে বা শ্রমিক অঞ্চলে অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ে যেতেন।' 'গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য', 'গণনাট্য', শারদীয় ১৯৬৪ (১৩৭১), পৃ ১০৮। এটা ছিল সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটা দিক। সীমিতভাবে হলেও এর অন্য দিকটাও ছিল, অর্থাৎ গণনাট্যের সংগঠকরা শ্রমিক-কৃষক অঞ্চলে শিল্পীর সন্ধানে ও স্থানীয় স্কোয়াড তৈরি করতে যেতেন।

২৪. 'শ্রমিক কবি ও গীতিকার', 'গণনাট্য', জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৬৭, পৃ ২৩-২৪।

পুনর্মুদ্রণ

পতিতোদ্ধার

শ্রীপ্রকৃত মুদগর বাবাজি

For Private Circulation only.

উপক্রমণিকা।

—

সম্প্রতি হিন্দু সমাজের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া, আমি এই অভিনব গ্রন্থখানি সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থে প্রকাশ করিলাম। ইহার গূঢ় বিষয় ও পরস্পর ঘেষাঘেষি রেশারেশি জানিবার জন্য বহুযত্নে ও অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেক স্থান হইতে ইহার মর্ম্ম বাহির করিয়াছি। বলিতে পারি না, যদ্যপি ইহার ভাবার্থ কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহারের সহিত সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তিনি যেন আমার উপর বিরক্ত না হন। বরং চোরের মার কান্নার মত বিরলে রোদন করিবেন। গোলমাল করিলেই তাঁহাকে মলবাহীর মলভাণ্ড আপনার মস্তকে লইতে হইবেক। কারণ মনুষ্যের স্বভাবের বিষয় পুস্তকে লিখিতে হইলে, অনেক স্থানে লোকের স্বভাব চরিত্রের সহিত এমন সংলগ্ন হইতে পারে যে তাহা প্রকৃত স্বরূপ বোধ হয়। অতএব তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি ইচ্ছা করিয়া কাহারও প্রতি দোষার্পণ করিতেছি না।

অহং শ্রীপ্রকৃত মুদ্গর বাবাজি।
সাং নয় নম্বর গুপ্তলেন।

—

ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত
ও পাষণ্ড দলন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করণজন্য প্রায় সকল দেশ বিদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নানারূপ আন্দোলন হইতেছে। এই বিচিত্র ব্যাপারের নিগূঢ় মর্ম্মই বা কি তাহা সাধারণের বিদিতার্থে অনেক স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি। এক্ষণে পাঠকবর্গেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কার্য্য ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতার শিমুলীয়া পল্লীর অন্তর্গত রামবাগানে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ ৺নীলমণি দত্তের তিন পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ ৺বলময় দত্ত, মধ্যম ৺শ্রীরাম দত্ত ও কনিষ্ঠ ৺পিতাম্বর

দত্ত। জ্যেষ্ঠ ৺রসময় দত্তের পাঁচ পুত্র। মধ্যম ৺শ্রীদাম দত্তের চারি পুত্র ও কনিষ্ঠ ৺পিতাম্বর দত্তের দুই পুত্র। ঐ তিন ভ্রাতার বংশধরেরা প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রধান পদে কর্ম্ম করিতেন, ইহারা সকলেই সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি ছিলেন। তাঁহারা নিজ বিদ্যা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে গবর্ণমেণ্টের নিকট ও লোকসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তি শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ সিপাহিবিদ্রোহে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ছয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ দত্ত নিজগ্রামস্থ সিমুলীয়া হিন্দু বিদ্যালয় নামক বিদ্যালয়ে, বাঙ্গলা শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তিনি চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া পরে হেয়ার স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স (অর্থাৎ প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি বিদ্যা শিখিবার জন্য প্রবিষ্ট হন। তথায় ডাক্তারি বিদ্যার সমস্ত বিষয় ভালরূপে শিক্ষা করেন। এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্ এম্ এস্ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় তথাকার প্রধান অধ্যক্ষ কোট সাহেবের বিশেষ অনুরোধে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণের সাহায্যে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে বিলাত গিয়া দুই বৎসর সেখানে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করেন। এবং উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়া নানাবিধ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার বিলাতগমনের জন্য তাঁহার পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

পরে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ২৯ শে এপ্রেল তারিখে বিলাতের এক পরম বন্ধুর অনুরোধে উক্ত বন্ধুর স্ত্রীর ভগ্নিকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই মাস পরে ডাক্তার বাবু আপন স্ত্রীকে ডবলিন নগরে তাঁহার মাতার নিকট রাখিয়া একাকী কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াতে, তাঁহার পিতা মাতা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তুমি আমাদের বিনা অনুমতিতে বিলাত গমন করিয়াছ, আর সেখানে বিলাতি মেম বিবাহ করিয়াছ, এ জন্য আমরা তোমাকে সংসারভুক্ত করিয়া একত্রে বাস করিতে পারি না। অতএব তুমি স্থানান্তরে পৃথক হইয়া অবস্থান কর। ডাক্তার বাবু পিতা মাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র বাটি ভাড়া করিয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু এই সময় চিকিৎসা দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বাবুর কলিকাতায় আগমনের সার্দ্ধ দুই বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী বিলাত হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এবং চিৎপুর রোডের ডাক্তারখানা বাটীতে স্ত্রী পুরুষে সদ্ভাবের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় একবৎসর

পরে ডাক্তার বাবুর এক পুত্র সন্তান হয়। মেম সাহেব ঐ পুত্রকে লইয়া পুনরায় ডবলিন নগরে গিয়া প্রায় আড়াই বৎসর কাল তাহার মাতার সহিত একত্র বাস করেন। পরে ঐ সন্তানকে তাহার মাতামহীর নিকট রাখিয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় আগমন করিয়া স্বামীর সহিত একত্র বাস করেন। এই সময় হইতে তাঁহার মেজাজ পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাতি ধরণে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল এবং স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। আর অনেক সাহেব শুভ ও বিলাতি মেমদিগের সহিত আলাপ ও সর্ব্বদা দেখা শুনার সূত্রপাত হয়, এই ভাবে চলিতে গেলে অনেক খরচের আবশ্যক হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবুর এত আয় হয় নাই যে ঐ সকল খরচ নির্ব্বাহ করিয়া তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। এজন্য পরস্পর মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখানে একবৎসর কাল অবস্থানের পর ডাক্তার বাবুর আর একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁহার স্ত্রী ঐ পুত্রকে লইয়া স্বামীর অমতে দার্জ্জিলিং গমন করেন। সেখানে প্রায় ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এখন তাঁহার নেটিব কোয়ার্টে বাস ও নেটিবের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লজ্জা বোধ হওয়ায়, স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া কলিকাতায় চৌরঙ্গীতে বাটী ভাড়া করিয়া বাস করেন।

তদনন্তর ১৮৯২ খৃঃ অব্দে জুন মাসে বিবাহ ভঙ্গের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে ডাইভোর্সের নিমিত্ত অভিযোগ করেন। পরে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে জুন মাসের প্রথমে মোকর্দ্দমা একতরফায় শেষ হইয়া যায়। এই মোকর্দ্দমার বিচারানুসারে ডাক্তার বাবু মেম সাহেবকে এককালীন ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া খোলসা প্রাপ্ত হন। এবং মেম বা পুত্রদিগের সহিত কোন সম্পর্ক রহিল না। এমন কি পুত্রেরা মাতুলের উপাধি (ওয়াএন) প্রাপ্ত হইল।

যে অবধি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের মেমের সহিত মনোবিবাদ চলিতেছিল, সেই সময় হইতে তাঁহার পিতামাতার পূর্ব্ব শোচনীয় কথা সকল তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বদাই চিন্তান্বিত করিয়াছিল। এখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন কিরূপে পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে পারি। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার মন আরও দুঃখে উদ্বেল হইয়া উঠে। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, আমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও বিলাতি মেম বিবাহ করিয়া অতিশয় গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যেহেতু তাহাদের আচার ব্যবহারের সহিত আমাদের আচার ব্যবহারের কোন প্রকারে মিল হয় না।

আর এই সময় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। তিনি রাত্রিকালে যখন নিদ্রা যাইতেন সেই সময় মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেন যে তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট আসিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন যে তোমার দ্বারা আমার কোন পারলৌকিক কার্য্য হইল না এবং ভবিষ্যতে হইবারও আশা নাই। অতএব যাহাতে তুমি

ম্লেচ্ছধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমাকে এবং তোমার বৃদ্ধা জননীকে সুখী করিতে পার তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হও।

এই সময় হইতে উপেন্দ্র বাবুর অত্যন্ত অনুতাপিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করণের ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপনার মনোগত অভিপ্রায় সকল তাঁহার প্রিয় বন্ধু বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পশুপতিনাথ বসু, শ্যামবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং নিমতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতির নিকট প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া কহিলেন যে তুমি যাহা মনস্থ করিয়াছ ইহা অতি প্রশংসার কর্ম্ম কিন্তু এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যে, তোমার এই বিষয় লইয়া কায়স্থ সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট প্রস্তাব ও আন্দোলন করিবেন। উক্ত বাবুরা এই বিষয় কিছু কাল চিন্তা করিয়া, পরিশেষে সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অনুপচাঁদ মিত্র মহাশয়কে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। যেহেতু উক্ত বাবুর কলিকাতায় প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের সহিত বিশেষরূপ আলাপ ও সম্মান আছে। আর তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা নিশ্চয় একার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন। অনুপ বাবুও উভয়পক্ষের সুহৃদগণের কথা রক্ষার জন্য এই ভার গ্রহণ করিলেন। এবং যাহাতে উক্ত বিষয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন।

উক্ত অনুপচাঁদ বাবু প্রথমেই শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (বি, এ) এবং শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের শাস্ত্র বিষয়ে পরামর্শ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের মতানুসারে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার নেবুবাগানের শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বসুর নিকট গিয়া প্রস্তাব করেন, উপেন্দ্র বাবুর বিলাত যাওয়া, মেম বিবাহ করা, খৃষ্টীয়ান হওয়া, বিবির গর্ভে সন্তানোৎপাদন করা, ডাইভোর্স হওয়া এবং টাকা দিয়া স্ত্রী পুত্রদিগের নিকট হইতে খোলসা প্রাপ্ত হওয়া সমস্ত বিষয়গুলি খুলিয়া কহিলেন। আরও কহিলেন, এইরূপ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করা এই প্রথম হইতেছে না। প্রায় ৭৫ বৎসর গত হইল হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের ৺গোকুলচন্দ্র দত্তের পুত্র ৺কালীপ্রসাদ দত্ত এক যবন কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া ঐ যবনীর আদেশানুসারে তাঁহার নিজের বেলগেছিয়ার বাগানে যাইয়া ত্বকচ্ছেদ ও কল্মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে উক্ত যবনীর গর্ভে ও দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ২।১ টী সন্তানাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণ বশতঃ দত্ত বাবু হিন্দুসমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বর্ষ পরে, তাঁহার মুসলমান পত্নী ও সন্তানাদির মৃত্যু হয়। পরে উক্ত কালীপ্রসাদ বাবু হিন্দুসমাজে মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া, সিমুলিয়াস্থ সুপ্রসিদ্ধ ৺রামদুলাল সরকার মহাশয়কে বিশেষরূপ অনুরোধ করেন, তাহাতে উক্ত সরকার মহাশয় আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত দত্ত বাবুর

বাক্যে সম্মত হইলেন, কিন্তু সে সময়ে কলিকাতার কায়স্থ সমাজের প্রায় সকল দলপতি এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া সরকার মহাশয়ের বিপক্ষে অনেক বিরুদ্ধাচরণ করেন, আর যাহাতে উক্ত কার্য নিষ্ফল হয়, সে জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাধারণের বিবেচনা করা উচিত ছিল ঐ সময়ে শোভাবাজার নিবাসী মহারাজা ৺ রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কোন এক প্রসিদ্ধ সুন্দরী যবনীর প্রেমে মোহিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিতেন। এবং তাহার পরামর্শে নিজে তাজিয়া বাহির করিয়া অতি সমারোহে মাণিকতলায় গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দোষী কিম্বা জাতিচ্যুত হন নাই। কিন্তু সরকার মহাশয় দত্ত বাবুকে আশ্বাস দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি প্রাণপণ যত্ন করিব। এবং অর্থের অভাব হইলে তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইব না। সরকার মহাশয় উক্ত কার্য্য সমাধার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ তিনি মোকাম শ্রীশ্রী ৺কালীঘাটের সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয় দিগের ও ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, আড়ুল, বর্দ্ধমান, কলিকাতা অপর অপর স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন। পরে খানাকুলকৃষ্ণনগর, জঙ্গলবাদা, বাগুটিয়া, কোন্নগর, সৌগন্ধ্য, আন্‌কুলবেলে শাণিহাটি, কলিকাতা ও অন্যান্য সমাজের প্রধান প্রধান কুলিনদিগকে আপন কার্য্য সম্পন্নের জন্য তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করেন। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, পরে কলিকাতার যাবতীয় দলপতি এবং অপর লোকেরা সরকার মহাশয়ের পুত্র পৌত্র জামাতা ও পারিষদবর্গকে মুসলমান আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।* এবং তাঁহাদের নামে, নানাপ্রকার লহরী গান ও পীরের গান বাঁধিয়া কলিকাতা হুলস্থুল করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার মহাশয় এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া ঐ কালীপ্রসাদ বাবুকে সমাজে রীতিমত চালাইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশাবলীরা সম্মানের সহিত সকল সমাজে চলিত হইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তাঁহার সকল স্থানেই নিমন্ত্রণ হইতেছে। এবং এখনও ২।১টি প্রাচীন ব্যক্তি জীবিত আছেন যাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষরূপ অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত অম্বুজচাঁদ মিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবুকে কহিলেন, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর গত হইল, গ্রীশ দেশের হিরোডোটস্, মিগাস্থিনিস্ এবং এরিয়ান

---

* রামদুলাল সরকার। গোলাম রবিস।
হ্যাতু বাবু ও লাটু বাবু। এবা ও দেবা।
রাধাকৃষ্ণ মিত্র। মিঠালাল।
রামচন্দ্র মিত্র। রহিম বক্স।

প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তারা তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, যে সময় ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক রাজ্য পার্শিয়ানদিগের অধীনস্থ ছিল সে সময় ঐ পার্শিয়ানদিগের সহিত গ্রীশিয়ানদিগের যুদ্ধ হয়। পারস্যের রাজা জারক্সিস্ কেবল ভারতবর্ষ হইতে ৭ লক্ষ সৈন্য এবং অপর অধীনস্থ রাজ্য হইতে প্রায় ৬৩ লক্ষ সৈন্য লইয়া গ্রীশরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল যুদ্ধেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা, জামাতা ও অধিকাংশ সৈন্য সামন্ত সকলই প্রায় ধ্বংস হইল। ইহার মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অপর জাতির কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। ইহাতেও তাহারা জাতিভ্রষ্ট হয় নাই।

আর প্রায় দুই হাজার বৎসর গত হইল, মাসিডোনের রাজা আলেকজান্দার দি গ্রেট জয়াশার বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র গ্রীশ, কার্থেজ, আর্মেণিয়া, সিরিয়া, টিউনিস, ইজিপ্ট, ফিনিসিয়া, পারস্য এবং ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশের কোন কোন রাজ্য জয় করিয়া ভূমণ্ডলের সম্রাট পদ লাভ করেন। তিনি এদেশ হইতে উত্তম উত্তম নানা প্রকার বিষয়ের গ্রন্থ সকল লইয়া আপনার আলেকজান্দারিয়া নামক পুস্তকালয়ে পাঠাইয়া দেন। আর এদেশের উত্তম উত্তম পণ্ডিত ও যোগী সকলের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে, তাঁহাদিগকে আপনার সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহাকে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে হইল না। যাইবার সময় পথিমধ্যে ব্যাবিলন নগরে জ্বররোগে মৃত্যু হয়। তাঁহার যে সন্তান ছিল, নিতান্ত শিশু, একারণ উক্ত জয়লব্ধ রাজ্য তাঁহার ৫ জন প্রধান সেনাপতিরা বিভাগ করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে সেলিউকস নামে একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি পারস্য, সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের অধীশ্বর হইলেন। এই সময় ভারতবর্ষ মধ্যে মগধরাজ্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইহার রাজা নন্দ অতি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। এবং শকটকার ও রাক্ষস নামে দুই জন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিল।

পরে মহারাজ নন্দ পরলোক গমন করিলে তাঁহার সুজাত পুত্রেরা পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন এবং তাঁহার দাসী পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ না দিয়া তাঁহাকে মারিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাহাতে অসম্মত হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। তথায় আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করেন যাহাতে তিনি আসিয়া মগধ রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে রাজা করেন। আলেকজান্দার তাঁহার অত্যন্ত গর্ব্ব ও কুপ্রবৃত্তি স্বভাব দেখিয়া এবং ঘৃণাকর অভিপ্রায় শুনিয়া, তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার নিজ দেশে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া মগধরাজকে পরাস্ত ও হত করত স্বয়ং রাজা হন। এবং মগধরাজ্যে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আর ঐ রাজ্য এত বিস্তৃত ও উচ্চদাবশিষ্টকরিয়াছিলেন যে, সমস্ত

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং যাহাদের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব ছিল না.. সকলকেই আপনার অধীনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে সেলিউকস নামে যিনি আলেকজান্দারের ৫ জন সেনাপতির মধ্যে একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি আপন সৌভাগ্যবলে পারস্য, অর্ম্মেণিয়া, ফিনিসিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মিগাস্থিনিস্ নামে এক বিজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতকে দূতস্বরূপ করিয়া মগধের রাজসভাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিগাস্থিনিস্ সেলিউকসের পুত্রের সহিত চন্দ্রগুপ্তের কন্যার বিবাহের ও উভয় রাজ্যের সওদাগরি বিষয়ে প্রস্তাব করেন। তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় সেলিউকসের সহিত আলেকজান্দারের অপর আর একজন জেনেরলের যিনি ইজিপ্টদেশের রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ হয়. এই উপলক্ষে বিবাহকর্ম্ম রহিত হইয়া যায়।

আবার যখন মোগল সম্রাটদিগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের বিবাহের নিয়ম প্রচলিত ছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান প্রভৃতি অনেক মুসলমান সম্রাট হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান গৃহে বিবাহ করেন। অর্থাৎ জয়পুর, যোধপুর, মালওয়ার, গুজরাট প্রভৃতি বড় বড় রাজাদিগের সহিত বিবাহের করণ কারণ ছিল। এই সকল কারণবশতঃ হিন্দুরা সম্রাটদিগের নিকট হইতে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইতেন। সম্রাটগণ উক্ত কর্ম্মচারিদিগকে সেনাপতি, দেওয়ান, ওমরা প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিতেন। তাঁহারা এই সকল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, সম্রাটগণের রাজ্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত কলুটোলা নিবাসী ৺হরচন্দ্র দের পুত্র মহেন্দ্রনাথ দে যিনি ছোট আদালতের প্রীডার ছিলেন, ভবানীপুরের কোন এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ তনয় যিনি এক্ষণে জীবিত আছেন ও বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাংসাহ পরগণার জমিদার চন্দ্রকিশোর বাবু, ইহাঁরা সকলেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সকল বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এই সমস্ত শুনিয়া শ্রীযুক্ত নন্দ বাবু অন্নপূর্ণ বাবুকে কহিলেন, আমাদের কায়স্থকুলসংরক্ষিণী সভার উদ্দেশ্য যাহারা বিলাত বা অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং ধর্ম্মত্যাগকরতঃ অনুতাপিত হইয়া পুনরায় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লওয়া যাইবে। এজন্য কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কুটুম্ব পাথুরিয়াঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিয়া ২।১ দিনের মধ্যে বলিয়া পাঠাইব। ইহার তিন চারি দিন পরে তিনি ইংরাজী ভাষাতে শ্রীযুক্ত অন্নপূর্চাদ মিত্র বাবুকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র বাবু ও অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তিগণ কেহই ইহাতে সম্মত হইলেন না। অতএব আমি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।

ইহার ২।১ দিন পরে, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতচাঁদ মিত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (বি, এ) মহাশয়ের ব্যবস্থা ও কোন্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তদ্বিষয়ে শোধকতা করা ও অপর বিষয়গুলি সংগ্রহ করিলেন। এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া উক্ত গিরীন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে কতকগুলি পণ্ডিত ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। এবং তথায় যেরূপ নন্দ বাবুর নিকট উপেন্দ্র দত্তের বিষয় কহিয়াছিলেন এবং শোধকতার সহিত আর আর অনেক বিষয় বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। তাহাতে উদার স্বভাব বহুবিধ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং উপস্থিত বিজ্ঞ পণ্ডিত সকলেই অত্যন্ত আদরের সহিত মত দিলেন। এবং আরও কহেন, যে সময় পড়িয়াছে ইহাতে এই সব কার্য্য না করিলে—অর্থাৎ বিলাতফেরা ও খৃষ্টানেরা, যাহারা স্বইচ্ছায় পুনরায় সমাজে মিলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে না লইলে আমাদের সমাজের কোন কালে উন্নতি হইবে না। বরং উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে থাকিবেক। এই বলিয়া তিনি সাধারণকে আপনার মত জানাইবার জন্য আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন। এবং কহিলেন, কলিকাতার যাবতীয় দলপতি ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের এই সকল বিষয় জানাইয়া তাঁহাদের মত লইতে হইবে। গিরীন্দ্র বাবুর এই উপদেশে শ্রীযুক্ত অমৃতচাঁদ মিত্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকে সঙ্গে করিয়া অনেকের নিকট যাইয়া তাঁহাদের মত স্বাক্ষর করিয়া আনিলেন। স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

নাম	সাকিন
মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর	শোভাবাজার
মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ঐ
কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ঐ
কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	পাথুরিয়াঘাটা
„ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ	ঐ
„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	জোড়াবাগান
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতচাঁদ মিত্র	সীমলা
„ চারুচন্দ্র ঘোষ	ঐ
„ কালীকুমার দেব	ইটালী
„ যোগেন্দ্রকুমার দত্ত	নিমতলা হাঃ সাঃ রামবাগান
„ শিবকৃষ্ণ দত্ত	নিমতলা
„ তেজচন্দ্র দত্ত	ঐ
„ রাজনারায়ণ দেব	ইটালী

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ মিত্র	চোরবাগান হাঃ নিঃ সীমলা
„ কিশোরীমোহন মিত্র	ঐ
„ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ
„ প্রমথনাথ মিত্র	ঐ
„ গোয়াচাঁদ বসু	গোয়াবাগান
„ ভূপেন্দ্রনাথ বসু	শ্যামবাজার
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ডাক্তার	নিমতলা
„ পাঁচকড়ি দে	পটলডাঙ্গা
„ বলাইচাঁদ সিংহ	জোড়াসাঁকো
„ রামচন্দ্র মিত্র	জামাপুকুর
„ অমৃতনাথ মিত্র	চোরবাগান
„ গিরীন্দ্রকুমার দত্ত	নিমতলা
„ ললিতচাঁদ মিত্র	সীমলা
„ দয়ালচাঁদ বসু	গরানহাটা
„ শ্যামলখন দত্ত	নিমতলা হাঃ নিঃ কলবাম দের ষ্ট্রীট
„ হরিনাথ দত্ত	নিমতলা
„ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	ঐ
„ উপেন্দ্রকুমার দত্ত	ঐ
„ লালগোপাল দত্ত	নিমতলা হাঃ নিঃ গরানহাটা
„ কেদারেশ্বর দত্ত	ঐ
„ বেণীমাধব বসু	গরানহাটা
„ সীতানাথ মিত্র	সীমলা
„ নরেন্দ্রকুমার দত্ত	পানিহাটি
„ বীরেশ্বর দত্ত	নিমতলা
„ বৈদ্যনাথ দত্ত	গোপীকৃষ্ণ শালস্ লেন
„ আশুতোষ ঘোষ ডাক্তার	গরানহাটা
„ অভয়চরণ গুহ	হোকলকুড়া
শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ গুহ	ঐ
„ গোবিনচাঁদ দত্ত	নিমতলা হাঃ নিঃ হাতীবাগান
„ নবীনচাঁদ দত্ত	ঐ
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	শোভাবাজার
„ প্রিয়নাথ বসু	সীমলা
„ হরকালী ঘোষ	গরানহাটা
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	টালা

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদকুমার দত্ত	পাথুরিয়াঘাটা
„ দেবেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
„ বৈকুণ্ঠনাথ বসু	সীমলা
„ মণিতচাঁদ [?] মিত্র	ঐ
„ সরলচাঁদ মিত্র	ঐ
„ মদনমোহন বসু	বরাণহাটা
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ	শোভাবাজার
„ বরদাকান্ত মিত্র	ঐ
„ অচিন্ত্যনাথ বিশ্বাস	খড়দহ
„ বৈদ্যনাথ মিত্র	কুমারটুলি
„ গোপালচন্দ্র মিত্র	সীমলা
„ লালিমোহন [?] মিত্র	ঐ
„ পাঁচকড়ি মিত্র	ঐ
„ অক্ষয়কুমার সিংহ	ঐ
„ মহেন্দ্রচন্দ্র আইচ	ঐ
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র আইচ ডাক্তার	ঐ
কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	শোভাবাজার
„ অনাথকৃষ্ণ দেব	ঐ
„ মণীন্দ্রনারায়ণ দেব	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু নীরোদকৃষ্ণ বসু	ঐ
„ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ
„ বিহারীলাল বসু	ঐ
„ বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ	গ্রে ষ্ট্রীট
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	শোভাবাজার
„ যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মল্লিক	ঐ
„ শরচ্চন্দ্র মিত্র	ঐ
„ গোপালচন্দ্র বসু	পটলডাঙ্গা
„ শিবদাস ঘোষ	শ্যামপুকুর
„ চারুচন্দ্র সরকার	শোভাবাজার
„ ফণীন্দ্রকুমার মিত্র	নিমতলা
কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব	শোভাবাজার
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্যামপুকুর

কুমার সুশীলকৃষ্ণ দেব	শোভাবাজার
শ্রীযুক্তবাবু নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক	দমদমাহাটা
কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব	শোভাবাজার
„ যতীন্দ্রনারায়ণ দেব	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু	ঐ
„ আশুতোষ বসু	ঐ
„ নালমাধব সর্ব্বাধিকারী	ঐ
„ যাদুগোপাল বসু	সীমলা
„ আশুতোষ ঘোষ	ঐ
„ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	কাশীমিত্রের লেন কুমারটুলি
„ গোলাপলাল ঘোষ	বাগবাজার
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্যামবাজার
„ মনোমোহন ঘোষ	পেনেটি
„ নলিনাক্ষ বসু	শোভাবাজার

দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র ও ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত উভয়ে এককালীন পীড়িত হওয়াতে অনেক ভদ্রলোকের নিকট যাইতে পারিলেন না। এ দিকে প্রায়শ্চিত্তের দিন সংকীর্ণ হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত দাসস্য কর্ত্তৃক পত্র দ্বারা তাঁহার স্বজাত ও বন্ধুবান্ধব অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হইল। ঐ পত্রের অবিকল নকল নিম্নে লিখিত হইল।

যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ—

আগামী ৮ই বৈশাখ শুক্রবার মদীয় মধ্যম সহোদর শ্রীমান উমেশচন্দ্র দত্তের প্রায়শ্চিত্ত ও দীক্ষা উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অপরাহ্ন বেলা ৫ ঘটীকার সময় পুরাণ পাঠাদি হইবেক। অতএব মহাশয় সবান্ধবে সভাস্থলে সমবেত হইয়া পাঠ শ্রবণ এবং জলপান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি।

কলিকাতা।
৭ নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট,
রামবাগান
৫ই বৈশাখ ১৩০১।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত দাসস্য।

নন্দ বাবু ও গিরীন্দ্র বাবুর নিকট যেরূপ বলা হইয়াছিল, স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাই অবিকল বলা হইল। তাঁহারা এ সমস্ত শুনিয়া সকলেই আনন্দের সহিত স্বাক্ষর করিলেন। গত ৮ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (বি, এ) এবং মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থানুযায়িক ৭ই বৈশাখ মস্তক মুণ্ডন হইয়া ৮ই বৈশাখ রীতিমত গঙ্গাস্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তদুপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ সকল আসিয়া জলপান করেন। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকৃষ্ণ মিত্রের জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দত্তও আগমনপূর্ব্বক সকলের সহিত আহারাদি করেন। এবং অনেকগুলি অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর উপেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (বি, এ) ও মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে সকল অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অতি সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে সন্না করিয়া মিষ্টান্ন প্রদান করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে নন্দলাল বসু বাবুর গুরুও উপস্থিত থাকিয়া বিদায় ও মিষ্টান্নের সন্না লইয়া যান।

পরে আমরা এই সকল ব্যাপার বিদিত হইয়া, বলিতে পারি না কি জন্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু, শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা, শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ মিত্রের কুহকে পড়িয়া উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ জন্য এত বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। ইহা কেবল তাঁহাদের মনের ঈর্ষা ও স্বভাবের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহারা কি জানেন না যে, অনেক ভদ্র সন্তান এক্ষণে বিলাত, ফ্রান্স, জর্ম্মনি ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিদ্যা ও ব্যবসা শিখিতে যাইতেছে। তাহাতে দেশের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বাবুদিগের কুটুম্ব হয়েন। এই সকল লোক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, আমরা তাহাদের উপর এ প্রকার অত্যাচার করিয়া সমাজচ্যুত করিলে, তাঁহাদের মন বিরূপ হইয়া যায়।

আর যে সময়ে কলিকাতা সীমুলীয়া নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগন্ধ্যা অমরপুর নিবাসী ৺কালীকিঙ্কর পালিতের পুত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ইহারা বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের নিজ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব অভিপ্রায় মত সমাজভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীন সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক ও আর কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সমাজ চলিত বিষয়ে অমত করেন। তাহাতে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাজ ত্যাগ করিয়া আলাহিদা রহিলেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ পালিত যিনি সীমলা দর্জিপাড়ার নবরত্ন কুলের মিত্র মহাশয়দিগের বাটীতে বিবাহ করেন, তাঁহাকে সমাজভুক্ত করিতে শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সম্মত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্রের জামাতার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন মল্লিকের সময় প্রথমে কয়েক মাস অমত করিয়া পরে তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এখনও তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বাটীতে কোট পেণ্টুলন পরিয়া থাকেন

এবং খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার নাই। আর সাহেব বলিয়া না ডাকিলে উত্তর দেন না। মল্লিক বাবুদের এই সকল ব্যবহার এক্ষণে কুমুদকৃষ্ণ বাবুর নিকট দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

আরও দেখা যায় অনেক বিলাত ফেরা ব্যক্তিদিগের পিতা মাতা বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাঁহাদের সন্তান সকলকে সংসারভুক্ত করতঃ নিজ দেশে এবং কলিকাতায় অচল হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, তাঁহারা আবার ঐ সকল বিলাত ফেরতদিগের ভ্রাতাকে কন্যা প্রদান করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। তাঁহারা নিজের বেলা বলেন "যাকড় মারিলে ধোকড় হয়।"

অতঃপর নন্দবাবুর বিষয় কি বলিব। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ও ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি, তিনি কি জানেন না শ্রীশ্রী৺ চৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁহাকে সকলে অবতার বলিয়া জানেন। তিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা, কৌশল প্রগাঢ় অমায়িকতা, উদার স্বভাব ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা অনেক মুসলমান ও অন্যান্য জাতিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করেন। সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। আর তাঁহাদের সংস্পর্শে থাকিয়া ও তাঁহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়া হিন্দুরা কি জাতিচ্যুত হইয়াছেন। অতএব নন্দবাবুর ঐ সমস্ত বিষয় লইয়া এখন আন্দোলন করা উচিত হয় না।

এমনও দেখা যায় যে কোন আধুনিক ব্যক্তি তাঁহাদের পল্লিস্থ পূর্ব্বের আলাপি, যাঁহারা তাঁহাদিগের অনুগত আশ্রিত, আর তাঁহাদের জাত কুলের পরিচয় দিতে হইলে অবাক হইয়া পড়িতে হয়, কেহ কেহ তাঁহাদিগকে লইয়া আপনার সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। এখনও উক্ত পল্লির অনেকেই ঐ সকল ব্যক্তির বাটীতে অদ্যাপি আহারাদি করেন নাই।

এতদ্ব্যতিরিক্ত হিন্দু সমাজে যদ্যপি কোন কন্যার পাণিগ্রহণ কারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যায়, আর ঐ দিবস বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পীড়া কিম্বা কোন কারণ বশতঃ স্থিরীকৃত বর উপস্থিত না হয়, তবে ঐ কন্যার বিবাহ স্থগিত থাকিতে পারে। যদি থাকে তাহা হইলে কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না। এবং তাহার কি হিন্দুধর্ম্ম মতে কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমরা সকলে জ্ঞাত আছি যে তামা তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করতঃ উক্ত দিবসে কন্যা সম্প্রদান না করিলে নীচত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ওও হিন্দুরা 'হুট' বলিয়া অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহ বন্ধ রাখিলেন। পরে অন্য একদিন ঐ পাত্রের সহিত পুনরায় বিবাহ দিলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা এরূপ ঘটনা কুত্রাপি দেখি নাই ও শুনি নাই।

আর আজকাল এমনও দেখা যায় যে, বাটীতে কোন পূজা উপলক্ষে ইংরাজের মজলিস বা সকের যাত্রা থাকিলে, এমন যে পরম গুরু পিতা মাতার যদি ঐ সময় মৃত্যু সংবাদ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সংবাদ গোপনে রাখিয়া

ঠাকুরের অঞ্জলি দেওয়া ও সাহেবদিগের সম্মুখে জুতা ও পোষাক পরিয়া এবং সকের যাত্রার লোকদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য কি হিন্দুধর্ম্মে মহাপাপ বলিয়া গণ্য নহে। এবং ইহা কি কোন প্রকৃত হিন্দুতে করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বাবুর বিষয় কি বলিব। তিনি একজন প্রকৃত হিন্দু হইয়া তাঁহার উপস্থিত ভ্রাতৃ শ্রাদ্ধে যেরূপ পূজাবর ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছে। এইটি তাঁহার সঙ্গ দোষে ঘটিয়াছে। তাঁহার জানা আবশ্যক সৎসঙ্গে কাশীবাস। এবং—।

আর আগাছা পরগাছার বিষয় কি লিখিব, তাঁহারা যে কালে গুঁড়িকে মারিয়া নিজের তেজ প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহাদের তুল্য অজ্ঞ আর পৃথিবীতে নাই। তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলবিক্রম সকল ব্যক্তি অবগত আছেন। অতএব উঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, হাজার বড় হই না কেন তবুও নীচে থাকিতে হইবেক। যাহাদের জাতির কুল মূল নাই সেই সকল ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কেন বৃথা মাথা নাড়া দেন।

সাধারণ পাঠকগণ এমনও দেখিয়াছেন, পূর্ব্বেকার ধনী ও প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা জীবিতাবস্থায়, কেহ কেহ বা মৃত্যুকালীন দেবতা প্রতিষ্ঠা ও কাশীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং গুরু পুরোহিত ও দুঃখী আত্মীয় স্বজনের পেন্‌সিয়ান (অর্থাৎ মাস হারা) বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এখনকার গোঁড়া হিন্দুরা জীবিতাবস্থায় উইলেতেই দেবতা প্রতিষ্ঠা বা মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আপন আপন রক্ষিতা ব্রাহ্মণী বা বেশ্যাদিগকে বিচিত্র অট্টালিকা ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের নিজের ও তাহাদের মাতার জন্য মাসহারা বরাদ্দ করিয়া দিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

এক্ষণে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া সাধারণের বিদিতার্থ ভূষণ্ডীর লিখন হইতে অবিকল ব্যাপারটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যে সকল মহা মহা শক্তিধর স্বার্থপরতা রাখেন না, যাহাদিগের মস্তক বিচলিত হয় না এবং যাহাদিগের ব্যবস্থা নির্ভুল বলিয়া সকলে জানে, তাঁহারা যে কেন উপেন্দ্র দত্তের বিষয়ে এত বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, কিন্তু অপর কোন একটী কায়স্থ যুবকের প্রতি সন্তোষ হইয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। ইহা কেবল হস্ত চুলকনা রোগ ব্যতীত আর কিছু বোধ হয় না।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণ

সমীপেষু

কস্যচিৎ নিবেদনং

কোন কায়স্থযুবক পাদ্রী সাহেবের কুহকে মুগ্ধ হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

পরে ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকায় হিন্দু ধর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রকাশ করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্মমতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়।

অস্যোত্তরং

শাস্ত্রবিরুদ্ধপরধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপবিধানাৎ স্বধর্ম্মপরিত্যাগে পাপবিধানাচ্চান্দ্রায়ণেন পাপক্ষয়বিধানাচ্চ ম্লেচ্ছজাতীয়কুহকেন মুগ্ধতয়া সমাজবিরুদ্ধং ম্লেচ্ছধর্ম্মং গৃহীতবত্তা শূদ্রেণ তজ্জনিতপাপক্ষয়ায় ব্রতাগ্নপক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণী-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং তেনাস্য ব্যবহার্য্যতাপীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণং।

১। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

তত্র হেতুঃ সধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ। ইতি গীতা।

২। সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রমাণতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

৩। বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম॥
ইতি মনুবচনঞ্চ।

৪। চান্দ্রায়ণেন চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেদিতি স্মার্ত্তধৃত বচনঞ্চ।

শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্নস্য সাং নবদ্বীপ।

শ্রীমধুসূদন স্মৃতিরত্ন সাং নবদ্বীপ মোং কলিকাতা শিমলা নয়ানচাঁদ দত্তের লেন ২৩ নং বাটী বা সংস্কৃত কলেজ।

শ্রীদুর্গাচরণ তর্কালঙ্কার সাং বিক্রমপুর জেলা ঢাকা, কলিকাতা পাথুরেঘাটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান।

শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি, কলিকাতা হাতিবাগান সাং হাসনহাটী, বৈঁচির ষ্টেশন, পোঃ বৈদ্যপুর জেলা বর্দ্ধমান।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি সাং গইলা জেলা বরিশাল, পোষ্ট গইলা।

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতা ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

শ্রীরামেন্দ্র ন্যায়বাগীশ সাং ভাটপাড়া পোষ্ট ভাটপাড়া, জেলা চব্বিশ পরগণা।

সকলেই বিদিত আছে, যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম করিয়া আন্তরিক অনুতাপ করেন, সেই তাহার সর্ব্ব শাস্ত্র মত প্রায়শ্চিত্ত, আর ইহাও সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে যে গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিলেই সমস্ত পাপের ধ্বংস হয়। তাহার আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

এখন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রকৃত অনুতাপিত হইয়া গদগদ কৃতবাসে যোড় হাত

করিয়া সকল ভদ্রলোকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তবে ইহার প্রতি কি জন্য কতকগুলি ধর্ম্ম বাধা ব্যক্তি এত বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, এবং সহোদরা, দুহিতা, মাসী, পিসি ও স্বশ্রূ প্রভৃতি অগম্যগমন, অখাদ্য ভক্ষণ ও পরধন হরণ ইত্যাদি কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারাই আবার সমাজ মধ্যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মাথা নাড়া দেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মস্তকে নামাবলী গাত্রে হরিনামের ছাপ ও গলায় ত্রিকণ্ঠী মালা ধারণ করিয়া লোককে জানান, আমরা পরম ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। কিন্তু আমরা জানি তাঁহারা ধর্ম্ম বাধা ব্যক্তি। অর্থাৎ ব্যাঘ্র যেমন জীবজন্তু দেখিলেই আক্রমণ করে, ইঁহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। উক্ত লোক দেখান বেশভূষাগুলি হজমিগুলি। যেহেতু ইহার দ্বারা সমস্ত পাপ হজম হইয়া যায়। এক্ষণে আমরা সকল ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উল্লিখিত পাপগুলি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের পাপ হইতে গুরু কি লঘু? যদি ঐ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তবে কি উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমরা প্রকৃত হিন্দুর উত্তেজনা সহিতে পারি, কিন্তু ভণ্ড হিন্দুদিগের সহিতে পারি না। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে তাপিত বালুকা রাশির তাপ কোনক্রমে সহ্য হয় না।—

সম্প্রতি হাতিবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গবিনচাঁদ দত্তের শ্রাদ্ধোপলক্ষে এক মহতী সভা হয়, ঐ সভাতে নবদ্বীপ, মুরশিদাবাদ, বিক্রমপুর, ঢাকা, যশোহর ও বরিশাল প্রভৃতি অনেক স্থানের অধ্যাপকগণ উক্ত সভাতে সমবেত হইয়াছিলেন। এবং কলিকাতার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় পণ্ডিত কুলতিলক শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা এবং শাস্ত্রের ব্যবস্থা, সমস্ত প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, শূদ্র জাতি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, অতএব উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের হিন্দুধর্ম্ম পুনরাগমন বিষয়ে কোন পণ্ডিতই শাস্ত্র হইতে ইহার বিরুদ্ধে একটিও প্রমাণ দিতে পারিলেন না।

আর অনেক প্রাচীন ভদ্রলোক জ্ঞাত আছেন, প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর গত হইল, যে সময়ে রেভেরেণ্ড ডফ্ সাহেব, রেভেরেণ্ড ওগলবি সাহেব ও রেভেরেণ্ড লং সাহেব প্রভৃতি বড় বড় মিশনরিরা অনেক অবোধ হিন্দু সন্তানকে তাঁহাদের কুহকে ফেলিয়া নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তখনকার হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাগণ পতিতোদ্ধারিণী সভা নামে একটি সমাজ স্থাপন করেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে সকল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সন্তানগণ স্বইচ্ছায় নিজ ধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিতে চাহেন তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইবেক। আর দরিদ্র হিন্দু বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক

হিন্দু চ্যারিটেবিল ইনষ্টিটিউসন নামে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া ঐ সভায় এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাধা করিতেন। এই সভার অধিবেশন ৭।৮ বার গরাণহাটার ওরিএন্টেল সেমেনরি নামক বিদ্যালয়ে হইয়াছিল। তাহাতে আমড়াতলা নিবাসী ৺ শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সর্ব্ববাদী সম্মত সম্পাদক হইয়াছিলেন। এবং ঘোড়াসাঁকো নিবাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺ রমানাথ ঠাকুর ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হন। আর সিমুলীয়ানিবাসী ৺ আশুতোষ দেব ও ৺ প্রমথনাথ দেব মহাশয়েরা ধনাধ্যক্ষ ছিলেন।

আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সভার সভ্য ও বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব	শোভাবাজার
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	ঐ
৺ শিবনারায়ণ ঘোষ	পাথুরিয়াঘাটা
৺ কালীচরণ দত্ত	নিমতলা
৺ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল	ভুকৈলাস
৺ মতিলাল শীল	কলুটোলা
৺ বীর নরসিংহ মল্লিক	পাথুরিয়াঘাটা
৺ কাশীনাথ মল্লিক	সিঁদুরেপটি
৺ রাজেন্দ্র মল্লিক	চোরবাগান
৺ দুর্গাচরণ দত্ত	বহুবাজার
৺ দেবনারায়ণ দে	ইটালী
৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর	পাথুরিয়াঘাটা
৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ	সীমলা
৺ রামকমল সেন	কলুটোলা
৺ রামরত্ন রায়	কাশীপুর
৺ বৈকুণ্ঠনাথ মুনসি	ঐ
৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দ্রিকা সম্পাদক
৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	প্রভাকর সম্পাদক
৺ সৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	ভাস্কর সম্পাদক

এক্ষণে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে যে মহোদয়গণ স্বদেশ-হিতৈষিতা ও সৎকর্ম্মের জন্য অকুতোভয়ে অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিগণের সামান্য আপত্তি ও আবদার সকল না শুনিয়া অনুতাপিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদিগকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আর পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি এ মহাশয় যিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন আর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীননাথ ন্যায়রত্ন যিনি ইহার

শোককর্তা করেন, তাঁহাদিগের চরণে ভূয়োভূয়ঃ দণ্ডপাত করিলাম।

শ্রীহরিঃ শরণং।

পরম পূজনীয়াশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্বজ্জনগণমহাশয়

শ্রীশ্রীচরণেষু—

সন্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং।

কোন কায়স্থযুবক বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ইংলণ্ডদেশে (বিলাত) গমন করেন তথায় মোহবশতঃ ম্লেচ্ছকন্যার রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন ম্লেচ্ছান্ন ও অন্যান্য অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি শাস্ত্রগর্হিত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে মোহ দূর হওয়ায় ম্লেচ্ছকন্যার সহবাস প্রভৃতি সমস্ত অকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছুক আছেন। অতএব যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়, ইতি।

এতন্নিপ্যর্থানুসারেণ—

মোহানুষ্ঠিত-ম্লেচ্ছদেশগমন-স্বধর্ম্মত্যাগ- ম্লেচ্ছকন্যাপাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদনবহুকালাভক্ষ্যাভক্ষণাদিপাপকারিণা তত্তৎ পাপকার্য্যেভ্যঃ সম্যক নিবৃত্যাতত্তৎপাপক্ষয়চিকীর্ষুণা অনুতপ্তেন মূত্রেন যথোক্তব্রতাদাশক্তৌ সদক্ষিণকং ষষ্ট্যধিকত্রিশতধেনুদানরূপং তন্মূল্যদানরূপং বা প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদ্যাং মতং।

শ্রীজীবানন্দশর্ম্মণাম্।

কোন্নগর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুমোদন পত্র—

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে দিয়াছেন তদ্বিষয় আমার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন আছে।

শ্রীদীনবন্ধুশর্ম্মণাং।

—

OPINION OF THE PRESS

THE ENGLISHMAN

Monday, April 23, 1894

RE-ADMISSION TO CASTE.—Babu Upendro Krishna Dutta, (Dr. U. K. Dutt) has been readmitted into caste, after performing the penance prescribed in the Hindu shastras. The ceremony,

which is of rare occurrence, took place on Friday evening at the house of his brother, Surendro Dutt, in Calcutta. Dr. Dutt went to England some years ago to study medicine, and there he was baptised and married a Europen girl, with whom he returned to Calcutta. He lived with his wife for some years and had three children. Last year his wife obtained a legal separation. The rite of the penance was performed by a Brahmin under the direction of a leading pundit of the Hindu community. Mnay high caste Kaistas were present, including Maharaja Norendro Krishna, Kumar Binoya Krishna of Shovàbazar and several members of Hatkhola Dutt family.

—

THE HINDOO PATRIOT

Tuesday, April 24, 1894

Re-admission to Caste.—Babu Upendra Krishna Dutt, (Dr. U. K. Dutt) has been re-admitted into caste, after performing the penance prescribed in the shastras.

—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

Calcutta, April 24, 1894

The re-admission of Dr. U. K. Dutt to Hindu society is an incident which shows the catholicity and elasticity of that society. Babu Upendra Krishna Dutta not only proceeded to England and lived there for several years in an un-Hindu way, but went the length of marrying an English lady. Last year there was a legal separation between wife and husband, and Babu Upendra Krishna was anxious to be taken back into society as a Hindu The proposal was at first regarded as a most extraordinary one, and it was feared that there was no penance prescribed in the Hindu *shastras* for a pervert like him. But an eminent pundit of Calcutta succeeded in ferretting out a rite of penance which was found to meet exactly the case of Babu Upendra Krishna. Upon the strength of this *Vyavastha*, a movement was set on foot by the leading *Kayastha* of Calcutta

to formally take him back into society. Accordingly, last Friday was fixed for the purpose of the penance ceremony, which was gone through in its every detail by Babu Upendro Krishna under the direction of several leading Hindu pundits. After the ceremony was over, the Doctor gave a good feast, which was partaken of by several leading members of the Sovabazar Raj family, the Nimtolla Dutt, the Pathuriaghatta Ghoses, the Rambagan Mitters and many other high *kulins*. The success of the movement is chiefly due to Maharajah Norendra Krishna Bahadur, Maharaj-Kumar Binoy Krishna Bahadur, Babus Girindra Chunder Ghose and Anoop Chand Mittra. An account of this rare ceremony is published elsewhere. The case of Babu Upendra Krishna paves the way of all England-returned Hindus, who are treated as outcastes by the orthodox classes, to re-enter the society after performing due penance.

—

PRAYASCHITTA CEREMONY

A very interesting ceremony was performed at Rambagan on the 20th instant, when Babu Upendra Krishna Dutt, better known as Dr. U. K. Dutt, was re-admitted into caste, after performing the penance as laid down by the Hindu Shastras.

Babu Upendra Krishna, it would be remembered, had gone to England to study medicine, where he married a European lady. On his return to this country he lived with his wife for several years and had two children. Last year, his wife obtained a judicial separation from him. The *prayaschitta* ceremony was performed by a Brahmin under the direction of the leading pundits of the metropolis and the metropolitan districts, who were present on the occasion to accept gifts (*bidayas*) and bless the penitent. All the leading Kayasthas, the caste to which Babu Upendra Krishna belongs, were present at his ancestral house in Rambagan, Amongst others we noticed Maharaja Bahadur Sir Narendra Krishna Bahadur, Maharaj Kumar Benoy Krishna and several other members of the Shobhabazar Raj family. Babu

Girindra Chunder Ghose ond others of the Pathuriaghatta Ghose family, members of the ancient Dutt family of Nimtola, the Mitter family of Simla, Babu Harakali Ghose of Garanhatta, and many other eminent Kaiysthas. The ceremony closed with a sumptuous dinner in pure Hindu style in which all the penitent's caste-people heartily joined.

—

THE STATESMAN

Tuesday, April 24, 1894

READMISSION TO CASTE.—Babu Upendro Krishna Dutt (Dr. U. K. Dutt) has been re-admitted into caste, after performing the penance prescribeb in the Hindoo Shastras. The ceremony, which is of rare occurrence took place on Friday evening at the house of his brother, Surendro Dutt, in Calcutta. Dr. Dutt went to England some years ago to study medicine and there he was baptised and married a European girl, with whom he returned to Calcutta. He lived with his wife for some years and had two children. Last year his wife obtained a legal separation. The rite of the penance was performed by a Brahmin under the direction of a leading pundit of the Hindoo community. Many high caste Kaisthas were present, inclucing Maharaja Norendro Krishna, Kumar Binoya Krishna of Sovabazaar, and several members of the Hatkhola Dutt family.

—

হিতবাদী।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

কলিকাতা, ১২৯১ সম্বৎ, ১৫ই বৈশাখ

বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইনি শুদ্ধ বিলাত প্রত্যাগত নহেন, আবার বিলাতী বিবি বিবাহকারী। গত বৎসর এই বিবিই আদালতের আশ্রয়ে বিবাহ-ভঙ্গ করিয়াছিলেন। স্ত্রী চলিয়া গেল, উপেন্দ্র বাবু আর কিজন্য হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া থাকিবেন? কাজেই হিন্দু সমাজের পুনঃ প্রবেশের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শ্রবণে প্রথমে অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু অবশেষে সে উপহাসের আর কোন মূল্য রহিল না। কলিকাতার শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন, উপেন্দ্র বাবু সমাজে পুনঃ প্রবেশ

করিতে পারেন। ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিগত শুক্রবার দিবসে উপেন্দ্র বাবু স্বসমাজে পুনর্গৃহীত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শোভাবাজারের রাজ বাড়ীর, নিমতলা দত্ত পরিবারের, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষদিগের, রামবাগানের মিত্র বাটীর এবং অন্যান্য অনেক কায়স্থ কুলীন ও সমাজপতি উপেন্দ্র বাবুর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ, বাবু গিরীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এবং অমৃতচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে এই কার্য্য হইয়াছে। ব্যবস্থা-দাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়েরও ত্রুটী হয় নাই। আমরা এই সকল ঘটনা দেখিতেছি, আর হিন্দু সমাজের অবস্থা ভাবিতেছি।

—

সংবাদ প্রভাকর।

কলিকাতা ২৭ বৈশাখ শকাব্দ ১৮১৬

ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত।

ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু, ইনি কলিকাতা এম্বলকজ কোর্টের জজ রসময় দত্তের ভ্রাতা শ্রীরাম দত্তের পৌত্র ও শ্রীকৃষ্ণ দত্তের পুত্র, জীবনের প্রথম অবস্থায় ইনি কলিকাতায় লেখা পড়া শিখেন, ও বরাবরই অতি প্রশংসার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন। এখানকার পাঠ একরূপ সমাপন করিয়া দত্ত মহাশয় ডাক্তারি শিখিবার জন্য বিলাত গমন করেন এবং সেখানেও সম্মানসূচক ডিগ্রী ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ ডিগ্রীও নহে, তিনি সেখানে এডিনবরা হাসপাতালের কর্তৃত্ব ভারও পাইয়াছিলেন।

এডিনবরা হাসপাতালের কর্তৃত্ব ভার পাওয়ার পর হইতেই দত্তজার জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ডাক্তার দত্ত যখন বিলাতে অধ্যয়ন করেন সেই সময় একজন সহপ্রাঠী সাহেবের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে, এবং কিছুকাল পরে সেই সৌহৃদ্যতা বন্ধুতায় পরিণত হয়। এই বন্ধুর একটী অবিবাহিতা শ্যালিকা ছিল, বন্ধুতা হইতে আত্মীয়তায় দাঁড় করাইবার জন্য সেই সাহেব বন্ধু তাঁহার শালীকে বিবাহ করিবার জন্য দত্ত মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ এবং উত্তেজিত করেন। দত্তজার তখন অপরিপক্ক বয়স; লেখা পড়ার যতই উন্নতি করুন, সংসারের জ্ঞান তখন অতি কম, তাহাতে আবার সামুদ্রিক বাতাসে মনের গতি অন্যরূপ। তিনি বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, কতক ইচ্ছায়, কতক অনুরোধে, খাস বিলাতী মেমকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর প্রথম প্রথম গেল একরূপ মন্দ নয়; কিন্তু শেষে কেমন হইতে লাগিল। হাজার হউক সাদায় কালায় মিশিবে কেন? দত্তজার সহিত মেম সাহেবের একটু গোলমাল চলিতে লাগিল। বিবি আহেলী বিলাতী, দত্তজা অসভ্য ভারতবাসী। বিবি সভ্যামিস্, দত্তজা কালা বাঙ্গালী! বিবির মতি গতি আচার ব্যবহার ঠিক তাহার বিপরীত। দত্তজা পিতৃ পিতামহ চালিত ধারা অনুসারে পত্নীর উপর কর্তৃত্ব করিতে যান। বিবির কোমল

প্রাণে তাহা সহে না ; বিবি চাহেন বিলাতী আইনের মর্য্যাদা রক্ষণ করিতে, স্বামীর গাইডেন্স হইতে। কাজেই দুজনার ভালরূপ বনিবনাও হইল না। দত্তজা একটু বিরক্ত হইলেন, এবং বিশেষ ব্যথিতও হইলেন। এইরূপ গোলমাল হওয়ায় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তাঁহার দুই তিনটি পুত্র হইয়াছিল।

দত্তজা স্বদেশে আসিয়া বিলাত ফেরত অহিন্দুর ন্যায় আলাহিদা বাড়ী ভাড়া করিয়া ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পশারও হইল মন্দ নহে। কিন্তু এখানে আসার কিছু দিন পরেই তাঁহার স্ত্রী জানি না কি ভাবিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিলাতী গৃহিণীর ন্যায় একেবারে তাঁহার বাড়ী অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আইন অনুসারে বলিতে পারিলেন না, কারণ সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, কাজে কাজেই তাহাকে যায়গা দিতে হইল। দত্তজা মহাশয় নিজ বুদ্ধির দোষে যে অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এই সময় হইতেই তাঁহাকে বিশেষরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। বিলাতী বিবি বিলাত ছাড়িয়া ভারতে আসিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য হাবভাব কিছুমাত্র বিস্মৃত হইল না। পরন্তু তাহার প্রতাপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু দত্তজা খাল কাটিয়া কুমীর ঢুকাইয়াছেন ; এখন আর চারা নাই। কাজে কাজেই তাঁহাকে সমস্ত সহ্য করিয়া থাকিতে হইল। কিছুদিন এইরূপ মনোবিবাদের পর তাঁহার পত্নী বিলাতী সভ্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই হউক, কিম্বা অন্য কিছু বিলাতী মতলবেই হউক স্বামীকে "ডাইভোর্স" করিবার জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। বিচার শেষ হইল পাঁচ হাজার টাকায় রফা করিয়া বিবাহ ফিরাইয়া লইয়া বিলাতী পুত্র সমভিব্যাহারে বিলাতে গেলেন ; দত্তজা মহাশয়ের গলার হাড় নামিল। তিনি একরূপ শান্তি পাইলেন। বুদ্ধি দোষে না বুঝিতে পারিয়া দত্তজা যাহা করিয়াছিলেন, হাড়ে হাড়ে তাহার ফল ভোগ করিয়া, বিধিমতে শাস্তি পাইয়া তিনি বিলাতী স্ত্রীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে পর দত্তজা মহাশয় পুনরায় স্বজাতিতে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; নিকটবর্ত্তী আত্মীয় অনুশচাঁদ মিত্র, শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, পাথুরিয়াঘাটার গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নিকট যাইয়া পরামর্শ লইলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবার জন্যও স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদিগের সাহায্যে নবদ্বীপ এবং ভাটপাড়ার প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গের নিকট বিধান লইয়া রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সম্প্রতি তিনি জাতিতে উঠিয়াছেন।

মতিগতি পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি যে পুনরায় স্বধর্ম্মে এবং স্বজাতিতে উঠিয়াছেন, তাহাতে আমরা যথার্থই আনন্দিত হইয়াছি। দুই একজন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের বিপক্ষে দুই একটী কথা বলিতেও ছাড়েন নাই ; কিন্তু আমাদিগের মতে

তাঁহাদের উহাতে মত প্রকাশ নিতান্ত অন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ না বুঝিয়া যদি কেহ দৈব বিপাকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং তৎপরে এই নিজ দুষ্কর্ম্ম জন্য অনুতাপ করিয়া যথাবাহিত শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি আর পুনরায় স্বধর্ম্মে লওয়া যাইতে পারে না? শাস্ত্রই যখন এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তখন আমাদের আর সে বিষয়ে বেশি বলিয়া প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? আর তাঁহাদের মতে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যদি শুদ্ধ হওয়া না যায়, তাহা হইলে বিদ্যা শিক্ষার্থ দেশের যে সকল বুদ্ধিমান প্রতিভাসম্পন্ন লোক বিলাতে যান, তাঁহাদের সকলকেই তাহা হইলে বাদ দিতে হয়, ইহাতে সমাজের ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র মঙ্গল দেখা যায় না। সেই জন্যই আমরা বলি যে, এইরূপ বৃথা গোলযোগ না করিয়া শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করাই বিধেয়।

—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৬১০—জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৫।—১৮১৬ শাক

সামাজিক আন্দোলন

এখন শিক্ষার সহিত বিশুদ্ধ ও উন্নত ধর্ম্মমত এদেশে প্রচার হইতেছে। শিক্ষা ও সুসংস্কৃত ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের আভ্যন্তরীণ আবর্জ্জনা সকল দূর হয় এবং তাহা ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিতে থাকে। বর্ত্তমানে এই মহানগরীর সামাজিক আন্দোলন ইহার প্রমাণস্থল। অনেকেই জানেন বিলাত প্রত্যাগত-দিগকে লইয়া এখানে ঘোরতর দলাদলি চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহা-দিগকে সংগ্রহ করিবার পক্ষপাতী এবং অনেকেই বিপক্ষ। প্রতিপক্ষেরা বলেন উহাদিগকে সংগ্রহ করিলে ধর্ম্মলোপ ও জাতিলোপ হইবে। যাহা হউক এইরূপ মতভেদ লইয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার সংস্পর্শ অনেক পল্লীগ্রামেও পৌঁছিয়াছে। যাঁহারা সংগ্রহের পক্ষপাতী তাঁহারা অসংগ্রহে সমাজের অস্তর্বল কমিবে এই আশঙ্কা করেন। কারণ আজ কাল উচ্চ শিক্ষা উচ্চপদ ব্যবসায় বাণিজ্য নানা সূত্রে লোক বিলাত যাইতেছে। এই স্রোত রোধ করাও কঠিন। কারণ নিজের এবং দেশের সর্ব্বব্যাপী দুরবস্থার সহিত এই সমস্ত স্বার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিরোধ চেষ্টা নিরর্থক। তাঁহারা আরও দেখিতেছেন ইংরাজ রাজত্বে কেবল ধনের আদর নাই, বিদ্যা ও পদমর্য্যাদার যথেষ্ট প্রতিশক্তি। এই বিলাত প্রত্যাগতদিগের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ এবং রাজদ্বারেও সুপ্রতিপন্ন। এই দলই যখন ক্রমশ প্রবল হইতে চলিল তখন ইহাদের অসংগ্রহে সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িবে। প্রতিপক্ষ দল কহিতেছেন অগ্রে ধর্ম্ম ও জাতিরক্ষা চাই। কারণ ধর্ম্ম ও জাতিই হিন্দুই প্রাণ। ফলত প্রতিপক্ষীয়েরা দেশ কাল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন এবং নিজের মত প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বিশেষ যত্নবান। যাহা হউক

এইরূপ মতভেদ লইয়া এই মহানগরীতে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে।

যাঁহারা মনে করেন হিন্দুসমাজ অটলপ্রতিষ্ঠ তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা অভিনিবিষ্ট চিত্তে ইহার অতীত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, জনসমাজের শুভাশুভে নির্ভর করিয়া ইহাতে ব্যাপক-কাল-প্রচলিত প্রথার অন্যথা ঘটিয়াছে এবং নূতনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু পরিবর্ত্তনে ভীত ছিলেন না বরং জনসমাজের হিতকর বলিয়া পরিবর্ত্তনকে সাদর দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। বর্ত্তমানে এ দেশের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। সেই দুরবস্থা মোচনের জন্য যে কোন পথ উন্মুক্ত হইবে তাহা কণ্টকাবৃত করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। অতি পূর্ব্বে অর্থকৃচ্ছ্রের সময় কেহ কোন বাধা মানিত না, যথেচ্ছাচার চলিত, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সকরুণ ভাবে সেগুলি অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। এখন এই দেশব্যাপী অর্থকষ্টে সেই পূর্ব্বপ্রথা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। দেশকালকে উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সমাজের অধঃপাত হয়। আর জাতি ও ধর্ম্মলোপের যে আশঙ্কা তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর! সমাজের অবস্থা বিশেষে যে কার্য্য হিতকরবোধে অনুষ্ঠিত হয় তাহা কোন অংশে দূষণীয় নহে এবং তাহার অনুষ্ঠাতাদিগের সংস্রবে পূর্ব্বতন লোকের জাতি ও ধর্ম্ম কদাচ বিলুপ্ত হইত না। তবে এখনই বা কেন সেই চিন্তায় আকুল হও। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অতি উদার। সমাজের যে কোন রূপ দুরবস্থা মোচনের জন্য বিজাতীয়দিগের দেশে গমন করাকে শাস্ত্রকারেরা তত দূষণীয় বিবেচনা করেন না। বর্ত্তমান আচার্য্যদিগেরও তাহাই ব্যবস্থা। সুতরাং জাতি ও ধর্ম্মলোপের অমূলক আশঙ্কার কথা তুলিয়া বিদ্যা ও পদমর্য্যাদায় যাঁহারা বাস্তবিক সমাজের শ্রী তাঁহাদিগকে অসংগৃহীত রাখা শ্রেয়স্কর নহে। ইঁহাদের অভাবে সমাজের অঙ্গ নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু সুখের বিষয় হিন্দুসমাজ অনুদার নহে। অনেকে এই সমস্ত লোককে সংগ্রহ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা কোন বাধা কোন বিঘ্নই আর মানিতেছেন না। আজ কাল হিন্দুর ভিতর যে পরিবর্ত্তনটুকু দেখিতেছি এদেশে শিক্ষা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারই তাহার প্রধান কারণ। বহুকাল পূর্ব্বে এই মহানগরীতে যাঁহারা কালিপ্রসাদি হাঙ্গাম স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা সেই হিন্দুসমাজের এই সহনীয় ভাব দেখিয়া আজ নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

উপসংহারে বিলাত প্রত্যাগতদিগকে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহারা শিক্ষাদি যে কোন স্বার্থ লইয়াই হউক বাস্তবিকই যদি দেশের হিতোদ্দেশে বিলাত গিয়া থাকেন তাহা হইলে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের প্রতি যেন উপেক্ষা না করেন। কি আহার কি পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে দেশকে আদর্শ করা তাঁহাদের উচিত। তাঁহারা হয়ত মনে করেন হিন্দুজাতি বড় অনুদার। বাস্তবিক তাহা নহে। দেশাচারের বিরুদ্ধ ভাব কোন সভ্য জাতিই সহ্য করিতে

পারে না। তোমরা আচার ব্যবহারে তাঁহাদের ন্যায় হও, তাঁহারা সস্নেহে তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইবেন। সংযোগেই তাঁহাদের প্রয়াস, বিশ্লেষে নহে। বুদ্ধিমান হইয়া এই সুযোগ উপেক্ষা করা তোমাদের উচিত নয়। যদি যথার্থই দেশের দুরবস্থায় তোমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে আর সেই হৃদয়েরই প্রবর্ত্তনায় যাবৎ কাল আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া দেশান্তরবাসের কষ্ট সহিয়া থাক তাহা হইলে মনে করিও না দেশের সহিত সর্ব্বাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের উপকারে কৃতকার্য্য হইবে।

—

FOR PRIVATE CIRCULATION.

—

প্রসঙ্গ-কথা

কলকাতার সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে রামবাগানের দত্ত পরিবারের ভূমিকার কথা সুবিদিত। 'শক্তিতোদ্ধার' পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু সেই পরিবারের একটি ঘটনা, যা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

রামবাগানের দত্ত বংশের আদিপুরুষ নীলমণি দত্তের তিন পুত্র থেকে পরিবারটি তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ রসময় দত্তর শাখায় কবি তরু দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবীদের জন্ম হওয়ায় তাঁদের গৌরবকাহিনী বহু প্রবন্ধে-নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। একইভাবে নীলমণির কনিষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর দত্তর শাখায় শশীচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র দত্তর মতো মনীষীদের সমাবেশ ঘটায় সে শাখাটির উপরেও ইতিপূর্বে আলোকপাত ঘটেছে। কিন্তু রসময়-পীতাম্বরের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীদামকৃষ্ণের (বা হরিশচন্দ্রের) বংশধররা আজও 'কাব্যে উপেক্ষিত'। এর প্রধান কারণ, এই মেজ তরফের সদস্যরা অন্য শরিকদের মতো সক্রিয় সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন নি। শিক্ষাদীক্ষা বা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁরা কিন্তু অন্য জ্ঞাতিদের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিলেন না। 'শক্তিতোদ্ধার'-এর নায়ক ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত শ্রীদামকৃষ্ণের অন্যতম পৌত্র। পুস্তিকাটি থেকে তাই রামবাগানের দত্ত পরিবারের একটি অজানিত অধ্যায়ের কথা জানা যাচ্ছে।

উপেন্দ্রকৃষ্ণের পিতা শ্রীকৃষ্ণ দত্ত (১৮২৩-১৮৯১) কলকাতার টাকশালের বুলিয়ন-সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর চার পুত্রই ছিলেন সুশিক্ষিত ও কৃতী। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ (শক্তিতোদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী) ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, মধ্যম উপেন্দ্রকৃষ্ণ (শক্তিতোদ্ধারের নায়ক) বিলাত ফেরত খ্যাতনামা

চিকিৎসক, তৃতীয় রায় বাহাদুর নরেন্দ্রকৃষ্ণ (১৮৫৮–১৯২৬) ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশন্‌স জজ এবং কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন অ্যাটর্নি। যে বাড়িতে উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে বাড়িতে তাঁর কনিষ্ঠ অনুজ যোগেন্দ্রকৃষ্ণের উত্তর-পুরুষরা এখনো বসবাস করছেন।

সমকালীন সমাজে উপেন্দ্রকৃষ্ণ সুপরিচিত ছিলেন 'ডাক্তার ইউ. কে. দত্ত' নামে। সেই জন্যেই 'পতিতোদ্ধার'-এর আলোচনার শীর্ষলেখে ঐ সংক্ষিপ্ত নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৩৯৩) উপেন্দ্রকৃষ্ণের এই সংক্ষিপ্ত নামই ব্যবহার করেছেন : 'একবার ডাঃ ইউ. কে. দত্ত লেখকের মাতাঠাকুরাণীকে বলেছিলেন, কায়স্থের কুটুম্ব কলমীদাম, যত টানবে ততই বেড়ে যাবে।' (পৃ ৬৭)। উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত-কাহিনীও ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে ব্যবহার করেছেন, তবে নায়কের নামটি উহ্য রেখে 'পরবর্তীযুগে যখন বহু সম্পন্ন পরিবারের ছেলেরা উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপে যেতে লাগল, সামাজিক অত্যাচারের প্রকোপও তখন ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে এল। ধার্মিক বৈশম্পিতাই [sic] সমাজকে বাধ্য করল এই বিপথগামীদের পুনরায় গ্রহণ করতে। এই নূতন অনুশাসনের ফলেই একজন কায়স্থ তরুণের ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভে দু'টি সন্তান হবার পরও গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করল স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর। পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরই এর ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।' (তদেব, পৃ ১০৪)।

সংবাদপত্রগুলিতে উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্তের যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার বহু নিদর্শন 'পতিতোদ্ধার'-এ সংকলিত হয়েছে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর স্টেট্‌সম্যান-এ উপেন্দ্রকৃষ্ণের বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। এ সংবাদটি 'পতিতোদ্ধার'-এ স্থান পায় নি। কিন্তু অসংকলিত এই সংবাদটি থেকে উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের ধর্মান্তরগ্রহণ এবং দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। বিচারপতি ট্রেভেলিয়ানের এজলাসে উপেন্দ্রকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-প্রার্থী পত্নী হেলেন দত্ত যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, সংবাদটি থেকে তার অংশ-বিশেষ আমরা উদ্ধৃত করছি 'I am the petitioner in this case. I am a Christian. The respondent is my husband. He was a Christian at the time of our marriage. Before our marriage he told me that he was about to be baptised. We both went to St. Andrew's Church on the day he was to be baptised.…This was two days before our marriage. The baptismal certificate was given to the priest who married us.…I read the certifitate. It was dated the 26th April 1882, and stated that my husband was received into the Roman Catholic Church. The marriage took

place on the 29th April 1882 at St. Kevin's Church, Dublin. The Rev. Fr. Baxter married us,···My husband is a doctor by profession.···After our marriage I and my husband lived at my mother's till he went away. He went away three weeks after the marriage, leaving me with my mother. He said he was going back to India to resume practice.··· I next saw him in India in October 1884 at R. C. Dutt's house. After we left R. C. Dutt's house we went to Sova Bazar. His ill-treatment of me commenced before the birth of my first child. This was in September 1885.···I left him on the 3rd July 1891, because he led me an awful life. He gave me no food, no ice, no punkah. In consequence of all his violence, I left him, and have not lived with him since. When I left him he was living at No. 357, Chitpore Road.···My first son was named Percival Lucius Dutt, the second was Francis Dutt.·· The children are both alive. The eldest is with my mother, and the second child is with me here.' হেলেন দত্তর বিবৃতির অন্যান্য অংশে স্বামী উপেন্দ্রকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনী স্বীকৃতি পেতে হলে এ-রকম বিবৃতি না দিয়ে উপায় নেই। তাই এই সব অভিযোগের কতটা সত্য আর কতটা মামলার স্বার্থে অতিরঞ্জিত, তা নির্ণয় করা কঠিন।

কলকাতার দলাদলি সম্বন্ধেও কিছু মূল্যবান নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে 'পতিতোদ্ধার' থেকে। কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা (১৭৯৮) থেকে উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত (১৮৯৪)—প্রায় একশো বছরের দলাদলির ট্র্যাডিশন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কলকাতার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থরাই ছিলেন দলাদলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মুষ্টিমেয় কয়েকটি সমাজপতি পরিবারের হাতে ছিল দলাদলি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। তাই দলাদলির প্রতিটি আন্দোলনেই আমরা ঘুরে-ফিরে সেই একই পরিবারগুলির সদস্যদের দেখতে পাই। 'পতিতোদ্ধার'-এর মধ্যে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের একটি তালিকা রয়েছে। এই তালিকার সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দলাদলি আন্দোলনের নায়কদের নামগুলি মিলিয়ে দেখলে ব্যাপারটি স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। 'পতিতোদ্ধার'-এর উপাদান ব্যবহার ক'রে এই ধরনের ঘটনাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দলাদলির ইতিহাস রচনায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

বিধর্মী-সংস্পৃষ্ট 'পতিত' ব্যক্তিদের পুনর্গ্রহণের ঘটনাগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে 'পতিতোদ্ধার'-এর লেখক কালীপ্রসাদী হাঙ্গামার একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা সম্পর্কিত বহু ভুল ধারণা এই বিবৃতি থেকে নিরসিত

হচ্ছে। হাঙ্গামাটি সম্বন্ধে প্রথম ভুল করেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (নব্যভারত, কার্তিক ১৩০৮)। হাটখোলার দত্ত পরিবারের সন্তান কালীপ্রসাদকে ভ্রমবশত প্রাণকৃষ্ণ শোভাবাজারের 'চূড়ামণি দত্তের পুত্র' বলে চিহ্নিত করেন। কালীপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধ-ঘটিত হাঙ্গামাটিকে তিনি বর্ণনা করেন 'চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধ' বলে। নিজের ভুল সংশোধন করতে প্রাণকৃষ্ণ দেরি করেন নি (নব্যভারত, চৈত্র ১৩০৮)। প্রাণকৃষ্ণের ভুল ও ভ্রম-সংশোধনের পুনর্মুদ্রিত রূপের জন্য দ্র. কলিকাতার ইতিবৃত্ত. পুস্তক বিপণি, ১৯৮১. পৃ ১৮-২০. ৪৩-৪৪)। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরবর্তী লেখকরা প্রাণকৃষ্ণের প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় তাঁর সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিটি লক্ষ করেন নি। তাঁরা তাই প্রাণকৃষ্ণের ভুল সিদ্ধান্তটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। ইদানীংকালে কালীপ্রসাদী হাঙ্গামার বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন শ্রী রাধারমণ মিত্র। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' (১ম সং. কলকাতা, ১৯১৫) বইটির উপর নির্ভর করার ফলে ভুল হয়েছে তাঁরও। নতুন যেসব তথ্য শ্রী মিত্র সংযোজন করেছেন তারও সবটুকু সঠিক নয় (দ্র. কলিকাতা-দর্পণ, সুবর্ণরেখা, ১ম সং, ১৯৮০, পৃ ৫২-৫৪, ৮২, ৮৬-৮৭)। 'শক্তিতোদ্ধার' পুস্তিকাটি থেকে প্রচলিত যে ভ্রান্তিগুলি সংশোধিত হচ্ছে, সেগুলি হল: ১. কালীপ্রসাদ চূড়ামণি দত্তের পুত্র নন, হাটখোলার রামহরি দত্তের পুত্র (প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সংশোধন সঠিক)। ২. আনারো বিবি কালীপ্রসাদের উপপত্নী নন, বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। ৩. কালীপ্রসাদের বাগানবাড়ি ছিল বেলগাছিয়াতে, বেলেঘাটায় নয়। ৪. কালীপ্রসাদের জীবদ্দশায় বিবি আনারোর মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর মুনশি আমিরকে বিয়ে করা অসম্ভব। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীক্ষেত্রদীপিকা, হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত সং, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, পৃ ১৬৯-১৮১)।

উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্তের সামাজিক পটভূমিও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। খ্রীস্টধর্ম বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহ তখন আর বাঙালী যুবকদের আকৃষ্ট করছে না, ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্কলহে দীর্ণ, অন্যদিকে শিকাগো ধর্মসভায় অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি লাভ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু-পুনরুত্থানের পদধ্বনি তখন শোনা যাচ্ছে। খ্রীস্টান মিশনারিদের আক্রমণ এবং ব্রাহ্মদের সংস্কার-প্রয়াসের মুখোমুখি হয়ে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল অংশ তখন অনুভব করছেন যে কিছুটা নরম না হলে তাঁদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি অচিরে অবলুপ্ত হবে। খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার জন্য তাঁরা তাই আপস-পন্থা গ্রহণ করলেন।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ এমন একটি পরিবারের সন্তান যে-পরিবারের বহু সদস্য ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। রসময় দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (তরু দত্তর পিতা) চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য সমুদ্রপথে বোম্বাই গিয়েছিলেন। 'কালাপানি' পার

হওয়ায় জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। তিতিবিরক্ত গোবিন্দচন্দ্র প্রতিবাদে সপরিবারে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত বসময়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৌত্র হেমচন্দ্র ব্যতীত সকলেই খ্রীস্টান হয়ে যান। এই তীব্র প্রতিবাদ ও শক্তিক্ষয় হিন্দুসমাজকে বিচলিত করেছিল। তাই একদিকে বত্রিশ বছরের ব্যবধান এবং অন্যদিকে শংকিত সমাজপতিদের আপসপন্থার কারণে উপেন্দ্রকৃষ্ণ অনেক গুরুতর 'সমাজদ্রোহ' করেও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে রেহাই পেয়ে গেলেন।

অন্যদিকে উপেন্দ্রকৃষ্ণের মানসিকতাও বোঝা দরকার। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কিভাবে নিজেদের পরিবার ও আজন্মের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ। সম্পূর্ণ একা হয়ে যাওয়ার চেয়ে তাই প্রায়শ্চিত্তের অপমান স্বীকার ক'রে নেওয়াটা তাঁর কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় নিলেন না কেন? তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি কালীনাথ বসু শুধু ব্রাহ্ম হন নি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবুও শ্বশুর-বাড়ির (দত্ত-পরিবার) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আলগা হয় নি। উপেন্দ্রকৃষ্ণ ভগ্নীপতির পদাংক অনুসরণ করলে আত্মীয়দের মাঝে ফিরে আসতেও পারতেন, আবার অপমানকর প্রায়শ্চিত্তও এড়াতে পারতেন। তা তিনি করলেন না কেন? কারণটা পরিষ্কার। কোচবিহার বিবাহ নিয়ে বিবাদের পর কালীনাথ বসু যান কেশবচন্দ্রের সঙ্গে, কিন্তু কালীনাথের জামাই সত্যপ্রিয় দেব পিতা শিবচন্দ্র দেবের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। কালীনাথ-সত্যপ্রিয়র সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ভগ্নীপতি এবং ভাগ্নীজামাইয়ের সেই ধর্মীয় বিরোধের সাক্ষী ছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ। স্বভাবতই তিনি ব্রাহ্মদের কোনো একটি দলে যোগ দিয়ে নতুন ক'রে বিতর্কে জড়াতে চান নি। বস্তুত সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে লিখেছেন: 'এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না।...ব্রাহ্মসমাজ এতদ্বারা লোকসমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।' (দ্র. আত্মচরিত, গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত সং, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৮২, পৃ. ২১৯)।

আকারে ক্ষীণকায় হলেও 'পতিতোদ্ধার' থেকে পাওয়া যাচ্ছে চারটি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য: ১. রামবাগানের দত্ত পরিবারের একটি অজানিত অধ্যায়, ২. কালীপ্রসাদী হাঙ্গামার সঠিক বিবরণ, ৩ কলকাতা সমাজে দলাদলির ধারাবাহিকতা ও চরিত্র, ৪. উনিশ শতকের শেষাংশে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের আপস প্রয়াস। একাধিক সামাজিক টানাপোড়েনের মূল্যবান সূত্র হিসেবে পুস্তিকাটি তাই বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

দেবাশিস বসু

পরিভাষা-পরিচয়

[অনিয়মিত এই বিভাগটিতে দু'টি বিষয় নিয়ে এ-সংখ্যায় আলোচনা প্রকাশ করা হল। ইতিপূর্বে যেসব পারিভাষিক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করেছি। প্রাথমিক লক্ষ্য ১০০ টি প্রসঙ্গের মধ্যে এ-যাবৎ মাত্র পঁচিশটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় আলোচনা সহজসাধ্যও নয়। তবু আমরা বিভাগটি সচল রাখতে চাই। বর্তমান সংখ্যায় দু'টি প্রসঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ 'এশিক থিয়েটার' বিষয়টিকে আশাতত আমরা নির্ধারিত পদ্ধতি ও আয়তনের সীমায় বেঁধে রাখতে পারি নি। তাতে পাঠকদের আপত্তি হবে না, আশা করা যায়। স. এ.।]

Psychology (মনস্তত্ত্ব / মনোবিদ্যা / মনোবিজ্ঞান)

মনোবিদ্যার উৎপত্তি দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র থেকে। মনোবিদ্যার পরিধি বিশাল। মন সম্পর্কিত যাবৎ তত্ত্ব ও তথ্য মনোবিদ্যার আওতার মধ্যে। মনের অবস্থান, গতিপ্রকৃতি, কাজ ইত্যাদি সমস্তই মনস্তাত্ত্বিকের কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয়।

দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে গত শতাব্দীতে। জার্মানির ভিল্‌হেল্ম ভুণ্ড (Wilhelm Wundt) ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মনোবিদ্যার স্বাধীন বিভাগ চালু করেন।

মন কী, মনের কাজ কী, ও কীভাবে মন সেই কাজ করে—এ নিয়ে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা তত্ত্বের প্রবক্তা। কেউ প্রাধান্য দিয়েছেন মনের গঠন বা কাঠামোর দিকে। কেউ দিয়েছেন মনের কাজের উপর। এঁরা হলেন যথাক্রমে অবয়বপন্থী ও কার্মিক পন্থী। অনুরূপভাবে আমরা পাই অনুষঙ্গবাদ, আচরণবাদ, মনঃসমীক্ষণবাদ, গেসটাল্‌ট ইত্যাদি। এই বিভিন্ন মত অবলম্বন ক'রে মানসিক ব্যাধির আলাদা আলাদা চিকিৎসা-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখার মতো মনোবিজ্ঞানও এখন বিভিন্ন প্রশাখায় বিভক্ত। যেমন—বিশুদ্ধ, ফলিত, পরীক্ষামূলক, শারীরতত্ত্ব বিষয়ক, শিশু সম্পর্কিত, শিক্ষাশ্রয়ী, শিল্পাশ্রয়ী, অস্বভাবী, চিকিৎসা সম্পর্কীয়, জনিক বা বংশগত, অপরাধবিদ্যা ইত্যাদি। তা ছাড়াও সূক্ষ্মতর বিভাগও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন—ক্রীড়া-

বিষয়ক, ছিলতাই ও বন্দী সম্পর্কিত প্রভৃতি। তা ছাড়া চিকিৎসা সম্পর্কিত মনোবিদ্যার এক বিশেষ অংশ হল মনোমিতি। এর মাধ্যমে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে কারো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও আপাত অপ্রকাশিত ও লুকায়িত অথচ সম্ভাব্য মানসিক রোগের আভাস পাওয়া সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে।

Psychiatry (মানসিক রোগবিদ্যা)

সাকায়াট্রি শব্দটির উদ্ভব দু'টি গ্রীক শব্দ থেকে। Psyche অর্থ মন বা আত্মা ; iatry অর্থ চিকিৎসা-পদ্ধতি। অবশ্য বর্তমানে সাকায়াট্রি বলতে শুধুমাত্র মানসিক রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বোঝায় না। সাকায়াট্রি বলতে বোঝায় মানসিক রোগতত্ত্ব বা মানসিক রোগবিদ্যা, অর্থাৎ রোগের উৎপত্তি ও কারণ, লক্ষণ ও উপসর্গ, চিকিৎসা ও নিরাময়, পুনর্বাসন ও প্রতিষেধক-পদ্ধতি—সবই মানসিক রোগতত্ত্বের অন্তর্গত।

মানসিক রোগকে মুখ্যত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, সাইকোসিস বা বাতুলতা এবং নিউরোসিস অর্থাৎ বায়ুরোগ অথবা উন্মাদরোগ। তা ছাড়াও শারীরিক রোগ-উদ্ভূত মানসিক রোগ, মাদকাসক্তি, জড়বুদ্ধি শিশু, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা, শিশুবিষয়ক অন্যান্য সমস্যা, বৈবাহিক ও যৌন সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ছোটবড় ভাগে মানসিক রোগতত্ত্ব বিভক্ত। আবার বয়ঃক্রম অনুসারে মানসিক রোগবিদ্যাকে শিশু সম্বন্ধীয়, বয়ঃসন্ধিক্ষণ সম্পর্কীয়, প্রাপ্তবয়স্ক ও বার্ধক্যজনিত—এই প্রকার ভাগেও বিভক্ত করা যায়।

মানসিক রোগের উদ্ভব নিয়ে প্রধানত দু'টি মতবাদ প্রচলিত আছে—যথা শারীরিক (Organic) ও মানসিক (Psychological)। শারীরিক কারণে বিশ্বাসীরা বলেন যে শরীরের কোনো অঙ্গের কর্মবৈকল্যই মানসিক রোগের কারণ। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী করা হয় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রোগ জনিক বা বংশগত। আর যাঁরা মানসিক কারণে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে মনের বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হলেই মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। তবে এ ব্যাপারে এখনো অবধি চূড়ান্ত সত্য তর্কাতীতভাবে জানা যায় নি। কারণ কোনো একটি মতবাদের সাহায্যে সমস্ত প্রকার রোগের উৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এ-ব্যাপারে একটি মূল অন্তরায় হল মনের সংজ্ঞাহীনতা ও অপরিমেয়তা। মনুষ্যেতর প্রাণীর মনের সঙ্গে মানুষের মনের বিপুল ফারাকও পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে এক বিরাট অসুবিধা। মোটামুটিভাবে এটুকু বলা যায় যে বাতুলতার ক্ষেত্রে শারীরিক ও জনিক মতবাদের মাত্রা কিছুটা প্রাধান্য পায়, তেমনি বায়ুরোগের ক্ষেত্রে মানসিক কারণের দিকে পাল্লা ঝুঁকে আছে।

মানসিক রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতিও অনুরূপভাবে দু'টি মূল ধারায় বিভক্ত। যথা, ভেষজ ও অন্যান্য ভৌত পদ্ধতি এবং সাইকোথেরাপি বা বিভিন্নপ্রকার মানসিক চিকিৎসা। পঞ্চাশ দশক ও তার পরবর্তী যুগে ভেষজ চিকিৎসায় বিরাট অগ্রগতি মানসিক রোগের দৃশ্যপট অনেকাংশে পরিবর্তিত করেছে।

মানসিক রোগের চর্চা চলে আসছে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতীয় বৈদ্যরা বর্তমানে স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) বলে বর্ণিত অসুখের নিখুঁত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। অথর্ববেদ ও আয়ুর্বেদে মানসিক রোগের উৎপত্তি ও প্রতিকারের বর্ণনা আছে। এ ছাড়াও গ্রীস, রোম, মিশর, চীন ইত্যাদি যে সমস্ত স্থানে প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল সে সর্বত্রই মানসিক রোগ চর্চার বিকাশের নিদর্শন মেলে।

বর্তমানে চিকিৎসা-বিদ্যায় স্নাতকরা পরবর্তী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হতে পারেন।

Psychotherapy (মানসিক চিকিৎসা)

কথাটির উদ্ভব দু'টি গ্রীক শব্দ থেকে। Psyche—মন, আত্মা। Therapy—চিকিৎসা করা, যত্ন নেওয়া। বৃহত্তর অর্থে মানসিক ব্যাধির সমস্ত প্রকারের চিকিৎসাই সাইকোথেরাপি বা মানসিক চিকিৎসা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানসিক চিকিৎসা বলতে বোঝায় ভেষজ বা অন্যান্য ভৌত উপাদান ব্যতিরেকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা। মূলত রোগীর কথা শুনে ও রোগীর সঙ্গে কথা বলে নিজের সমস্যা যাতে রোগী নিজেই বুঝতে পারে ও নিজেই সমাধান করতে সক্ষম হয়, সে ব্যাপারে সাহায্য করাই হল মানসিক চিকিৎসার মূল কথা। রোগীর যে সমস্ত আচরণ, মানসিক গঠন ও চিন্তাপ্রণালীর জন্য বর্তমান রোগ বা লক্ষণের উৎপত্তি সেগুলি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনই মানসিক চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য। ঘোলোক ব্রয়ারের রোগিণী বার্থা প্যাপেনহাইম এই পদ্ধতির নাম দেন 'কথায় আরোগ্য' (Talking Cure)

সাধারণ অর্থে মানসিক চিকিৎসা প্রতিদিনই কেউ না কেউ কারো না কারো কাছে পাচ্ছেন বা নিচ্ছেন। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিজের নানা-বিধ সমস্যা নিয়ে প্রাণখুলে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়তই মানসিক চিকিৎসা চলছে। কোনো ব্যাকুল ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা, কোনো হতাশ ব্যক্তিকে উৎসাহ দেওয়া বা কোনো শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেওয়া—সবই মানসিক চিকিৎসা।

বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানসিক চিকিৎসকরা অবশ্য আরো আনুষ্ঠানিক পরিবেশে মানসিক চিকিৎসা করেন। এই পদ্ধতিতে রোগীর ভূমিকা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও গতিশীল। রোগী যে শুধুমাত্র নির্দেশাবলি মেনে চলেন তা নয়, মানসিক চিকিৎসক শুধুমাত্র রোগীর দিক্‌দর্শক হিসেবে কাজ করেন। চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান রোগী নিজেই। অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষণের উৎসমূল খুঁজে বার

করার অন্তর্দৃষ্টি যাতে রোগী লাভ করেন সেই ব্যবস্থাই করা হয় এই পদ্ধতিতে। এইভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে আপাতভুচ্ছ সাফল্য লাভ করে রোগীর নিজের মনে আস্থা জেগে ওঠে।

মানসিক চিকিৎসা যাঁরা করবেন তাঁরা ডাক্তার হতে পারেন, আবার মনোবিৎও হতে পারেন। কিংবা এসব কিছুই নন এমন লোকও বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে বা মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গিয়ে মানসিক চিকিৎসক হতে পারেন। মানসিক চিকিৎসার সব চেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চিকিৎসকের ব্যক্তিগত গুণাবলি—যেমন দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান, রোগীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করার ক্ষমতা, অধিকারবোধহীন হৃদ্যতা ইত্যাদি।

ঘাদও ভেষজ ও ভৌত উপাদান ব্যতিরেকে মানসিক রোগের অন্যান্য চিকিৎসা-পদ্ধতিকেই মানসিক চিকিৎসা বলে, বর্তমানে আচরণবাদী চিকিৎসা-পদ্ধতিকে মানসিক চিকিৎসার আওতার বাইরেই ধরা হয়। মানসিক চিকিৎসা বলতে অনেকেই মনঃসমীক্ষণ বা মনঃসমীক্ষা ঘেঁষা চিকিৎসা-পদ্ধতি বোঝান। বর্তমানে মানসিক চিকিৎসার অনেক ভাগ যেমন একক বা গোষ্ঠীবদ্ধ, নিবিড়, বিশ্লেষণমূলক অথবা সংক্ষিপ্ত, সহায়ক, পারিবারিক, বৈবাহিক ইত্যাদি। পাশ্চাত্য দেশে ইদানীং মানসিক চিকিৎসার অনেক নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনার দাবিদার দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাসী মানসিক চিকিৎসকরা এগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও কার্যকরতা সম্পর্কে সন্দিহান।

Psychoanalysis (মনঃসমীক্ষণ, মনঃসমীক্ষা)

মূলত সিগমণ্ড ফ্রয়েড কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত একপ্রকার মানসিক চিকিৎসা। যোসেফ ব্রয়ারের সঙ্গে কাজ করার সময় ফ্রয়েড যৌথভাবে আবিষ্কার করেন যে বিস্মৃত ঘটনার স্মৃতি যদি রোগীর মনে জাগিয়ে তোলা যায় তবে তা রোগমুক্তিতে সাহায্য করে। ব্রয়ার ও ফ্রয়েড প্রথমে সম্মোহনের সাহায্যে বিস্মৃত ঘটনার স্মৃতি জাগিয়ে তুলতেন। পরবর্তী কালে ফ্রয়েড সম্মোহনের পরিবর্তে অবাধ ভাবানুষঙ্গের ব্যবহার করেন। অবাধ ভবানুষঙ্গ হল চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে কোনো বাধাবন্ধ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ মানসিক যোগাযোগ। রোগীর মনে যা চিন্তা আসবে তা যতই অকিঞ্চিৎকর, অস্বাভাবিক, অসামাজিক, ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় মনে হোক না কেন তাকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে হবে চিকিৎসকের কাছে।

মনঃসমীক্ষণের উদ্ভাবন করতে গিয়ে ফ্রয়েড মনকে অবস্থানগত তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা—সংজ্ঞান (conscious), অন্তর্জ্ঞান (sub-conscious) ও নির্জ্ঞান (unconscious)। সংজ্ঞান মন হল মনের সেই অংশ যে সম্পর্কে আমরা সচেতন—এই মনের ক্রিয়াকলাপ, গতিপ্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা আমাদের গোচরেই

আছে। একে চেতন মনও বলা হয়। অন্তর্জ্ঞান মনের কার্যকলাপ ও তত্ত্ব চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, তবে বিশেষ চেষ্টার সাহায্যে মনের এই অংশকে আমরা চেতনে আনতে পারি। আর নির্জ্ঞান মনের চিন্তা-ভাবনা বা কার্যকলাপ সবই আমাদের চেতনার অতীত এবং নিজের কোনো প্রকার চেষ্টাই মনের এই অংশকে চেতন পর্যায়ে আনতে পারে না। এর আর এক নাম অচেতন মন।

গুণগতভাবেও ফ্রয়েড মনকে তিন ভাগ করেছেন। অদস (id), অহং (ego) ও অধিশাস্তা (super ego)। অদস জন্মগত প্রবৃত্তির আধার, তাৎক্ষণিক আনন্দ উপভোগ ও ইচ্ছাপূরণের দাবিদার, বাস্তব জ্ঞানহীন। অধিশাস্তা মোটামুটিভাবে বিবেকের অনুরূপ। এ দু'টি প্রায় পুরোপুরি নির্জ্ঞান মনের বাসিন্দা। আর অহং বাস্তব সূত্র, সামাজিক বিধিনিষেধ, প্রবৃত্তিগত ইচ্ছা ও বিবেকবুদ্ধির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কাজ করে।

শিশুকাল থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের বিবর্তন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে হয়। মানুষের কামশক্তি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার সময় পূর্ববর্তী স্তরে সমস্ত প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। সুষ্ঠু সমাধান না হলে কামশক্তি তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে পরবর্তী স্তরে যেতে পারে না। পূর্ববর্তী স্তরে মন কিছু দুর্বল থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে এই পদ্ধতি চলে পুরোপুরি নির্জ্ঞান স্তরে।

নির্জ্ঞান মনে অদস্, অহং ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্বের জন্য মানসিক রোগের উৎপত্তি ঘটে। এর পিছনে থাকে মনের বিবর্তনের পথের দুর্বল স্তরের কোনো বিস্মৃত স্মৃতি। মনঃসমীক্ষক মনকে বিবর্তনের পথে সেই বিকারগ্রস্ত স্তরে পিছিয়ে নিয়ে সেই বিস্মৃত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলেন। এর সাহায্যে রোগমুক্তি ঘটে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যায় যে মনঃসমীক্ষা খুবই প্রলম্বিত পদ্ধতি ও বায়ুরোগ জাতীয় মানসিক ব্যাধিতে অধিক ফলপ্রদ।

বাপ্পাদিত্য দেব

Epic Theatre (এপিক থিয়েটার)

[বর্তমান শতকের ২০-র দশকে জর্মনিতে পিস্‌কাটর (Irwin Piscator, 1893-1966) ও ব্রেখ্‌ট (Bertolt Brecht, 1898-1956) নাট্যকলায় এপিক-ধর্মিতার প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ এক উপস্থাপনা রীতির প্রবর্তন করেন। অ্যারিস্টটল থেকে 'এপিক' শব্দটি গৃহীত হয়েছে—যেখানে থাকে বৈচিত্র্যধর্মী নানা বৃত্তান্তের

একত্র গ্রথিত আখ্যান, অথচ যে বৃত্তান্তগুলি প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে বাঁধা এবং কালগত ঐক্যকে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা যেখানে নেই। আবার সব বৃত্তান্ত সেখানে দর্শকের চোখের সামনে না দেখিয়ে পরোক্ষ কথনে বা ইঙ্গিতে উপস্থাপিত।

ব্রেখ্‌ট-এর মতে 'এশিক থিয়েটারের মূল আবেদন দর্শকের হৃদয়াবেগের চাইতেও তার যুক্তিবোধের কাছে।' এই ধরনের নাটকে ঘটনার ধারা স্বচ্ছ ও সরলভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, যার মধ্যে প্রথাগত নাটকীয় গঠনকলা অনুপস্থিত। অবশ্য ব্রেখ্‌ট সারাজীবনে বারবার এই জাতীয় থিয়েটারের তাৎপর্য অদল-বদল ক'রে গিয়েছেন, যার মধ্যে রাজনৈতিক সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং যার মধ্যে ঘটছে দর্শকমনে সমানুভূতি (empathy) বর্জনের চেষ্টা।]

নাটকের ক্ষেত্রে জর্মন থিয়েটারের বিশেষ অবস্থিতি নতুন নতুন প্রথার প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করেছিল। নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব হিসেবে মঞ্চের অবদান গায়টে ও শীলারের সময় থেকে স্বীকৃত, যা নাটককে সমাজ-সমালোচনার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় জর্মন জনগণের কাছে থিয়েটারের গুরুত্ব অনেক বেশি; ফলে থিয়েটার জর্মন বিপ্লবী চিন্তার মুখপাত্র হয়ে ওঠে।

জর্মন নাটকের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল নতুন নতুন চিন্তার প্রকাশে বা থিয়েটারের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের তুলনায় থিয়েটার ব্যক্তির বৈপরীত্যে সমষ্টির উদ্দেশে কথা বলে এবং দেখা যায় তা করে কারণ থিয়েটার ও দর্শকের মাঝে কোনো মুদ্রিত পৃষ্ঠা বা চিত্রকরের ক্যানভাস নেই; উপরন্তু দর্শকের উপর থিয়েটারের প্রভাব অনেক বেশি, কারণ থিয়েটার অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য যে কোনো কলাকৌশল ব্যবহার করতে পারে। ঐতিহ্যকে সরাসরি বাতিল করার প্রবণতা দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে অন্যান্য ইয়োরোপীয় থিয়েটারের তুলনায় জর্মন থিয়েটারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। এই থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য কমবেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা—যা নাটকের প্রতিপাদ্য, এমন কি সমাজ সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং যা শিল্প ও সমসাময়িক পরিবেশের যুক্তিবাদী সম্পর্কের সন্ধানে ব্রতী।

অকটোবর বিপ্লবের সাফল্য পিস্‌কাটরের ক্ষেত্রে থিয়েটারকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে হাতিয়ারের মতো ব্যবহারের কাজে উদ্বুদ্ধ করে; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে থিয়েটার নিছক বিনোদনের চেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেই থিয়েটারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কার্ল লীবনেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের হত্যাকাণ্ডের পর পিস্‌কাটর তৎকালীন জর্মনির চরম বামপন্থী স্পার্টাকুস দলে যোগ দেন। তখন থেকেই মার্কসবাদী তত্ত্ব থিয়েটারে তাঁর কাজে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। তাই পিস্‌কাটরের মতে 'মঞ্চের নাটক সর্বহারার মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী বাহিনীর কর্মকাণ্ড হিসেবে কাজ

করবে···সর্বহারার থিয়েটার অবশ্যই হবে শ্রেণীগত থিয়েটার—শ্রেণী-সংঘর্ষের থিয়েটার।'

পিস্‌কাটরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক থিয়েটারে তিনি নাটক মঞ্চস্থ করার পরিবর্তে উপন্যাস অবলম্বনে যুগোপযোগী ঘটনার (stucke der zeit) নাটক রচনা ক'রে মঞ্চস্থ করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ ১৯২৮ সালে তিনি ইয়ারোস্লাভ হাসেক রচিত Schewyk এবং ১৯৩০ সালে গ্লিজিয়ারের উপন্যাস The Kaiser's Coolies, ১৯৪২ সালে তলস্তয়ের War and Peace, ১৯৪৩ সালে থিওডোর ড্রাইজারের An American Tragedy, ১৯৪৮ সালে রবার্ট পেন্ ওয়ারেন-এর All the King's Men, ১৯৫৩ সালে সার্ত্র-র Iron in the Soul, ১৯৬৩ সালে রমাঁ্যা রলাঁ্য-র Robespierre উপন্যাসগুলি অবলম্বনে নাটক রচনা ক'রে মঞ্চস্থ করেন। পিস্‌কাটর থিয়েটারে ব্যবহার করার জন্য যেসব মাল-মশলা খুঁজতেন উপন্যাসে তার অনেকগুলিই ছিল ; বিশেষভাবে দর্শকের বিচার-বিবেচনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইচ্ছামতো এক স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করার সুযোগ ছিল উপন্যাস থেকে গৃহীত নাটকের উপাদানে। এইভাবে ঘটনার বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তিকে সন্তোষজনকভাবে থিয়েটারে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। পিস্‌কাটর এই বৈশিষ্ট্যকে 'এপিক' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তার সংজ্ঞা হিসেবে বলেন এপিক পদ্ধতি কেবলমাত্র নাট্যক্রিয়াই চিত্রিত করে না, একই সঙ্গে তা ব্যাখ্যা করে কী সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা আধুনিক যুগের ভাগ্য নির্ধারণ করছে।

আধুনিক নাট্য-সমালোচকরা 'এপিক' নাটককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার ভঙ্গিগত দিকটিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন—যেমন, প্রযোজনায় পর্দার নানা প্রতিফলন (পরিসংখ্যান, শিরোনাম ইত্যাদি), চলচ্চিত্রের ব্যবহার, কোরাস ও ভাষ্যকার, মঞ্চের বিভিন্ন অংশে যুগপৎ অভিনয় ইত্যাদি। প্রচলিত নাটকের সঙ্গে এপিকের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে নাটকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যের কথা বলা হয় এবং তার প্রশস্ত উদাহরণ হিসেবে গিওর্গ বুখ্‌নের-এর 'ভোয়েৎসেক' নাটকটির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পিস্‌কাটরের শিল্পসৃষ্টিতে এপিক ভঙ্গি স্পষ্টই গৌণসাপেক্ষ এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গিই হল প্রধান বিবেচ্য। পিস্‌কাটরের নাট্য-প্রযোজনায় যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহার সমাজ সম্বন্ধে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক এবং যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল কথা। এপিক ভঙ্গি হল নাটকের বিষয়বস্তু ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রযোজনাগত থিয়েটারি সমস্যার কার্যকর সমাধান। এপিক ভঙ্গি প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাটকের বিষয়বস্তু ও নাট্য-ক্রিয়া নিয়ে আলোচনার অবতারণা করে। তাই এখানে নাটকের উৎসাহ কেন্দ্রীভূত হয় ঘটনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর, চরিত্রের ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর নয়। এ হল অ্যারিস্টটলের এপিক সম্বন্ধে প্রদত্ত বিবরণ-ধর্মী সংজ্ঞারই বিস্তৃত রূপ, যা উপর্যুপরি একাধিক ঘটনার বিবরণ দেয়।

নাটকের ঘটনাকে পিস্‌কাটরের পক্ষে এশিক ব্যাপ্তি ততদিন দেওয়া সম্ভব হয় নি যতদিন না তিনি একই সঙ্গে মঞ্চের বিভিন্ন অংশে নাটকের ঘটনা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন এবং মঞ্চ-ক্রিয়ার উপর টিকাটিপ্পনির জন্য চলচ্চিত্রের ব্যবহার নাট্য-প্রযোজনায় সংযোজন করতে সক্ষম হন। পিস্‌কাটরের মঞ্চসজ্জায় মঞ্চের পশ্চাদ্-ভাগে পর্দায় এবং মঞ্চসজ্জার গায়ে অথবা মঞ্চসজ্জার উপরিভাগে অবস্থিত পর্দায় চলচ্চিত্র প্রতিফলিত করা হয়। মঞ্চের দু'পাশে ছোট পর্দাও লাগানো হতো, যেখানে স্থিরচিত্র, শিরোনাম, পরিসংখ্যান বা উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে মঞ্চে ঘটমান ক্রিয়ার উপর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা যেত। এইভাবে পিস্‌কাটর নাটকের উপর উক্তি করতেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বা প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের উপর বিভিন্ন প্রতিফলনের মাধ্যমে, অথবা প্রযোজিত নাটকের যে কোনো বিষয়ের উপর তিনটি উপাদানের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ প্ল্যাকার্ড ও লিখিত উক্তি ছিল প্রযোজনায় ব্যবহৃত চলচ্চিত্র ও মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যের তুলনায় এক ভিন্ন স্তরের বাস্তবতা, যদিও সাধারণত মঞ্চের দু'পাশের ছোট পর্দায় প্রতিফলিত উক্তি চলচ্চিত্রের প্রভাবকে আরো শক্তিশালী করত। পিস্‌কাটর প্রযোজিত 'রাস্‌পুটিন নাটকে চলচ্চিত্র যেখানে সামরিক অধিনায়কদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেখাত, সেখানে নাটকের কথ্যাংশ মানব জীবনের অর্থহীন অপচয়ের উল্লেখ ক'রে তাদের অকর্মণ্যতা ব্যাখ্যা করত; যেমন, ক্ষতি ৫ লক্ষ মৃত লাভ ১২০ স্কোয়ার মাইল।

একই মঞ্চের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার মূলত কার্যকর করা হয় নাট্য-প্রযোজনাকে চলচ্চিত্রের ব্যাপ্তি প্রদানের জন্য, যা পরবর্তীকালে নাটককে ব্যাখ্যা করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মঞ্চে অবস্থিত বিভিন্ন অভিনয়-ক্ষেত্রগুলিকে অস্তিত্বের ভিন্ন স্তর হিসেবে চিহ্নিত ক'রে নাটকের চরিত্ররা তাদের ভূমিকা অভিনয় করতে পারে একাধারে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে এবং অন্যদিকে ব্যক্তি হিসেবে। stage of fate অংশে পদার্পণ ক'রে চরিত্ররা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের প্রতিভূ। ঐ চরিত্ররা যখন মঞ্চের সেই অংশে ফিরে আসেন যেখানে রয়েছে ড্রইং রুমের চেয়ার, ল্যাম্পপোস্ট, গারদ বা সিংহাসন—তখন তা হয়ে ওঠে স্বাভাবিক পরিবেশ এবং চরিত্ররা দৈনন্দিন জীবনে ফিরে এসে নিজেদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

এই ধরনের প্রযোজনা-পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোনো নাটকের প্লটকে বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করা সম্ভব এবং চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবনকে অগ্রাহ্য না করেও মঞ্চের ক্ষুদ্র জগতে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে জাগতিক তাৎপর্য প্রদান করা সম্ভব। তাই পিস্‌কাটরের প্রযোজনায় জটিল যান্ত্রিক কলাকৌশলের মধ্যে কথক বা কাহিনীকারের চরিত্র পুনরায় হাজির হয়। মার্কিন ঔপন্যাসিক থিওডোর ড্রাইজারের 'অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি' এবং তলস্তয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'

অবলম্বনে রচিত নাটকে ভাষ্যকারও এক চরিত্র হিসেবেই আসে ; তার ভূমিকা কখনো নাটকের ঘটনায় অবগাহন, আবার কখনো বা সরাসরি দর্শককে উদ্দেশ্য ক'রে কথিত উক্তি। এতেও পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট না হয়ে পিস্‌কাটর ঐতিহ্যবাহী প্রস্তাবনা যুক্ত করেন 'পতাকা' নাটকে, যেখানে নাটকটিকে 'পুতুল নাচ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত The Kaiser's Coolies নাটকে তিনি master of ceremonies নামক এক চরিত্রের অবতারণা করেন, যিনি নাটকের ঘটনার রেখাচিত্র অংকন করেন ব্ল্যাকবোর্ডে। এইভাবে পিস্‌কাটর নাট্য-পরিচালক হিসেবে তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে বৈচিত্র্যবহুল মুখপাত্রসূচক চরিত্রদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যার ফলে অনেক জটিল বিষয়বস্তু তাঁর হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

তত্ত্বগতভাবে নাটকের ঘটনার উপর এই ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, নাটকে এক বাস্তব-বিরোধী থিয়েটারি আবহাওয়া সৃষ্টি করে যা ব্রেখ্‌টের 'অ্যালিয়েনেশন' বা 'verfremdungseffekt'-এর সমগোত্রীয়। কারণ, তা থিয়েটারে প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করে। পিস্‌কাটর ও ব্রেখ্‌ট উভয়েই এপিক থিয়েটার সম্বন্ধে একই সংজ্ঞার ধারক ; উপরন্তু পিস্‌কাটর তাঁর লেখায় স্বীকার করেন যে ব্রেখ্‌ট সঠিকভাবেই দাবি করেছেন যে 'আমরা নাটকের ঘটনার মুখোমুখি হব, কিন্তু একাত্মতার মাধ্যমে তার মধ্যে ডুবে যাব না।'

পিস্‌কাটরের প্রযোজনায় অভিনেতারা যখন তাদের ভূমিকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সরাসরি দর্শককে উদ্দেশ্য ক'রে কথা বলেন, অথবা পর্দায় প্রতিফলনের মাধ্যমে নাটকের ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়, সেটা হল ব্রেখ্‌টের 'অ্যালিয়েনেশন'-পদ্ধতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পিস্‌কাটর অবশ্য ব্রেখ্‌টের এই চিন্তাকে প্রাচ্যের ক্লাসিকাল থিয়েটার ভিত্তিক রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে নাকচ করেন। পিস্‌কাটর নাটকের চরিত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার যে ধারণা তা বাতিল করেন এবং পরিবর্তে নাটকের ঘটনার চিত্রণের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেন ; পর্দায় প্রতিফলিত চিত্র নাটকের ঘটনার উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চরিত্রের কার্যকলাপের সমালোচনা করে ; ফলে এই সমালোচনা কখনোই নাটকের ঘটনায় প্রবেশ ক'রে তার পরিণতিকে প্রভাবিত করে না। এই জন্য পিস্‌কাটর নাটকের dramatic illusion বিসর্জন না দিয়েও এপিক থিয়েটারের সুবিধা লাভ করেন।

পিস্‌কাটর তাঁর নাট্য-প্রযোজনায় অভিনয়-পদ্ধতিকে 'অবজেক্‌টিভ' আখ্যা দিয়েছেন ; এই অভিনয়-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে নাটকে চরিত্র সৃষ্টির বদলে ঘটনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে। এ ধরনের অভিনয়ে অভিনেতার নিজ শরীরের উপর পরিপূর্ণ দখল থাকা প্রয়োজন, কারণ তিনি কোনো চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করছেন না, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রভাবের ফলে চরিত্রদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন করছেন। পিস্‌কাটরের এই অভিনয়-পদ্ধতি ছিল স্তানিসলাভ্‌স্কি-প্রবর্তিত অভিনয়-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি

বলেন : 'অভিনেতা যখন দর্শকের সামনে অভিনয় করছেন তখন দর্শকই হবে অভিনেতার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।'

এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল, মার্কসবাদী চিন্তাই একমাত্র সমাজ-সচেতন নাটকে অভিনেতাকে তার চরিত্রের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারে। সর্বহারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেই অভিনেতা তাঁর দর্শককে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। দর্শকের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ক'রে তিনি নিজের চরিত্র থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, কারণ তিনি বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক চিন্তার বাহক, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের রূপ নন।

থিয়েটারের রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্রেখ্‌টের প্রথম তত্ত্বগত রচনা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে। তাঁর নোটবই থেকে প্রাপ্ত তথ্যসম্ভার এ-কথার প্রমাণ দেয় যে বিশের দশকের গোড়া থেকেই তিনি নাটক ও থিয়েটার সম্বন্ধে নতুন চিন্তা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই সব চিন্তা ১৯২৬ সাল নাগাদ দানা বাঁধে এক পরিপূর্ণ নাট্যতত্ত্বের আকারে। এই সময়ে জর্মন থিয়েটার অনেকের চোখেই এক ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু শিল্প। এ সম্বন্ধে আংশিক সচেতনতা এবং অংশত মার্কিন সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত এক নাটকের প্রয়োজনা প্রসঙ্গে উপযোগী ভঙ্গির সন্ধান করতে গিয়ে ব্রেখ্‌ট এপিক থিয়েটার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি বলেন 'আধুনিক জগৎ নাটকের উপযোগী নয়—যে মুহূর্তে এই অনুভূতি দেখা দেয়, তখনই মনে হয় প্রচলিত নাটকও বর্তমান জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না।'

আধুনিক জগতের উপযোগী নতুন নাটক বলতে এ সময় ব্রেখ্‌টের ধারণায় আসে 'এমন নাটক যা হবে ভঙ্গি ও অবস্থিতির দ্বারা প্রকাশিতব্য অভিনেতার স্বতিচারণ।'

ব্রেখ্‌ট এই সময় এক সাক্ষাৎকারে বলেন তাঁর নতুন এপিক থিয়েটার একাত্মতার পরিবর্তে যুক্তির কাছে দায়বদ্ধ। 'অনুভূতি নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তার সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু এর বৈশ্বরীত্যে যুক্তি অনেকাংশে বিশ্বাসযোগ্য।'

১৯২৬ সালে ব্রেখ্‌ট মার্কসের 'ডাস্ কাপিটাল' অধ্যয়ন শুরু করার ফলে তাঁর নাট্যতত্ত্বের বহু বক্তব্যকে সুসংহত রূপ দিতে সক্ষম হন। ব্রেখ্‌টের নাট্যতত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় তাঁর অপেরা The Rise and Fall of the City of Mahagonny-র একগুচ্ছ টিকাটিপ্পনি হিসেবে। এখানে আমরা প্রচলিত নাটকীয় থিয়েটারের ভঙ্গি ও এপিক থিয়েটারের ভঙ্গির পার্থক্য সংক্রান্ত তালিকা পাই। এই তালিকায় ব্যাখ্যা করা হয় এপিক ভঙ্গির যুক্তিবাদী চিন্তা। এপিক থিয়েটার দর্শকের সঙ্গে ঘটনার দূরত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ঘটনা দর্শকের চোখে পরিবর্তন সাপেক্ষ হিসেবে দেখা দেয়। উপরন্তু এপিক ভঙ্গি দর্শককে অন্যান্য সম্ভাব্য পথের কথা চিন্তা করতে এবং নিজের বিচার শক্তি ব্যবহারে [illegible]

বাধা করে। এর ফলে হয় আর একটি পার্থক্যের সূচনা, যা হয় 'নান্দনিক' ও 'রাজনৈতিক' থিয়েটারের পার্থক্য।

ব্রেখ্‌ট এপিক থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। থিয়েটার যদি সংগীতে, দৃশ্যসজ্জায় এবং অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তবজীবন সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টির পন্থা বিসর্জন দিয়ে খোলাখুলি আলোচনার পথ গ্রহণ করে এবং দর্শক যদি তার বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন তাহলে থিয়েটারের সামাজিক ভূমিকা অবলম্বনের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ব্রেখ্‌টের নাট্যতত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'gestus'। ব্রেখ্‌ট gestus ও প্রচলিত থিয়েটারে 'gesture'-এর মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। 'gesture' যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেখানে 'gestus' সামাজিক। তিনি বলেন নাটকের চরিত্রকে একাধিক অংশে ভেঙে নিতে হবে, যেখানে চরিত্রটি কোনো অংশে প্রেমিক, কোনো অংশে বীর, কোনো অংশে কাপুরুষ, আবার কোথাও বা বিশ্বাসঘাতক। এই টুকরোগুলিকে জুড়লে তবেই পাওয়া যাবে গোটা চরিত্রটিকে এবং এই জোড়ার গ্রন্থিগুলি যেন দর্শকের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রেও এই 'gestus' প্রয়োগের কথা বলেছেন।

Alienation Effect in the Art of Chinese Acting হল অ্যালিয়েনেশন বা বিয়োজন-পদ্ধতি সংক্রান্ত তাঁর প্রথম বিস্তারিত আলোচনা (১৯৩৬)। এখানে তিনি এপিক থিয়েটারের অভিনয়-পদ্ধতির ক্ষেত্রে চীনের ঐতিহ্যবাহী অভিনয়-পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে গণ্য করেছেন। এই এপিক থিয়েটারের অভিনেতারা দর্শকের কাছে পরিচিতকে অপরিচিত হিসেবে দেখান। বুর্জোয়া থিয়েটার ঘটনাকে দেখায় সর্বজনীন, অসীম এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে—এপিক থিয়েটারে ঘটনাকে দেখানো হয় বিয়োজনের পদ্ধতি অনুসারে এমনভাবে যাতে দৈনন্দিন ঘটনাকেও মনে হয় 'অদ্ভুত', 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' এবং 'তদন্তসাপেক্ষ' হিসেবে।

যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে দেশে ফিরে ব্রেখ্‌ট রচনা করেন নাট্যতত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর সামগ্রিক চিন্তা—Kleines Organon fur das Theater (1949)। এই গ্রন্থে এপিক নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ব্রেখ্‌ট আলোচনা করেছেন কিভাবে দৈনন্দিন ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিবর্তন করা যায়, বিয়োজন বা অ্যালিয়েনেশন-পদ্ধতি কাকে বলে, এপিক থিয়েটারে অভিনেতার ভূমিকা কী, নাটকীয়তাকে কী উপায়ে খণ্ডিত এবং দ্বন্দ্বমূলকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব ইত্যাদি।

ব্রেখ্‌টের নাট্যতত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর শিল্পজগতে এক মৌলিক অবদান, যদিও তিনি নিজে ঋণ স্বীকার করেছেন অনেকের কাছে। সমালোচকরা ব্রেখ্‌টের নিজের নাটকের উপর কিপলিং ভিলোঁ, বাইবেল, জাপানি 'নো' নাটক, প্রাচ্য, এলি-

জার্মেণীর ও জর্মন থিয়েটারের প্রভাব লক্ষ করেছেন। প্রাথমিক পিস্‌কাটরের প্রভাবকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন সমালোচক জন উইলেট বলেছেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে ব্রেখ্‌টের প্রথম এপিক-ধর্মী নাটক 'ম্যান ইস্‌ট ম্যান'। এপিক থিয়েটার সংক্রান্ত ব্রেখ্‌টের চিন্তা তখন ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায়। 'অ্যালিয়েনেশন'-এর প্রকাশ দেখা যায় ১৯২৬ সালেই পিস্‌কাটরের The Drunken Ship প্রযোজনায়। পিস্‌কাটর এই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করেন Tai Yang Awakes নাটকে।

এঁদের দু'জনের কাজের পরিমাপ করা যায় তাঁদের একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে। পার্থক্য তাঁদের পদ্ধতিতে। পিস্‌কাটরের মতে থিয়েটার শুধু সামাজিক দর্পণ নয়, থিয়েটার যুগকে পরিবর্তনের মাধ্যম। ব্রেখ্‌ট এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেন : 'আমার [অনুসৃত নীতির] থিয়েটার শুধু জগৎকে ব্যাখ্যাই করবে না, তা জগৎকে পরিবর্তনও করবে।'

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিপূরণ

[গত শারদীয় সংখ্যায় (১৩৯৫) এই বিভাগটির সূত্রপাত হয়। গ্রন্থ-সমালোচনার বদলে অধুনা প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কোনো বই নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করা হবে এই বিভাগে। 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রবন্ধের উপরও অনুরূপ মতামত দেওয়া হতে পারে। এর প্রধান লক্ষ্য হবে সূত্রাকারে বইগুলির বা রচনাগুলির ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিগুলি ধরিয়ে দেওয়া, যাতে পরবর্তীকালে সেগুলি সংশোধনের জন্য বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, সম্ভবক্ষেত্রে পরিপূরক তথ্যও সরবরাহ করা হবে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির কিছু সুফল আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সূত্রে কোনো লেখককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার সুযোগ নেই। লেখকের মতো সমালোচকও ভুল করেন। তাই ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচকদের ভুলও তুলে ধরা হবে। উভয় পক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে গঠনমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। গত বছর শারদীয় সংখ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখিত 'ছবি তোলা বাঙালির ফোটোগ্রাফি-চর্চা' বইখানির উপর মন্তব্য করেছিলেন অশোক উপাধ্যায়। বর্তমান সংখ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষ ঐ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যগুলি জানাচ্ছেন। একই সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধ নিয়েও মন্তব্য প্রকাশিত হল। স. এ. ।]

১

'ছবি তোলা'-র 'পরিপূরণ' প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের নিবেদন

'ছবি তোলা' গ্রন্থটির সূচনা হয়েছিল 'এক্ষণ' পত্রিকার পাতায় ১৩৯২-এর শারদীয় সংখ্যায়। পরের সংখ্যাতেও (শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৯২) 'ছবি তোলা : একটি অসমাপ্ত কাহিনী' নামে এই রচনার আর একটি সংযোজন প্রকাশিত হয়। তার প্রায় আড়াই বছর পরে গ্রন্থাকারে 'ছবি তোলা'র প্রকাশ। এক্ষণের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-প্রকাশের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শ্রী অশোক উপাধ্যায় যদি তাঁর আহৃত মূল্যবান অতিরিক্ত তথ্যগুলি এক্ষণের পাতায় পেশ করতেন তবে গ্রন্থকার হিসাবে আমিও পাঠকদের মতোই উপকৃত হতাম। তবে এক্ষণ পত্রিকার গত শারদীয় সংখ্যায় (১৩৯৫) অশোক বাবু 'পরিপূরণ' নামক বিভাগে বই হিসাবে 'ছবি তোলা'-র ভুল ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির প্রসঙ্গ আলোচনা সূত্রে স্বয়ং কিছু প্রমাদ

ঘটিয়েছেন। 'পরিপূরণে'র ক্রমানুসারেই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. 'গবেষণার সময়সীমা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে সাধারণ-ভাবে সীমিত…' আমার এই উক্তিকে শ্রী অশোক উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন ভুলভাবে এবং তার ফলেই তিনি বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন 'অথচ বইটিতে ভারতে ফোটোগ্রাফির আগমন (১৮৪৪) থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত কালের ইতিহাস আলোচিত।' 'সীমা' শব্দটিকে (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান-সম্মতরূপেই) আমি 'অন্ত' বা 'শেষ' অর্থে ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ আমার গবেষণার অন্ত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে। ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর সালের মতো নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণার আদ্য ও প্রান্তকে বিশেষ বর্ষ দ্বারা।

২. অশোক উপাধ্যায় লিখেছেন 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের আদিপর্বে যে-সব বাঙালি সমিতির সদস্য হন, তাঁদের নামের তালিকা দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন "সোসাইটি কি ভাবে প্রথমে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রদের আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু শেষ অবধি তা মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তির শৌখিন বিচরণের স্থান হয়ে ওঠে"।'

উক্ত সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ কোনো তালিকা আমার গ্রন্থে নেই। ৩১ ও ৪২ পৃষ্ঠায় দু'টি তালিকা আছে যার প্রথমটি একটি প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষরকারীদের নামের ও দ্বিতীয়টি কয়েকজন সদস্যের যাঁদের ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে যোগদানের সন-তারিখ সংগ্রহ করতে পারা গেছে। তাছাড়া অশোক বাবুর বক্তব্য '৪২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত চৌদ্দ জন বাঙালি সদস্য'—ঠিক নয়, এই পৃষ্ঠায় সতেরো জন বাঙালি সদস্যের নাম রয়েছে।

অশোক বাবু প্রশ্ন করেছেন, সাংস্কৃতিক জগতের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সবাই কি ধনী ও শৌখিন ব্যক্তি হিসাবেই ফোটোগ্রাফি চর্চা করেন নি? এ-প্রশ্ন উত্থাপন অবান্তর, কারণ আমি দেখাতে চেয়েছিলাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদত্যাগ করার আগে ও পরে সোসাইটির চরিত্রে কী বদল ঘটেছিল। 'শৌখিন ধনী' ও 'সাংস্কৃতিক জগতের' চরিত্রদের অবতারণা সেই কারণেই।

এই প্রসঙ্গক্রমেই শ্রী উপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন, '"শৌখীন ধনীব্যক্তি" ছাড়া এ শখ চরিতার্থ করা সেকালে কোন সাধারণ চাকরিজীবীর পক্ষে সম্ভব হতো?' অন্তত একটি ক্ষেত্রে যে সম্ভব হয়েছিল তা কানাইলাল দে সম্বন্ধে এই গ্রন্থভুক্ত বিবরণটি পাঠ করলেই অশোক বাবু হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। ফোটোগ্রাফিক কেমিক্যাল প্রস্তুতকারক ও ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য কানাইলাল এবং পরবর্তী কালে ঔষধ-প্রস্তুতকারক চিকিৎসক কানাইলাল অভিন্ন সত্তা। এর সঙ্গে 'ধনী শৌখিন'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

অশোক উপাধ্যায়ের মন্তব্য : 'পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে সিং-ক্লেশ

উল্লেখ অত্যন্ত দৃষ্টিপীড়াদায়ক। আলোচ্য গ্রন্থে অন্তত দশ বার 'ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ' নামেই উল্লিখিত হয়েছেন এই ব্যক্তি, এমন কি নির্ঘণ্টেও। মুদ্রণ-প্রমাদে ৪২ পৃষ্ঠায় একবার 'সিং' ছাপা হয়েছে। সমালোচনার এই রীতিও অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

৫. ফোটোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণভাবে ভারতীয় রাজারাজড়াদের পার্থক্য আছে, আমার এই বক্তব্যের প্রতি কটাক্ষ ক'রে সমালোচক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে এক ফরাসি ফোটোগ্রাফার কিছুদিন আগরতলায় চাকুরি করেছিলেন এবং তার পরে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে অশোক বাবু উদ্ধৃত করেছেন 'ফটোগ্রাফী বিদ্যার আবিষ্কারের অল্পপরে মহারাজ এক জন ফরাসীকে বেতনভোগী করিয়া রাজধানী লইয়া আসেন এবং তাঁহার সাহায্যে কলোডিয়ান্ প্রণালীতে ফটো তুলিতে আরম্ভ করেন।'

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তির স্ববিরোধিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্যই তাঁর একই প্রবন্ধের অন্যান্য অংশ থেকে আমার রচনায় বহু অংশ উদ্ধৃত করলেও এই বাক্যটি বর্জন করেছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থের পাঠক দেখবেন ফোটোগ্রাফি বিদ্যার আবিষ্কারের প্রথম পর্বেই দাগেরোটাইপ ছবি তোলায় বীরচন্দ্র ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 'কলোডিয়ান' প্রণালীর প্রচলন ঘটে বহু পরে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মহারাজা বীরচন্দ্রের ফোটোগ্রাফি চর্চায় সাফল্য, মহারানী ও রাজকুমারদের ফোটোগ্রাফি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা, 'ক্যামেরা ক্লাব' স্থাপন ও বার্ষিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে আর কোনো ভারতীয় রাজা-মহারাজার তুলনীয় কীর্তির সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি শ্রী অশোক উপাধ্যায়ের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তবে তাঁর তা অবিলম্বে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন।

৭. 'বিষয় ফোটোগ্রাফি : গ্রন্থ ও নিবন্ধ' অধ্যায়ে বাদ পড়েছে এমন তিনটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন সমালোচক। আরো বই বাদ পড়ে থাকলেও বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। অধ্যয়নের সুযোগ না পেলে শুধু ক্যাটালগ-ভুক্ত কোনো বইয়ের শিরোনাম আমি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নি।

সমালোচক লিখেছেন: 'আলোকচিত্রচর্চার প্রতি মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ যখন মনোযোগী হয়ে ওঠে তখন থেকেই বাংলা সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ ও ফোটোগ্রাফি মুদ্রণ বাড়তে থাকে।' সর্বৈব ভ্রান্ত অনুমান। গ্রন্থে মুদ্রিত আলোকচিত্রের প্রতিচ্ছবি কারিগরি-সম্ভব হয়ে ওঠে মূলত হাফটোন ব্লক প্রচলনের সুবাদে, তখন থেকেই বাংলা সাময়িকপত্রে ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের আলোকচিত্রের প্রতি অনুরাগকে সম্বল ক'রে বাংলা সাময়িকপত্রে ফোটোগ্রাফির প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৮) তৃতীয় সংখ্যার উল্লেখ ক'রে

শ্রী অশোক উপাধ্যায় লিখেছেন: "'কাশ্মীর চিত্রাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে ১১টি ফোটো প্রকাশিত হয়, কয়েকটি কোণে G N M এই আদ্যক্ষর ছিল। অনুমান করা চলে এগুলিও পূর্বোক্ত জি এন মুখার্জি ব্রাদার্স-এর তোলা।' অশোক উপাধ্যায়ের অনুমানের কোনো অবকাশই নেই এখানে। হাফটোন ব্লক থেকে গ্রন্থে মুদ্রিত ফোটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবির কোণে (বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) এই জাতীয় আদ্যক্ষর ব্লক-নির্মাতাকেই চিহ্নিত করত, ফোটোগ্রাফারকে নয়। এইটাই ছিল রেওয়াজ। 'প্রবাসী'র পাতাতেই তার অসংখ্য উদাহরণ আছে।

৮. শ্রী অশোক উপাধ্যায় বিস্মিত হয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ চারটির উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে না থাকায় বিবেকজ্যোতি মিত্রের (ক) 'পৃথিবীর প্রথম স্টুডিও কলকাতায়' (খ) 'কলকাতায় ফোটোগ্রাফির প্রথম যুগ' (গ) 'পার্ক স্ট্রীটের সেই বাড়িটি' ও কমল সরকারের (ঘ) 'বিদ্যাসাগরের শেষ ফটোগ্রাফার'।

(ক) সম্বন্ধে আমার নিবেদন, পৃথিবীর প্রথম স্টুডিও কলকাতায় স্থাপিত হয় নি, কাজেই এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাস্য আমার ছিল না। (গ) শীর্ষক প্রবন্ধটি ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া বিষয়ক, কিন্তু কলকাতায় যে এই সোসাইটি স্থাপনের (১৮৮৮) বহু পূর্বেই আরেকটি সোসাইটি (বস্তুত পক্ষে এই সোসাইটিরই আদি পুরুষ: ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল) স্থাপিত হয়েছিল তার উল্লেখমাত্র নেই। (ক) ও (গ)-এর পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি (খ) সম্বন্ধে আমার আগ্রহ নিবৃত্ত করেছিল।

কমল সরকারের প্রবন্ধটির কথা বলার আগে এই প্রসঙ্গে অশোক উপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি 'সবকটিই [উপরোক্ত প্রবন্ধ চারটি] তো এই বইয়ের পূর্বে প্রকাশিত।' হ্যাঁ, কমল সরকারের প্রবন্ধটিও আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের আগে প্রকাশিত, কিন্তু মনে রাখা দরকার (গ্রন্থের ভূমিকায় সে-কথা বলা হয়েছে) যে, 'ছবি তোলা' গ্রন্থটির সূচনা হয়েছিল 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৩৯২-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একই শীর্ষক বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের সুবাদে। কমল সরকারের প্রবন্ধ, এক্ষণ-এ আমার লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় তিন মাস পরে প্রকাশিত হয় এবং কমল সরকারের প্রবন্ধেও আমার রচনার কোনোই উল্লেখ ছিল না। ব্যাপারটি আরোই প্রণিধানযোগ্য, কারণ এক্ষণ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামই ছিল 'মৃত্যুর পরেও পরোপকারী বিদ্যাসাগর'। এবং 'বাতায়ন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি মারফত আমি প্রথমেই 'বিদ্যাসাগরের শেষ ফোটোগ্রাফার' এস. সি. সেনের কথাই আলোচনা করি।

১০. 'রাখি-সংক্রান্তি' অ্যালবামটির জনকত্ব নিয়ে আমার সংশয় দূর করার আকাঙ্ক্ষায় শ্রী উপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'পাঁচজন ফোটোগ্রাফার যদি একই

দৃশ্যের ফোটো তোলেন, তবে চারজনের ছবিই তো "প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যায়"।' যায় কি? রঘু রাই ও রঘুবীর সিং তাজমহলের ('একই দৃশ্যের') ছবি তুললেও কি প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যাওয়ার উপায় আছে?

১১. প্রেমতোষ বসু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, লিখেছেন শ্রী উপাধ্যায়। প্রেমতোষ বসু 'ক্ষণিকা'র মুদ্রাকর, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠির সুবাদেও উভয়ের যোগের কথা জানা যায়, কিন্তু 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বলা যায় কি? 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-কে সাক্ষী মেনেছেন অশোক বাবু, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সেটি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এটি প্রামাণ্য চরিতাভিধান নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, অসদানন্দ রায়কে ওই গ্রন্থে মুদ্রাকর বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সন্ধান নেওয়ার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বরং পুলিনবিহারী সেন-রচিত 'রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমণ্ডলী' (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা, 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থভুক্ত)।

১২. ৩৩১ পৃষ্ঠায় 'আহিরিটোলা স্ট্রিট' সত্যিই দৃষ্টিকটু, তবে তার পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাতেই 'আহিরিটোলা' বোধহয় সেই ব্যথা কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারে।

১৫. গ্রন্থের পরিশিষ্টে ফোটোগ্রাফিক স্টুডিও ও ফোটোগ্রাফারদের তালিকায় কলকাতার ফোটোগ্রাফার এইচ সি চন্দ্র-র নাম বাদ পড়েছে, জানিয়েছেন অশোক বাবু। এর থেকে মনে হয় অশোক বাবুর ধারণা এই নামটি যুক্ত হলেই তালিকাটি 'সম্পূর্ণ' হতো। অশোক বাবুর ধারণাকে স্বীকার ক'রে নিলে আমার কৃতিত্ব বৃদ্ধি পেত জেনেও লিখতে বাধ্য হচ্ছি, প্রদত্ত তালিকাটিকে 'পূর্ণাঙ্গ' বা 'সম্পূর্ণ' দাবি করার মতো দুর্মতি হয় নি আমার। তালিকা পেশ করার আগেই জানানো হয়েছে কি-কি ডাইরেক্টরি ও কোন-কোন পারিবারিক সংগ্রহের ভিত্তিতে এটি রচিত।

এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রী অশোক উপাধ্যায়কে ধন্যবাদ, তিনি আলোচ্য গ্রন্থটির ত্রুটি-শোধন সূত্রেও তার ত্রুটি অপসারণের জন্য ও পরিপূরক রূপে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্য ও মন্তব্য উপহার দিয়েছেন।

২৪ অক্টোবর ১৯৮৮

সিদ্ধার্থ ঘোষ

২

'রসাপাগলার উন্মাদাগার' প্রসঙ্গে

১৩৯৪-এর শারদীয় এক্ষণ-এ প্রকাশিত শ্রী ছন্দক সেনগুপ্তের 'মনোচিকিৎসা' প্রবন্ধের প্রথমাংশে ঔপনিবেশিক যুগের উন্মাদাগারগুলির কথা আলোচিত হয়েছে। সে যুগের একটি উন্মাদাগার স্থাপিত হয়েছিল রসাপাগলায়। রসাপাগলার মানসিক হাসপাতালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়। রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত নথিপত্রও এটির বিষয়ে নীরব, কেন না মেডিকাল বোর্ডের সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।'

লেখকের এ অনুযোগ কিন্তু যথার্থ নয়। শ্রী সেনগুপ্ত যদি রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত জুডিসিয়াল (ক্রিমিনাল) দপ্তরের নথিপত্র দেখতেন, তাহলে উন্মাদাগারটি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেতেন, আমরাও পেতাম একটি অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। বস্তুত সমগ্র নিবন্ধটির জন্য শ্রী সেনগুপ্ত মুদ্রিত সরকারি প্রতিবেদন বা গ্রন্থাদির সাহায্য যতটা নিয়েছেন, লেখ্যাগারের নথিপত্র ততটা দেখেন নি। সে জন্যই উপাদানের অভাব ঘটেছে।

রসাপাগলা হাসপাতাল নিয়ে কোম্পানি ও কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হয় ১৮০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। হাসপাতালের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ১৮০৪-এ, শেষ হয় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়ে একই ধরনের মানসিক হাসপাতাল গড়ে ওঠে মুঙ্গের, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহরে। এই সব হাসপাতালের গোড়ার দিকের ইতিহাস জুডিসিয়াল (ক্রিমিনাল) দপ্তরের ১৮০২-১৮ খ্রীস্টাব্দের কাগজপত্র থেকে জানা যায়।

রসাপাগলায় উন্মাদাগার স্থাপিত হওয়ার আগে মনোরোগীদের রাখা হতো 'হাউস অফ কারেকশন'-এ। উন্মাদাগার স্থাপনের সময়ে 'হাউস'-এ ছিলেন কুড়ি জন মনোরোগী। রসাপাগলার নতুন উন্মাদাগারে পঞ্চাশ জন রোগীকে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক রোগীর জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র ঘর ছিল না। মোট ঘরের সংখ্যা দশ হওয়ায় একই ঘরে একাধিক রোগীকে থাকতে হতো। সরকারি নথিতে হাসপাতালটির বিস্তারিত জন্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গাঁথনির বর্ণনা থেকে শুরু ক'রে প্রশস্ত জানলা-দরজা এবং রেলিং-ঘেরা বারান্দার কথা সে বিবরণ থেকে জানা যায়। প্রতিষ্ঠাপর্বে মানসিক চিকিৎসালয়টির কর্মচারী-সংখ্যা এবং বেতন-বিন্যাস ছিল এ রকম

১ জন দেশীয় চিকিৎসক :	১৬ টাকা
১ জন জমাদার	১০ টাকা
৮ জন পিয়ন	৩২ টাকা
২ জন রান্নার লোক	১০ টাকা
২ জন ভিস্তিওয়ালা	৮ টাকা
২ জন মেথর	৮ টাকা
মোট ১৬ জন	—৮৪ টাকা

হাসপাতালটি নির্মাণ করেছিল স্টুয়ার্ট মরিসন অ্যাণ্ড কোম্পানি, খরচ পড়েছিল সাড়ে সাত হাজার টাকা। হাসপাতালের কর্তৃত্ব ছিল কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে, তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন চব্বিশ পরগনার সার্জেন।

ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বারানসী প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ হাসপাতাল গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন তৎকালীন শাসকরা। ঐ সব শহরের নগরাধ্যক্ষদের বলা হয় তাঁরা যেন খসড়া-পরিকল্পনা তৈরি ক'রে চব্বিশ পরগনার সার্জেনের কাছে জমা দেন। নির্দেশে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা থেকে পাঠানো হয় একটি পরিকল্পনা। হাসপাতাল-নির্মাণের জন্য তাতে ১৩১৯ টাকা ১২ পয়সা দাবি করা হয়। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গেরেও মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুঙ্গেরের কর্মচারী-সংখ্যা এবং বেতন-বিন্যাস ছিল হুগলীগলার মতোই। কিন্তু পঞ্চাশ জন রোগীর জন্য মুঙ্গেরের ক্ষেত্রে অনেক কম খরচ ধরা হয়, মাসিক মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা। অবশ্য পথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য মুঙ্গেরের সার্জেনকে রোগী পিছু মাসিক পাঁচ টাকা দেওয়া হতো।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেমবর ঢাকায় মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলা সরকারের সচিবকে লেখা ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি : '...the Plan consisting of seven cells of 12 ft. by 8 ft. with a verandah...and fourteen cells 10 × 7ft. for the worst cases...the walls that bear the roof are each 2 ft. thick.' ঢাকা হাসপাতালে মনোরোগীদের মানবিক প্রয়োজনগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। ঘরগুলি জানলায় পর্দার ব্যবস্থার উল্লেখ দেখে সে কথা অনুধাবন করা যায়। এই মানসিক হাসপাতালের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম মহিলা মনোরোগীদের কথা জানা যায়। তাঁদের জন্য আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঢাকার জেলাশাসক মানসিক হাসপাতালটিকে দ্বিতল ক'রে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে একটি বড় একতলা বাড়ি নির্মাণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য হুগলীগলার মানসিক হাসপাতালের উদ্দেশ্য

অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। হাসপাতাল-নির্মাণের ইট সরবরাহ করার জন্য চারপাশে মাটি কাটা হয়েছিল। শূন্যগর্ভ ইটখোলাগুলি পরে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এছাড়া ছিল বিস্তৃত প্রাকৃতিক জলাভূমি এবং ঝোপ-জঙ্গল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত একটি প্রতিবেদনে মেডিক্যাল বোর্ডের তৃতীয় সদস্য গিলম্যান রসাপাগলা হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর দুরবস্থা বর্ণনা করেন। সেই প্রতিবেদনকে ভিত্তি ক'রে সরকার গ্রহণ করেন প্রতিকারের পদক্ষেপ। হাসপাতালের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ১০৮৮ × ৪৭৮ ফিট জমি তখন ৫৯০ টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়ে ভরাট করার ব্যবস্থা হয়।

পরিবেশ-উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর দেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল চব্বিশ পরগনার সার্জেন এইচ. ইন্নাং মেডিক্যাল বোর্ডকে লেখেন 'It would be desirable that the whole of the Insane patients should sleep on cots or beds.' তিনি আরো লিখেছিলেন যে খাটে শোয়ার বন্দোবস্ত মনোরোগীদের বেলায় অপছন্দ। তাঁদের দীর্ঘদিনের সামাজিক আচার-ব্যবহার এজন্য দায়ী। শয্যা বলতে তাঁরা বোঝেন দু'টো মাদুর আর দু'টো কাঁথা। ইন্নাং-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার চল্লিশটি খাটের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া কাপড়, চাদর, শাড়ি, কম্বল, চটি প্রভৃতি তো দেওয়া হতোই।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে নেটিভ খ্রীস্টানদের রসাপাগলা উন্মাদাগারে স্থান দেওয়া শুরু হয়। চারজন নেটিভ খ্রীস্টানকে স্থান দিয়ে এই নতুন প্রথাটি প্রবর্তিত হয়।

আশা করি এই রূপরেখা থেকে বোঝা যাবে যে রসাপাগলা উন্মাদাগারের ইতিহাস রচনার প্রচুর উপকরণ রাজ্য লেখ্যাগারে রয়েছে। যথেষ্ট অনুসন্ধান করলে প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য আমরা যে সব নথিপত্রের সাহায্য নিলাম, সেগুলি হল

১. Letters to the Court of Directors (Judicial Deptt.), 1805. para 94.

২. Judicial (Criminal) Department :

(ক) Nov. 1, 1804, No. 17.

(খ) Sep. 5, 1804, No. 20.

(গ) May 23, 1805, No. 3.

(ঘ) Extract from a letter (dated Feb. 21, 1818) from the Secretary to the Medical Board contained in the Proceedings of March 17, 1818, No. 2.

(ঙ) March 17, 1818, No. 2, Extrac. Gillman's Report.

(চ) Jan. 15, 1819, No. 13.
(ছ) Jan. 29, 1819, No. 15.
(জ) June 6, 1835, No. 12.

রসাপাগলা মানসিক হাসপাতাল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করেছিলেন লেখক। কিন্তু সরকারি নথি থেকে দেখা গেল যে হাসপাতালটির জন্ম তার ঢের আগে। শ্রী সেনগুপ্তের আরো দু'টি বিভ্রম চোখে পড়েছে। কেওার্ডাইন প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন : '…মেডিক্যাল বোর্ডের ৩ এপ্রিল ১৭৮৭-র কার্যবাহতে…' (পৃ. ৯৩)। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু আদৌ মেডিক্যাল বোর্ডের অস্তিত্ব ছিল না। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯ মে হসপিটাল বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জুন হসপিটাল বোর্ড রূপান্তরিত হয় মেডিক্যাল বোর্ডে। ১৭৯৬-তে যে বোর্ডের জন্ম, তার ১৭৮৭-তে অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অন্য ভুলটি হয়েছে উল্লেখপঞ্জির বারো নম্বর টীকায়। ১৮৩৫-এর জেনারেল ডিপার্টমেন্টের প্রোসিডিংস-কে শ্রী সেনগুপ্ত 'লেফটেনান্ট-গভর্নরের প্রোসিডিংস' বলেছেন। লে. গভর্নরের বিভাগ খোলা হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১ মে। ১৮৩৫-এর নথি তার মধ্যে ঢুকবে কি ক'রে ?

উদয়ন মিত্র

ত্রিলোকেশ মুখোপাধ্যায়

দাগের ভাষা

আমাদের কোনো কোনো আবিষ্কার এত পুরনো যে সেখানে ইতিহাসের সঙ্গে ইতিকথার সীমারেখা নেহাতই ধোঁয়াটে। অথচ এই সমস্ত প্রাচীন আবিষ্কারই আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা নির্বাহে ও প্রাণী-জগতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সেগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞ ইংরেজ ফ্রান্সিস বেকন তিনটি আবিষ্কারকে মানুষের সব চেয়ে কালান্তর-কারী আবিষ্কার বলে উল্লেখ করেছেন—বারুদ, কম্পাস ও ছাপাখানা। তাঁর সাথে দ্বিমত না হয়েও আমরা বলতে পারি যে এগুলির আগে ও পরে আরো অন্তত চারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে—পরিবর্তন বা আবিষ্কার হয়েছে—যার জন্য আমরা অন্ত-জানোয়ার বা কীটপতঙ্গ থেকে উন্নত হয়ে রয়েছি, উন্নত হয়ে চলেছি—যদিও ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই আমরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আমাদের থেকে হাতির শক্তি বেশি, চিতা দৌড়ায় জোরে, পাখি ওড়ে উঁচু আকাশে, মাছ থাকে জলের ভিতরে। লম্বায়-চওড়ায় বিঘে-নখে প্রায় সব ব্যাপারেই কোনো না কোনো প্রাণী আমাদের চেয়ে বড়। তবু মানুষ সব প্রাণীকেই নিজস্ব শক্তির এলাকায় হারিয়েছে—নিজের অধিকার দাবি করেছে। কারণ, সম্ভবত নিম্নোক্ত চার ঘটনা, আবিষ্কার বা পরিবর্তন।

এই চার যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রথম হল—চার হাত-পায়ের উপর শরীরের ভার না বয়ে খালি দু'পায়ে সোজা হয়ে মানুষ দাঁড়ালো ও হাত দু'টো মুক্ত ক'রে নিল। মেরুদণ্ড সোজা করতে পারায় ও হাত দু'টো শরীরের ভার না বওয়াতে মানুষ এখন অন্যান্য কাজ হাত বাড়িয়ে, হাতে ধরে করতে শুরু করল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতেও সক্ষম হল। কয়েক হাজার বছর ধরে এই পরিবর্তন এলো এবং মানুষ গাছ থেকে ফল ছিঁড়তে, মাটি থেকে শিকড় তুলতে, পাথর ভেঙে তীরের ফলা তৈরি করতে এবং সে-তীর বা বর্শা ছুঁড়ে ব্যবহার করতেও পারল। এই মুক্ত হাতের সাহায্যে সে যেন পেল নতুন এক জীবন।

দ্বিতীয় বড় আবিষ্কার—আগুন। আগুনের আবিষ্কার এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পরিবর্তনকারী জগতের সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দিল। আগুন বা অনুরূপ শক্তি (পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ বা আণবিক শক্তি) আমাদের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে সাহায্য করল। পরে এলো তাম্র যুগ, লৌহ যুগ।

তৃতীয় বড় পরিবর্তন হল—আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তন। আমাদের ক্রমবর্ধমান মনন, বুদ্ধি, জ্ঞানের এবং অনুভূতি ও জিজ্ঞাসার জগৎ। আমরা প্রশ্ন করি, উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বিচার করার চেষ্টা করি, ন্যায়-অন্যায় বোধ করি। অণু-পরমাণুর গবেষণা, কবিতা, শিল্পকলা, সংগীত সৃষ্টি এবং উপভোগ করা, বিচারকের রায়, দুঃস্থদের সেবা—সবই এই মনন সঞ্জাত।

চতুর্থ বড় পরিবর্তন হল—কথ্য ও লিখিত ভাষার বিবর্তন, যার ফলে আমাদের পক্ষে চায়ের টেবিলে বসে আড্ডা মারা, হাজার হাজার মাইল দূরে চিঠি লেখা এবং কয়েক শো বছর আগে মৃত লেখকের লেখা পড়ে তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করা সম্ভব হল। জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়, পাখি, মাছ, ব্যাং-এরও এক ধরনের ভাষা আছে। কিন্তু তাদের ভাষার সাথে মানুষের ভাষার তফাতটা এতই বড় যে তার তুলনামূলক আলোচনা এখানে নিরর্থক।

আমরা এই শেষ পরিবর্তন ও ভাষা নিয়ে এখানে আলোচনা করব—তাও কথ্য বা মুখের ভাষা নয়, এমনকি মুখের বা হাতের সংকেতও নয়। আমরা কেবল রেখা বা দাগ কাটা (Mark making) সম্বন্ধে আলোচনা করব। যদিও শব্দ-সঞ্জাত ভাষার সাথে লিখিত ভাষার একান্ত নিবিড় যোগাযোগ ভুলে গেলে চলবে না। সেই যোগাযোগের সেতু পার হয়েই তো আমরা এখানে এই লেখাপড়ার জগতে পৌঁছেছি। এ ছাড়া অত্যন্ত লোভের হলেও সেই সনাতন প্রশ্ন—মানুষের জীবনে মুখের ভাষা আগে এসেছিল, না দাগ কাটার ভাষা এসেছিল, সেই তর্ক এড়িয়ে গেলাম। যদিও বলতে সংকোচ নেই যে আমার মনে শব্দসঞ্জাত ভাষার প্রাথমিক আবির্ভাব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো সন্দেহ দেখা দেয় নি। কারণ, মনে হয় সেটাই স্বাভাবিক।

দাগ কাটা থেকে যে ভাষার প্রচার তা মূলত তিন রকম

ক. নিছক অ্যাব্‌সট্রাক্ট দাগ-মূলক

খ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক দাগ-মূলক

গ. সচেতন, সচেষ্ট দাগ-মূলক ; অনেক সময় এই দাগ মূলত অ্যাব্‌সট্রাক্ট এবং স্বাভাবিক দাগের মিশ্রণ।

আমরা দাগের মধ্যে মানে খুঁজি, দাগের উপর মানে আরোপ করি। কোনো একটা দাগকে মানে যোগ ক'রে ভাষার জগতে তুলে আনি এবং অজানা দাগের মানে বোঝবার চেষ্টা করি। কখনো বা পুরনো মানে বদলে নতুন মানে আরোপ

করি। আমাদের স্বস্তিকার মানে যেমন হিটলার বদলে দিয়েছেন। সমস্ত দাগেরই মানে বোঝা বা ভুল বোঝা সম্ভব এবং এই বোঝা বা ভুল বোঝার উপরেই আমাদের জীবনের জানা-অজানার জগৎ অনেক সময় নির্ভর করে। মধ্য প্রদেশের ভীমভেটকা, ফ্রান্সের লাসকো (Lascaux), স্পেনের আল্‌তামিরা (Altamira) প্রভৃতি জায়গায় গুহার ভিতর বিশ-ত্রিশ হাজার বছরের পুরনো মানুষের হাতে-আঁকা অপূর্ব ছবির মধ্যে দিয়ে আমাদের দাগ কাটা ভাষার জন্ম। এই সব ছবির মধ্যে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রার, জন্তু-জানোয়ারের কিছু আন্দাজ আমরা পাই। এই ধরনের ছবিই ক্রমশ সরলতর (simplified) হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রাথমিক মানে বদলে যায়। এমন কি তা মানে-হীন হয়ে পড়ে। এই অসাধারণ মানে-হীনতার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন যে 'গরু' লেখার জন্য গরুর মুখ আঁকা হয়েছিল, সেই মানেই বদলে লিপি তৈরি হল – যে-লিপি আর গরু লেখার জন্য ব্যবহারই হয় না।

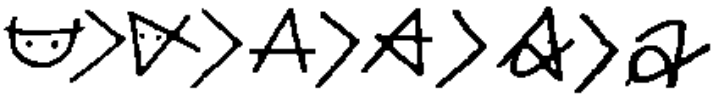

উপরন্তু সেই লিপি A বা a অন্যান্য হাজার শব্দের জন্য ব্যবহার হয়। এই ধরনের সাধারণ মানে-হীন (neutral) লিপি সাজিয়ে শব্দ হয়। এই সাধারণ মানে-হীনতার জন্য এই লিপি ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন শব্দ লেখা যায়। যেমন : God / Dog ; বল / লব ; বশ / শব, ইত্যাদি। শব্দ যোগ ক'রে বাক্য হয় এবং রেল-গাড়ির মতোই এক-একটা বাক্য এক-এক ধরনের মানের বোঝা বহন করে। কিন্তু রেলগাড়ির মতো বাক্যের সামনে সব সময় ইঞ্জিন (বা ক্রিয়া) থাকে না। কিন্তু ক্রিয়াই বাক্যের গমন-শক্তির উৎস। মানুষের সাথে মানুষের ব্যবহারের মতোই শব্দকে দেখে বোঝা যায় যে ওরা একাকী, দোকলা বা দল। এ সত্ত্বেও লিপির একটা অসাধারণ মানে সম্বন্ধেও আমাদের সজাগ থাকা দরকার। এম. পি (MP), পি. এম (PM), ডি. এম (DM), এম. ডি (MD) বা শুধু [,], [।], [‖] ইত্যাদির জন্য কত তফাত হয় মানের। কখনো কখনো শব্দের মাঝে, লিপির মধ্যেকার ফাঁকের (space) উপরও মানে নির্ভর করে। যেমন, a gent agent ; ভালো বাসা / ভালোবাসা, ইত্যাদি।

আমাদের ছয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখের দেখা এবং সেই দেখার মাধ্যমে যে ভাবের আদান-প্রদান, মানে-র বিনিময়, সেটাই প্রধান। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব এক-একটা সংকেত (code)-ময় জগৎ আছে – সেটার ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা (decodification) দিয়ে আমরা এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ গড়ে তুলেছি। সেই জগতের সাথে আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, মনন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই

জন্যই এ-জগতের যে একটা অদৃশ্য সীমানা আছে, যেটা পার হওয়া সব সময় সহজ নয়। একজন বাঙালির পক্ষে জেলেণ্ড বা চীনা অক্ষরকে ছবি বা আঁচড় মনে করা অস্বাভাবিক নয়। অথচ আশ্চর্য মানুষের অসীম ভাবের আকাশ—যেখানে ক্রমাগত আমরা সেই অদৃশ্য সীমারেখা ভেঙে চলেছি। নতুন মানে সৃষ্টি করছি পুরনো আঁচড়ের। যেভাবে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনকে অসামান্য ক'রে তুলেছি নিজেরাই মনের জোরে, যেভাবে গাছের ফুলকে কেউ দিচ্ছে দেবতার পায়ে, কেউ দিচ্ছে প্রেয়সীর খোঁপায়—সে ভাবেই একটা দাগকে তিন (৩), কখনো তমাল ক'রে দেখছি—বা সব দেশে সূর্য উঠলেও আপনাকে 'সূর্যের দেশ' বলছি। এছাড়া নিজস্ব গোপন সাংকেতিকতা—যেটা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ব্যবহার করে, বা বিয়ের আংটির মতো আমরা কখনো নিজস্বতাকে সামাজিক, অসামাজিককে নিজস্ব ক'রে তুলি।

দৃষ্ট লেখার ভাষাকে (visible language) সমালোচনা ও আলোচনার জন্য তিনভাগে ভাগ করা সম্ভব

ক. সেমান্টিক (semantic) দাগ দেওয়ার, দাগের মানে করার এবং দাগ বোঝার ব্যাপার ; দাগের আবার রং, রকম, আয়তন, টেক্সচার, ফর্ম, কোয়ালিটি ইত্যাদির আলোচনার বিজ্ঞান।

খ. সিন্ট্যাক্টিক (syntactic) এক দাগের সাথে অন্য দাগের সম্বন্ধ। কাছাকাছি, পাশাপাশি ; একসাথে, আলাদা ; কোনটা আগে কোনটা পরে—তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন : ৫০.৫০ ৫০৫.০।

গ. প্র্যাগমাটিক (Pragmatic) দাগের সাথে মানে-র সম্বন্ধ। আমরা দাগ দেখি, দাগের স্বরূপ নিরূপণ করি, দাগকে নাম দিই। পুরনো মানে-র সাথে নতুন মানে-র তুলনা করি। দাগ ও দাগের মানে-র চুলচেরা বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি ; তারপর বোঝবার চেষ্টা করি। এই সূত্রে কী আমরা বলতে চাই, কী বোঝাতে চাই, কাকে বলতে চাই, কেন বলতে চাই—প্রশ্ন করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবু সেগুলোকে এড়িয়ে কীভাবে বলতে চাই সেটাকেই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে টানতে চাই। একটা বক্তব্য লিখিতভাবে কাউকে জানাতে গেলে কী ধরনের লেখা, কী format, কি structure—এগুলো নিয়ে মাথা না ঘামালেও আমরা এগুলোকে মনে মনে ধরে নিই। যে বক্তব্য পাঠাচ্ছে / ছাপাচ্ছে লিখছে (sender) এবং যে বক্তব্যটাকে গ্রহণ করছে / পড়ছে (receiver) তারাই যে কোনো ভাষা / ভাব বোঝার (communication-এর) মুখ্য চরিত্র। এদের একজনও যদি না থাকে তাহলে সে communication সম্ভব নয়।

আমাদের দৃশ্য জগৎ বিশাল। তাও কেবল চোখের দেখা নয়, মনের দেখাও বটে। মনটা প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা। তবু ভাষার মাধ্যমে আমরা একটা

কোনো রকম সাধারণ জ্ঞান (common point of reference) সৃষ্টি করেছি। তাই কিছু ভাষাভিত্তিক একতা আমাদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে থাকলেও তার বাইরে প্রত্যেক মানুষ তার যে নিজস্ব এক ভাবের জগৎ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ছোট-বড়র তফাত সবসময় ধরা পড়ে। যেমন, এই মুহূর্তে যদি একজন লোককে চোখ বুজে একটা ফোঁটার (spot) কথা ভাবতে বলি তাহলে উপরোক্ত দু'টি মূল বক্তব্য প্রমাণ হবে—(ক) একশোজনের প্রত্যেকেই চোখ বুজেও একটা ফোঁটা দেখতে পাবে। অতএব দেখার জন্য চোখের প্রয়োজন নেই। যদিও স্মৃতিতে যে ফোঁটা স্থান অধিকার করেছে তার জন্য দেখা হয়ত দরকার হয়েছিল। স্বপ্ন দেখার জন্য চোখ খোলার দরকার হয় না। (খ) প্রত্যেকের দেখা ফোঁটা আলাদা, রং-এ, আয়তনে, টেক্সচারে বা ব্যাকগ্রাউণ্ডে ফোঁটাগুলো আলাদা। কিন্তু ভাষার ব্যবহার ক'রে এই দ্বিতীয় ধরনের ফোঁটা-গুলোর মধ্যে আমরা এক ধরনের একতা আনতে পারি। যেমন, আমরা যদি বলি মায়ের কপালের সিঁদুরের টিপ চিন্তা করো তাহলে দেখা যাবে (ক) এবং (খ) অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। অতএব ভাষার সাথে ছবির যে সম্পর্ক আছে তার নিশ্চিত ও অনিশ্চিত ব্যাপারে আমাদের একান্ত সচেতন থাকা দরকার।

এই সচেতনতার পাশাপাশি কিন্তু আমাদের ভাব, স্বপ্ন এবং কিছু অবাস্তবতার, কিছু অলীকতার স্থান সব সময়েই থাকবে এবং এগুলোই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা, জড়তা এবং যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়। এখানেই আমাদের এক ধরনের বিশেষত্ব যে, একই সাথে বাস্তব ও অবাস্তবের জগতে আমরা বিচরণ করতে পারি। তার ফলে একই ছবির বিভিন্ন মানে একই সাথে করার ক্ষমতা আমাদের আছে—তাই 8 4 IV-কে চার বোঝবার ক্ষমতা আমাদের আছে। এবং একই সাথে 48-এর 8-কে আট বোঝার ক্ষমতা আমাদের আছে। একই হরফের বিভিন্ন প্রয়োগে বা অবস্থানে বিভিন্ন ধরনের মানে করার ক্ষমতাও আমাদের আছে। এই ক্ষমতার দরুণ সিনেমা দেখে আমরা হাসতে পারি, কাঁদতে পারি, ভয় পেতে পারি। তখন আমরা জানতে চাই না, বুঝতে চাই না যে এগুলো ছোট ছোট ৩৫ মি. মি. স্টিল ছবি একটা বিশেষ গতিতে চলছে—তার মধ্যে দিয়ে আলো এসে পড়ে একটা স্বাভাবিক গতিবিধির সৃষ্টি ক'রে আমাদের চোখের মধ্যে, মনের মধ্যে একটা বাস্তবতার ভাব এনে দিচ্ছে। এমন কি, যখন স্লো মোশন এফেক্ট তৈরি ক'রে দৃশ্যমান গতির লয় কমিয়ে দেওয়া হয় তখনো জানতে চাই না কেন কীভাবে ইত্যাদি। চার্লি চ্যাপলিন লাঠি নিয়ে হাঁটছেন বা ইন্দির ঠাকরুণ মারা যাচ্ছেন—সেই সব ভাবের সাথে আমরা এক হয়ে যাই। এমনকি আমার চার ধারের কয়েকশো লোকও তখন উধাও হয়ে যায়। যেন আমি একলা হয়ে পড়ি।

এই মিথোর অপূর্ব জগতের সাথে আমাদের সত্যের জগতের যে অসাধারণ মিশ্রণ তার উপর আমাদের ভাষার নির্ভরতা। ভাষার কৃত্রিমতা কিন্তু হেয় নয়, খেলো নয়। এই কৃত্রিমতাই ভাবের বাহন—কেবল এই কৃত্রিমতার জন্যই একই জিনিসের, একই ভাবের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম। এবং এই ভাষা কৃত্রিমভাবে লিখতেও হয়। ভাষাহীন জগতেও সূর্য উঠত, পাতা ঝরে যেত, জন্ম-মৃত্যু হতো। আজ আমরা ভাষার মাধ্যমে সেই সমস্ত অনুভূতিকে ভাবমূর্ত করতে পারছি। এবং অন্যের (অন্তত যে সেই ভাষা জানে) সাথে সে ভাব-বিনিময় করতে পারছি। ভাষার মূর্তভাব জন্ম নিচ্ছে যে মনে, সে মনের জগৎ বিশাল এবং তার নানান স্তর আছে। ভাষার মাধ্যমে আমরা যা প্রকাশ করি তার পিছনে জানা-অজানা সচেতন-অবচেতন এবং অচেতন মানসিক জগতেরই অবদান আছে। কখনো সে-বিষয়ে আমরা সচেতন, কখনো বা নয়।

একটা রেডিওর মতোই ভাব প্রকাশে এবং ভাব গ্রহণে আমরা ক্রমাগত বিভিন্ন wave length-এর সাথে নিজেদের মনের জগৎটাকে মানানসই বা সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলছি। আমাদের ভাষার মাধ্যমে আমরা আদেশ করি, অনুরোধ করি, অভিমান করি, রাগ প্রকাশ করি। কথ্য ভাষায় এই প্রকাশের তফাত স্বরের পরিবর্তনে ধরা পড়ে। লেখায় সময়ও আমরা এই ধরনের বিভিন্নতা আনার চেষ্টা করি। অনেক সময়ই আমরা বুঝতে পারি ভাষার নিদারুণ সীমা-বদ্ধতা। কথা বলার সময় যেমন যথাযথ ভাবপ্রকাশে হাত নাড়ি, ভুরু কোঁচকাই, শরীর হেলাই তেমনি লেখার সময়ও সে ধরনের ব্যাপার করার চেষ্টা করি না, তা নয়। তবু সীমাবদ্ধতা থেকে বার হবার জন্য আমরা ম্যাপ, ডায়াগ্রাম, ছবি, ফোটোগ্রাফ-এর ব্যবহার করি। এমনকি, একজনকে কীভাবে কোথায় যেতে হবে বলতে গিয়ে একটা কাগজ টেনে নিয়ে ছোট ম্যাপ এঁকে ফেলি। অর্থনীতি, রাজনীতি ও ইলেকশনের গ্রাফ, কীভাবে প্লাগে তার লাগাতে হয় তার ছবি, কাগজের কার্টুন, রাস্তার ট্রাফিক লাইট বা সাংকেতিক চিহ্ন আজকাল আমরা আমাদের ভাষার জগতে এনে ফেলেছি। ইদানীং অনেকেই মাতৃভাষা, বিদেশী-ভাষা, অঙ্কের ভাষা, কম্পুটারের ভাষা, ট্রাফিক সাইন-এর ভাষা, সংগীতের ভাষা ইত্যাদি জানে। তবু ভাষা কখনোই সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত একমাত্র আদরের সন্তানের জন্য মায়ের মনের সেই দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমনকি তার কান্নায় যে সীমাহীন আকুলতা প্রকাশ পায় সেটাও কোনো ঔপন্যাসিক, কবি বা দার্শনিক ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন নি—কারণ তা সম্ভব নয়।

এই জন্য যে-কোনো আবদ্ধ ভাষা ক্রমশই বদলাচ্ছে। অন্য ভাষা থেকে আমরা ক্রমাগত ভাষা গ্রহণ করি, বা সেটাকে বদলে নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করি, বা ছবি ব্যবহার ক'রে ভাষার দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করি। কবিতা সংগীত বা

নাটকের মাধ্যমে ভাষার জড়তা দূর করার চেষ্টা করি। তা সত্ত্বেও এক মীরার ভজন কত রকমের হয়, একই রবীন্দ্রসংগীত বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে আলাদা হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই ভাবেন তিনি গানের আসল ভাবটাকে মূর্ত করতে পারছেন।

যে ভাষা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তারও রূপভেদে ভাবভেদ হয়। সকাল বেলায় ডাকে যদি আটখানা চিঠি আসে তাহলে শুধু খামের হাতের লেখা দেখেই মনের মধ্যে আনন্দ বা ভয়ের সঞ্চার হতে পারে। কারণ, হাতের লেখা তো কেবল হাতের লেখা নয়। যেমন, টেলিফোনে গলার স্বর শুনে আমরা বুঝতে পারি কার গলা এবং সে অনুযায়ী অনুভূতিরও তফাত হয়, গলার স্বরেও আমরা তারতম্য আনার চেষ্টা করি—কার সাথে কথা বলছি বা কী বলতে চাইছি তার উপর। গীতায় কৃষ্ণের উপদেশ সত্ত্বেও মনে হয় দুঃখের কথা ও সুখের কথা কি একই ভাবে বলা যায়?

যাঁদের হাতের লেখা সুন্দর—যেমন, সত্যজিৎ রায়—তাঁদের হাতের টানে একই লাইন দুঃখের বা সুখের হতে পারে। আমরা যারা ওঁদের মতো কৃতী নই আমরা চিঠিতে কোনো শব্দের তলায় লাইন টেনে শব্দটির গুরুত্ব বাড়াই। গুরুত্ব দেওয়া, অভিনবত্ব সৃষ্টি করা এবং ভাব অনুসারে পরিবর্তন করা ভাষার এক মহান ক্ষমতা। একঘেয়ে বক্তৃতা বা লেখা সবই আমাদের চোখে ঘুম এনে দেয়। অথচ অসাধারণ লোকের হাতে বাঁশ হয়ে যায় বাঁশি। একঘেয়ে কথা হয়ে যায় মর্মভেদী বক্তৃতা এবং একটা সামান্য হাতের লেখা হয়ে যায় লোভনীয় নিমন্ত্রণ।

শেষ জীবনে প্রায় সম্পূর্ণ বধির হওয়া সত্ত্বেও কেবল লেখার সাহায্যে বেঠোফেনের পক্ষে বোধহয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ Choral Symphony সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল—যদিও তিনি তা কখনো শুনে যেতে পারেন নি। তবু তাঁর মনের শোনার জগতে নিশ্চয়ই তিনি এ-সংগীত বার বার শুনেছিলেন।

সুন্দরী নারীর মতো ই সুন্দর হাতের লেখা বিরল। অসাধারণ পুরুষের মতোই অসাধারণ হাতের লেখাও বিরল।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দাগ কাটা এবং দাগ কাটার মাধ্যমে ভাষা প্রকাশের মূল কারণই হচ্ছে অন্য মানুষের সঙ্গে এক ধরনের একাত্মীকরণ, শ্রদ্ধা ও দরদ—অন্য মানুষকে বোঝবার চেষ্টা। এতে অন্য মানুষের প্রতি আমাদের সচেতনতা, আমাদের অনুভূতিশীলতা ধরা পড়ে। কারণ, ভাষার মাধ্যমেই আমরা ভাব ভাগ ক'রে নিতে পারি, শিখি। এতে মানুষের সাথে মানুষের সহবাসের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়।

ভাষার, বিশেষত লিখিত ভাষার, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লিখিত ভাষার জগৎ ক্রমশই বাড়ছে। লিখিত ভাষার জগৎ বাড়ার দু'টো বড় কারণ আছে, এবং সম্ভবত এ দু'টি একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। প্রথম হচ্ছে, লিখতে পড়তে জানে

৭ রকম লোকের সংখ্যা বাড়ছে ; দ্বিতীয়ত, এই হাজার হাজার কোটি কোটি লোকের পড়ার জন্য পত্রিকা বই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে একমাত্র ছাপাখানার উদ্ভাবনার জন্য। এর পরের সংখ্যায় এই ছাপায় জগৎ সম্পর্কে বলার ইচ্ছা রইল।

সংযোজন

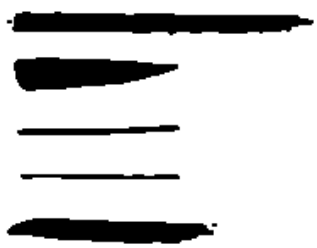

কীভাবে দাগ মারা হল, কী দিয়ে মারা হল এবং তা কত বড়, কত মোটা—
এ-সবের উপর একটা দাগের পরিচয়।

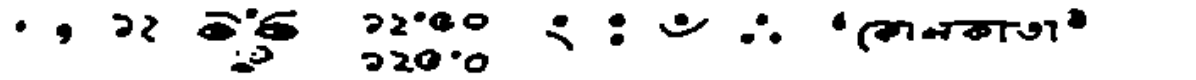

২

একটা দাগ বা একটা বিন্দুর আরো অর্থ বা পরিচয় হল, তা কোথায় ও কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যে কোনো দাগের একটা বিবর্তন থাকা সম্ভব। শুরু দেখে সব সময় বোঝা যায় না কোথায় শেষ হবে।

৪

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মধ্যপ্রদেশে ভীমভেট্‌কা গুহার গায়ে আঁকা ছবিতে সমবেত নৃত্য।

৫

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফ্রান্সে ডরডয়েন (Dordogne) নদীর উপত্যকায় পেস-ম্যার্লে (Pech-Merle) গুহার গায়ে আঁকা ঘোড়ার ছবির উপর মানুষের হাতের ছবি। সম্ভবত এ-ভাবেই শাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়।

৬

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে দাগ কেটে তাদের মনের চিন্তার ছবি এঁকেছিল। এ রকম ছবিরই বিবর্তন হয় হরপ্পে।

৭

মিশরে এক লেখকের মূর্তি।

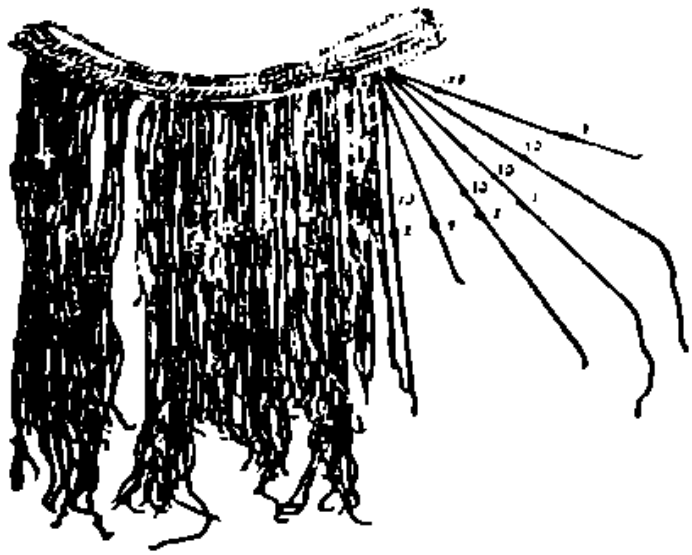

৮

কিপু (Quipu)—দড়িতে গিঁট লাগিয়ে নানাধরনের নক্‌শা তৈরি করত প্রাচীন পেরুর অধিবাসীরা, যা কোনো সংখ্যা বা বিষয় স্মরণ রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো।

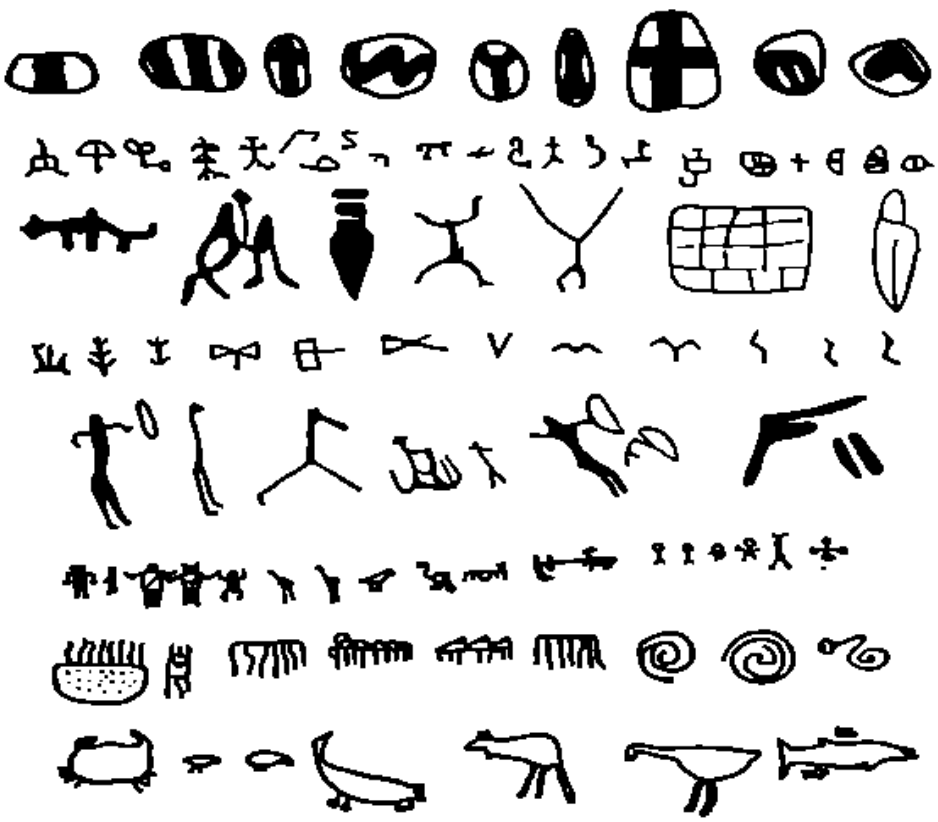

৯

নানা ধরনের আঁকা-লেখার চেষ্টা।

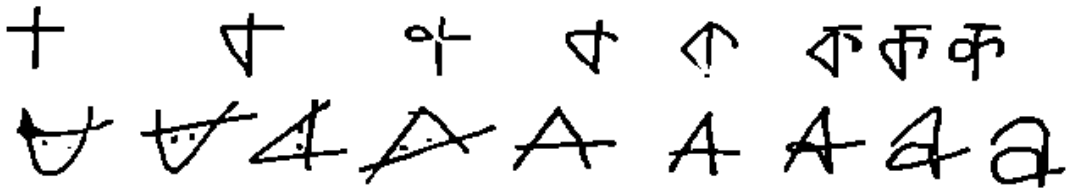

বাংলা বা দেবনাগরী হরফ 'ক'-এর বিবর্তন একধরনের যোগ-চিহ্ন বা ৩.৩ ৩-চিহ্ন থেকে হয়েছে। প্রায় সমস্ত হরফের শুরুই ছবি থেকে। ছবি থেকে রোমান হরফও এসেছে।

বস / সব
সব / শব

১১

একই হরফের নানারকম ব্যবহার সম্ভব। মুখের ভাষার সাথে সবসময় লিখিত ভাষার যোগ থাকে না, যদিও এই যোগ খুবই দরকারী।

ক + ত = ক্ত
ক + ত = ক্ত
ক + ত = ক্ত
এ ক্ত ক্ত ক্ত

১২

হরফের সাথে হরফের মিলনের নানারকম সম্ভাবনা। সামান্য মাত্রার ব্যবহার বা একই চিহ্ন উল্টে ব্যবহার করলে হরফের মানে বদলে যায়।

ও বলল কাল ও অসুস্থ ছিল
ও বলল কাল ও অসুস্থ ছিল
ও বলল কাল ও অসুস্থ ছিল
ও বলল কাল ও অসুস্থ ছিল
ও বলল কাল ও অসুস্থ ছিল

১৩

একটা বাক্য যখন আমরা মুখে বলি তখন সামান্য উচ্চারণের তফাতে সেই একই বাক্যের নানা অর্থ করা যেতে পারে। লেখার বা ছাপার সময় সেই তফাত কীভাবে দেখানো যাবে, সেটা একটা সমস্যা।

ছোটো বোঝা বহুলভ

১৪

কীভাবে একটা শব্দ লেখা হল তা দিয়ে কখনো কখনো তার অর্থ বোঝা যায়। সত্যজিৎ রায়ের ডিজাইন করা সিগনেট প্রেসের বইয়ের মলাটের উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, 'অর্কেস্ট্রা' বা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'।

১৫

একটা তুচ্ছ দাগের মধ্যেও ছবি দেখি, কারণ ছবি আছে আমাদের মনের মধ্যে।

১৬

কোনো কোনো চিহ্ন, যেমন Milton Glaser-এর এই হৃদয়-চিহ্ন ব্যবহার এখন পৃথিবীর সব ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে।

১৭

পরিচিত শব্দ বা নামের মধ্যে ব্যবহৃত হরফে কখনো কখনো একটা ছবি গোপন থাকে। অনায়াসে সেটাকে বার করা যায়।

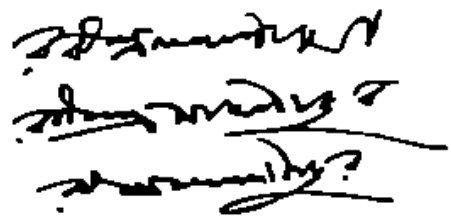

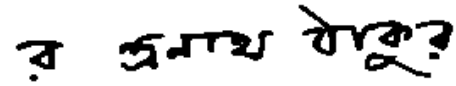

১৮

পরিচিত শব্দ বা নাম আমরা পুরোটা পড়ার প্রয়োজন বোধ করি না। কয়েকটা পরিচিত চিহ্ন দেখেই পুরোটা বোধগম্য হয়। এমন কি, একটা হরফের অভাব থাকলেও পড়তে কষ্ট হয় না। কারণ নামটা আছে আমাদের মনে আঁকা।

—

চা-বাগিচার কড়চা

সোমনাথ হোর

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের মে মাসে লেখা চা-বাগানের এই কাহিনী বন্ধুবর নির্মালা আচার্যের আগ্রহে এক্ষণে ছাপতে দিলাম। বিদ্যা এবং বুদ্ধি দু'টোরই অভাব এই লেখাতে। না ডায়েরি, না একটি সুসংহত রচনা। যাই হোক ছাপাতে যখন রাজি হয়েছি—এর জন্য নিন্দামন্দ আমারই প্রাপ্য।

'তেভাগায়ে ডায়েরি' লেখার পাঁচ মাসের মধ্যে এই ভ্রমণ। মাঝে মাঝে নেশার মতো পেয়ে বসত দরিদ্র শোষিত এই মানুষগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। তাদের মুখে তাদের কথা শুনতাম, তাদের সঙ্গে মিটিংয়ে মিছিলে যেতাম, শিকারেও গেছি—তীর ধনুক বল্লম নিয়ে, আর ভালোবেসে ছবি এঁকেছি। শেষ কালে রইল ছবিগুলি, বাকি সব মায়া মনে হয়—সে কি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছি বলে, অথবা, রাজনীতির আদর্শগুলি পরিবর্তিত হতে হতে অচেনা রূপ নিয়েছে বলে? লেনিন স্টালিন, মাও সে তুঙ, এমন কি সেদিনের দেঙ-এরা তো দিলেন অনেক; অথচ যা দেন নি কিংবা কেড়ে নিয়েছেন—তার হিসেব নিকেশে এত হলাহল কেন?

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ক্ষমতার হাতছানিতে সহজেই দিক্‌ভ্রষ্ট হয়। সে শুধু টানে তাদেরই, ক্ষমতাকে যারা আরও পাওয়ার আয়ুধ বলে মানে। এ এক বিস্ময়, তাই বিমূঢ় বোধ করি। তবু ভুলতে পারি না জুমিয়া পল্লীতে মায়েদের হাতে মশলাবিহীন অথচ স্বাদু পাখির ঝোল, সূর্যমণি-শুকচাঁদের বাড়িতে বুনো শাক আর শুঁটকির ঝাল, দুঃখীরামের মায়ের আশ্রয়ে রাতের পরমান্ত নিশ্চিন্ত নিদ্রা—সবই হয়েছে কমরেডের উল্কিকাটা ছাপ সারা অঙ্গে লেপ্‌টে ছিল বলে। আমার কত বড় ভাগ্য যে আঁকতে পারতাম। অবলা সুবঘুনী সূর্যমণিরা, যারা মালিকের লোকেদের তীব্র ঘৃণায় সরিয়ে রাখত, তারাই আমাদের অলাভ সুযোগ দিয়েছে ছবি আঁকার—কমরেড নামাংকিত পাসপোর্ট ছিল বলে। তাদের, তাদের ছেলেমেয়েদের এবং স্বামীদের সেই প্রতিকৃতিগুলি আমার শিল্পকর্মে নানাভাবে যাওয়া-আসা করেছে। হৃদয়ানুভবের এই সম্পর্ক মামুলি কৃতজ্ঞতায় চিহ্নিত হবার নয়।

শান্তিনিকেতন, ২০. ৮. ৮৯

সোমনাথ হোর

রাতের আঁধারে অন্ধকারের রাজ্যে এলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি চা-বাগানে কুলিরা থাকে—কুলির দেশে আলো জ্বলে না। প্রায় ৬০ বছর আগে ইংরেজ বণিকেরা যখন এখানে চা-বাগান তৈরি করে, তখন তাদের সংকল্প ছিল—এখানে কোনোদিন আলো জ্বলবে না, আলো জ্বলতে দেব না। মাদ্রাজী, বিহারী, ওড়িয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি নানাজাতের লোকেরা নিজেদের দেশে খেতে না পেয়ে ভিন্ দেশে পাড়ি দিয়েছিল দু'মুঠো অন্নের আশায়; এসেই পেল একটি ক'রে কলাই করা লোহার থালা, গ্লাস, বাটি, সস্তার কম্বল আর শোয়ার জন্য খানিকটা মাটি। আরও পেল বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিকৃত এক সমাজব্যবস্থা এবং মদের দোকান। কুলি জীবনের প্রারম্ভেই জানল—ম্যানেজারই ভাগ্যনিয়ন্তা, তার অঙ্গুলি হেলনে জীবন-মরণের ফারাক এক চুলও নয়।

বুড়ো পরদেশী বলে ঐ যে পাহাড়গুলো দেখছেন বাবুরা, ওতে অনেক বেদনা জমাট বেঁধেছে, মাঝে মাঝে ওখানে ফাটল ধরে, ধোঁয়া বেরয়।

মনে পড়ছে ফেব্রুয়ারি দিন এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর পাহাড়ে পাহাড়ে দেখি, মেঘের মতো কী যেন ওড়ে। নগেন দে বলেছিলেন, 'ও মেঘ নয়, ধোঁয়া।' কে জানে পরদেশী একেই হয়ত বেদনার ধোঁয়া ঠাউরেছিল!

কোনো এক বাগানের শক্ত সমর্থ জোয়ান কুলি ম্যানেজারকে বলেছিল, 'বাবু জ্বর হয়েছে, আজ কোদালি চালাতে পারব না।' জবাবে পেয়েছিল বেদম প্রহার, পরে মৃত্যু। বুড়োরা বলতে পারে প্রতি পদক্ষেপে ক'টা মানুষের গুমরানি আটকে রয়েছে। তারা আরও জানে বস্তিতে সুন্দর মেয়ে জন্মাতে নেই। সুন্দর মেয়ের উপর তাদের কোনো দাবি থাকে না; বড়ো হলেই তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে ম্যানেজারের কুঠিতে। ম্যানেজারের লালসায় হাজারো বাহু অক্টোপাসের মতো কুলি লাইন তছনছ ক'রে বেড়ায়। তারা নির্ভয়ে বিয়ে করতে পারত না।

দাঁতমারা বাগানের গহু আর সরলা পরস্পরকে বরণ করেছিল, সহস্র দুঃখের মধ্যেও নীড় বাঁধবে আশা নিয়ে; কিন্তু আশা নির্মূল হয়ে গেল—ম্যানেজারের দালাল অপর্ণাচরণ যেদিন সরলাকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল ম্যানেজারের হুকুমে, যা ছিল বাগানের অলঙ্ঘ্য আইন। বিলিতি আমলের আইন দিশী আমলে আরও ধার পেয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অনেক বিলিতি মালিক বাগান বিক্রি ক'রে দেয়। তাদের স্থান দখল করে বি. কে. রায়চৌধুরী (ভারত টি কোং লিঃ) মহালক্ষ্মী ব্যাংক (রাঙাপানি টি এস্টেট), চাঁদমল ভাটিয়া (বুলিয়ন এণ্ড কোং লিঃ) প্রভৃতি ভারতীয় মালিকেরা। মালিক বদল হল, কিন্তু বাগানের আইন বদলাল না। আগে

16.5 47

৮টি বাগান ছিল. এখন ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে প্রায় ২০টি বাগান। এই বিস্তৃত এলাকায় এলোমেলো জাতের কালো কালো মেয়ে মরদেরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাতি তোলে বর্ষার দিনে; শীতের দিনে কোদালি চালায়। হাজিরা পায় মরদেরা দৈনিক আট আনা, মেয়েরা ছ' আনা। বালবাচ্চা নিয়ে অভাব অনটনের সংসার টানে। হাঁড়িয়া খেয়ে কোনোদিন ফুর্তি করে দুঃখ ভোলার আশায়। তারপর আসে ১৯৩০-৩১-এর বিশ্বব্যাপী মন্দা। হাজিরা কমে হল পুরুষ চার আনা, মেয়ে তিন আনা, কিশোর দু'আনা। কর্মক্ষমতা যত কমে, অত্যাচার তত বাড়ে। মূক মানুষগুলি অজস্র অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ একদিন রুখে দাঁড়ায়; কৈফিয়ত তলব করে, 'মারবে কেনে, ম্যানেজার তাতে মারবে কেনে?'

আবার ঝিমিয়ে পড়ে; হাঁড়িয়া টানে, নিষ্ক্রিয়তার ফাঁকে দলাদলি আসে।

১৯৩৬ সালে হালদা ভ্যালি চা-বাগানে এক কংগ্রেসি দেশকর্মী এলেন, নাম সুশান্ত চৌধুরী। কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ভুবন গুহ ছিলেন ম্যানেজার। ভুবন গুহের সাহায্যে সুশান্তবাবু সদস্য সংগ্রহ (!) তো করলেনই, উপরন্তু নিজের কাঠের ব্যবসায়েরও একটি সুরাহা ক'রে গেলেন। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে সুশান্তবাবু সেই যে গেলেন, কংগ্রেসের কাজে এদিকে আর এগোন নি।

এর পরে এলেন এক নতুন ধেয়ানের কর্মী, কালাপানি পেরিয়ে। নাম নগেন দে। বেথুয়া ডাকাতির আসামী। আন্দামানে থাকতেই অনেক বইপত্তর ঘেঁটে সিদ্ধান্তে এলেন যে, মজুর-কিষাণের পেটের লড়াই সত্যিকারের স্বাধীনতার লড়াই। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না।

রাতের পর রাত বড় বড় গর্জন গাছের অন্ধকার আশ্রয়ে গোপন বৈঠক ক'রে ৭০।৮০ জন শ্রমিককে নিয়ে নেপচুন বাগানে প্রথম ইউনিয়ন গঠন করলেন। এর পরে ফটিকছড়ি বাগানে ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। ম্যানেজারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আন্দোলন করতে হতো। নইলে নিঃশব্দে গুম্ হয়ে যেতে হতো। দাঁতমারা বাগানের একটি আমগাছ দেখিয়ে নগেন দে বলেছিলেন— ম্যানেজারের গুণ্ডার হাত থেকে কি ক'রে আত্মরক্ষা করেছিলেন। সেদিন গুণ্ডার লাঠির ঘায়ে মুয়ে পড়লে চারপাশের গাঁয়ের কেউ জানতে পেত না নগেন দে কোথায় উবে গেলেন; কিংবা জানলেও মুখ ফুটত না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এল। মজুরি বাড়ল না, শ্রমও কমল না। সকাল বেলায় নুন মেশানো এক গামলা চায়ের জল খেয়ে কাজ করতে যাওয়া. সন্ধে বেলায় হাঁপাতে হাঁপাতে লাইনে ফেরা। ৬৪ নল × ১ নল (১ নল—৮ হাত) জমিতে কোদালি দেয়ার মজুরি চার আনা। অথচ চার আনায় খাবার যা মেলে তাতে কঠিন পরিশ্রম করা চলে না। তাই অশক্ত শ্রমিক যখন অত জমিতে কোদালি চালাতে পারল না, তার মজুরিও গেল কমে। সে এক আনা দু'আনা হাজিরা

শেল। বাজারে চালের দাম তুঙ্গে—টাকায় তিন সোয়া, এক সের। কাতারে কাতারে শ্রমিক প্রাণ হারাল। দলে দলে বাগান ছাড়ল। মরা মায়ের স্তনে আধমরা শিশুর কাতরানি গাঁয়ের লোকে আজও মর্মান্তিক বেদনায় স্মরণ করে।

যেখানে ইউনিয়ন ছিল, সেখানে আন্দোলন হল, মজুরি কিছুটা বাড়ল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। কোনো কোনো বাগানে আন্দোলনের ভয়ে কোম্পানি আগে ভাগেই মজুরি কিছুটা বাড়িয়ে দিল। যে বাড়াল না, যেমন চাঁদমল ভাটিয়া, তার উপর ইউনিয়নের উদ্যোগে সরকার থেকে চাপ দিয়ে মজুরি বাড়ান হল।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে ইউনিয়ন গঠনের কাজ নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। ছাপানো ইস্তাহার আসে, এক বাগানের শ্রমিকেরা উৎকর্ণ হয়ে শোনে, ভিন্ বাগানের জঙ্গী আন্দোলনের কাহিনী; তাদের জোর আওয়াজ—মানুষের মতো বাঁচতে চাই। তারাও কিস্ কিস্ কথা কয়, চুপি চুপি জোট বাঁধে তারপর রাতের গহীন আঁধারে নেতার সাথে দেখা ক'রে আকুতি জানায় পথ দেখাও। যাওশানি চা-বাগানে আন্দোলনের শুরু এমনি করেই।

ছোট একটি টিলার উপরে আমকাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা একখানি কুটির। মজুররা বলত 'আশ্রম'। এই আশ্রমে শ্রমিকরা জড়ো হয়েছে, ইউনিয়ন বানাবে। চা-বাগানের হাড়ভাঙা খাটুনির ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট জোতে তারা ফসল ফলায়, কোম্পানি জোর ক'রে দুই-তৃতীয়াংশ ফসল কেড়ে নেয়। মন্বন্তরের সংকটে তারা টের পেয়েছে—ফসল হাতছাড়া করা চলবে না। ধান নিজেদের খোলায় তুলবে। কোম্পানিকে দেবে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ—অর্থাৎ ভেভাগা। আরো দাবি আছে—যেমন 'তলব বাড়াও', 'ম্যানেজারের জুলুম বন্ধ কর'। কিন্তু কাজের জন্য জোট বাঁধা চাই। তাই তাদের জমায়েত। সামনে রয়েছে 'তামা-তুলসী' এবং ফুলে পল্লবে সাজানো জলভরা ঘট। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, সাহস্ ক'রে এগোয় না, এত বড় একটা শপথ! কিন্তু রামমোহন শক্ত হাতে ঘট ধরে প্রথম প্রতিজ্ঞা নিল

ইউনিয়ন গড়লাম, ইউনিয়ন মানলাম।
দশভায়ের যে গতি আমারও সে গতি।

তার বিশাল গোঁফ জোড়া, নিকষ কালো রঙের বলিষ্ঠ দেহ, বুকভরা মন্ত্রোচ্চারণ সঙ্গীদের অন্তরে বরাভয় আনে। একে একে সবাই প্রতিজ্ঞা নেয়—'ইউনিয়ন গড়লাম, ইউনিয়ন আমাদের বাপ-মা।'

সেই ঘট ধরার কথা বলতে গিয়ে আজো রামমোহনের চোখমুখ জ্বলে ওঠে—'মিলিটারি এনে কোম্পানি আমাদের ভয় দেখায়। মিলিটারির চেয়ে আমরা কম কিসে? কোম্পানিকে বলি, তোমাদের ছয় মিলিটারি, আমাদের দু'শ মিলিটারি. আমরা ভয়াই না, আমরা একজোটে ঘট ধরেছি।'

কোম্পানি হুমকি দিল — মারব, মামলা করব, জেলে পুরব ইত্যাদি। শ্রমিকরা নির্বিকারভাবে দলে দলে ধান কাটে, নিজেদের খোলায় তোলে। কোম্পানি বেগতিক দেখে লোক পাঠাল (অপূর্ব দাসকে) ঘটনার তদন্ত করতে। তদন্তের সময়ে খাতাপত্রের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে হিসাবের ছারপোকারা। মহালক্ষ্মী ব্যাংক শ্রমিকদের কাছে থেকে টাকা পাবে আড়াই হাজার, ধান পাবে দেড় হাজার মণ।

শ্রমিক অবাক, হতবাক। ওড়িয়া শ্রমিক শত্রুঘ্ন আজও বিস্ময়ে বিহ্বল, মুখে প্রশ্ন, 'টাকা পাবে কেনে, ধান পাবে কেনে — আগে কুনদিন ত শুনি নাই!'

কোম্পানি কৈফিয়ত দিল — 'ও কিছু না। আমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য লেখা। ওটা ত কখনও উসুল করা হয় না।'

গোবিন্দ বলে, 'সাধে কি লড়াই করি বাবু। ছোটবেলা থেকে দেখে এলাম কোম্পানি আমাদের কাছে এটা ওটা পাবে। আমাদের কোনো পাওনা নেই। সারাদিন ঝড়ে জলে খেটে এই এত বড় এক টুকরি পাতি তুললাম — কেরানি বাবু ওজন নিয়ে বলল — ৫০ পাউণ্ড। টুকরির ওজন কেটে নিল ১৫ পাউণ্ড (টুকরির ওজন সাধারণত ২।৩ পাউণ্ড)। তখন ত জানতাম না টুকরির ওজন কি ক'রে ১৫ পাউণ্ড হয়। তখন যে পাতির ওজন হতো ৫০ পাউণ্ড, এখন দেখি তারই ওজন ৮০।৯০ পাঃ। জুচ্চুরিতেই আমরা সর্বস্বান্ত হলাম।'

শুকচাঁদ আর সূর্যমণির সংসারের খুঁটিনাটির কথা শুনছিলাম। শুকচাঁদ চাকরি করেছে সাতাশ বছর, সূর্যমণি সতের বছর। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত চুয়াল্লিশ বছরের খাটুনির সঞ্চয় এই

একখানি ভাঙা কুঁড়ে (এক-তৃতীয়াংশ গরুর দখলে, বাকিটা নিজেদের), দু'টি মেয়ে, দু'টি ছেলে। চারটি ঘটি, দু'টি গ্লাস, দু'টি বাটি, তিনখানি থালা, দু'টি কড়াই, একটি ডেকচি, একখানি দা, ভালো ধুতি একখানি, ছেঁড়া একখানি, মা-মেয়েতে মিলে তিনখানি শাড়ি; ছেলেদের গায়ে দু'টি ছেঁড়া জামা, একটির পরনে নেংটি, অন্যটির হাফ প্যাণ্ট; কাচ্চাবাচ্চা মিলিয়ে দশটি মুরগি, দু'টি গরু, কয়েকখানি ছেঁড়া চট, একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন আর তীর ধনুক।

বলা বাহুল্য, শুকচাঁদের অবস্থা সচ্ছল। তদন্তের সময় শ্রমিকদের তরফ থেকে দাবি পেশ করা হল

১। বাগান ভালোভাবে চালু করো;

২। তলব পুরুষ-দশ আনা, নারী আট আনা;

৩। শনিবার-পিছু ৩ থেকে ৫ কানি জমি, জমির খাজনা কানি পিছু দু'টাকা।

৪। ধান নিজের খোলায় তুলবার অধিকার চাই, মালিক পাবে তিনভাগের একভাগ;

বসতবাড়ির জন্য খাজনা নেয়া চলবে না;

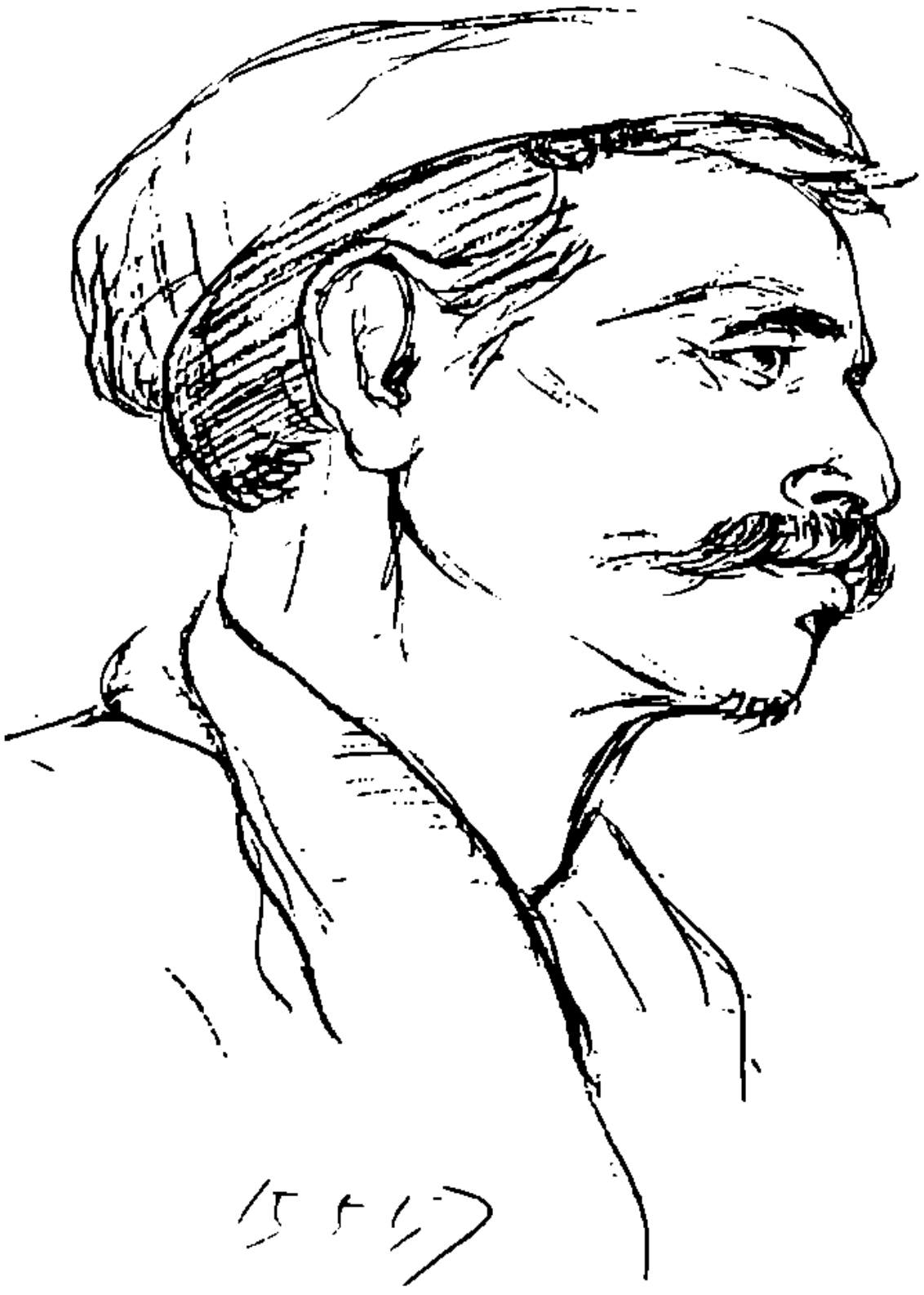

৬। প্রস্তুতি ভাতা চাই ; এবং আরও কিছু।

কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ দাবির কিছু কিছু মানল। তবে ঠিক হল—পুরুষ আট আনা, নারী ছ আনা। সেদিনের বৈঠকে শ্রমিকদের প্রধান দাবিগুলি মানার সঙ্গে সঙ্গেই টেবিল চাপড়ে রামমোহন বলে উঠল, 'তাহলে ম্যানেজারবাবু, আজ থেকে তুমি আর মারধোর করতে পারবে না।' ম্যানেজার কাঁচু মাচু হয়ে বললেন, 'কে মেরেছে।' রামমোহনের জবাব, 'তুমি, তুমিই আঙ্গিন মেরে এসেছো, আজ থেকে জুলুম বন্ধ করতে হবে। আমরাও মানুষ।'

মনুষ্যত্বের এই উপলব্ধি আশেপাশের বাগানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল। সুজানগর, বারমাসিয়ার শ্রমিকরা বলতে লাগল—'রাঙাপানি আলো জেলেছে।'

১৯৪৫-এর গোড়ায় এই সাফল্য। ঐ বছরের অক্টোবরে মহালক্ষ্মী ব্যাংক পাঁচ লাখ টাকায় বাগান বিক্রি করল হিলটপ টি কোম্পানির কাছে (Hill Top Tea Co. Ltd.)। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীনাথ মুখার্জি।

এই একই বছরের শেষ দিকে বাগানের হাটে একটি সভা ছিল। সভায় লালঝাণ্ডা উড়ছে। ঝাণ্ডার নিচে জড়ো হয়েছে বাগানের শ্রমিকেরা। হঠাৎ এসে পড়লেন সতীনাথ মুখার্জি। বাগান কেনার পর এই প্রথম পদার্পণ, 'আমার বাগানে লালঝাণ্ডা, শিগ্‌গির নামাও, লালঝাণ্ডা আমার দু'চোখের বিষ।'

কেউ ঝাণ্ডা নামাল না দেখে ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মুখার্জি সাহেবকে বাংলোয় ফিরিয়ে নিয়ে অনুরোধ জানালেন—সভা-বৈঠক নিয়ে বিচলিত না হতে। ভোল পালটে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন—'ঠিক আছে, সভা করছে করুক। আমিও ওসব পছন্দ করি।'

স্বভাবতই শ্রমিকরা খুব মজা পেল। লালঝাণ্ডার উষ্ণ অভিনন্দন সাহেবের মেজাজ জুড়িয়ে দিল।

ইতিমধ্যে একদিন রাঙাপানির চা-শ্রমিকরা অবাক হয়ে দেখে সুবলমাঝি আর বিশু সর্দারের নেতৃত্বে বারমাসিয়া সুজানগরের ধর্মঘটী একদল শ্রমিক তাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। মধু, শুকচাঁদ, পরদেশী, ঠাকুরা এগিয়ে এসে তাদের বুকে টেনে নিল।

তারা রাঙাপানিতে কেন এল? এই প্রশ্নের জবাবে সুবল মাঝি বলে—সুজানগর চা-বাগানে কাজ করার সময় তাদের ইউনিয়ন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কিছুদিনের মধ্যে ইউনিয়ন জমি দখলের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়। সেই থেকে ম্যানেজারের বিষ নজরে। ইতিমধ্যে কোম্পানি ইউনিয়নের নেতা এবং কর্মীদের নামে মিথ্যা নালিশ ক'রে তাদের গ্রেপ্তার করায়। শ্রমিকরা এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদে শুরু করে ধর্মঘট। কিন্তু নেতাবিহীন ধর্মঘট তিন সপ্তাহ পরে ভেঙে যায়। কয়েক মাস পরে নেতারা ছাড়া পেলে, সুবল এবং বিশু প্রায় ৫০ জন শ্রমিককে নিয়ে ইউনিয়নের নির্দেশে বাগান থেকে বেরিয়ে আসে।

17 5 47

Asm. Bridhu Rajguru.

আসার পথে কোম্পানির গোবা গুণ্ডারা তাদের প্রায় পাঁচশ টাকার বাসনপত্র, সুবলের ১২ টি গরু, ১১ টি ছাগল, ১৪ টি মুরগি লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। ম্যানেজার তারক পত্রনবীশ সব কিছু আটকে রেখে প্রস্তাব পাঠায়, 'হাজার টাকা দেব, লুঠের মাল কিরিয়ে দেব, দলবল নিয়ে বাগানে ফিরে এলেই সব মিটে যাবে।'

সুবলের মাথায় গামছা বেঁধে একটি পাগড়ি। চোয়ালের উঁচু হাড়গুলোর পাশে শান্ত চোখ দু'টি হয়ত একটু বে-মানান। শান্ত দৃষ্টি মেলে ধীরকণ্ঠেই সে বলে—'ম্যানেজার আমাকে টাকার লোভ দেখায়। মামলা ঠুকেছি, সে কিন্তু হারানো জিনিস ফিরে পাবার জন্য নয়। মালিকের জুলুমকে রুখব বলে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছি, লড়াই শেষ না হলে সে পাগড়ি আর খুলব না।'

সুবলের লড়াই রাঙাপানিতেও চলেছে, তাই মাথায় এখনও পাগড়ি।

তাদের আসার পর রাঙাপানির শ্রমিকরা টাকাপয়সা, ধানচাল, কাপড়চোপড় দিয়ে সাহায্য ক'রে বাগানে কাজ জুটিয়ে দেয়। তাদের থাকার জায়গা, চাষের জমি, রেশন, তলব ইত্যাদির জন্য আন্দোলন শুরু করে। শ্রমিকভায়েদের এই সহমর্মিতা কোম্পানির কর্তাদের অসহ্য লাগে, তাদের প্রথম এবং শেষ অস্ত্র বিভেদনীতির আশ্রয় নেয়। অর্থ এবং বাড়তি সুবিধা দিয়ে এতোয়া সর্দার, শ্যাম সর্দার, দুর্গা উরাং প্রভৃতি কয়েকজনকে হাত করে।

কিন্তু তাতে সুবিধা বিশেষ হয় নি। বস্তিতে বস্তিতে রটে গেছে—ওরা দালাল, পরামাণিক মধু শীল ওদের খেউরি করে না। সমাজের মোড়ল দুঃখীরাম উরাং চটে লাল, বলে, 'লালঝাণ্ডাকে অপমান করে, ওদের সাথে জলচল বন্ধ!'

এখনও কানে বাজে অবলার কথা। বাগানে পাতি তোলার পর বিশ্রাম নিচ্ছে, পাশে একটি কাঁচা বাঁশের খোলে পানীয় জল। জিগেস করলাম—'কোম্পানি থেকে খাওয়ার জল দেয় না?'

বলল—'দিত। এখন ও লোককে বারণ ক'রে দিয়েছি; ও কোম্পানির দালাল। দালালের হাতে জল খেতে ঘেন্না করে।'

অবশ্য ঘটনা ঘটেছে আরও বিশদভাবে। দু'দিন জল আনতে বারণ করার পর তৃতীয় দিন আবার সেই লোক জল নিয়ে বাগানে এলে বলে, 'আমার হাতে জল না খেলে তোদের নামে নামে জল ঢেলে দিয়ে যাব। পাশেই ছিল অবলা, হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠল, 'ওরে আবাগির ব্যাটা আমরা কি মরেছি যে আমাদের নামে জল ঢালবি। ফের যদি এদিক মাড়াবি, ঝেঁটিয়ে পিঠের ছাল ছাড়াব।'

এতোয়া সর্দারের দূরসম্পর্কীয় নাতি দেড় বছরের পুরুণ, সেও বলে, 'এতোয়া সর্দার দালাল হায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্—শ্যাম সর্দার দালাল হায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্।'

বড়দের মুখে শুনে শুনে শিখেছে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিয়ন থেকে কতকগুলি দাবি পেশ করা

হল। সতীনাথ এলেন, টালবাহানা করলেন, ভেভাগা সম্পর্কে বললেন—'এরকম শাগলামি চলতে পারে না।' শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হল।

মার্চ মালের মাঝামাঝি কর্তৃপক্ষ বিশুকে কাজ থেকে জবাব দিল, শরদেশীকে দিল হুমকি। 'বিশুকে কাজে নিতে হবে'—এই নতুন দাবি এবং আগেকার দাবিগুলির আওয়াজ তুলে শ্রমিকরা ২৪ ঘন্টার নোটিস দিল।

২৩ শে মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু হল। থানা থেকে দারোগা পুলিস এল। মধু, রাসমোহন, ঠাকুরা, শক্রয়, বিশু, টুপু সমেত আট জনকে গ্রেপ্তার করল। এদিকে খবর পেয়ে ঝাঁটা হাতে মেয়েরা হাজির, মরদেরা লাঠি হাতে।

দারোগা ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'কেউ জামিন হও, সবাইকে ছেড়ে দেব।' মেয়েরা বলে—'জামিন হবে কেনে? কি দোষ করিছে।'

দারোগার মান বাঁচানোর জন্যে বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এগিয়ে এসে বলল 'আমি জামিন হলাম।'

শ্রমিকরা গরবাজি। তারা বলে—'তুমি কেনে হবে, তোমাকে কে পুছে?'

নিরুপায় দারোগা সবাইকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথ দেখে।

ছেলের দল নতুন আওয়াজ বানায়—'জামিন রেখে লজ্জা নাই।'

দীর্ঘদিন হরতাল চলে। মেয়ে মরদের মিলিত মিছিলে মাটি নড়ে; মিলিত আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। আবার দারোগা আসে, আবার ধমকায়; কিন্তু সংঘবদ্ধ শ্রমিকের নীরব দৃঢ়তার সামনে হটে যেতে বাধ্য হয়।

এরই মধ্যে এগিয়ে আসে চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল রাঙাপানিতেই। ধর্মঘটী বুভুক্ষু শ্রমিকেরা শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ ক'রে সম্মেলনকে সার্থক ক'রে তোলে; পথ দেখায় আশেপাশের গ্রামগুলিকে।

সম্মেলনের কিছুদিন পরে ৩০শে এপ্রিল দারোগার সঙ্গে কিছু শ্রমিকের কোনো কারণে বাদানুবাদ হয়। দারোগা রেগে গিয়ে বলেন, 'তোদের আমি গুলি করবো। দেখি কোন্ ব্যাটা আটকায়?'

মেয়েরা দারোগার জিপের সামনে শুয়ে পড়ে দাবি জানায়, 'গুলি করো, গুলি না ক'রে যেতে পাবে না।'

দারোগা সেদিন ক্ষমা চেয়ে ছাড়া পায়।

শুকচাঁদের বউ সূর্যমণি, ঘরে যার চার চারটে বালবাচ্চা, সে এ দলের নেতৃত্ব করেছিল। নিঃস্বতা তাদের মেরুদণ্ড টান টান ক'রে রেখেছে। তাদের হারাবার ভয় নেই, পিছোবার জায়গা নেই।

৩ রা মে এস. ডি. ও, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং কমলতরু সেনগুপ্ত—এদের সামনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কথা দিলেন—

Abala
1754

১। বিশুকে কাজে নেওয়া হবে ;
২। প্রতি শ্রমিককে সপ্তায় এক আড়ি ক'রে ধান দেয়া হবে ;
৩। বাগান থেকে মিলিটারি এবং গুণ্ডা সরানো হবে
৪। সাজানো মামলা প্রত্যাহার করা হবে ;
৫। তলব পুরুষ পাবে বারো আনা, নারী দশ আনা ;
৬। প্রসূতি ভাতা রোজ আট আনা ক'রে ৮ সপ্তাহ দেয়া হবে।
এ ছাড়া আরও কিছু ছোটখাট দাবি মানা হল।
বিজয়ী শ্রমিকেরা ঝাণ্ডা উঁচিয়ে মিছিল ক'রে কাজে ফিরে গেল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদিন বাংলোয় দাঁড়িয়ে বিশুকে কিছু বলছিলেন। এমন সময় দেখা গেল দূর বস্তি থেকে সারি বেঁধে মেয়েরা আসছে। কণ্ঠে আওয়াজ—'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আঁতকে উঠে বললেন, 'দেখো বিশু দেখো, ওরা ধ্বনি দিচ্ছে।' বিশু বলল, 'তাতে কী হয়েছে, ওরা ত আনন্দ করছে!'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'এ কি আনন্দের কথা হল বিশু, ধ্বনি শুনলে আমার যে বুক কাঁপে।'

আরেক দিনের কথা। রাসমোহনের স্ত্রী পদ্মাবতী কোলের ছেলেটিকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে মালবাছাইয়ের কাজে যেত। সেখানে ছেলেটি আরও দুয়েকজন সমবয়সীর সাথে জুটে আওয়াজ তুলল, 'ম্যানেজারের জুলুম বন্ধ করো।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিষম বিব্রত হয়ে কিছু বিস্কুট এনে তার হাতে দিয়ে তাকে চুপ করাতে চাইলেন। বোকা ছেলে ভাবল—এ তার কেরানতির পুরস্কার। সে দ্বিগুণ জোরে ধ্বনি দিতে লাগল। নিরুপায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ্মাবতীকে ভিন্ন কাজে পাঠিয়ে এই শ্রুতিকটু আওয়াজের হাত থেকে রেহাই পেলেন।

দুয়েক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোনাব্যাঙগুলো নতুন জলের ছোঁয়া পেয়ে মাঠে ঘাটে তীব্র কোলাহল শুরু করেছে। ছেলেদের একজন নতুন আওয়াজ বাঁধল, 'ভাওয়া ব্যাঙ (সোনা ব্যাঙ) পুকুর ছাড়ো. পুকুর ছাড়ো।' বিশুর সাত বছরের ছেলে বসু বলে, 'ভাওয়া ব্যাঙ হল ম্যানেজার ; পুকুর মানে বাগান।'

কোম্পানি যে সব শর্তে আপস করেছিল তার অনেকটাই কাজে পরিণত করে নি। তলব এখনও আগের নিয়মেই। মিলিটারি বাগানেই আছে। মিথ্যে মামলা যাদের নামে আছে—তাদের নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সেদিনের মিছিলের আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠেছে মাটির আওয়াজ এখনও শোনে নি।

ফেব্রুয়ারি আগের দিন দুখীরামের উঁচু ভিটের আমাদের জটলা। দুখীরাম, গঙ্গা, বিভূতি দাস, নগেন দে, শুকচাঁদ, বিশু এবং আরও অনেকে জড়ো হয়েছি। সম্মুখে বড় বড় গাছগুলি অনড় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে। দূরের আকাশ ধীরে ধীরে ধূসর

হয়ে আসছে। হঠাৎ শুনি মিলিত আওয়াজ। দুঃখীরামের নাতি-নাতনির দল সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে আওয়াজ তুলেছে—'ইংলাজ, ভালত ছালো।'

গঙ্গা বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই শ্যামলাল।' দুঃখীরাম মৃদু হেসে বলল, 'শ্যামলাল নয় রে, শ্যামলাল নয়। এ হল মাটির ডাক, মাটি আজ কথা কয়। মাটির ডাকে লড়াইয়ের কথা ভুলতে পারি না কমরেড, এই ফুলেরা আমাদের রেখেক

২৫ শে মে, ১৯৪৭। চট্টগ্রাম।

Puran, 17.5.47

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবলম্বনে

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

দেবী

সত্যজিৎ রায়

অবোরার নিবেদন (১৯৫৮)

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়
মূল কাহিনী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ

আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র
শিল্প-নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা দুলাল দত্ত
শব্দগ্রহণ দুর্গাদাস মিত্র
ব্যবস্থাপনা অনিল চৌধুরী

ভূমিকালিপি

বিশ্বম্ভর রায় : কীর্তিপুরের জমিদার (ছবি বিশ্বাস)
মহামায়া : বিশ্বম্ভরের স্ত্রী (পদ্মা দেবী)
বীরেশ্বর বিশ্বম্ভরের পুত্র (পিনাকী সেনগুপ্ত)
মহিম গাঙ্গুলী ধনী ব্যবসায়ী (পঞ্চানন বসু)
তারাপ্রসন্ন : জমিদার বাড়ির নায়েব (তুলসী লাহিড়ী)
অনন্ত জমিদারের খানসামা (কালী সরকার)
দুর্গাবাঈ আখতারী বাঈ [ফৈজাবাদী]
কৃষ্ণা বাঈ : নৃত্যশিল্পী (রোশনকুমারী)
ওস্তাদ গাইয়ে (প্রতাপ মুখোপাধ্যায়)
সুরবাহার বাদক : ওস্তাদ (ওয়াহেদ খাঁ)

এবং

লালামাত খাঁ বিসমিল্লা খাঁ ওয়াহেদ খাঁ লড্ডন খাঁ
দক্ষিণামোহন ঠাকুর ও অন্যান্য

অবোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রা. লি. পরিবেশিত

ছবির দৈর্ঘ্য ৯১১৭ ফুট

১

পুরনো জমিদার বাড়ির ঝাড়বাতি দুলছে। ঝাড়বাতিটা ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসে। তার উপর ছবির টাইটেল পড়ে। টাইটেল শেষ হলে পর ছবি শুরু হয়।

ভোর। রায়বাড়ির ছাদ।
ছাদে চেয়ারে একাকী বসে আছেন জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। ছাদের ঘরের দরজা দিয়ে গড়গড়া হাতে ঢোকে খানসামা অনন্ত। বিশ্বম্ভরের পাশেই গড়গড়াটিকে মাটিতে রেখে নলটা মনিবের দিকে এগিয়ে দেয়।

অনন্ত হুজুর। হুজুর।

বিশ্বম্ভর হাত বাড়িয়ে নলটি নিলে অনন্ত ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বিশ্বম্ভরের 'অনন্ত' ডাক শুনে সে দাঁড়িয়ে যায়।

অনন্ত হুজুর।
বিশ্বম্ভর এটা কি মাস রে?
অনন্ত ফাগুন মাস, হুজুর।
বিশ্বম্ভর বসন্তকাল?
অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। মুচকুন্দ ফুটেছে, আপনার সরবতে দেব, হুজুর?

বিশ্বম্ভর কথার উত্তর দেন না। মুখ ঘুরিয়ে নেন অন্যদিকে। অনন্তর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে আবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।
বিশ্বম্ভর চেয়ারে বসা অবস্থায় গড়গড়া টানতে থাকেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পান দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর। উৎকর্ণ হয়ে সানাই শুনতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। চারদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কোত্থেকে আসছে সানাইয়ের সুর। বুঝতে না পেরে ছাদের কার্নিশের কাছ থেকে নিচে উঠোনের দিকে তাকিয়ে ডাকেন—

বিশ্বম্ভর অনন্ত।

অনন্ত নিচের উঠোন দিয়ে যেতে যেতে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে গিয়ে উপরের দিকে তাকায়।

অনন্ত হুজুর!
বিশ্বম্ভর সানাই বাজছে কোথায়?
অনন্ত গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়িতে, হুজুর।
বিশ্বম্ভর কোথায়?
অনন্ত গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়িতে, হুজুর।
বিশ্বম্ভর নায়েবকে পাঠিয়ে দে।
অনন্ত যে আজ্ঞে হুজুর।

অনন্ত নায়েবকে ডাকতে চলে যায়।

বিশ্বম্ভর ছাদে পায়চারি করতে থাকেন।

নায়েব তারাপ্রসন্ন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। অনন্ত তাঁকে ডেকে তোলে।

অনন্ত শেসন্নবাবু, শেসন্নবাবু। রায় হুজুর ডাকছেন।

অনন্তর ডাকে চমকে উঠে পড়েন তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন অ্যাঁ, কে?
অনন্ত রায় হুজুর ছাতে রয়েছেন। যান যান যান—

ছাদ। তারাপ্রসন্ন আসেন।

বিশ্বম্ভর মহিমের বাড়ি সানাই বাজছে কেন?
তারাপ্রসন্ন ওর ছেলের উপনয়ন, হুজুর।
বিশ্বম্ভর বন্দে আলীর সানাই, না?
তারাপ্রসন্ন হ্যাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে?
তারাপ্রসন্ন করেছে।
বিশ্বম্ভর নিজে এসেছিল?
তারাপ্রসন্ন না, হুজুর। চিঠি পাঠিয়েছে।
বিশ্বম্ভর ও।
তারাপ্রসন্ন আপনি কি যাবেন?

বিশ্বম্ভর আমি যাই কোথাও ?
তারাপ্রসন্ন না, হুজুর।
বিশ্বম্ভর তবে ?

তারাপ্রসন্ন একমুহূর্ত বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে চলে যান। অনন্ত সরবত নিয়ে আসে।

অনন্ত সরবত এনেছি, হুজুর।
বিশ্বম্ভর রেখে যা।

বিশ্বম্ভর মুখ ঘুরিয়ে নহবৎখানার দিকে তাকান। নহবৎখানা সামনে, দূরে দেখা যায় গঙ্গার চর। কিছুক্ষণের জন্যে নহবৎখানার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি, পরে মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়েন।
বিশ্বম্ভরকে চিন্তিত দেখায়। তাঁর গালে হাত। কি যেন ভাবছেন তিনি।

বিশ্বম্ভর (স্বগত উ-প-ন-য়-ন !

মনে পড়ে যায় তাঁর নিজের ছেলের উপনয়নের কথা।

ফ্ল্যাশ ব্যাক।

নহবৎখানায় সানাইবাদক সানাই বাজাচ্ছে। নহবৎখানার ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যায় গঙ্গার চর। দূর থেকে বিশ্বম্ভরকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকে এসে দাঁড়ালেন মূল বাড়ির সামনে। পিছনে সহিসকে ছুটে আসতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর ঘোড়ার পিঠে আদরের চাপড় মেরে কটক দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে যান। তাঁর পরনে জমিদারি পোশাক, মাথায় পাগড়ি।

রান্নবাড়ির ভিতরের বারান্দা।
উপনয়ন উপলক্ষে বাড়ি সাজানো হচ্ছে। একজনকে দেখা যায় দেওয়ালগিরির চিমনি লাগাতে।
বিশ্বম্ভর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুত এগিয়ে আসেন। পিছনে সেরেস্তা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তারাপ্রসন্ন। তাঁর হাতে চিঠি। বিশ্বম্ভরের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি ডাক দেন।

তারাপ্রসন্ন হুজুর !

বিশ্বম্ভর ততক্ষণে দোতলায় যাবার সিঁড়ির দিকে উঠতে আরম্ভ করেছেন। তারাপ্রসন্নর ডাক তাঁর কানে যায় না। তারাপ্রসন্ন এগিয়ে এসে আবার ডাকেন।

তারাপ্রসন্ন হুজুর!

বিশ্বম্ভর থামেন। কয়েক ধাপ উঠে আসেন তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন ব্যাংক থেকে চিঠি এসেছে, হুজুর।
বিশ্বম্ভর কি লিখেছে?
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে—!

তারাপ্রসন্নর মধ্যে একটু ইতস্তত ভাব দেখা যায়।

তারাপ্রসন্ন লিখছে—With reference to your proposal for further loan against the security already pledged by you with us, the Board of Directors regrets…
বিশ্বম্ভর দেবে না।
তারাপ্রসন্ন না, হুজুর। লিখছে—the cover has already exceeded the margin limit set forth under the Banking Rules…

বিশ্বম্ভর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন।

তারাপ্রসন্ন হুজুর, মহিম এসেছে, একবার দেখা করবেন?

বিশ্বম্ভর ভ্রুকুটি ক'রে মহিমকে মনে করার চেষ্টা করেন।

বিশ্বম্ভর মহিম—?
তারাপ্রসন্ন জনার্দন গাঙ্গুলীর ছেলে, হুজুর।
বিশ্বম্ভর হুঁ। সে সুধখোরের ব্যাটা আবার কেন?

বিশ্বম্ভর কথাটা বলেই আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন। তারাপ্রসন্ন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে, সামনের চরটা ইজারা নিতে চায়, হুজুর। বালির ব্যবসা করবে।

কথা শুনে বিশ্বম্ভর আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

বিশ্বম্ভর জনার্দন গাঙ্গুলীর ছেলে?
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। পয়সা করেছে, হুজুর। সদরে ব্যবসা

আছে, গাঁয়ে বাড়ি তুলছে।

বিশ্বম্ভর বটে?

তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে, একবার কথা বলবেন হুজুর? নইলে তহবিলে যা আছে তাতে অনুষ্ঠানের ব্যয় সংকুলান—

বিশ্বম্ভর আচ্ছা, তাকে পাঠিয়ে দাও। আমি জলসাঘরে আছি।

তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে।

তারাপ্রসন্ন নেমে যান। বিশ্বম্ভর উঠতে থাকেন।

জলসাঘর।

দরজা দিয়ে ঢুকে এগিয়ে আসেন বিশ্বম্ভর। আসবাবপত্র ছড়ানো। জলসাঘর পরিষ্কার করা হচ্ছে। কর্মরত লোকগুলোর দিকে তিনি তাকালেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি দেখা যায়। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বিশ্বম্ভর এগিয়ে যান বড় ঝাড়বাতিটার দিকে। ঝাড়বাতিটাকে কয়েকজন লোক পরিষ্কার করছে। হাসিমুখে তিনি দেয়ালে টাঙানো তাঁর পূর্বপুরুষের ছবিগুলোর দিকে দেখেন। তারপর এগিয়ে যান প্রকাণ্ড আয়নার দিকে। এবার আয়নার দিকে আরো একটু এগিয়ে গেলেন। পাশ ফিরে পেটে হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর উদর স্ফীত হয়েছে কিনা। কিছুক্ষণ আয়নায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আয়নায় অনন্তকে সরবত আনতে দেখা যায়। দেখা যায় তারাপ্রসন্নকেও, মহিমকে সঙ্গে নিয়ে আসতে।

বিশ্বম্ভর এসো।

মহিম এগিয়ে এসে বিশ্বম্ভরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

অনন্ত এই সময় বিশ্বম্ভরের হাতে দেয় সরবতের গ্লাস। এবং ছুটে গিয়ে ছোট টেবিলটা নিয়ে আসে। বিশ্বম্ভর সরবতে চুমুক দেন।

বিশ্বম্ভর জনার্দন গাঙ্গুলীর ছেলে তুমি?

মহিম আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিম উত্তর দেয় বিনীতভাবে।

বিশ্বম্ভর সরবতে কি দিয়েছিল যে?

অনন্ত আজ্ঞে, মুচকন্দ ফুলের গোটাকতক পাপড়ি মেড়ে দিইচি।

বিশ্বম্ভর অ। বেশ হয়েছে।

অনন্ত খুশি হয়ে চলে যায়।

বিশ্বম্ভর বাপের বাকলা ধরেছ ?

মহিম বিনয়ে গলে পড়ে।

মহিম হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—
বিশ্বম্ভর সুদ নাও কত ?

মহিমের থতমত ভাব।

মহিম আজ্ঞে—
বিশ্বম্ভর রায়বাড়ির এলাকায় মহাজনী করতে হলে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, জানো বোধ হয়।

আয়নার ভেতর দিয়ে দেখা যায় তারাপ্রসন্ন দাঁড়িয়ে আছেন।

মহিম আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ
বিশ্বম্ভর মাসে শতকরা এক টাকার বেশি সুদ নেই। বাকি খাজনায় সুদ নেই। খাজনার তামাদি নেই। নালিশ নেই, জানো বোধ হয়।
মহিম আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। হুজুরের খেয়েই ত মানুষ।
বিশ্বম্ভর অ্যাদ্দিন দেখি নি যে ?
মহিম পশ্চিমে ছিলুম—প্রায় বিশ বছর। এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ—
বিশ্বম্ভর অ !

সরবতে চুমুক দেন বিশ্বম্ভর।

মহিম গান বাজনার শখ আমারো একটু আধটু আছে। পশ্চিমে থাকতে আমিও অনেক শুনেছি। দরকার হলে তবলার ঠেকা-টেকা একটু আধটু—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ

বিশ্বম্ভর সরবৎ শেষ ক'রে গ্লাসটা টেবিলে রেখে উঠে পড়েন।

বিশ্বম্ভর তুমি তাহলে এসো।
মহিম আসবো ?

বিশ্বম্ভর এগিয়ে যান, তাঁর পিছনে পিছনে আসেন তারাপ্রসন্ন।

বিশ্বম্ভর দুর্গাবাঈ আসছেন ?

তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

বিশ্বম্ভর নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে?

তারাপ্রসন্ন সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বিশ্বম্ভর মহিমকেও বলে দিও।

তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে। কিন্তু—

বিশ্বম্ভর সুদখোরের টাকায় আমার একমাত্র ছেলের উপনয়ন হতে পারে না, তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন কিন্তু সে ছাড়া যে—

বিশ্বম্ভর উপায় আছে। সিন্দুকে আগের আমলের রায় গিন্নিদের গহনা আছে।

বিশ্বম্ভর চলে যান। তারাপ্রসন্ন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

২

নহবৎখানায় সানাই বাজছে।

নাটমন্দির।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। বিশ্বম্ভর আর তাঁর পুত্র বীরেশ্বর পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করেন।

পুরোহিত আচার্য দেবতা আমন্ত্রণে বিনিয়োগ ভো অধি ভো সাবিত্রে—

রাত।

রায়বাড়িতে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। আকাশে নানা ধরনের বাজির সমারোহ। বাজির ফুলকিগুলো উপরদিকে উঠে ছিটকে পড়ছে।

বিশ্বম্ভর ও জনৈক আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বাজি পোড়ানো দেখতে দেখা যায়। তাঁরা আনন্দে হাত তালি দেন।

আলোকসজ্জিত রায়বাড়ির সামনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। ব্যাণ্ডপার্টি বাজনা বাজাচ্ছে। ব্যাণ্ডে দেশাত্মবোধক সংগীতের সুর।

দোতলার বারান্দায় লোকের ভিড়।

আলোক সজ্জিত রায়বাড়ির দোতলার বারান্দা ফাঁকা। লোক নেই নিচেও।

দুর্গাবাঈয়ের গান ভেসে আসে।

জলসাঘরে ঝুলছে ঝাড়বাতি।
নিচে ফরাসপাতা মেঝেতে বসে দুর্গাবাঈ গাইছেন. আয়না দিয়ে দেখা যায়। বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য অতিথিরা তাঁর গান শুনছেন তন্ময় হয়ে। পিলু রাগে ঠুংরি গাইছেন দুর্গাবাঈ—

ভর ভর আঈঁ মেরি আঁখিয়া পিয়া বিন
ঘিরি ঘিরি আঈ কারি বদরিয়া,

বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য অতিথিরা তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। দুর্গাবাঈ গেয়ে চলেছেন—

ক্যাসে কহু মিঠি বাতিয়াঁ।
সজিয়া সুনি রয়ন আঁধেরি,
ধড়কন লাগি মোরি ছাতিয়াঁ॥

বিশ্বম্ভরের শোবার ঘর।
বড় টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। খাটে বসে সেলাই করছেন বিশ্বম্ভরের স্ত্রী মহামায়া। তাঁর চোখে জল। দূর থেকে ভেসে আসে ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ। বিশ্বম্ভরকে বারান্দা দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন খাটের অন্যদিকে। তাঁর হাতে জড়ানো রয়েছে মালা। বিশ্বম্ভরের আসার শব্দ পেয়ে মহামায়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলেন। সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে তিনি উঠে চলে যান। বিশ্বম্ভর তাঁর দিকে তাকালেন।

বিশ্বম্ভর কী হলো? অভিমান?

বিশ্বম্ভর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বিছানার উপর বসে পড়েন।

বিশ্বম্ভর সব ত শেষ হয়ে গেছে, গিন্নি।

মহামায়া আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান।
আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব। তিনি বিশ্বম্ভরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকান।

মহামায়া আমার গয়নাগুলো আছে এখনো?
বিশ্বম্ভর গহনা? ও হো-হো-হো-হো। সে ত বাঁধা দিয়েছি. ছাড়াতে কতক্ষণ?

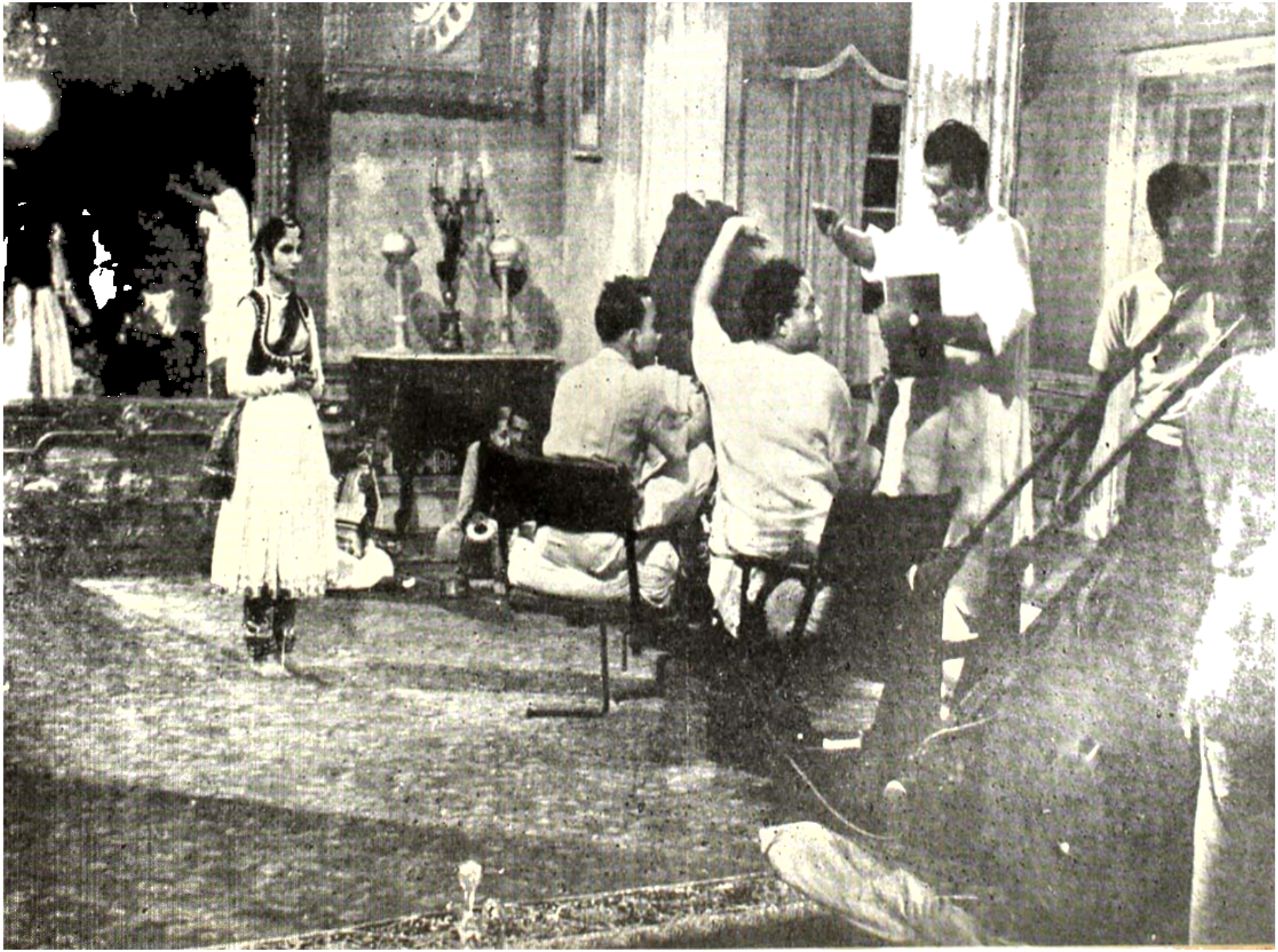

আয়নার সামনেই মহামায়া দাঁড়িয়ে আছেন।

মহামায়া কি ক'রে বলছ তুমি? এবারে কত খরচ হয়েছে তার হিসেব আছে?

বিশ্বম্ভর খরচ! তা খরচ করবো না গিন্নি? খোকা আমার একমাত্র বংশধর, শিবরাত্রির শলতে! তার উপনয়নে খরচ করবো না—কী বলছো গিন্নি? নইলে যে মান থাকে না।

মহামায়া তাই বলে গয়না বাঁধা দিয়ে বাঈজী?

মহামায়া রাগ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নেন আয়নার দিকে।
বিশ্বম্ভরের চোখে অস্বস্তি ভাব, তিনি চোখ দু'টো রগড়ে নেন।

বিশ্বম্ভর এই বাঈজী সেই বাঈজী নয় গিন্নি! এর রূপ, এর গানে! আঃ, তুমি যদি শুনতে ও বুঝতে—?

মহামায়া আমার শুনে কাজ নেই।

মহামায়া রাগ ক'রে আয়নার কাছ থেকে সরে যান।

বিশ্বম্ভর 'ভর ভর আঁখি মেরি আঁখিয়া'—হায়-হায়-হায়!

বিশ্বম্ভর মুখ ঘুরিয়ে মহামায়ার দিকে তাকালেন।

বিশ্বম্ভর যাচ্ছ কোথায়?

মহামায়া দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ান।

মহামায়া তিনটে বেজে গেছে। আমি খোকার কাছে শোব।

বিশ্বম্ভর শোনো না!

মহামায়া কী, বলো।

বিশ্বম্ভর হাত থেকে ফুলের মালাটা খুলে মহামায়ার হাতে দেন।

বিশ্বম্ভর কিসের ভাবনা এত?

মহামায়া জলসাঘরটা বন্ধ ক'রে দাও।

বিশ্বম্ভর কেন? গান শুনবো না?

মহামায়া ওই তোমার এক সর্বনেশে নেশা। খোকাও তোমার সব গুণগুলো পেয়েছে। পড়াশোনার নাম নেই, গান গান ক'রে পাগল। আবার ক'দিন ধরে আবদার ধরেছে ঘোড়ায় চড়বে।

বিশ্বম্ভর সে ত ভালো কথা গিন্নি। তুফানের পিঠে সওয়ার হবে, মন্দ

পিঠে চড়ে মৃগয়ায় যাবে—এই না হলে যায় বংশের জমিদার— ?

মহামায়া জমিদার ? জমিদারের আর আছে কী ? সব ত ভেসে গেছে ।

বিশ্বম্ভর মহামায়ার দিকে তাকান ।

মহামায়া নদী কি রকম এগিয়ে আসছে দেখছো না ? অমন সুন্দর বাগানটা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ।

বিশ্বম্ভর বন্যা ?

মহামায়া ভুলে গেছো ?

বিশ্বম্ভর বিছানায় শোয়া । তাঁর চোখ আধবোজা ।

বিশ্বম্ভর রায়বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলাম, হাজার লোক আশ্রয় পেয়েছিল । আমার পুণ্যের বোঝাও কিছু কম নয় গিন্নি ।

মহামায়া জানি, তবু ভয় করে—কাল যা দুঃস্বপ্ন দেখেছি—

বিশ্বম্ভর আর আমি কি দেখেছি জানো ? —দেবরাজ ইন্দ্রের জলসাঘরে মাইফেল হচ্ছে—রম্ভা গাইছে, উর্বশী নাচছে, আর মেনকা—মেনকা—

কথা শেষ হয় না, বিশ্বম্ভর ঘুমিয়ে পড়েন ।
মহামায়া কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান ।

৩

বীরেশ্বর ঘোড়ায় চড়া শিখছে । ঘোড়ার পিঠে বীরেশ্বর, তার গায়ে জরির কাজ করা পাঞ্জাবি, মাথায় জরির টুপি । সহিস লাগাম ধরে ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে ।
বীরেশ্বর ঘোড়ার পিঠে, লাগাম ধরে সহিস, এবারে ঘোড়ার চলার ছন্দ একটু দ্রুত ।
নদীতে হাতিকে স্নান করাচ্ছে মাহুত । বীরেশ্বর হাসিমুখে হাতির স্নান করানো দেখছে ।
হাতি স্নান করতে করতে শুঁড় দিয়ে জল ছুঁড়ে দেয় । বীরেশ্বর তাই দেখে মজা পায়, তার মুখে হাসি ।
বীরেশ্বর আর মাহুতকে দেখা যায় হাতির পিঠে চড়ে নদীর চর দিয়ে যেতে ।

দূরে রায়বাড়ি।

বিশম্ভর চেয়ারে বসে, তাঁর হাতে গড়গড়ার নল। বিশম্ভরের প্রতিকৃতি আঁকছেন এক চিত্রকর। পাশে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা দেখছে বীরেশ্বর।

বিশম্ভরের শোবার ঘর।
বিশম্ভর এস্রাজ বাজাচ্ছেন। বিছানায় বসে বীরেশ্বর ঝিঁঝিট রাগে স-র-গ-ম সাধছেন। তাঁর সামনে খোলা রয়েছে গানের খাতা।
মহামায়া ঘরে ঢুকে খাটের পাশে এসে দাঁড়ান। হাসিমুখে ছেলের গান শুনতে থাকেন।
বীরেশ্বরের গান সাধা শেষ হয়।
মহামায়া বীরেশ্বরের দিকে এগিয়ে আসেন।

মহামায়া খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়। অনেক রাত হয়েছে, শুতে যা।

বীরেশ্বর হাই তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

মহামায়া একি শুয়ে পড়লি যে? ওঠ! ওঠ-ওঠ, উঠে পড়—যা—
বীরেশ্বর না—। মা, আমরা নারায়ণপুর যাবো না?
মহামায়া সে হবে 'খন। তুই এখন যা ত।

বীরেশ্বর খাট থেকে নেমে দরজার কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে এসে বিছানা থেকে গানের খাতাটা নিয়ে চলে যায়।

বিশম্ভর কোথায় যাবে?
মহামায়া মা চিঠি দিয়েছেন—
বিশম্ভর অ—। নারায়ণপুর।
মহামায়া বাবার খুব অসুখ। মা যেতে লিখেছেন।

বিশম্ভর একটা পান মুখে দিয়ে চিবোতে থাকেন।

বিশম্ভর তা বেশ ত, যাও না।
মহামায়া ভাবছি খোকাকেও নিয়ে যাবো।
বিশম্ভর যেও।
মহামায়া তুমিও যাবে।
বিশম্ভর আমি, কেন?

মহামায়া তোমায় একা ফেলে রেখে যেতে ভয় করে। কখন যে কি ক'রে বসবে তার ঠিক নেই!

বিশ্বম্ভর স্ত্রীর কথা শুনে হেসে ফেলেন। তিনি এপ্রাজের ছড়টা তুলে নিয়ে বাজনা লাগাতে থাকেন।

মহামায়া সত্যি বলছি, চলো না গো! তোমার ত হাতে এখন কোনো কাজ নেই, চলো—

বিশ্বম্ভর কি যে বলছ গিন্নি, জমিদারি সামলাবে কে?

মহামায়া কি—?

বিশ্বম্ভরের কথা শুনে হেসে ফেলেন মহামায়া।

মহামায়া কি বললে, তুমি সামলাবে জমিদারি? ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, চলো না গো! চলো—। বল না, যাবে?

বিশ্বম্ভর ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানান।

মহামায়া বেশ! তা হলে আমি খোকাকে নিয়ে চলে যাই, কি বলো? যাবো?

বিশ্বম্ভর এপ্রাজটা হাতে তুলে নেন।

বিশ্বম্ভর সে কথা পরে হবে। এখন রসভঙ্গ কোরো না।

মহামায়া উঁ, চঙ দেখে আর বাঁচি না।

মহামায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যান।
বিশ্বম্ভর আবার এপ্রাজে স-ম-গ-ম তুলতে শুরু করেন।

কুলিদের মাথায় বাক্স, বিছানা প্রভৃতি সরঞ্জাম তোলা হচ্ছে।
বিশ্বম্ভরকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।
বীরেশ্বর ঘরে ঢোকে। তার হাতে চাবুক। সে ঘরে ঢুকে বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করে।

বিশ্বম্ভর বাবা—

বিশ্বম্ভর আয়!

বীরেশ্বর যাচ্ছি—

বিশ্বম্ভর যাচ্ছি বলতে নেই, বলতে হয় আসি।

বীরেশ্বর ছুটে চলে যায়।
বিশ্বম্ভর ছেলেকে উদ্দেশ ক'রে চেঁচিয়ে বলেন—

বিশ্বম্ভর লক্ষ্মী হয়ে থেকো, দুষ্টুমি কোরো না।

বীরেশ্বর বারান্দা দিয়ে ছুটে চলে যায়।
মহামায়াকে আসতে দেখা যায়। কাছে এসে তিনি বিশ্বম্ভরকে প্রণাম ক'রে স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকান।

মহামায়া আসি?
বিশ্বম্ভর এসো।

মহামায়া দরজার কাছাকাছি গিয়ে আবার বিশ্বম্ভরের কাছে ফিরে আসেন।

মহামায়া দুষ্টুমি কোরো না।

বিশ্বম্ভরের মুখে মৃদু হাসি।

চরের রাস্তা।
পাইক পেয়াদা নিয়ে মহামায়ার পাল্কি চলেছে।
বীরেশ্বরকে দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে ক'রে পাল্কির পিছনে পিছনে যেতে।
বিশ্বম্ভর বাড়ি থেকে তাঁদের যাওয়া দেখছেন।

৪

রায়বাড়ি। সময় সন্ধে।
শোনা যায় সুরবাহারের আওয়াজ।
রায়বাড়ির দোতলার বারান্দা।
ওস্তাদজী সুরবাহার বাজাচ্ছেন।
সামান্য দূরে বসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্বম্ভর তন্ময় হয়ে বাজনা শুনছেন।
তাঁর হাতে গড়গড়ার নল।
ওস্তাদজীকে সুরবাহার বাজাতে দেখা যায়।

গড়গড়া টানতে টানতে বাজনা শুনছেন বিশ্বম্ভর। একবার মুখ তুলে ওস্তাদজীর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে তৃপ্তির আভাস।

বিশ্বম্ভর আহা।

হঠাৎই কোনো কিছুর আওয়াজ শুনে বিরক্ত হন বিশ্বম্ভর। ডাক দেন তিনি।

বিশ্বম্ভর অনন্ত?

বাজনা বন্ধ ক'রে দেন ওস্তাদজী। হাত তুলে কুর্নিশ করেন বিশ্বম্ভরকে।
পর্দা সরিয়ে অনন্ত ঘোরে ঢোকে।

বিশ্বম্ভর কিসের আওয়াজ হচ্ছে দেখ ত?
অনন্ত ইলেকট্রিকের কল বসিয়েছে, হুজুর।
বিশ্বম্ভর ইলেকট্রিকের কল?
অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর কে বসিয়েছে? কোথায়?
অনন্ত গাঙ্গুলীবাবুদের নতুন বাড়িতে, হুজুর। ছাদে উঠলে আলোর রোশনি দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর মহিমের বাড়ি?
অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

উত্তর শুনে গম্ভীর হয়ে যান বিশ্বম্ভর। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি। গড়গড়ার নলটা তুলে মুখে দেন তিনি।
ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসে।

অনন্ত আবার শুনছি, কোলকাতার সাহেবদের দোকান থেকে তেনার সব আসবাব পত্তর আসছে।

ওস্তাদজী বাজনা থামিয়ে বসে ছিলেন।

ওস্তাদজী হুজুর কো হুকুম হো ত বাজাউঁ, ইয়া বাস করু?

বিশ্বম্ভর চেয়ার থেকে উঠে চলে যান।
ডায়নামোর শব্দটা আরো জোরে শোনা যায়।

রায়বাড়ির ছাদ। সময় সন্ধে।
দূর থেকে ভেসে আসছে ডায়নামোর শব্দ।

ছাদের ছোট ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় বিশ্বম্ভরকে। আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে সেটা জানতে তিনি এগিয়ে যান ছাদের রেলিংয়ের ধারে।
বিশ্বম্ভর বুঝতে পারেন আওয়াজটা আসছে মহিমের বাড়ি থেকে।
দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মহিমের বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি।
বিশ্বম্ভরের চোখে ভ্রূকুটি। মুখ ঘুরিয়ে তিনি নিজের বাড়ির বারান্দার দিকে চোখ রাখলেন। দেখা যায় অনন্তকে বাতি হাতে দোতলার বারান্দা দিয়ে চলে যেতে। বিশ্বম্ভর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

চরের রাস্তা দিয়ে পরপর চারখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গাড়িতে আসবাবপত্র বোঝাই। দূরে দেখা যায় রায়বাড়ি।

বিশ্বম্ভর দোতলার বারান্দা থেকে গরুর গাড়িগুলোকে দেখছেন।
মহিমের বাড়িতে বাতি পোড়ানো হচ্ছে। আকাশে বাতির ফুল্‌কিগুলো নিচের দিকে মুখ ক'রে ছিটকে পড়ে।

বিশ্বম্ভর শোবার ঘরের জানলা থেকে বাতি পোড়ানো দেখছেন। জানলা থেকে সরে এসে তাঁকে টেবিলের সামনে দাঁড়াতে দেখা যায়। এতক্ষণে বোঝা যায় ঘরে অনন্তও আছে, সে বিছানা করছে। বিশ্বম্ভর টেবিল থেকে মদের গ্লাসটা হাতে তুলে নেন।

বিশ্বম্ভর গাঙ্গুলীদের নতুন বাড়ি তুই দেখেছিস নাকি রে?
অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর কেমন দেখলি? কেমন বাড়ি?
অনন্ত হাল ফ্যাশানের বাড়ি, হুজুর। আমাদের রাজবাড়ির মতো শোভা নেই। নহবৎখানা নেই, ফোয়ারা নেই, বাগান নেই, নাটমন্দির নেই—এই যেমন ধারা হয় আর কি।

বিশ্বম্ভর মদের গ্লাস হাতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে চলে আসেন ঘরের মধ্যে। ভেসে আসে ডায়নামোর শব্দ।

৫

জনৈক ঘোষক ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে—

ঘোষক আসছে সোমবার গাঙ্গুলীবাবুদের নতুন বাড়িতে কাঙালী ভোজন হবে—

বিশ্বম্ভর সেরেস্তায় বসে আছেন অন্যমনস্কভাবে।
দূর থেকে অস্পষ্ট ঢ্যাঁড়ার শব্দ ভেসে আসে।
শোনা যায় তারাপ্রসন্নর ডাক—'হুজুর।'
শুনে চমকে ওঠেন বিশ্বম্ভর।

তারাপ্রসন্ন মহিম একবার দেখা করতে এয়েছে—মহিম গাঙ্গুলী।
বিশ্বম্ভর নিয়ে এসো।

বিশ্বম্ভর প্যাঁসনে চশমাটা চোখে দিয়ে কাগজপত্র দেখতে থাকেন।
সেরেস্তার দরজা দিয়ে মহিমকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন তারাপ্রসন্ন। দূরে অফিসঘরে কয়েকজনকে কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় তক্তপোষের উপর বসে থাকতে।

বিশ্বম্ভর এসো হে মহিম।

মহিম এগিয়ে এসে প্রণাম করে বিশ্বম্ভরকে।

বিশ্বম্ভর থাক—থাক—।

মহিম প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে ইতস্তত ভাব।

মহিম একবার অনুগ্রহ ক'রে আমার ওখানে যে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে, হুজুর।

বিশ্বম্ভর কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজপত্র দেখায় মনোযোগী হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে তাকান।

বিশ্বম্ভর অ্যাঁ—?

মহিম বলছিলুম কি, আমার ওখানে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—

বিশ্বম্ভর কেন হে? কী ব্যাপার?

মহিম আপনাদের আশীর্বাদে একখানা বাড়ি করেছি। আগামী সোমবার পয়লা বৈশেখ গৃহপ্রবেশ—

বিশ্বম্ভর একটু ভেবে নিয়ে বলেন—

বিশ্বম্ভর পয়লা বৈশাখ—পয়লা বৈশাখ. আমার এই পুরনো বাড়িতেই যে উৎসব হে।

মহিম একটু অবাক হয়।

মহিম পয়লা?

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ, পুণ্যাহ।

মহিম পুণ্যাহ?

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ।

মহিম কই আমি ত—তেমন কিছু—

বিশ্বম্ভর তা তুমি যদি বলো, ত না হয় আমার কাজটা পেছিয়ে দিই—

বিশ্বম্ভর মহিমের দিকে তাকিয়ে গড়গড়ায় টান দিতে থাকেন।
মহিম কথাটা শুনে কি বলবে ভেবে পায় না।
দূর থেকে ঢ্যাঁড়ার আওয়াজ আর ঘোষণা ভেসে আসে।

বিশ্বম্ভর তাতে কি তোমার বিশেষ সুবিধা হবে?

মহিম না, না, এটা কি একটা কথা হোল! আপনি হলেন রাজা, আর আমরা—না, না, আপনার কাজ সকলের আগে।

বিশ্বম্ভর তা কি করা যায় বলো? আমার ত এদিকে সব ব্যবস্থা তৈরি।

কথাটা বলেই বিশ্বম্ভর তারাপ্রসন্নর দিকে তাকান। মহিম অবাক হয়ে তারাপ্রসন্ন ও বিশ্বম্ভরের দিকে দৃষ্টি দেয়।

মহিম আচ্ছা দেখি, আমি কি করতে পারি। তাহলে এখন আমি চলি।

মহিম বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করে।

বিশ্বম্ভর এসো এসো—থাক্।

মহিম দরজার দিকে পা বাড়ায়।

বিশ্বম্ভর চশমা খুলে মহিমের চলে যাওয়া লক্ষ করেন। পরে তারাপ্রসন্নর দিকে দেখেন।

বিশ্বম্ভর শুনলে ত—
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর গহনা আর আছে?
তারাপ্রসন্ন আর এক সিন্দুক আছে, হুজুর। এই শেষ!

বিশ্বম্ভর এতক্ষণ হেলান দিয়ে ছিলেন। তারাপ্রসন্নর কথা শুনে উঠে বসেন।

বিশ্বম্ভর শেষ?

বিশ্বম্ভর উঠে দাঁড়ান। তাঁর মাথার কাছে পূর্বপুরুষের ছবি।

বিশ্বম্ভর 'শেষ' কথাটা তুমি এত সহজে উচ্চারণ করলে কি ক'রে তারাপ্রসন্ন? শেষ নেই—

বিশ্বম্ভর দরজার দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে তারাপ্রসন্নর দিকে ঘুরে দাঁড়ান।

বিশ্বম্ভর সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেল, যেন কোনো কার্পণ্য না হয়।
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর আর সেই বুড়ো মুসলমান ওস্তাদ, কি নাম যেন? মুর্শিদাবাদে থাকেন—
তারাপ্রসন্ন উজীর খাঁ, হুজুর।
বিশ্বম্ভর হ্যাঁ, তাঁকে খবর দিয়ে আনাও। জলসা হবে।

বিশ্বম্ভর ঘুরে তাকালেন।
তারাপ্রসন্ন ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছেন উল্টোদিকে।

বিশ্বম্ভর আর শোনো—

তারাপ্রসন্ন ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়েন।

বিশ্বম্ভর নারায়ণপুরে লোক পাঠাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—যেন রানীমা আর খোকা পয়লা বৈশাখ সকালবেলায় এখানে এসে পৌঁছে যান। যাও।
তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে, হুজুর।

তারাপ্রসন্ন দরজার দিকে এগিয়ে যান।

বিশ্বম্ভর 'হাঃ হাঃ' ক'রে হাসতে হাসতে খাটের উপর বসে পড়েন। তাঁর হাসির শব্দের মধ্যেই শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ।

৬

নাটমন্দিরের সামনে ঢাকীরা ঢাক বাজাচ্ছে। পুণ্যাহের বাজনা।
পুণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে টাকায় সিঁদুর মাখিয়ে খাতায় ছাপ দেওয়া হল। পরে রাখা হল ধানদূর্বা। খাতায় লেখা হল — শুভ পুণ্যাহ।
বিশ্বম্ভরকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর শোবার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তারাপ্রসন্নর গলা শোনা যায়।

তারাপ্রসন্ন হুজুর!

বিশ্বম্ভর ফিরে তাকান।

তারাপ্রসন্ন পুণ্যাহের সব আয়োজন হয়ে গেছে, হুজুর। প্রজারা সব আসতে আরম্ভ করেছে।

বিশ্বম্ভর জানলার কাছ থেকে ধীরে ধীরে তারাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে আসেন।
তারাপ্রসন্ন খাটের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।
বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তারাপ্রসন্নর দিকে তাকান।

তারাপ্রসন্ন বজরা এখনো ফেরে নি, হুজুর।

বিশ্বম্ভরের মুখে কোনো কথা নেই।

তারাপ্রসন্ন দু'টো ছিপ পাঠিয়ে দেব? বৈশাখ মাস···
বিশ্বম্ভর দাও। আর আমি এখুনি আসছি, তুমি যাও।
তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে, হুজুর।

তারাপ্রসন্ন চলে যান।
বিশ্বম্ভর পায়চারি শুরু করেন। ধীরে ধীরে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

তাঁর মুখে উদ্বিগ্ন ভাব।

দূরে দেখা যায় নদী আর চর। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শোনা যায় জোড়ো হাওয়ার শব্দ।
বিশ্বম্ভর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।
হাওয়ায় পর্দাগুলোকে দুলতে দেখা যায়। হঠাৎ কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে বিশ্বম্ভর পিছন ফিরে তাকান। হাতির দাঁতের তৈরি বজরাটা উল্টে পড়ে আছে। বিশ্বম্ভর সেটা তুলে যথাস্থানে রেখে দেন। তাঁকে চিন্তিত দেখায়।

নহবৎখানায় বসে শানাইবাদকদের শানাই বাজাতে দেখা যায়।
রায়বাড়ির সামনে কাঙালী ভোজন হচ্ছে।

ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব গাইছেন মিঞা-কি-মলহার। আশেপাশে অতিথি অভ্যাগতগণ বসে গান শুনছেন।
যন্ত্রীদেরও দেখা যায়। ওস্তাদ গাইছেন—

জলকণ বুঁদন বরসে
পিয়া মিলনকো জিয়রা তরসে।
ইউ ইউ আওয়ত ঘোর বদরিয়া,
মোরি আখিয়াঁ বরসৈঁ।

দোতলা বারান্দায় বেশ উদ্বিগ্ন মুখে পায়চারি করতে দেখা যায় বিশ্বম্ভরকে।
ঝাড়বাতি, দেওয়ালগিরি সব জ্বলছে।
বিশ্বম্ভর একবার চরের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন।
উজীর খাঁ-র গান ভেসে আসছে।

চরের দৃশ্য। সময় রাত্রি।
আকাশে মেঘের ঘনঘটা। থমথমে ভাব। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।
বিশ্বম্ভর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।
ভেসে আসছে জলসার গান।

৭

জলসাঘরে গান গাইছেন ওস্তাদজী।
অতিথি অভ্যাগতগণ গান শুনছেন।
তন্ময় হয়ে গান গাইছেন ওস্তাদজী।
বিশ্বম্ভরকে জলসাঘরে ঢুকতে দেখা যায়। তাঁকে দেখে অনন্ত সেলাম করে। অনন্তর পরনে খানসামার পোশাক। কয়েকজন আতিথও আভবাদন জানান। তিনি অভিবাদন গ্রহণ ক'রে আসনে গিয়ে বসেন।
ওস্তাদজী গাইছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন যন্ত্রীরা।
গান শুনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী তারিফ ক'রে ওঠেন—বাঃ! বেশ, বেশ!
বিশ্বম্ভর মশগুল হয়ে গান শুনছেন। তাঁর মুখে গড়গড়ার নল। কিছুক্ষণ পর তাঁকে গ্লাসে মদ ঢালতে দেখা যায়।
ওস্তাদজী গান গাইছেন।
শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা শোনা যায়।
বিশ্বম্ভর মদের গ্লাসে মুখ দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে জলসাঘরের জানলা। সেখান দিয়ে বাইরের বিদ্যুৎ চমকানো দেখা যায়। তিনি চিন্তিত মুখে গ্লাসটা নামিয়ে রাখেন। গড়গড়ার নলটা তুলে নেন হাতে। মনোযোগী হবার চেষ্টা করেন গানে।
সম্পূর্ণ জলসাঘর দেখা যায়। ওস্তাদজী গান গাইছেন।
বিশ্বম্ভর চেষ্টা করেও গানে মন বসাতে পারেন না।
তাঁর চোখ চলে যায় উপরের দিকে।
হাওয়ায় ঝাড়বাতিটা দুলছে।
বিশ্বম্ভর চোখ নামিয়ে নেন। গানে মন বসাবার চেষ্টা করেন।
ওস্তাদজীকে গাইতে দেখা যায়। যন্ত্রীরা পাশে বসে সঙ্গত ক'রে যাচ্ছেন।
বিশ্বম্ভর গড়গড়ার নলটা মুখে দিতে যান। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে মদের গ্লাসে। গ্লাসের মদে একটা পোকা। পোকাটা পাখার ঝাপট দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।
বিশ্বম্ভর পোকাটাকে দেখে একটু আতংকিত হন। কিছুক্ষণ পোকাটার দিকে তাকিয়ে আবার গানে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেন।
ওস্তাদজী গাইছেন, এবার দ্রুতলয়ে।

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি আবার গ্লাসের দিকে। পোকাটা মৃত। নিস্পন্দ হয়ে গ্লাসের মধ্যে ভেসে আছে।
বিশ্বম্ভর চোখ তুলে ওস্তাদজীর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ চোখে আতংকের ভাব।
ওস্তাদজী দ্রুতলয়ে গাইছেন। পাশের যন্ত্রীরা সঙ্গত ক'রে যাচ্ছেন।
বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য অতিথিদের দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর হাতে জড়ানো মালাটা খুলে রেখে আসন ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যান।
অন্যান্য অতিথিরা তন্ময় হয়ে গান শুনছেন।
বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে।
বিশ্বম্ভর সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ান।
কিছুক্ষণ ভেবে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান।

রায়বাড়ি।
বাড়ির সামনে কোয়ারা। দূরে দেখা যাচ্ছে নদীর চর।
তারাপ্রসন্নকে পথ দিয়ে আসতে দেখা যায়। তাঁর চোখমুখে শোকের চিহ্ন।
বিশ্বম্ভর তারাপ্রসন্নকে দেখতে পান। তারাপ্রসন্নর মুখ দেখে তাঁর চাহনিতে আশংকা ফুটে ওঠে।

বিশ্বম্ভর বজরা ফিরেছে ?

তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর। তাঁর চোখমুখে শোকের চিহ্ন স্পষ্ট। বিশ্বম্ভর আবার জিজ্ঞাসা করেন—

বিশ্বম্ভর কি হোল ?
তারাপ্রসন্ন ঘূর্ণিতে পড়েছিল, হুজুর।
বিশ্বম্ভর (ভয়ে চিৎকার ক'রে) কী বললে ? ঘূর্ণিতে পড়েছিল ? কে বললে তোমায় ?
তারাপ্রসন্ন কালী ফিরেছে হুজুর।
বিশ্বম্ভর কালী ? আর কেউ ? আর কেউ ? চুপ ক'রে আছো কেন ? বল না, আর কেউ ফিরেছে কি না ?
তারাপ্রসন্ন ছোট রাজকুমার।
বিশ্বম্ভর খোকা ফিরেছে। খোকা, খোকা—

বিশ্বম্ভর প্রায় পাগলের মতো ছুটে এগিয়ে যান। কিছুটা এগিয়ে এলে তিনি থমকে

দাঁড়ান। তাঁর চোখে ভয় ও বিস্ময় মাখানো।
কালী বাগ্দী দাঁড়িয়ে আছে দু'হাতে মৃত বীরেশ্বরকে ধরে।
বিশ্বম্ভর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। তিনি হতবাক। পরে দ্রুত এগিয়ে আসেন।

বিশ্বম্ভর খোকা! খোকা! খোকা!

বিশ্বম্ভরের গলার আওয়াজে ক্রন্দন মিশে যায়। তিনি কালীর হাত থেকে বীরেশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন।
কালীও আর পারে না, অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।
বিশ্বম্ভর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

৮

মূষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।
রায়বাড়ির সামনের ফোয়ারার তিনটে নারী মূর্তি দেখা যায়। বৃষ্টির জলে উপচে পড়ছে ফোয়ারার পাত্র। জল পড়ছে মূর্তির চিবুক বেয়ে।
রায়বাড়ির সামনে দেখা যায় নদীর জল এগিয়ে এসেছে।

বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় নদীর চর অদৃশ্য, সেখানেও জল।
নহবৎখানার সামনে যে চর ছিল, জল সেখানেও।

বিশ্বম্ভরের শোবার ঘর।
বিশ্বম্ভর চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চেহারার মধ্যে হতাশা ও বিষাদ প্রকাশ পাচ্ছে।
বিশ্বম্ভরের পিছনের দেওয়ালে জলের ছায়া।
তারাপ্রসন্নকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়।

তারাপ্রসন্ন হুজুর!

বিশ্বম্ভর নিরুত্তর। তারাপ্রসন্ন আবার ডাকেন।

তারাপ্রসন্ন হুজুর!

বিশ্বম্ভর কে ?

তারাপ্রসন্ন আমি তারাপ্রসন্ন, হুজুর।

বিশ্বম্ভর তুমি আছো এখনো ?

তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হাঁা, হুজুর।

বিশ্বম্ভর কেন ?

তারাপ্রসন্ন সবাই গেলে চলবে কি ক'রে, হুজুর ?

বিশ্বম্ভর না-ই বা চললো। সবই ত গেছে।—

তারাপ্রসন্ন সব যেত না হুজুর, আপনি যদি একটু নজর দিতেন। তাহলে জমিদারি—

বিশ্বম্ভর জমি—? কোথায় জমি ? সবই ত মল। সব অতলে তলিয়ে গেছে। সব ভেসে গেছে, সব ভেসে গেছে।

তারাপ্রসন্ন হুজুর, প্রিভি কাউন্সিলের রায় বেরিয়েছে, দেবোত্তর ছাড়া আর সবই গেছে, আপনি যদি একবারটি নিচে আসতেন, হুজুর। জিনিসপত্র সব নিলাম হবে—।

বিশ্বম্ভর না, আমাকে আর ডেকো না। আমি নিচে যাবো না।

তারাপ্রসন্ন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিশ্বম্ভর তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো।

তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে, হুজুর।

তারাপ্রসন্ন চলে যেতে উদ্যত হয়। বিশ্বম্ভর ডাকেন তাঁকে।

বিশ্বম্ভর শোনো। মতি আর তুফান গেছে, না আছে ?

তারাপ্রসন্ন আছে হুজুর। সুন্দরপুর রাজবাড়ি থেকে লোক এসেছিল। দর দিয়ে গেছে। কিন্তু, আপনার হুকুম ছাড়া ত কিছু বলতে পারি না—

বিশ্বম্ভর ওরা যাবে না, থাকবে। খোকার বড় প্রিয় ছিল।

তারাপ্রসন্ন যে আজ্ঞে, হুজুর। ওস্তাদজী নিচে রয়েছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দেব ? গান বাজনা শুনবেন ?

বিশ্বম্ভর না, ওকে যেতে বলো। সংগীতের আর প্রয়োজন নেই।

বিশ্বম্ভর মুখটা ঘুরিয়ে নেন।

ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ হয়।

রায়বাড়ির ছাদে চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন বিশ্বম্ভর।
অনন্তের ডাক শোনা যায়।

অনন্ত হুজুর!

বিশ্বম্ভর আনমনে বসে ছিলেন। অনন্তর ডাক তাঁর কানে যায়।

বিশ্বম্ভর উঁ!

অনন্তকে দেখা যায় দাঁড়িয়ে থাকতে।
বিশ্বম্ভর আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

অনন্ত সরবতটা খান নি হুজুর?

বিশ্বম্ভর অনন্তকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—

বিশ্বম্ভর আজ একবার নিচে যাবো।

কথা শুনে অনন্ত বিস্ময় বোধ করে।

অনন্ত নিচে?
বিশ্বম্ভর তুফানকে দেখবো। মতিকে দেখবো।
অনন্ত এক্ষুনি যাবেন, হুজুর?
বিশ্বম্ভর তুই একবার খবর দিগে যা।

অনন্ত ছুটে চলে যায়।
বিশ্বম্ভর লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসেন।

রায়বাড়ির একতলার ভিতরের থামওয়ালা বারান্দা। একটা কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। অনন্ত ছুটে যেতে যেতে কুকুর টাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বম্ভরকে দেখা যায়। বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে যান। চারিদিকে তাকালেন একবার। আবার লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে যান। আবার একবার দাঁড়িয়ে পড়েন। নাটমন্দিরটাকে লক্ষ করেন। এগিয়ে যান আবার।

রায়বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণ।
ফোয়ারাটা দেখা যাচ্ছে।
সদর দরজা দিয়ে বিশ্বম্ভরকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

বিশ্বম্ভর এগিয়ে আসেন।
অনন্তকে সরবতের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।
সহিস রহমতের সেলাম শোনা যায়।

রহমৎ সালাম হুজুর।

বিশ্বম্ভর হাসি মুখে প্রত্যুত্তর দিয়ে এগিয়ে আসেন।
সহিস রহমৎকে দেখা যায়। পাশে ঘোড়া, তুফান।

বিশ্বম্ভর তুফান, ভালো আছিস?

ঘোড়াটা মুখ ঘুরিয়ে বিশ্বম্ভরের দিকে তাকায়।

রহমৎ হুজুর, ঘোড়েকে তবিয়ৎ খারাপ নেহি, বহৎ রোজ সে আপকো সোয়ারি নেহি মিলা, ইস লিয়ে দিল খারাপ।
বিশ্বম্ভর দানা ঠিক পাচ্ছে ত?
রহমৎ জী হাঁ, হুজুর।

অনন্ত কিছুক্ষণ হাসিমুখে তাকিয়ে ছুটে চলে যায়। বিশ্বম্ভর অনন্তকে অনুসরণ করেন।

রায়বাড়ির সামনের ভাঙা গেট।
অনন্ত ছুটে এগিয়ে যায়। তার পিছনে বিশ্বম্ভর লাঠিতে ভর দিয়ে অনন্তকে অনুসরণ করেন।
অনন্ত চরের পথ দিয়ে নেমে যায়।
বিশ্বম্ভরও সেই পথ দিয়ে নেমে যান।
বিশ্বম্ভর চরে নেমে দাঁড়িয়ে যান।
দূরে, চরে দেখা যায় হাতিকে।
বিশ্বম্ভর হাসিমুখে হাতিটার দিকে চেয়ে থাকেন।
অনন্তরও দৃষ্টি হাতির দিকে।
এমন সময় শোনা যায় লরির গর্জন।
একটা লরিকে দেখা যায় চরের রাস্তা দিয়ে যেতে।
লরির গায়ে লেখা GANGULI & CO.
লরিটা ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বম্ভর হাতি আর লরি দু'টোই দেখছেন।
ধুলো হাতিটাকে ছেয়ে ফেলে।

বিশ্বম্ভর মুখটাকে ঘুরিয়ে নেন।

বিশ্বম্ভর ছোট গিন্নির জামিম-টামিমগুলো সব আছে ত?
অনন্ত আহাম্মদকে শুধুচ্ছি হুজুর।
বিশ্বম্ভর তাকে বলো, ছোট গিন্নিকে খুব ভালো ক'রে সাজিয়ে দিতে। গাঙ্গুলী বাড়িতে যাবে।
অনন্ত যে আজ্ঞে, হুজুর।

অনন্ত ছুটে চলে যায়। বিশ্বম্ভর আবার অনন্তকে ডেকে বলেন—

বিশ্বম্ভর আর নায়েবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

একটা হাত এসে চাবি দিয়ে সিন্দুকের দরজা খোলে। বোঝা যায় হাতটা বিশ্বম্ভরের। সিন্দুকের ভেতর থেকে তিনি একটা থলি বার করেন। থলিতে মোহরের আওয়াজ। তা থেকে একটা মোহর বার ক'রে এগিয়ে দেন।
মোহরটা তিনি তারাপ্রসন্নর হাতে দিয়ে থলিটা রেখে দেন সিন্দুকে।

বিশ্বম্ভর মতিকে সাজাতে বলেছি। একখানা চাঁদির রেকাবির ওপর মোহরখানা রেখে মহিমের বাড়ি দিয়ে এসো। আগে যেমন দিয়ে আসতে।

বিশ্বম্ভর চাবি দিয়ে সিন্দুকটা বন্ধ ক'রে দেন।
তারাপ্রসন্ন তখনো দাঁড়িয়ে আছেন।
বিশ্বম্ভর তাঁর দিকে তাকান, মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

বিশ্বম্ভর দাঁড়িয়ে কেন?
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে, চাঁদির রেকাবি নেই হুজুর।

কথা শুনে বিশ্বম্ভর সামান্য চমকে ওঠেন।

বিশ্বম্ভর কাঁসার আছে ত?
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে, তা আছে।
বিশ্বম্ভর তাই নিয়ে যাও।

তারাপ্রসন্ন চলে যান।
ব্যথিত মুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন বিশ্বম্ভর।
হঠাৎ তাঁর কানে আসে ইংরেজি ব্যাণ্ডের আওয়াজ। বোঝা যায় আওয়াজটা আসছে মহিমের বাড়ি থেকে। তিনি বিরক্ত সেই আওয়াজে। প্রচণ্ড অস্বস্তি

নিয়ে তিনি কানে হাত চাপা দেন। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ডাক দেন—

বিশ্বম্ভর অনন্ত।

অনন্তর গলা শোনা যায়।

অনন্ত হুজুর।
বিশ্বম্ভর জানলাগুলো সব বন্ধ ক'রে দে।

রায়বাড়ির দেউড়ির সামনে সুসজ্জিত হাতি হাঁটু গেড়ে বসে আছে।
তারাপ্রসন্ন হাতির পিঠে উঠে বসেন।
হাতি দাঁড়িয়ে উঠতে থাকে। শোনা যায় হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজ। ৬
রায়বাড়ির সামনে দিয়ে হাতিকে চলে যেতে দেখা যায়। হাতির পিঠে মাহুত আহাম্মদ আর তারাপ্রসন্ন। তারাপ্রসন্ন মাথায় ছাতাটা খুলে ধরেন। হাতিটা এগিয়ে চলে।
তার চলার ছন্দে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।

বিশ্বম্ভর প্যাসনে চশমা পরে শোবার ঘরে চেয়ারে বসে বই পড়ছেন।
তাঁর কানে আসে হাতির ঘণ্টার শব্দ।
তিনি হাসিমুখে জানলার দিকে তাকান। কিছুক্ষণ সেই শব্দ শুনে আবার বই পড়ার দিকে মন দেন।

৯

রায়বাড়ির ভেতরে একতলার বারান্দা।
অনন্তকে দেখা যায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। তার হাতে ডাব আর কাটারি মুখে শ্যামাসংগীতের সুর।
অনন্তকে ডাব কাটতে দেখা যায়।
হঠাৎ শোনা যায় মোটরের আওয়াজ।
বারান্দায় শুয়ে থাকা কুকুরটা মোটরের আওয়াজে চমকে উঠে পড়ে।
অনন্ত আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

রায়বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণ।
দেখা যায় মহিমের মোটর গাড়িটা আসছে।
সদর দরজা দিয়ে অনন্ত উঁকি মেরে গাড়িটা আসতে দেখে। তারপর ভেতরে চলে যায়।
দেউড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামে। মহিম গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে হাঁক দেয়।

মহিম দারোয়ান। দারোয়ান।

কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মহিম গাড়ি থেকে নেমে আসে। তার হাতে সিগারেট।
শোনা যায় ইংরেজি ব্যাণ্ডের শব্দ।

মহিম বেয়ারা। দারোয়ান।

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়।

দেউড়ির সামনের বারান্দা।
তারাপ্রসন্ন সেরেস্তা-ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মহিম তাঁকে দেখতে পায়।

মহিম এই যে।

তারাপ্রসন্ন মহিমের দিকে এগিয়ে যান।

মহিম লোকজন কি সব বিদায় করিয়ে দিয়েছেন না কি? বলি এত্তেলা পাঠাবার দু-একজন লোক আছে ত? না, তাও গেছে?
তারাপ্রসন্ন এত্তেলা?
মহিম হাঁ, একবার দেখা করবো যে।
তারাপ্রসন্ন প্রয়োজন?
মহিম সেটা না হয় তাঁর কাছেই বলবো। আপনি খবরটা পাঠিয়ে দিন।

তারাপ্রসন্ন মহিমের দিকে তাকান। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি। তারাপ্রসন্ন খবর দিতে যান বিশ্বম্ভরকে।
যেতে গিয়ে বারান্দার বেঞ্চটা পরনের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে দেন।

তারাপ্রসন্ন বোসো।

মহিম এক টিপ নস্যি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

তারাপ্রসন্নকে চলে যেতে দেখা যায়।
মহিম চারিদিক দেখতে থাকে। তার মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। তার নজর পড়ে ওপরের দিকে।
থামের কার্নিশে দু'টো পায়রা বসে আছে।
মহিম পায়রা দেখে একটু সরে দাঁড়ায়।
তারাপ্রসন্নকে ফিরে আসতে দেখা যায়।
তারাপ্রসন্নকে দেখে মহিমের তাচ্ছিল্য ভাবটা আরো প্রকট হয়।

তারা প্রসন্ন একটু অপেক্ষা করতে হবে।
মহিম কি ছিল এই রায়বাড়ি, আর কি ছিরিই না হয়েছে!

তারাপ্রসন্ন বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

মহিম কিন্তু, হলে কি হবে, ও হাতি মরেও লাখ টাকা—কি বলেন নায়েব মশাই—অ্যাঁ।

সামনে তারাপ্রসন্ন দাঁড়িয়ে, মহিমকে দেখা যায় সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে।

মহিম হেঁ হেঁ হেঁ—। আজ সকালে যখন আপনি আপনাদের ঐ বুড়ো হাতিটা চড়ে গেলেন আমাদের বাড়িতে, রাস্তার সব লোকেরা সেলাম ঠুকলো ত—কিন্তু, আমার এই নতুন গাড়িটার কি করল জানেন? ঢিল মেরে মাডগার্ডের রঙ চটিয়ে দিলে! বেটাদের রকম দেখেছেন? আমি নিজে গাড়িতে বসে—

অনন্ত আসে।

অনন্ত আপনাকে হুজুর ডাকছেন।

অনন্ত খবর দিয়েই চলে যায়। মহিম তার বলা থামায় না।

মহিম কিন্তু এসব কেন জানেন, আমি self-made pedigree—হাঃ হাঃ হাঃ

মহিম হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়।

দোতলা বারান্দায় বিশ্বম্ভর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছেন। মুছতে মুছতে একবার পাশে তাকালেন। মহিমকে আসতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর বসে আছেন। মহিম এগিয়ে আসে।

মহিম কই ঠাকুর্দা, আপনি ত এলেন না খেতে ?

মহিম প্রণাম করে বিশ্বম্ভরকে।

বিশ্বম্ভর আয় ভাই—বসো বসো।

মহিম সামনের চেয়ারে বসে পড়ে।

মহিম অবিশ্যি আমারই কসুর হয়ে গেছে। নানান ঝঞ্ঝাটে আমি আর নিজে এসে বলতে পারি নি।

বিশ্বম্ভর না, ব্যাপারটা কি জানো, বুড়ো বয়সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে আর সহ্য হয় না।

মহিম সেকি ঠাকুর্দা, আপনি আবার বুড়ো হলেন কবে ? এই সেদিনও ত ঘোড়ার পিঠে দেখলুম !

বিশ্বম্ভর সেদিন আর নেই মহিম। এই চার বছরে বুড়ো হয়ে গিয়েছি।

মহিম ও, তাই বুঝি হাতে লাঠি ? হাঃ হাঃ হাঃ—। তা সেই যাই হোক, আজকে ওবেলা একবারটি যে পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার বাড়িতে।

বিশ্বম্ভরকে চিন্তিত দেখায়।

বিশ্বম্ভর ওবেলায়—?

মহিম হ্যাঁ, আমার ঐ নতুন জলসাঘর খুলবো আর কি—কৃষ্ণা বাঈয়ের নাম শুনেছেন ? লক্ষ্ণৌয়ের কৃষ্ণাবাঈ ?

বিশ্বম্ভর কৃষ্ণা—?

মহিম শোনেন নি ? এদিকে তাঁকে নিয়ে যে হৈ চৈ পড়ে গেছে ! লোকে বলছে, এই বয়সে ঐ রকম ইয়ে—কি বলে—কত্থক নাচ, এর আগে কেউ কখনো দেখে নি।

বিশ্বম্ভর বটে ?

মহিম হ্যাঁ, এই কৃষ্ণাবাঈজীর নাচ আর কাশীর সেরা তবলচীর সঙ্গত—এর কদর ত—আপনি ছাড়া তো আর কেউ বুঝবে না ঠাকুর্দা—। তাহলে সন্ধেবেলায় আমার নতুন গাড়িটা পাঠিয়ে দোবো—এই আটটা নাগাদ।

বিশ্বম্ভর না ভাই।

মহিম কেন ?

অনন্ত সামনের টেবিলে এক গ্লাস সরবত রেখে দিয়ে চলে যায়।

বিশ্বম্ভর আর যেয়োই না কোথাও। ভালো লাগে না।
মহিম সে কি, গানেও অরুচি?

বিশ্বম্ভরের মুখে হাসি।

মহিম তা হলে নেহাতই যাবেন না?
বিশ্বম্ভর না ভাই।
মহিম আচ্ছা, তাহলে উঠি।

মহিম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিশ্বম্ভর সরবতটা?
মহিম সরবত? ও, আচ্ছা।

মহিম সরবতের গ্লাসটা তুলে মুখে দেয়।
চুমুক দেওয়ার শব্দ ক'রে সরবতটা খেয়ে নেয় মহিম। খাওয়া হলে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

মহিম আচ্ছা, তাহলে আমি চলি। এখুনি আবার সদরে ছুটতে হবে। সব সাহেব-সুবোরা আসবেন। হেঃ হেঃ হেঃ— আচ্ছা—

বিশ্বম্ভর নিরুত্তর, চেয়ারে নিশ্চুপ হয়ে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যায়।

সময় সন্ধে।
চর দিয়ে তিনটে লরি চলে যায় হেডলাইট জ্বালিয়ে।
দৃষ্টিকোণ বদলে এবার রায়বাড়িটাও দেখা যায়।

রায়বাড়ির ছাদ।
চাঁদনি রাত। ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়।
শোনা যায় কুকুরের ডাক।
অন্ধকার দোতলার বারান্দায় একাকী বসে থাকতে দেখা যায় বিশ্বম্ভরকে।
মহিমের বাড়ি থেকে ভেসে আসে ডায়নামোর শব্দ আর ঘুঙুরের আওয়াজ।
ঘুঙুরের আওয়াজে বিশ্বম্ভর একবার আঙুলে তাল ঠোকেন।
অনন্তকে আসতে দেখা যায়।

বিশ্বম্ভর অনন্ত!

অনন্ত হুজুর।

বিশ্বম্ভর জলসাঘরটা বন্ধ, না যে?

অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত সেদিন থেকেই—

বিশ্বম্ভর চাবি কোথায়?

অনন্ত নায়েববাবুর কাছে।

বিশ্বম্ভর জলসাঘরটা একবার খুলে দে ত।

অনন্তর মুখে হাসি। সে ছুটে চলে যায় চাবি আনতে।

রায়বাড়ি।

চারদিকে থমথমে ভাব।

শোনা যায় কুকুরের ডাক।

বিশ্বম্ভরের হাত দেখা যায়। হাতে লাঠি। লাঠিতে আঙুল দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে টোকা মারছেন তিনি।

অনন্ত ছুটে আসে চাবি নিয়ে।

তাকে দেখে বিশ্বম্ভরও দ্রুত এগিয়ে যান।

অনন্ত জলসাঘরের চাবি খুলে দেয়।

অনন্ত আমি একটা বাতি নিয়ে আসি।

অনন্ত আবার ছুটে চলে যায়।

বিশ্বম্ভরের আর তর সয় না। একটু ইতস্তত ক'রে জলসাঘরের দিকে এগিয়ে যান। জলসাঘরের ভেতর থেকে দেখা যায় বিশ্বম্ভরকে ঢুকতে। বিশ্বম্ভর ঘরে ঢুকে বিমর্ষ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকালেন। লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের ভেতরে এগিয়ে আসেন। তাঁর দৃষ্টি যায় ঘরের ওপরদিকে—ঝাড়টা মাকড়শার জালে ঢাকা।

বিশ্বম্ভর তাঁর লাঠিটা দিয়ে আস্তে ক'রে ঝাড়ে টোকা দেন। ঝাড়ের টুং-টাং শব্দে তাঁর মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয়। মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের স্মৃতি।

জলসাঘর।

দেখা যায় জলসাঘরের আয়না।

জলসাঘরটায় অদ্ভুত থমথমে ভাব।

মেঝেতে কার্পেট। তাকিয়া, মদের গ্লাস সব এদিক ওদিক ছড়ানো। সবেতেই ধুলোর আস্তরণ।

বিশ্বম্ভরের মনে ভেসে আসে জলসাঘরের পুরনো স্মৃতি। ভেসে আসে গান-বাজনা।

বিশ্বম্ভরকে লাঠি হাতে মাটিতে বসে থাকতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর আয়নার দিকে তাকালেন। পরে মাথা নামিয়ে নেন। বাইরে থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে।
অনন্তকে দেখা যায়। বাতি হাতে সে অবাক হয়ে বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে আছে।
বিশ্বম্ভর মাথা হেঁট ক'রে বসে আছেন।
ভেসে আসে দুর্গাবাঈয়ের গান।

বিশ্বম্ভর লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান।
বিশ্বম্ভর এগিয়ে যান, আয়নার দিকে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকান। হাত দিয়ে মুছে ফেলেন আয়নার ধুলো। পরিষ্কার আয়নায় দেখতে থাকেন নিজের প্রতিবিম্ব।
নিজের গালে হাত বুলিয়ে একবার স্পর্শ করলেন নিজের বার্ধক্যের রেখাগুলো।
তারাপ্রসন্ন সবিস্ময়ে বিশ্বম্ভরকে দেখছেন।
বিশ্বম্ভর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
বিশ্বম্ভর কি একটা যেন ভাবলেন। তারপর মন স্থির ক'রে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিশ্বম্ভর কৃষ্ণাবাঈ কত নিচ্ছে? মহিমের বাড়ি কৃষ্ণাবাঈ কত নিচ্ছে?
তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে দুশো, হুজুর।
বিশ্বম্ভর তোমার তহবিলে আছে কত?

তারাপ্রসন্ন কোনো উত্তর দেন না।
বিশ্বম্ভর রেগে প্রশ্নটা আবার করেন।

বিশ্বম্ভর কত আছে?
তারাপ্রসন্ন দেবোত্তরের তহবিলে তিনশোর বেশি নেই হুজুর।
বিশ্বম্ভর কাল এখানে জলসা হবে। কৃষ্ণাবাঈকে চাই।

তিনি বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে থাকেন। আয়নায় দেখা গেল তাঁকে চলে যেতে।
বিশ্বম্ভরের কথা শুনে চমকে ওঠেন তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন কিন্তু, এ তো সম্ভব নয়, হুজুর। তারাপ্রসন্নর কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর।

তারাপ্রসন্নর কথা শুনে বিশ্বম্ভর চমকে ওঠেন। যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি।

বিশ্বম্ভর কী বললে ?

বিরক্তি আর রাগে তিনি তারাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে আসেন। কাছে এসে প্রশ্ন করেন—

বিশ্বম্ভর কী বললে ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারাপ্রসন্ন উত্তর দেন।

তারাপ্রসন্ন মাপ করবেন হুজুর, মাপ করবেন !

বিশ্বম্ভর তাঁর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।
অনন্ত বাতি হাতে এগিয়ে আসে। সে হাসিমুখে একবার তারাপ্রসন্নর দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

অনন্তকে হাসিমুখে জলসাঘরের গুটোনো কার্পেট খুলতে দেখা যায়। কার্পেটটা গড়াতে গড়াতে খুলে যায়।

অনন্ত গামছা দিয়ে ধুলো পড়া আয়নাটা পরিষ্কার করছে। তার মুখে হাসি। আয়নাতে তার প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

অনন্ত দেওয়ালগিরিতে চিমনি লাগাচ্ছে। আয়নায় অনন্তকে চিমনি লাগাতে দেখা যায়।

খুব মনোযোগ দিয়ে অনন্তকে তকমা পরিষ্কার করতে দেখা যায়।
তকমায় লেখা আছে KIRTIPUR RAJ ESTATE, KIRTIPUR
অনন্ত মুখের কাছে তকমাটা নিয়ে এসে ভাপ দেয়। তার মুখে হাসি। তকমাটা সে গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে।

বিশ্বম্ভরের শোবার ঘর।
হাসিমুখে তিনি পায়চারি করেছেন। তবুও বোঝা যায় তাঁর মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।
তারাপ্রসন্নকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়।
তারাপ্রসন্নকে দেখে বিশ্বম্ভর তাঁর দিকে এগিয়ে যান।

বিশ্বম্ভর সব ব্যবস্থা হয়েছে ?

তারাপ্রসন্ন শহরে একবার লোক পাঠাতে হবে হুজুর।

বিশ্বম্ভর কেন?

তারাপ্রসন্ন আতর ফুরিয়েছে, মোমবাতিও নেই—আর তাছাড়া জলসায় যাঁরা আসবেন, তাঁদের আদর আপ্যায়নের জন্যে—

বিশ্বম্ভর মদ।

তারাপ্রসন্ন আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

বিশ্বম্ভর রহমৎকে পাঠিয়ে দাও। এক্ষুনি তুফানকে নিয়ে চলে যাক।

তারাপ্রসন্ন চলে যান।
বিশ্বম্ভর আবার পায়চারি শুরু করেন।

অনন্ত হাসিমুখে মদের বাক্স থেকে মদের বোতল বার করছে।
বোতল থেকে মদের পাত্রে অনন্ত মদ ঢালে।
ঝাড়ের কয়েকটা চিমনিতে মোমবাতি জ্বলতে দেখা যায়।
কয়েকটাতে জ্বলছে না।
মোমবাতি জ্বালানোর লাঠিটার জ্বলন্ত শলতে এসে একটা চিমনির মোমবাতি জ্বেলে দিতে দেখা যায়।
অনন্তকে দেখা যায় মোমবাতি জ্বালাচ্ছে।

১০

বিশ্বম্ভরের শোবার ঘর।
টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে।
বিশ্বম্ভর জলসাঘরে যাবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এই সময়ে মহিমের মোটর গাড়ির হর্ন শোনা যায়। বিশ্বম্ভর শোনেন।
এগিয়ে এসে টেবিল থেকে ফুলের মালাটা হাতে জড়িয়ে নেন।
অনন্তকে দেখা যায়। এগিয়ে এসে তার হাতের মদের ট্রে-টা টেবিলে রাখে।

অনন্ত গাঙ্গুলী বাবু এইমাত্র এসে পৌঁছলেন।

অনন্ত চলে যায়।

বিশ্বম্ভর কোনো কথা না বলে হাতে মালাটা জড়াতে থাকেন।

জলসাঘর।
দু-একজন অতিথিকে দেখা যায়। সবে তাঁরা আসতে শুরু করেছেন।
মহিম গাঙ্গুলীকে আসতে দেখা যায়। সে জুতো খুলতে খুলতে পকেট থেকে বার করে সিগারেট কেস। একটা সিগারেট মুখে দিয়ে এগিয়ে আসে বসবার আসনের দিকে। মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে জলসাঘরে চারদিক দেখতে থাকে। তাকে দেখতে পায় এক অতিথি।

অতিথি বোসো মহিম।
মহিম হ্যাঁ, বসবো ত—কিন্তু, ব্যাপারটা কি রকম হবে বলুন ত?
অতিথি কেন হে—?
মহিম না, আমার কাছে যেন—হেঃ হেঃ—একটু কি রকম, কি রকম ঠেকছে—

মহিম আসনে বসে পড়ে।
অনন্তর হাত মদের ট্রে। সে এগিয়ে এসে ট্রে-টা অতিথিদের সামনে নামিয়ে রাখে।
মহিম দেখে টিপ্পনি কাটে—

মহিম ওঃ বাবা।

অনন্ত ট্রে থেকে আতর-দানিটা নিয়ে অতিথিদের গায়ে আতর ছিটিয়ে দেয়। মহিমের গায়েও দেয়। মহিম বিরক্ত হয়। নড়ে চড়ে ওঠে।

মহিম অ্যাঁ অ্যাঁ আরে—

অনন্ত কোনো কথা না বলে এদিক ওদিক আতর ছিটিয়ে আবার মহিমের গায়ে দেয়। আতর দেওয়া হয়ে গেলে সে বিরক্তভাবে একবার মহিমকে দেখে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বিশ্বম্ভর রায়কে দেখা যায় শোবার ঘরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।
তিনি কিছু একটা ভাবছেন যেন।
জলসাঘর থেকে ভেসে আসে সুর বাঁধার আওয়াজ।
দেওয়ালে ঝোলানো স্ত্রী আর ছেলের ছবির দিকে এগিয়ে যান বিশ্বম্ভর। ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার এগিয়ে আসেন টেবিলের দিকে।

বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় পাত্র থেকে মদের গ্লাসে মদ ঢালতে।

জলসাঘর।
মহিম ও অন্যান্য অতিথিদের দেখা যায়।
মহিম মদ খেয়ে গ্লাসটা রেখে এদিক ওদিক তাকায়।

মহিম কই হে, কেউ আছে নাকি? একটু হাওয়া টাওয়া করো—

মহিম মুখ মোছবার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বার করে। রুমালের সঙ্গে কয়েকটা মোহর পড়ে যায়।
মহিম সেগুলো কুড়িয়ে নেয়।
বিশ্বম্ভর সিন্দুক খুলে মোহরের থলে বার করলেন। তাঁর হাত জড়ানো রয়েছে মালা।
সিন্দুকটা বন্ধ ক'রে তিনি চলে যান।

জলসাঘরে অতিথিদের সমাগম হয়েছে। মহিমকেও দেখা যাচ্ছে।
বিশ্বম্ভরকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। তাঁকে দেখে কয়েকজন অভিবাদন জানালেন।
বিশ্বম্ভর এগিয়ে এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

মহিম এই যে ঠাকুর্দা—। আসুন—আসুন—আসুন—আসুন। বসুন। তারপর—? শরীরটা ভালো ত আজকে?

মহিমকে হাতের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেন বিশ্বম্ভর।
একজন ওস্তাদজী গৌড় মল্‌হারে আলাপ শুরু করেন।
পাশে আর একজন যন্ত্রী সেতারে সঙ্গত ক'রে যাচ্ছেন।
তবলচী আর পাখোয়াজ-বাদক সঙ্গত দিতে শুরু করেন।
দেখা যায় কৃষ্ণাবাঈয়ের ঘুঙুর পরা পা। তেহাইয়ের জন্যে সেই পা অপেক্ষা করছে।
কৃষ্ণাবাঈ নাচ শুরু করেন।
বিশ্বম্ভর, মহিম ও অন্যান্য অতিথিদের বসে থাকতে দেখা যায়।
কৃষ্ণাবাঈ নাচছেন। পাশে যন্ত্রীদের দেখা যাচ্ছে সঙ্গত করতে।
কৃষ্ণাবাঈ বোলের সঙ্গে সঙ্গে নাচছেন।
বিশ্বম্ভর, মহিম ও অন্যান্য অতিথিরা তন্ময় হয়ে নাচ দেখছেন। মুখ খোলে মহিম।

মহিম কেমন বুঝছেন ঠাকুর্দা?

গড়গড়ার নল টানতে টানতে বিশ্বম্ভর নাচ দেখছেন।

পাশে কয়েকজন অতিথিকেও দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর আর মহিমকে দেখা যায়।
কৃষ্ণাবাঈ নেচে চলেছেন বোলের সাথে।
তবলচী আর সারেঙ্গী-বাদক বাজিয়ে যাচ্ছেন।
এবার তবলার বোলের সাথে নাচছেন কৃষ্ণাবাঈ।
বিশ্বম্ভরের মুখে গড়গড়ার নল। নলটা সরিয়ে রেখে তিনি তন্ময় হয়ে নাচ দেখছেন। পাশে কয়েকজন অতিথিকেও দেখা যায়।
কৃষ্ণাবাঈ নানারকম তাল, লয় ও ছন্দে নেচে যাচ্ছেন।

তারাপ্রসন্নকে দেখা যায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাচ দেখতে।
অনন্ত তাল ঠুকে নাচতে নাচতে গিয়ে দাঁড়ালো তারাপ্রসন্নর পাশে।
তারাপ্রসন্ন অনন্তকে দেখে বিরক্ত হয়ে চলে যান।
অনন্ত হাসতে হাসতে তারাপ্রসন্নকে অনুসরণ করে।
কৃষ্ণাবাঈ নেচে চলেছেন।

মহিম নাচ দেখে তারিফ ক'রে ওঠে।
কৃষ্ণাবাঈকে দ্রুতলয়ে নাচতে দেখা যায়।
তবলচীও দ্রুত বাজাচ্ছেন।
মহিম অবাক হয়ে নাচ দেখছেন।
কৃষ্ণাবাঈয়ের পা। দ্রুত লয়ে নাচছেন।
দেখা যায় কৃষ্ণাবাঈয়ের শরীর।
কৃষ্ণাবাঈয়ের পা দ্রুতলয়ে নাচছে।
বিশ্বম্ভর অবাক হয়ে নাচ দেখছেন।
কৃষ্ণাবাঈয়ের পা ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে।
কৃষ্ণাবাঈ নাচছেন।
পায়ের কাজ আরো দ্রুততর হচ্ছে।
বিশ্বম্ভর অবাক হয়ে দেখছেন।
পায়ের কাজ আরো দ্রুত।
কৃষ্ণাবাঈয়ের চেহারা দেখা যায়।
মহিম অবাক হয়ে দেখছে।
বিশ্বম্ভর তাকিয়ে আছেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে।
পায়ের কাজ আরো দ্রুত।
বিশ্বম্ভর দেখছেন।
পায়ের কাজ দ্রুততর।

মহিম তাকিয়ে আছে।
পায়ের কাজ আরো দ্রুত।
তবলার ওপর তবলচীর হাতে চলছে দ্রুত লয়ে।
পায়ের কাজ অসম্ভব দ্রুত।
তবলচীর হাতও সমান লয়ে।
বিশ্বম্ভর দেখছেন অবাক হয়ে।
পায়ের কাজ দ্রুত। তেহাই পড়ে।
তেহাইয়ের সঙ্গে নেচে কৃষ্ণাবাঈ শেষ করেন তাঁর নাচ।
মহিম হাত তুলে নাচের তারিফ করে।

মহিম বহুৎ খুব। বহুৎ খুব। জিতী রহো বাঈজী, জিতী রহো।

মহিম পকেট থেকে মোহর বার ক'রে দিতে যায়। বিশ্বম্ভরের লাঠির ডগাটা এসে মহিমের হাত আটকে ধরে।
মহিমের হাতে মোহর। বিশ্বম্ভরের লাঠি তার হাতটা ধরে থাকে। মহিমের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও অপমানবোধ।

বিশ্বম্ভর প্রথম ইনাম দেওয়ার অধিকার গৃহস্বামীর।

বিশ্বম্ভর লাঠিটা সরিয়ে নিয়ে নিজের মোহরের থলিটা উঁচু ক'রে তুলে ধরেন।
কৃষ্ণাবাঈ কুর্নিশ ক'রে এগিয়ে এসে থলিটা নেন।
থলিটা নিয়ে কৃষ্ণাবাঈ কুর্নিশ করতে করতে আবার পিছিয়ে যান।
মহিম হতভম্ব। অপমানিত হয়ে সে মোহরগুলো কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বিশ্বম্ভরের দিকে তাকায়।

১১

জলসাঘর।
জলসা শেষ হয়ে গিয়েছে।
বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় মদের গ্লাস হাতে জলসাঘরের একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

বিশ্বম্ভর পারে নি—পারে নি—

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মদ শেষ করেন তিনি।
বিশ্বম্ভরের হাতে খালি গ্লাস।

বিশ্বম্ভর অনন্ত।

অনন্ত জলসাঘরের সামনের দরজার চৌকাঠে বসে ঝিমুচ্ছে। বিশ্বম্ভরের ডাক তার কানে যায়। সাড়া দিয়ে সে ছুটে যায়।

অনন্ত হুজুর।

অনন্তকে দেখে বিশ্বম্ভর ইশারায় খালি গ্লাসটা দেখিয়ে দেন।
অনন্ত গ্লাসে মদ ঢালে। বিশ্বম্ভর ইশারায় আরো ঢালতে বলেন। অনন্ত ঢেলে দেয়।

বিশ্বম্ভর পারে নি। মুদখোরের ব্যাটা পাহাড়ের চূড়ো ভাঙতে গিয়েছিল—এতবড় আস্পর্ধা, অ্যাঁ—কতবড় আস্পর্ধা!—বামন হয়ে চাঁদে হাত? পারে নি—পারে নি—

উত্তেজনায় বিশ্বম্ভর হো হো ক'রে হেসে ওঠেন।

বিশ্বম্ভর কেন পারে নি জানিস? রক্ত।
অনন্ত রক্ত?
বিশ্বম্ভর Blood. The blood in my veins—জানিস কার রক্ত বইছে আমার শিরায়?
অনন্ত কার হুজুর?
বিশ্বম্ভর দেখবি—দেখবি—আয়—আয়

বিশ্বম্ভর এগিয়ে যান দেওয়ালের দিকে।
অনন্ত তাঁর পিছনে পিছনে যায়।
বিশ্বম্ভর তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবির সামনে দাঁড়ান।

বিশ্বম্ভর দেখ, আমার পিতৃদেব, ঈশ্বর রামেশ্বর—My grandfather ঈশ্বর ভুবনেশ্বর, my great grandfather ঈশ্বর ভাবকেশ্বর, My great great grandfather ঈশ্বর রাবণেশ্বর—।

ছবিগুলো দেখানো হলে বিশ্বম্ভর পিছিয়ে আসেন।
অনন্তকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

বিশ্বম্ভর তাঁর হাতের গ্লাসটা উঁচু ক'রে তুলে ছবিগুলোর উদ্দেশে বলে ওঠেন—

বিশ্বম্ভর To you—to you, to you, my noble ancestors—to you.

বিশ্বম্ভর মদের গ্লাসে চুমুক দেন।
মদটা শেষ ক'রে তিনি গ্লাসটা আবার অনন্তর সামনে ধরেন।
অনন্ত বোতলের বাকি মদটা ঢেলে দেয় গ্লাসে।
বিশ্বম্ভর ইশারায় অনন্তকে আরো একটা বোতল আনতে বলেন।
অনন্ত ছুটে চলে যায়।
বিশ্বম্ভর এগিয়ে এসে তাঁর নিজের ছবির সামনে দাঁড়ান। গ্লাসটা তুলে ধরেন ছবির দিকে।

বিশ্বম্ভর And to you, my noble self!

কথাটা বলেই তিনি ভয়ে চমকে উঠলেন। দেখা যায় বিশ্বম্ভরের ছবিতে একটা প্রকাণ্ড মাকড়শা। লাঠিটা উঁচিয়ে তিনি মাকড়শাটাকে তাড়াতে এগিয়ে আসেন।
ছবিটার ওপর মাকড়শাটাকে দেখা যায়।
লাঠিটা ছবিটাকে আঘাত করে।
মাকড়শা পালিয়ে যায়।
বিশ্বম্ভর মাকড়শাটাকে লক্ষ করেন। পরে হাসিমুখে লাঠিটা নামিয়ে নেন।
বিশ্বম্ভর গ্লাসে মুখ দিতে যান। হঠাৎ গ্লাসের ভিতর কিছু একটা দেখে থমকে থেমে যান।
দেখা যায় মদের গ্লাসের ভিতর ঝাড়বাতির প্রতিবিম্ব।
বিশ্বম্ভর হাসিমুখে ওপরের দিকে তাকালেন।
ঝাড়ের সব বাতিগুলোকে জ্বলতে দেখা যায়।
সব মোমবাতিগুলোই ছোট হয়ে এসেছে।
বিশ্বম্ভর হাসিমুখে ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি।
ঝাড়ের একটা বাতি নিভে যেতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর ভয়ে পিছিয়ে আসেন। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তিনি এদিক ওদিক লক্ষ করেন।
এবার বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় দেওয়ালগিরির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।
দেয়ালগিরির আলোটা ধীরে ধীরে নিবে যায়।
বিশ্বম্ভর অবিশ্বাস্য দৃষ্টি মেলে পাগলের মতো ছুটে আসেন। এগিয়ে এসে, চমকে আর একটা দেওয়ালগিরির সামনে দাঁড়িয়ে যান।
সেই দেওয়ালগিরির আলোটাও নিবে যায়।

বিশ্বম্ভর আবার ছুটে আসেন। তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। তিনি দাঁড়িয়ে যান। দেখা গেল আর একটা দেওয়ালগিরি নিবে যেতে।
বিশ্বম্ভর আবার ছুটে যান। তাঁকে জলসাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তারপর আবার ছুটে যান পাগলের মতো।
বাতিগুলো প্রায় নিবে যাওয়ার মুখে। বিশ্বম্ভর ওপরের দিকে তাকিয়ে আর পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে, ভেঙে পড়লেন। পরক্ষণেই চিৎকার করে ডাকলেন—

বিশ্বম্ভর অনন্ত—অনন্ত—অনন্ত।

অনন্তর গলা শোনা যায়।

অনন্ত হুজুর।

অনন্ত ছুটে আসে।
বিশ্বম্ভর তখনো চেঁচিয়ে ডাকছেন—

বিশ্বম্ভর অনন্ত—
অনন্ত কি হয়েছে হুজুর?

বিশ্বম্ভর ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।
অনন্ত মদের বোতল হাতে ছুটে আসে, বিশ্বম্ভরের দেখাদেখি সেও ঝাড়ের দিকে লক্ষ করে।
ঝাড়ের শেষ বাতিটাকেও নিভে যেতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর মর্মাহত হয়ে বসে পড়েন।

বিশ্বম্ভর নিভে গেলো—সব বাতি নিভে গেলো।

বিশ্বম্ভর আসনে বসে পড়েন।
অনন্তও বসে পড়ে।

অনন্ত বাতি?
বিশ্বম্ভর সব বাতি নিভে গেলো?
অনন্ত বাতি ত নিববেই হুজুর।
বিশ্বম্ভর সব বাতি নিভে গেলো।
অনন্ত বাতি শেষ হয়ে গেছে, হুজুর। ভোর হয়ে এসেছে, হুজুর। এক্ষুনি সুর্য্যি উঠবে—
বিশ্বম্ভর সুর্য্যি উঠবে?

অনন্ত আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর — আমি জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিচ্ছি —

অনন্ত ছুটে চলে যায়। জানলার কাছে গিয়ে সে মদের বোতলটা রেখে পর্দা সরিয়ে দেয়।

বিশ্বম্ভর বসে আছেন। পর্দা সরাতে তাঁর মুখে আলো এসে পড়ে।
আলোকিত হয় বিশ্বম্ভরের প্রতিকৃতিটাও।
বিশ্বম্ভর নিজের ছবিটা দেখে আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

বিশ্বম্ভর সূর্য উঠবে!

বিশ্বম্ভরের প্রতিকৃতি।
বিশ্বম্ভর প্রতিকৃতির সামনে এসে দাঁড়ান।
হঠাৎ তাঁর কানে আসে তুফানের ডাক। তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত — তিনি অনন্তর দিকে ফিরে বলেন —

বিশ্বম্ভর তুফান — তুফান ডাকছে — তুফান ডাকছে —
অনন্ত আপনি পারবেন না হুজুর, আপনি পারবেন না।
বিশ্বম্ভর আমার সোওয়ারের পোশাক?
অনন্ত আপনি পারবেন না, হুজুর —

অনন্ত ভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসে।
বিশ্বম্ভর তাঁর হাতের লাঠিটা উঁচু ক'রে ধরেন। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন —

বিশ্বম্ভর আমার চাবুক?

বিশ্বম্ভর লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ঘোড়া ছুটিয়ে বিশ্বম্ভর চরের রাস্তা দিয়ে দূরে চলে যান।
তারাপ্রসন্ন ছুটে এসে রায়বাড়ির সামনে দাঁড়ান। তিনিও হতবাক।
অনন্তও অবাক। হতভম্ব হয়ে চরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে

তারাপ্রসন্ন তুমি ওঁকে যেতে দিলে?
অনন্ত মানা ত করলুম, কিন্তু শুনলেন না।
তারাপ্রসন্ন সর্বনাশ!

তারাপ্রসন্ন ছুটে চলে যান। অনন্তও তাঁকে অনুসরণ করে।

বিশ্বম্ভরকে চরের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে যেতে দেখা যায়।
অনন্ত আর তারাপ্রসন্ন ব্যগ্রভাবে ছুটে আসছেন। পিছনে দেখা যায় বাড়িঘর।
বিশ্বম্ভর ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন।
অনন্ত আর তারাপ্রসন্ন দেখছেন বিশ্বম্ভরকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে।
বিশ্বম্ভর আরো দূরে চলে যান।

অনন্ত আর তারাপ্রসন্ন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে আসার পরিশ্রমে তাঁদের দু'জনকেই হাঁফাতে দেখা যায়।
বিশ্বম্ভর চরের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছেন।
ঘোড়ার পিঠে বিশ্বম্ভর, তাঁর হাতে লাগাম।
বিশ্বম্ভর ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন।
ঘোড়াটা এগিয়ে যাচ্ছে চরের উপর পড়ে থাকা একটা ভাঙা নৌকোর দিকে।
ঘোড়াটা ছুটে চলেছে।
বিশ্বম্ভর ঘোড়ার পিঠে।
নৌকোটা সামনে এগিয়ে আসছে।

অনন্ত হাঁফাচ্ছে।
হাঁফাচ্ছেন তারাপ্রসন্নও।

নৌকোটা যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে সামনে।
তুফান সামনের দু'পা তুলে লাফিয়ে ওঠে।
বিশ্বম্ভর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান।

তারাপ্রসন্ন ছুটে এগিয়ে যান। অনন্তও ছুটে যায়।
বিশ্বম্ভরকে দেখা যায় মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বালির উপর পড়েছে।
বিশ্বম্ভর মাথাটা তোলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পড়ে যান।
অনন্ত এগিয়ে আসে মানিকের দিকে।
বিশ্বম্ভর মাটিতে পড়ে আছেন।
তারাপ্রসন্ন এগিয়ে এসে সেখানে বসে পড়েন।
অনন্ত বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে জল।
বিশ্বম্ভর মৃতাবস্থায় পড়ে আছেন।
অনন্ত বিশ্বম্ভরকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে।
অনন্ত এতক্ষণে বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে লক্ষ করে—

অনন্তর গলা শোনা যায়।

অনন্ত বক্ত।

দূরে তুফানকে দেখা যায়।
চর দিয়ে কয়েকজন মাঝি-মাল্লা ছুটে আসে নৌকোটার পাশ দিয়ে।
বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে ক্যামেরা পাশে সরে এসে বালিতে পড়ে থাকা তাঁর পাসপোর্টটাকে দেখায়।

পিছনে সূর্য উঠছে।
ঝাড়বাতিটা দুলছে। তার উপরে ফুটে ওঠে—

সমাপ্ত

—

স্বীকৃতি

আর্ট পেপারে মুদ্রিত ফোটোগ্রাফগুলির প্রথমটি জলসাঘর-এর শুটিং-এ নৃত্যশিল্পী রোশনকুমারীসহ দৃশ্যগ্রহণের স্থিরচিত্রে পরিচালক সত্যজিৎ রায়। এ-ছবি তুলেছিলেন শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত। অপর দু'টি স্থিরচিত্র ফিল্মের 'গেট' থেকে নেওয়া। ছবিগুলির কপির কাজ ক'রে দিয়েছেন নিমাই ঘোষ।
বর্তমান পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সত্যজিৎ রায়-কৃত 'জলসাঘর' লোগো-র কপি করেছেন দেবব্রত ঘোষ।
বর্তমান মুদ্রণে চিত্রনাট্যের মূল কপিটি তৈরি করেছেন দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

পরিচালকের কথা

সত্যজিৎ রায়

আমি জলসাঘর ছবি করি অপরাজিত-র পরেই। পথের পাঁচালি ভালো চলেছিল; ভেবেছিলাম অপু-কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বও লোকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু তা হল না। অপরাজিত চলল না। ফলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হল। তখন আমি বিজ্ঞাপনের চাকরি ছেড়ে কায়েমিভাবে ছবি তৈরি করব বলে মনস্থ করেছি, কাজেই একের পর এক ছবি আমাকে করতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল—এবারে কেমন ধরনের গল্প করা উচিত? অন্য লোকের টাকায় ছবি করব, সে লোক যাতে সে টাকা ফিরে পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সুতরাং এমন ছবি করা চাই যা লোকে নেবে। গ্রামের গল্প, জীবন সংগ্রামের গল্প, আর চলবে না। মনে হল বাঙালি দর্শক চিরকালই ছবিতে নাচ গান পছন্দ করেছে—সেই উপাদান বজায় রেখে কি কোনো ভালো ছবি করা যায় না?

গল্প খোঁজা শুরু হল। অচিরেই তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প জলসাঘর-এর সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় হল। পড়তি অবস্থার জমিদারের গল্প। তহবিল প্রায় শূন্য, কিন্তু জলসার প্রতি লোভ সংবরণ করতে পারেন না বিশ্বম্ভর রায়। এ গল্প থেকে ছবি করলে তাতে নাচ গানের সুযোগ স্বভাবতই আসবে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে জলসাঘর করাই স্থির করলাম। টালায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁকে জানালাম আমাদের ইচ্ছা। ভদ্রলোক খুশি: বললেন, 'আমার গল্প থেকে এতাবৎ যত ছবি হয়েছে সবগুলোই পয়সা দিয়েছে। জলসাঘরও হিট করা চাই।'

তখনও চিত্রনাট্য রচনায় হাত পাকে নি। তাই তারাশঙ্করকে প্রস্তাব করলাম তাঁর গল্পের ভিত্তিতে একটি চিত্রনাট্য রচনা করার জন্য। ভদ্রলোক রাজি হলেন; বললেন, 'আমি কাজ শুরু ক'রে দিচ্ছি। আপনি এক সপ্তাহ পরে এসে একবার খোঁজ করবেন।'

আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যথাসময়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তারাশঙ্কর বাঘছালের উপর বসে ডেস্কে খাতা রেখে লেখেন। ডেস্কের ডালাটা তুলে একটি খাতা বার ক'রে তিনি আমার হাতে তুলি দিলেন। বললেন, 'পড়ে দেখুন কেমন হয়েছে, তারপর বাকিটা লিখব।'

বাড়ি এসে লেখা পড়ে দেখি তারাশঙ্কর একটি আনকোরা নতুন গল্প ফাঁদতে বসেছেন যার সঙ্গে মূল গল্পের মিল সামান্যই। আমাকে আবার টালা গিয়ে বাধ্য হয়ে বলতে হল যে তাঁর প্রকাশিত গল্পটি ভালো লেগেছে বলেই আমি তার

থেকে ছবি করা স্থির করেছি। চিত্রনাট্য মূলের অনুসরণ না করলে আমার পক্ষে মুশকিল হবে। 'তাহলে আপনি নিজেই লিখুন,' বললেন ভদ্রলোক। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত ছবি যা দাঁড়িয়েছিল তাতে নাচ গান ছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ বাংলা ছবির উপাদানের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। তখনকার সেরা গাইয়ে-বাজিয়েদের ব্যবহার করেছিলাম আমরা। তার ফলে সংগীত হয়েছিল একেবারে খানদানী। বিশ্বম্ভরের ভূমিকায় স্বভাবতই ছবি বিশ্বাসকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তিনি গোড়াতেই বলেছিলেন, 'দুটো জিনিস আপনাকে বলা দরকার, মিস্টার রায়। এক—আমি ঘোড়া চড়তে পারি না, এবং দুই—গানবাজনায় আমার আদৌ রুচি নেই।'

সত্যি বলতে কি—এমন tone-deaf মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি; কিন্তু অভিনয়ের গুণে তাঁকে গানের সমঝদার হিসাবে মেনে নিতে কারুর অসুবিধা হয় নি।

একটা তথ্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জলসাঘর শুটিং-এর মাঝামাঝি কাবুলিওয়ালা ছবির প্রধান অভিনেতা হিসাবে ছবি বাবু বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হন। ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন, 'আমি ভাবছি বার্লিন যাবো। আর তার পরে ইউরোপটা একটু ঘুরে আসব। কাজেই কদিন বাদে ফিরব তা বলতে পারছি না।' ভদ্রলোকের যাবার একান্ত আগ্রহ দেখে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। যথাসময়ে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু এই ভাবে কাজ না ক'রে অনির্দিষ্টকাল বসে থাকার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। তাই এই ফাঁকে খুব অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে আমি আরেকটি ছবি করি। সেটা হল পরশ-পাথর। পরশ পাথর শেষ হবার পর জলসাঘরের বাকি কাজটা হয়।

জলসাঘর হিট করে নি, তবে অল্প খরচের ছবি বলে লোকসানও হয় নি।

৩।১।৮৯

'জলসাঘর' প্রসঙ্গ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

অপরাজিত ছবির শুটিংয়ের সময় কাশীর ঘাটে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে সত্যজিতের হাঁটুতে বেশ চোট লাগে, প্লাস্টার করতে হয়। বাড়িতে বসে থেকে হাতের কাছে যা-পেয়েছেন পড়ে ফেলেন। জলসাঘর পড়ে তাঁর পছন্দ হয়। মনে হয়েছিল ভারতীয় দর্শকেরা নাচ-গানের ছবি পছন্দ করে, জলসাঘর তাদের ভালোই লাগবে।

১৯২০-র পটভূমিকায় ক্ষীয়মাণ জমিদার ও এক উঠতি ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা জলসাঘর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্প, প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। জলসাঘর চিত্রনাট্য রচনা করার সময় বিশ্বস্তরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের কথাই ভেবেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ছবির আউটডোর শুটিং হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতার জমিদার বাড়ি ও বাড়ির সামনের অংশে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরই পছন্দমতো এই বাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায়। পরে জানা যায় তারাশঙ্কর এই বাড়িরই জমিদারের কথা শুনে 'রায় বাড়ি' ও 'জলসাঘর' গল্প দু'টি লিখেছিলেন। ছবির কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের গোড়ায়। জলসাঘর মুক্তি পায় ১৯৫৮-র ১০ অক্টোবর।

দৈনিক পত্রে জলসাঘর-এর প্রথম বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের ৪ অক্টোবর। এক কলাম ৩৫ সে.মি. মাপের বিজ্ঞাপনটিতে ছিল না সত্যজিৎ রায়ের নাম। বিজ্ঞাপনটির উপরের দিকে লেখা ছিল — 'আগামী শুক্রবার থেকে রাধা পূর্ণ ও প্রাচীতে জলসাঘর'। নিচের দিকে ছিল — 'বুধবার ৮ই অক্টোবর অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হইবে'। সত্যজিৎ রায় কৃত জলসাঘর' শব্দটির বিন্যাসে ক্যালিগ্রাফিক 'জ' বর্ণটিকে দেখাচ্ছিল ঝাড়বাতির মতো। পরের দিনগুলোতেও দেখা গিয়েছিল একই বিজ্ঞাপন। অবশেষে পুজোর ঠিক এক সপ্তাহ আগে বহু প্রতীক্ষিত ১০ অক্টোবরে এলো 'জলসাঘর'। সেই এক কলাম বিজ্ঞাপন, মাপে সামান্য বড়, ৪৩ সে.মি.। বিজ্ঞাপনের মাথায় নৃত্যরত রোশনকুমারীর ছবি। তার নিচে ডানদিক ঘেঁষে সাজানো ছিল — 'অরোরার নিবেদন / প্রযোজনা, চিত্রনাট্য / ও পরিচালনা / সত্যজিৎ রায় শ্রেষ্ঠাংশে ছবি বিশ্বাস সংগীত / বিলায়েৎ খাঁ সহকারী / ইমরাত হোসেন খাঁ মূল কাহিনী তারাশঙ্কর / বন্দ্যোপাধ্যায় / জলসাঘর আজ সুরু। / ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস গঙ্গাপদ বসু / কালী সরকার তুলসী লাহিড়ী পদ্মা দেবী পিনাকী সেনগুপ্ত সংগীতাংশে /

আখতারী বাঈ / সালামত আলি খাঁ বিসমিল্লা খাঁ / রোশনকুমারী ওয়াহেদ খাঁ'। এর নিচে ছিল উপর দিকে তাকানো বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের কাট আউট ছবি এবং তার নিচে প্রেক্ষাগৃহের নাম। রাধা, পূর্ণ, প্রাচী, পার্বতী, অলকা, গৌরী, উদয়ন, জ্যোতি, নৈহাটী সিনেমা ও রূপালী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পেয়েছিল জলসাঘর। পরের সপ্তাহে আরো দু'টি প্রেক্ষাগৃহ—জয়শ্রী ও স্বপ্না-য় (আন্দুল) ছবিটি শুরু হয়। একটানা ৬ সপ্তাহ চলার পর, ২২ নভেম্বর ১৯৫৮ তারিখে প্রাচী থেকে এবং ৮ সপ্তাহ চলার পর জলসাঘর অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ থেকে উঠে যায়। অবশ্য ১৪ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের জন্য আলেয়া-য় ছবিটি পুনরায় দেখানো হয়।

সত্যজিৎ রায়ের আগের ছবি তিনটির মতো জলসাঘর নিয়েও আলোড়ন সৃষ্টি হয় বাঙালি চলচ্চিত্র-প্রেমীদের মধ্যে। পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হলেও জলসাঘর নিয়ে পাঠকের চিঠির ঝড় ওঠে আনন্দবাজার পত্রিকায়। পক্ষে-বিপক্ষে সেই চিঠির লড়াই চলেছিল ৬ সপ্তাহ ধরে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের জুন মাসে বোম্বাই শহরে রবিবারের সকালের শো-তে জলসাঘর দেখানো হয়। এর কয়েকমাস পর ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হয়।

জলসাঘর-এর পুরস্কার

১৯৫৮ সালের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি হিসাবে জলসাঘর রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক পায়। ৬২ টি ছবির মধ্যে সেই বছর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে স্বর্ণপদক পেয়েছিল দেবকী বসু পরিচালিত 'সাগর সঙ্গমে'।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে জলসাঘর অর্জন করেছিল শ্রেষ্ঠ সংগীতের পুরস্কার।

[সম্ভবত এই ছবিতে অভিনয়ের সূত্রেই ছবি বিশ্বাস ১৯৫৯-এ সংগীত-নাটক অকাদেমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান।]

ফ্রান্সে জলসাঘর ও কম্প্যাক্ট ডিস্ক

আশির দশকের গোড়া থেকে সত্যজিৎ রায় ফ্রান্সে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন। ১৯৮১ সালে ফরাসি টেলিভিশন প্রযোজিত পিকু এবং অরণ্যের দিনরাত্রি ফরাসি টি ভি-তে দেখানোর বেশ কিছুকাল পর ওখানকার টি ভি-তেই জলসাঘর দেখানো হয়। ফরাসিদের মুগ্ধতা ও আগ্রহে এরপর জলসাঘর প্যারিসের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং ৬টি সিনেমা হলে একটানা ৬ মাস ধরে ছবিটি চলে। ছবিটির জনপ্রিয়তার কারণে ১৯৮৯ সালের গোড়ায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছে জলসাঘরের সংগীতাংশ নিয়ে ৫৬ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডের একটি 'কম্প্যাক্ট ডিস্ক'। সঙ্গে ২৭ পাতার একটি ছোট পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতে রয়েছে 'কম্প্যাক্ট

ডিস্ক' প্রকাশ উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক চিঠি, অঁরি মিচিগুলো-র জলসাঘর-বিষয়ক লেখার অংশ এবং অ্যান্ড্রু রবিনসন-গৃহীত জলসাঘর সংক্রান্ত সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার। OCORA, Radio France প্রকাশিত কম্প্যাক্ট ডিস্কটির ফরাসি নাম 'Le Salon de Musique / Satyajit Ray', নম্বর C559022.

ডিস্কটির সূচি (সংশোধিত)

১। টাইটেল মিউজিক – সানাই, সকালের রাগ ভৈরবী	২ মি. ২০ সে.
২। ফ্ল্যাশ ব্যাক – সানাই – ঘোড়ার পিঠে বিশ্বম্ভর	১ মি. ৫৬ সে
৩। জলসাঘর – বিশ্বম্ভর-মহিম সাক্ষাৎকার – প্রথম জলসার ঘোষণা।	১ মি. ৩৬ সে.
৪। উপনয়ন অনুষ্ঠান – আতস বাজি	১ মি. ৫৮ সে
৫। প্রথম জলসা – আখতারী বাঈ (লক্ষ্ণৌ)-এর ঠুমরী	৩ মি. ৩৮ সে.
৬। মহামায়ার উৎকণ্ঠা – বিশ্বম্ভরের স্বপ্ন – খোকার ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা – হাতির স্নান – খোকার সংগীত শিক্ষা	৪ মি.
৭। খোকা ও মহামায়ার বিদায় (সেতার)	১ মি. ০৭ সে.
৮। সুরবাহার – ডায়নামোর আওয়াজ – মহিমের বাড়িতে বাজি পোড়ানো	
৯। কাঙালী ভোজনের ঘোষণা – পুণ্যাহের বাদ্যি – ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ – নহবৎখানায় সানাই	১ মি. ২৫ সে.
১০। দ্বিতীয় জলসা – সালামত আলি খাঁ-র খেয়াল – খোকার মৃত্যু	৮ মি.
১১। বিচ্ছেদ-বেদনা – বিষাদগ্রস্ত বিশ্বম্ভর	১ মি. ০২ সে
১২। ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ – খোকার প্রিয় ঘোড়া তুফান, হাতি মতি – মহিমের লরি – ধুলোয় অদৃশ্য হাতি	মি. ৫৯ সে.
১৩। মহিমের বাড়িতে নিমন্ত্রণ – হাতির ঘণ্টা – মহিমের মোটর – বিলাতি বাজনা	১ মি. ৪১ সে.
১৪। বিশ্বম্ভরের জলসাঘরে পুনঃপ্রবেশ – জলসাঘরের স্মৃতি – – বিশ্বম্ভরের দম্ভ – শেষ জলসার ঘোষণা – জলসার প্রস্তুতি	
১৫। শেষ জলসা – কত্থক নর্তকী রোশনকুমারীর নাচ – মহিমের অপমান	৮ মি. ৫৯ সে.
১৬। জলসাঘরের বাতি নিভে যাওয়া – বিশ্বম্ভরের অপ্রকৃতিস্থতা – তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর ও তাঁর ও মৃত্যু	৬ মি ৪৪ সে.

কম্প্যাক্ট ডিস্ক প্রকাশ উপলক্ষে রেকর্ড কোম্পানিকে সত্যজিৎ রায়ের চিঠি

After the box office failure of my second film Aparajito (The Unvanquished), I was a little unsure as to what kind of film I should make next. After some deliberation, I decided on a film featuring singing and dancing—a farmula which usually worked with the Indian audience. I chose a popular short story—Jalsaghar—about the last days of a music loving feudal baron. The screenplay, however, developed into a serious study of decaying feudalism. The songs and dances were retained but became classical instead of popular. I was fortunate to be able to use some of the leading singers and instrumentalists for the film. As composer, I chose the great sitar virtuoso Vilayat who was most ably assisted by his younger brother Imrat Khan, also a sitar virtuoso. The two of them provided superb solos and duets for the background music for which—with the exception of violins—only Indian instruments were used. All the background score is raga-based. There is a great deal of music in the foreground too, but there is an attempt to weave it into the fabric of the plot.

I am extremely happy that a compact disc is being produced on the music of Jalsaghar.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জলসাঘর

চলচ্চিত্রোপযোগী রূপান্তর

কাল প্রত্যূষ। বিশ্বম্ভর রায় আধো আলো আঁধারির মধ্যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে চললেন—ঠাকুর বাড়ীর দিকে। জীর্ণ রায়বাড়ী—বারান্দার থামের মাথায় মাথায় কার্ণিশে পায়রা গুঞ্জন করছে, বারান্দার পাশের সারি সারি ঘরগুলি তালা বন্ধ। ঘরের ভিতর ইঁদুরের চলাফেরার এবং মধ্যে মধ্যে কিচকিচ শব্দ উঠছে মাথার উপর চামচিকে উড়ছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে থমকে দাঁড়ালেন—একটা শব্দ উঠছে—সাপে ব্যাঙ ধরেছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ডাকলেন—তারা তারা—মা! তারপর এসে উঠলেন নাট মন্দিরে। প্রণাম সেরে উঠেছেন—তখনও দাঁড়ান নি এমন সময়—সানাইয়ের সুর বাজল। সঙ্গে সঙ্গে রৌশন চৌকির ঐকতান।

রায় প্রায় চমকে উঠলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বাজনা শুনতে লাগলেন। ভৈরবীতে আলাপ সুরু হল। বাইরে তুফান ডেকে উঠল। দুতিন বার উল্লাসের ডাক। রায় সঙ্গীত মগ্নতার মধ্যেও একবার ঘাড় ফেরালেন। নিতাই সহিসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—তুফান নাচছে বহমৎ। রতন চৌকীর বাজনা শুনে বেটার রক্ত চনমনিয়ে উঠেছে। বলিহারি বেটা। বাহা-বাহা-বাহারে!

বহমৎ বললে—ছোট গিন্নি ভি নাচছে রে। বেটী পাওয়ের শিকলিতে ঘুঙুর বাজায়। বহুৎ রোজ বাজনা ওজনা শুনে না—আজ শুনেছে

রায় আবার ডেকে উঠলেন—তারা তারা মা!

তারপর এসে দাঁড়ালেন—আস্তাবলে। সারিবন্দী খালি আস্তাবলের সামনে একটি সাদা ঘোড়া। ডাকলেন—নিতাই!

চমকে উঠল নিতাই।—হুজুর! নিতাই ঘোড়াকে ডলাই মলাই করছিল। তুফান ডেকে উঠল।

এগিয়ে এলেন রায়। তুফানের মুখে হাত দিয়ে হেসে বললেন—কি রে বেটা কেমন আছিস?

তুফান মাথা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করলে।

—বাজনা শুনে নাচছিল।

কবর প্রস্তুত।

বিকাশের কথা মনের মধ্যে আসতেই তাঁহাদের মন্ত্রী- বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে চলবের- পুকুর কাটার দিকে। ছোট-বড় কোদালী- [illegible] কোদাল নামিয়ে মাটি কাটা শুরু করল, কাদা-মাটির পাশের মাটি মাটি ঘর মাটির ওপরে পড়ে। ঘরের ভিতর ইন্দুর চলাফেরার [illegible] করে মাটিমাটি কিচকিচ শব্দ উঠছে, ঘরের উপর চলাফেরার উঠছে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একে একে দাঁড়াচ্ছে- মুখে শব্দ উঠছে- সাপের ফোঁস শুনছে।

মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে চলবের- [illegible]- চলে চলে- চল। উপর [illegible] চলে এসে উঠবের পাশে দাঁড়াচ্ছে। সুযোগ বুঝে উঠছে- একটা দাঁড়াচ্ছে নিচে কথা বলে- সাপটিকে ধুয়ে নিচ্ছে। [illegible] মনে মনে ভাবছে বিকাশ।

বেশ কিছু ঘরের উঠবের। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পুকুর ভরাট করছে। তাঁহাদের মাঝখান [illegible] মুক্ত হয়। বাইরে মুখের ভাব উঠল। মুখোমুখি উপরের ভাব। বড় সাপটি ধনুকের মতন মুখের ঘাড় নামাচ্ছে। নিচে সাপটির লেজের ভাগে এল।- মুখের কাছে ঘুরছে। [illegible] বড় সাপটি পুকুর ভরে ফেলে ঘরের ওপরে উঠছে। সাপটির ফোঁস! ফোঁস- ফোঁস- ফোঁস।

ঘরের ভিতর - ইন্দুর কিচকিচ ও শব্দ নেই। বড় সাপের ফোঁসানি খুব শুনছে! বড় কোন কারণে হয়ত ওর মা- মারা গেছে— ।

নিতাই বললে—ঘুড়ুর ছিঁড়ে গিয়েছে হুজুর—তাই বেঁধে ছেঁদে পরিয়ে দেব হুজুর ?

না। তুফান রোগা হয়ে গেছে রে! দানা ঠিক পাচ্ছে না বোধ হয় ? হাঁ-হাঁ বেটা বহুত আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা!

তুফানের নাচের তারিফ করলেন!

না হুজুর, দানা ঠিক আছে। রসগুল্লা অবিশ্যি পায় না। কিন্তু ওর তাগদ ঠিক আছে। চালও তেমনি আছে। ওর দুখ্ শুধু হুজুরকে সওয়ার পায় না

রায় গলা ঝেড়ে উঠলেন—নিতাই থেমে গেল। তুফান মাথা নাড়লে।

বহমৎ এসে দাঁড়াল—সেলাম করে বললে ছোটি গিন্নী শিকলি ছিঁড়ে দিবে হুজুর। হুজুরের গলার সাড়া পেয়েছে—

রায় অগ্রসর হলেন—নেহি বেটি চুপসে খাড়ি রহনা! বেটি-বেটি-বেটি-বেটি!

ছোট গিন্নীর সামনে এসে শুঁড়ে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন।

ছোট গিন্নী শুঁড় দুলিয়ে গা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। হঠাৎ শুঁড়টা বেঁকিয়ে ধরলে। এটা তাঁকে উঠতে অনুরোধ!

বহমৎ স্মরণ করিয়ে দিলে—হুজুরকে সওয়ার হতে বলছে।

রায় ছোটগিন্নীকে বললেন—উঁহু। উঁহু। উঁহু! বলো না। বলতে নেই। আমাকে আর চড়তে নেই। আমাকে আর বাইরে বেরুতে নেই বেটি। উঁ-হু!

বাইরে মোটরের শব্দ হল। চকিত হলেন রায়। এবং দ্রুতপদে ফিরলেন।

রায় বাড়ীর ভাঙা কাছারী বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল মহিম ঘোষালের নতুন মোটর।

এরই মধ্যে ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছে। সেই আলোয় রায়-বাড়ীর পুরানো কাছারীর জীর্ণতা সকরুণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সিঁড়ির ধারিগুলি ভেঙে গেছে। ঠাঁই ঠাঁই খোয়া উঠেছে। থামের গায়ের পলেস্তারা ছেড়েছে। কোণে কোণে মাকড়সার জাল। ঝুল ঝুলছে। থামের মাথায় পাখীর বাসার খড় কুটো বেরিয়ে আছে। সামনে বাগানের কেয়ারিতে গাছগুলি শুকিয়ে গেছে। তার পাশে পড়ে আছে একটা মরা প্রজাপতি—একটা মরা ভ্রমর।

নায়েব তারাপ্রসন্ন বেরিয়ে এলেন।

মোটর থেকে নামলেন বর্ত্তমানের মহাজন ধনী এবং জমিদার—মহিম ঘোষাল। সাজ সজ্জায় আধুনিকতা এবং ঐশ্বর্য্যের উগ্র ছাপ। নেমেই উচ্চকণ্ঠে বললেন—জয় রায় হুজুর! দরবার অবাধ্য—পুত্র অবাধ্য—, কাজেই নিজে এলাম। তারাপ্রসন্নকে প্রায় নজরেই আনলেন না।

তারাপ্রসন্ন আতিশয্যহীন সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন—এস-এস বাবা মহিম এস।

—এলাম। হাসলে তাচ্ছিল্য বললেন—ছেলেটা বলে—সে তো বড়লোকের ছেলে—চড়া মেজাজ—বলে—ওদের ওখানে গেলে ওরা তুমি বলে কথা বলে।

আমি ওখানে যাব না। আমি বলি—ওরে বেটা তুই ও তুমির মর্ম বুঝবি কি? বড়লোক হলি কোত্থেকে? সব ওই রায়বাড়ী থেকে। আমার বাবা—রায়বাড়ীর আশ্রয়ে সুদি কারবার করতেন—পুঁজি তিন চার হাজার। রায়বাড়ীর আয় তখন—বছরে আশী হাজার।

—বস—বাবা—বস!

নিজেই একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন, নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে দিলেন।

মহিম নিজের রুমাল বের করে তার উপর আবার ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—না-না-না। আমি নিজেই নিচ্ছি ঝেড়ে। তারপর বসবার আগে বললেন—ওঃ এ যে মন দরদে ধুলো! কতকাল ঝাড়া হয় নি? চাকর বাকর নেই বুঝি?

চারিদিক তাকিয়ে দেখে বললেন—এঃ এ কি দশা হয়েছে? খোয়া উঠে শলেস্তারা ছেড়ে—ঘর চটে—এঃ—। ওঃ—কাটও একটা দেখা দিয়েছে দেখছি! মেরামত করান—একবার মেরামত করান! ওঃ সেই রায়বাড়ী!

তারাপ্রসন্ন মর্যাদার সঙ্গে বললেন—ও কথা থাক মহিম! কালের গতি! বড়লোক মথুরাপুরীই নাই তো রায়বাড়ী!

—উঁহু-উঁহু। তা ব'লে এত শিগ্‌গির রায়বাড়ী যেতে না। গেল নিজেদের দোষে। পঁচিশ বছর আগে রায়বাড়ী যাবে আমি চোখে দেখতে পেয়েছিলাম। সে আমি দিব্যচক্ষে দেখেছিলাম—বুঝেছেন? ওঃ—তখন আমার বয়স বিশ বছর। আমি তখন ঠাকুরদাকে চিনি না ভাল ক'রে। তখন আমাদের বাড়ী কীর্তিহাটায়। তাও আমি সেখানে থাকতাম না। ছেলেবেলায় মা মরে আমি তো প্রথম বয়সটা মামার বাড়ীতে মানুষ! সবে ইস্কুল ছেড়ে মামার বাড়ী ছেড়ে কীর্তিহাটায় এসেছি—সেদিন ভোর বেলা—কার্তিহাটে রেখো বৈরাগীর বাড়ীতে এসেছি—ধারের টাকা আদায়ের জন্যে—রেখো—আমার পিসীর কাছে টাকা ধার নিয়েছিল পিসী সদ্য মরেছে। মরবার সময় তার যা কিছু আমাকে দিয়ে গেছে। আজও আমার মনে জ্বল জ্বল করছে—চোখের সামনে ভাসছে—

মহিমের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল—অতীত স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া উঠিল।

পাকা সড়কের পাশে একখানি গ্রাম। সড়কের একপাশে মাঠ অন্যপাশে গ্রামের প্রান্তের গাছপালা, তালগাছ ও বাগানওয়ালা পুকুর। গাছপালার মধ্যে বসতির খড়ের চাল দেখা যায়। পথের পাশে গ্রামপ্রান্তে দুই তিন ঘর দরিদ্রের বসতি। তাহারই মধ্যে একখানি ঘর রাধু বৈরাগীর।

রাধু বৈরাগীর উঠানে—একটি বাচ্চা গাইয়ের গলার দড়ি ধরে টানছে তরুণ মহিম, নিতান্তই গ্রাম্য বেশ, গ্রাম্য চেহারা, আর সেই গাইটির গলা জড়িয়ে ধ'রে আছে রাধুর তরুণী বিধবা মেয়ে। চোখে তার জলের ধারা। সে বলছে—না-না-না। দেব না—দেব না। এ গাই আমার। বাবার নয়। আমি দেব না।

মহিম টানছে—ছাড় বলছি, ছাড়। রোজ রোজ চালাকি। ভোর না-হতে

গাইটাকে ছেড়ে দিল। আজ ধরেছি। হেঁচকা টান মারলে। মেয়েটা চীৎকার করে উঠল—বাবা!

রাধু বৈরাগী নীরব।

মহিম আবার টেনে বললে—বাবার বাবাও আজ কিছু করতে পারবে না। দশটাকা নিয়েছ আজ চার বছর। চার বছরের সুদের মধ্যে চৌদ্দ মাসের সুদ পেয়েছি—আর এক পয়সা দাও নি। এই গাই বিক্রী ক'রে যা হয় উশুল করব আমি।

রাস্তায় দূরে আসছিল এক অশ্বারোহী। শাদা ঘোড়া। সওয়ারের পোশাক শাদা। মাথায় শাদা পাগড়ী। মুখ দাড়ী গোঁফ, গালপাট্টা ক'রে বাঁধা।

রাধুর বাড়ীর সামনে এসেই রাশ টেনে ধরে দাঁড়ালেন।

অশ্বারোহী বিশম্ভর রায়। বয়স তখন ত্রিশ বত্রিশ।

মেয়েটির কান্না থেমে গেল।

রাধু সভয়ে সসম্ভ্রমে প্রণত হল।

মহিম ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল। তাতে প্রশ্ন—এ কে? হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল—কেয়া? কেয়া দেখতা হ্যায় শিখলী?

বিশম্ভর সকৌতুকে মৃদু হাসি গোপন ক'রে বললেন, কাঁহাঘর হ্যায় বাবুজীকা?

—হিঁয়া। এই গাঁয়ে মে।

হেসে রায় বললেন—সচ্ বাৎ? এই গাঁয়ে মে? তো কেয়া হুয়া বাবুজী? কেয়া ঝামেলা? ইয়ে লেড়কী রোতি কিঁউ? কি রে বেধো—মেয়ে কাঁদছে কেন? এ ছেলেটি কে?

—আজ্ঞে হুজুর নবীন ঘোষাল মশায়ের ছেলে। আমার কাছে টাকা পাবেন—চার বছর আগে দশ টাকা নিয়েছিলাম—মাসে দশ আনা ক'রে সুদ শোধ চৌদ্দমাস দিয়ে আর দিতে পারি নাই। তাই উনি গরুটি ধরেছেন—কিন্তুক গরুটি আমার বিধবা কন্যের—ও উটিকে সন্তানের মত পেলেছে—

রায় হুজুর বললেন—হুঁ। (মহিমের প্রতি) কি নাম তোমার—মহিম বললে না রাধু?

মহিম—(বিস্ময় ও শঙ্কা মিশ্রিত ভাবে)—হ্যাঁ।

—ছেড়ে দাও গাইটা। তোমার বাবাকে বলো আমি ছেড়ে দিতে বলেছি। আর তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

—আপনি কে?

—তুমি বুঝি নবীন ঘোষালের প্রথম পক্ষের ছেলে। মামার বাড়ীতে থাকতে? তাই আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছিলে।

এরই মধ্যে রাধু বার বার ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে দিলে—রায় হুজুর—উনি রায় হুজুর।

—হ্যাঁ। রাধুর কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন রায়। তিনি বললেন—হ্যাঁ। আমি বিশম্ভর রায়। ছেড়ে দাও গরুটা। আর তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আমার নাম করো, সে তোমাকে কিছু বলবে না।

মহিম কিন্তু গরু ছাড়লে না। বললে—এ টাকা তো বাবার পাওনা নয়।

—তবে?

—এ আমার টাকা।

—তোমার? তুমিও মহাজনী করছ না কি?

—আমার পিসীমা মরবার সময় তার সব আমাকে দিয়ে গিয়েছে। এ টাকা রাধু আমার পিসীর কাছে নিয়েছিল। এ আমার টাকা।

—তা হলে, তুমিই আমার সঙ্গে দেখা করবে রায়হাটে গিয়ে। গরুটা এখন ছেড়ে দাও। আমার এলাকায় শতকরা মাসিক একটাকার বেশী সুদ নেই, খুচরো টাকায় মাসিক এক পয়সার বেশী সুদ নেই। সেই হিসেবে যা পাওনা হবে—তাই নিয়ে আসবে গিয়ে কাছারী থেকে। যে টাকা রাধু দিয়েছে সেটা বাদ যাবে। বুঝেছ?

মহিম গোঁ ভরে বললে—আপনাদের জমিদারীতে বাকী খাজনায় সুদ টাকায় সিকি—

—না। রায়বাড়ীর এলাকায় বাকী খাজনায় সুদ নেই। খাজনার কখনও তামাদি নেই। নালিশ নেই। রায়দের এলাকায় মহাজনী করছ—এগুলো জেনে রেখো। এখন গাইটা ছেড়ে দাও। ছেড়ে দা-ও।

(মহিমের হাত থেকে দড়িটা খসে পড়ে গেল)

—কাল কাছারীতে যাবে—নইলে চাপরাশী আসবে—বুঝেছ? রায় রাধুকে বললেন—রাধু কাছারীতে গিয়ে একদিন গান শুনিয়ে আসবি। রায়ের ঘোড়া ছুটল।

মহিম পরদিন এল রায়বাড়ীর কাছারীতে।

সে কাছারী জমজমাট কাছারী। নায়েব-গমস্তা-পাইক-পেয়াদা-চাপরাশী; লোকজন গিস্ গিস্ করছে।

খাজাঞ্চির কাছে সে টাকা পেলে—খাজাঞ্চি বললে—এই তোমার পাওনা হিসেব—এই তোমার পাওনা আটটাকা চার আনা। এই রসিদে এইখানে সই কর।

সই ক'রে টাকা নিয়ে মহিম খানিকটা হাঁ ক'রে বসে রইল। তারপর উঠল—বললে—একবার সব ঘুরে দেখব?

খাজাঞ্চি—দেখ না।

আর একজন ইতিমধ্যে এসে দাঁড়াল—একটা চিরকুট দিয়ে—সেলাম ক'রে দাঁড়াল। একজন লাঠিয়াল। কপালে একটা ফেটি জড়ানো। তাতে খানিকটা রক্তের দাগের আভাস।

খাজাঞ্চি—কপাল কাটিয়েছিল ?

হেসে সে বললে—লেগে গেল ফটাস করে—কি করব ? বেকায়দা হয়ে খেয়েছেন একটুকুন—। তা সে বেটার মাথাটা কাঁকুড় কাটা করে দিয়েছি।

—মরবে না কি ?

—কি জানি ? তবে জান শক্ত। ভদ্দ নোক হলে বাঁচত না। ই বাঁচবে। তবে ছ মাস এখন ঘি রুটি খেতে হবে।

—চর দখল হয়েছে তো ?

—না-হলে বকশিসের চিরকুট নিয়ে আসতাম কোন মুখে ? সে হয়ে খেয়েছে। শুধু দখল নয়, পেলাম দিয়ে মোড়ল বেটার কান মলে দিয়ে এসেছি।

মহিম সভয়ে বের হয়ে এল।

যে ঘরে পড়ল—সে ঘরে গমস্তাদের কাগজ মিল হচ্ছে। গুঞ্জনে মুখরিত।

খোকা মিল করছে দুজনে—

১ম :—৭২ নং প্রজা—রামচন্দ্র পাল—

২য় :—হুঁ। (কাগজে টিপ মারিল)

১ম :—পিতা ৺গগন পাল সাকিম মহলা—জমি দশ বিঘা আট কাঠা তিন গণ্ডা ন-ছটাক—জমা—পনের টাকা বারো আনা দশ গণ্ডা দু কড়া দু কান্তি—

অন্য স্থলে—কাগজ মিল হচ্ছে—

মৌজা ৫৭৭ নং লাট কবনপুর। পরগনে আলমশাহী—একপ্রস্ত খোকা বন্দী—একপ্রস্ত—সেহা—একপ্রস্ত—জমাওয়াশীল বাকী !

এরই মধ্যে চাকর কল্কে দিচ্ছে কর্মচারীর ডাবা হুঁকোর মাথায় পরিয়ে। জলের গেলাস দিচ্ছে।

কেউ ওরই মধ্যে ঘুমুচ্ছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে ঘুমুচ্ছে।

কেউ আফিংয়ের সফ গুলি বের ক'রে মুখে ফেলে গিলে জল খাচ্ছে।

মধ্যে মধ্যে দুজনে জোড় বেঁধে এসে ঢুকে আসনে বসছে। কেউ কারুর কানে কানে ফিস ফিস করে কিছু বলছে।

কেউ যোগ করছে—এক পোন দু পোন তিন পোন—তিন তিন তিন—তিন আর তিনে ছয়, ছয় দুই আট—আট তিন এগার—এগারে বারো পনের—আঠারো (টিপ মারলে)—একুশ—একুশের এক পোন—হাতে রইল পাঁচ চোক—, পাঁচ তিন আট আট দুই দশ—বারো পনের আঠারো উনিশ-উনিশ বাইশ—দুই চব্বিশ দুই ছাব্বিশ—

বাইরে হাঁক উঠছে—পয়ষট্টি লাট নং লাট বালিয়াড়ার গমস্তা মশায়—বিশ্বেশ্বর হালদার—।

এরই মধ্যে ঘর অতিক্রম করে একান্তে একটি ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল

মহিম। স্থানটা নির্জন কাছারীর সামনের অংশের উল্টা দিক। ঘরের কোলে টানা বারান্দা। সামনে উঠান। ঘরের দরজার মাথায় লেখা নায়েব তারাপ্রসন্ন মজুমদার। ঘরের ভিতর থেকে কথার শব্দ আসছে—

—Bank আর টাকা দেবে না তারাপ্রসন্ন বাবু। তাদের সঙ্গে জমিদারী মর্টগেজ রেখে যে পাঁচ লাখ টাকার বন্দোবস্ত ছিল—সে টাকার উপরেও তারা টাকা দিয়েছে।

—হুজুর তা জানেন ম্যানেজার বাবু।

—তা হ'লে? এ অবস্থায় অজন্মা হয়েছে বলে এ বছর মহালে খাজনা আদায় রাখার ব্যবস্থা পিতৃ পুরুষে ক'রে গিয়েছেন বলে বহাল রাখলে তো চলবে না! সুন্দরপুর পরগনাতে কম আদায় নয়—তিরিশ হাজার টাকা!

—আরও বেশী। ছত্রিশ হাজার টাকা।

—তবে? এর উপর সে দিন ম্যাজেস্ট্রেট সাহেবকে কলেজের জন্য পাঁচ হাজার চাঁদা সই করে দিয়েছেন। হাসপাতালের চাঁদার হাজার খানেক টাকা এখন বাকী আছে। এ আমি চালাব কি ক'রে? আপনি চলুন—কত্তাকে বলুন আমার সঙ্গে।

—আমি বলেছিলাম ম্যানেজার বাবু।

—কি বললেন?

—বললেন—সে হয় না তারাপ্রসন্ন।

—সে হয় না? কি ব্যবস্থা কি হবে?

—বললেন—আগের আমলের রায়গিন্নীদের গয়নাগুলো সিন্দুকে জমা হয়ে রয়েছে—ওগুলি ব্যাঙ্কের কাছে রেখে—চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার যা দরকার হয় নিয়ে এস।

—ও গেলে আর ঘর ঢুকবে না তারাপ্রসন্ন বাবু। এই শেষ।

বাহিরে মহিম যেখানে দাঁড়িয়ে শুনছিল—তার সামনে উঠানটায়—জালে ঘেরা ঘরে এক জোড়া ময়ূর খেলা করছিল। ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক জোড়া হরিণ। একপাশে পড়েছিল একটা বাঘের খাঁচা। বাঁক বন্দী পায়রা ছড়ান দানা খাচ্ছিল।

হঠাৎ এই মুহূর্তটিতে অর্থাৎ ম্যানেজারের কণ্ঠস্বরোচ্চারিত ওই কথাটি—'এই শেষ' শেষ হবা মাত্র উঠল কোথা থেকে বিশ্বম্ভর রায়ের উচ্চ অট্টহাস্য—হা-হা-হা-হা-হা-হা।

পায়রার ঝাঁক সে হাসিতে চকিত হয়ে উড়ে গেল।

বিশ্বম্ভর রায় যেন অট্ট হেসে উত্তর দিলেন—কুচ পরোয়া নেহি।

পায়রারা যেন—সুখের পায়রাদের—বাসের কাল শেষ হল বলে উড়ল।

মহিম চমকে উঠল সে হাসিতে।

পরমুহূর্তেই বিশ্বম্ভর রায়ের কৌতুক কঠোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—হাসির রেশ মিশিয়ে বললেন কত টাকা করেছিল রে বেটা—ফুলাওয়ালা—ডাল সরবেওয়ালা?

এক লাখ ? দেড়লাখ ? অাঁ ?

মহিম আত্মসম্বরণ করতে পারলে না—সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

এসে হাজির হল—বিশ্বম্ভর রায়ের খাস কামরার জানালার ধারে। এ দিকটা কামরার পিছন দিক। জানালা থেকেই দেখা যায়—ওদিকে বারান্দায় চাপরাশী ঘুমুচ্ছে। বড় দরজায় পর্দা ঝুলছে। এ দিকেও একটি ছোট দরজা—সেখানেও পর্দা। বিশ্বম্ভরের হাতে শটকার নল। তাকিয়ার উপর বুক রেখে অর্দ্ধশায়িত।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্থানীয় ভাল সরষের ব্যবসাদার—

সজ্জন লাল। পশ্চিমা।

বিশ্বম্ভর বলছিলেন—বাঈ হলেই কসবী হয় না রে বেটা ভালওয়ালা। আমার এখানে যে বাঈ সাহেবারা আসে তারা কসবী নয়। তারা—গীত গাইতে আসে। বুঝলি।

—হাঁ হুজুর। ওহি গীত শোনে লিয়ে হম অদমী ভেজিয়েছিলো—রামজী জানে—

—চোপ রও হারামজাদা। সরস্বতী বাঈ আমাকে মিছে কথা লিখেছে ? সরস্বতী বাঈ তার মেয়ে কৃষ্ণা বাঈকে নিয়ে নৌকোতে রওনা হবার পর—টাকার লোভ দেখিয়ে রাজী করতে না-পেরে তুই লোকজন নিয়ে তার নৌকো জোর করে আটকাতে চেয়েছিলি কি না ? কুৎসিৎ কথা বলেছিলি কি না ?

—নেহি হুজুর—গীত শোনে কে লিয়ে—

—গীত বুঝিস ?

—গীত হমি খুব ভালবাসে হুজুর। ধরম জানে—

—হুঁ। এই তো সেল মাসে ওস্তাদ লালত বর্মা এসেছিলেন। এমন গান। তার গীত শুনবার জন্যে তো ইচ্ছে হয় নি তোর ? পাঠিয়েছিলি লোক ? ছ মাস আগে—ষাঠ বছর বয়সের রৌশন বাঈ এসেছিল—তার গান শুনতে ইচ্ছে হয় নি ? ষোল বছরের কৃষ্ণাবাঈকে দেখে বেটা ভালওয়ালা—সঙ্গীত রসিক হয়ে উঠল !

(এবার উঠে বসলেন)

আমার ইচ্ছে হচ্ছে বেটাকে গাধার টুপি পরিয়ে বাজারটা ঘুরিয়ে আনি। হাতে পায়ে বেঁধে পাঠিয়ে দি কাশীতে সরস্বতী বাঈয়ের পায়ের তলায়। শোন্ ভালওয়ালা—এর জন্যে জরিমানা হ'ল তোর পাঁচশো টাকা। আর সাতদিনের মধ্যে আমার এলাকা ছেড়ে তোকে চলে যেতে হবে। সাতদিনের মধ্যে—। আট দিনের দিন তোকে এ এলাকায় দেখতে পেলে—চাবুক মেরে তোর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেব। ভূপ সিং—(দারোয়ান প্রবেশ করে দাঁড়াল) লে যাও। হামারা হুকুম শুনা হ্যায় ?

ভূপ সিং সেলাম করে বললে—হাঁ হুজুর।

—ঠিক হ্যায়। অরিমানাকে রুপেয়া আদায় করকে তব ছোড়না।

—হুজুর।

—যাও। ইধর।

ভূপ সিং সজ্জন লালকে নিয়ে বেরিয়ে এল মহিম যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই বারান্দায়। সজ্জন লাল শুধুই বলছিল—হুজুর! হুজুর মেহেরবান! হুজুর মায়বাপ। ভূপ সিং দিল ধমক।

সেই ধমকে মহিম উঠল চমকে। ছুটে পালাতে গিয়ে কাপড়ে পা বেধে গেল পড়ে।

ভূপ সিং বলে উঠল—এই কোন হ্যায় তুম? বলেই এসে ধরল মহিমকে।

ঘরের মধ্য বিশ্বম্ভর বললেন—কে?

ভূপসিং মহিমকে টেনে তুলে—ঘরের মধ্যে হাজির করলে।

বিশ্বম্ভর রায় ওকে দেখেই চিনে বললেন—আরে—বাচ্চা মহাজন? তুমি? জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বুঝি সজ্জন লালের বিচার দেখছিলে?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে মহিম বললে—আমি ময়ূর হরিণ দেখছিলাম—

—সজ্জনের বিচার দেখ নি? তবে জানলার ধারে পড়লে কি করে?

—দেখেছি। একটু জল খাব।

—অনন্ত। একে জল খাওয়া রে।

অনন্তের সঙ্গে মহিম চলে গেল। রায় হাসতে লাগলেন কৌতুকে অট্টহাসি।

অনন্ত মহিমের সামনে ছাদের উপর থেকে খানিকটা পলেস্তারা খসে পড়ল। পড়ল যেন ওই হাসির ধমকে।

দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর পর আজকের ধনী মহিম—নিজের নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিশ্বম্ভর রায়কে নিমন্ত্রণ করতে এসে সেই কথা স্মরণ না ক'রে পারলে না। মুখ তার কঠিন হয়ে উঠল। চোয়াল দুটো প্রকট হল—। কয়েকটা নিশ্বাস ফেললে সাপের মত। চোখ দুটো স্থির হয়ে গিয়েছিল—স্থির দৃষ্টি দিয়ে অতীতের অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখছিল—পঁচিশ বছর আগের দৃশ্য।

তারাপ্রসন্ন এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন—বললেন—সে সব কথা এতকাল পর তুলে তো লাভ নেই মহিম বাবু।

—নাঃ তা নেই।

সিগারেট কেস বের ক'রে সিগারেট ধরালেন। বেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তা হ'লে একবার কর্তার কাছে এত্তেলা পাঠান। এত্তেলার নিয়ম এখনও আছে না কি?

তারাপ্রসন্ন উত্তর দিলেন না।

মহিম আবার বললেন—বলুন—আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। নিজে এসেছি। আমার প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন।

তারাপ্রসন্ন সবিস্ময়ে এবং সশঙ্কিত ভাবে বললেন—নি-ম-ন্ত্র-ণ—! ক-র্ত্তা-কে! উনি তো—

মহিম বললেন—এখানে উনি কোথাও যান না জানি। কিন্তু আমার বাড়ী মাটির বাড়ী নয়, মেঝেতে মার্বেল বসিয়েছি আমার বাড়ীতে রুপোর থালার সেট আছে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। পায়ে গায়ে একছিটে ধুলো লাগতে আমি দেব না। আমার অনেক সাধ। আমার প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন!

অস্বস্তিভরে তারাপ্রসন্ন চঞ্চল হয়ে একবার মাথা চুলকে একবার একটু ঘুরে একবার কেশে নিয়ে বললেন—না-না। শরীর ওঁর খারাপ। নইলে আগে তো প্রতি বাড়ীর ক্রিয়াতে উনি গিয়ে দাঁড়াতেন। তারপর—একদিনে স্ত্রী পুত্র কন্যা শেষ। এরপর—আর যদি দাঁড়াতে না-পেরে থাকেন—তবে কি আর দোষ দিতে পারে কেউ? তাও গ্রামে নয়—গ্রামান্তরে।

—বেশ তো—আপনি গিয়ে বলুন—আমি এসেছি, আমি দেখা করি—নিজে বলি, দেখি কি বলেন? শুনেই যাই নিজের কানে! আচ্ছা—আমি নিজেই যাই।

(উঠে দাঁড়ান)

তারাপ্রসন্ন চঞ্চল হয়ে উঠে হঠাৎ বলে উঠলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাবা মহিম। আগে আলো আনতে বলি। সিঁড়িটাতে বড় সাপের উপদ্রব হয়েছে। বাবা মহিম।

মহিম থেমে গেল। প্রায় চমকে থেমে গেল। হাস্যকর চমক নয়।—সাপ? সাপের উপদ্রব হয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা, সিঁড়িটায় অনেক জায়গা ফেটেছে। প্রায় খোলস দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে চিতি সাপ বের হয়। আমি আলো আনতে বলি। তুমি বস।

মহিম ফিরে এল। তারাপ্রসন্ন ওরে-ওরে বলতে বলতে চলে গেলেন। খানিকটা ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং ফিরলেন।

মহিম সিগারেট খাচ্ছিল। এবং ঘরের কাটল লক্ষ্য করছিল।

তারাপ্রসন্ন ফিরে এসে বললেন—আনছে আলো। কিন্তু দেখা হ'তে তো দেরী হবে মহিম বাবু! উনি তো সন্ধ্যায় বসছেন। কাপড়টি সদ্য ছেড়েছেন।—এখন অন্তত একঘণ্টা।

—তা বেশ তো, উনি আহ্নিক করুন না। করতে করতেই কথা হবে।

—তা হয় না মহিম বাবু, সে হুকুম কোন কালে কারও নেই। তুমি জান না—একমাত্র ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে অজ্ঞান হয়ে গেল—উনি তখন আহ্নিকে বসেছেন—গিন্নী মা বলতে তিনবার গিয়ে তিনবার ফিরে এলেন। ব্যাঘাত করতে পারলেন না। ডাকলেও উনি উঠতেন না; ওঠা দূরের কথা চোখ

মেলেও তাকাতেন না। আমিও তাকতে পারব না, তোমাকেও তাকতে দেব না। তুমি বরং আমার কাছে পত্র রেখে যাও, আমি দেব, বলব তুমি নিজে এসেছিলে। বারবার ক'রে ব'লে গেছ।

[অসমাপ্ত]

প্রসঙ্গত

'জলসাঘর'-এর চিত্রনাট্য লেখার প্রয়াসে উপন্যাসের অসমাপ্ত খসড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত ১৯৫৮-র শেষদিকে কোনো সময়ে লেখেন—একটি ফুল-টানা একসারসাইজ খাতায় মোট ১৭ পৃষ্ঠা—সুন্দর হস্তাক্ষরে কাগজের একদিকে। নবীন চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অনুরোধেই সেদিন এ-কাজে তিনি হাত দেন। ঠিক চিত্রনাট্য নয়, কাহিনীর চলচ্চিত্রোপযোগী বিন্যাস। বলা বাহুল্য, 'জলসাঘর' নামে তাঁর প্রকাশিত ছোটগল্পটি থেকে এটি প্রায় আলাদা এক কাহিনী হতে চলেছিল। লেখাটি এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অবস্থাতেই এটি লেখক তুলে দেন চিত্র-পরিচালকের হাতে—যদি তাঁর কোনো কাজে লাগে এই আশায়। অপ্রকাশিত এই লেখা তারাশঙ্করের মতো শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের এক অজানা প্রয়াসের সাক্ষী। তাগ্যক্রমে নিজস্ব কাগজপত্রের মধ্য থেকে এটিকে উদ্ধার করেছেন সত্যজিৎ রায়। জলসাঘর চিত্রনাট্য প্রকাশ উপলক্ষে এটিকে পুরোপুরি প্রকাশ করা হল। লেখাটি সম্পর্কে 'পরিচালকের কথা'-য় সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য জানা যায়। কোনো কোনো দিক থেকে অবশ্যই এ-লেখার উল্লেখযোগ্য মূল্য আছে। প্রকাশের জন্য সত্যজিৎ রায় ও লেখক-পুত্র সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি। স. এ.।

সত্যজিৎ রায়

ছবি বিশ্বাস প্রসঙ্গে

১

ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার সাড়ে তিনবার। 'সাড়ে' এই কারণে যে, 'পরশ পাথর' ছবিটিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন একটি মাত্র দৃশ্যে, এবং তাও 'অতিথি-অভিনেতা' হিসাবে – বেনামে এবং বিনা পারিশ্রমিকে। বাকি তিনখানা ছবি হল 'জলসাঘর', 'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। তাঁর উপযুক্ত আরো অনেক চরিত্র, অনেক কাহিনী আমার পরিকল্পনায় ছিল। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে একটি কমেডি ছবির মোটামুটি কাঠামোও আমার তৈরি ছিল। এ-সবই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হয়েছে। হয়ত এসব কাহিনী, এসব চরিত্র আর কোনোদিনই চলচ্চিত্রে রূপ পাবে না ; কারণ অভিনয় দক্ষতায়, ব্যক্তিত্বে, চেহারায় ও বাচনভঙ্গিতে ছবি বিশ্বাসের জুড়ি আর নেই, এবং অচিরে আবির্ভূত হবার সম্ভাবনাও নেই। তাই আক্ষেপ হয় সত্যিই, কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হয় যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে এতবার কাজ করার সুযোগ পাওয়া, এবং তাঁর কাছে থেকে তাঁকে মানুষ হিসাবে চিনে বন্ধু হিসাবে পাওয়া – এ সত্যি সৌভাগ্যের কথা।

২

ছবি বাবুর মতো অভিনেতা না থাকলে 'জলসাঘর'-এর মতো কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হতো কিনা জানি না। বোধ হয় না। একদিকে বিশ্বম্ভর রায়ের দম্ভ ও অবিমৃষ্যকারিতা, অন্য দিকে তার পুত্রবাৎসল্য ও সংগীতপ্রিয়তা এবং সব শেষে তার পতনের ট্র্যাজিডি – একাধারে সবগুলির অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 'অপরাজিত'-র আর্থিক ব্যর্থতার পর কোনো একটি অপেক্ষাকৃত নাটকীয় বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। সেই সঙ্গে সংগীতের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হেতু একটা Musical ছবি করার ইচ্ছাও মনে জাগছিল। তারাশঙ্করের গল্পে দেখলাম, দুইয়ের চমৎকার সমাবেশ – একেবারে সোনায় সোহাগা। গল্প সম্বন্ধে মন স্থির ক'রে ছবি বাবুর কাছে তলব পাঠানো গেল – তিনি কি বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হবেন ?

জবাবের পরিবর্তে ছবি বাবু নিজেই আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

সেটা ছিল শীতকালের সন্ধ্যা। ছবি বাবুর পরনে গরম স্যুট। আমার বৈঠকখানার আরামকেদারায় বসে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে তিনি আমার প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'পার্ট তো আমার খুবই পছন্দ হয়; এককালে ওটাকে নাটক ক'রে অভিনয় করবার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে—ঘোড়ার ব্যাপারটা কি করবেন?'

এটা সম্বন্ধে আমারও অবশ্যি কিঞ্চিৎ উদ্বেগ ছিল। অশ্বপ্রীতি ও অশ্বারোহণ বিশ্বম্ভর চরিত্রের একটা প্রধান দিক। ওটা বাদে ছবি হয় না—অথচ বিশ্বাস মশাই কি ঘোড়া চড়তে জানেন? জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'নো স্যার। ও কর্মটি করি নি কখনো। আর, এ বয়সে ওসব জিনিস আর শেখা যায় বলেও বিশ্বাস করিনে।'

আমি ভেবে বললাম, 'আর কিছু না হোক, ঘোড়ায় মাউন্টিং এবং আন-মাউন্টিংটা শিখে ফেলুন। ঘোড়া ছোটানোর ব্যাপারে আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। ফিল্মে ধোঁকা দেওয়ার পন্থা অনেক আছে।'

ঘোড়ার পিঠে ওঠা এবং পিঠ থেকে নামার ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ মনে হয়—কাজে তত নয়। বিশেষ ক'রে পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়ের পক্ষে তো নয়ই। রাইডিং স্কুলে সাত দিন দৈনিক এক ঘণ্টা অভ্যাসের পর ছবি বাবু ব্যাপারটা মোটামুটি রপ্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে সারা 'জলসাঘর' ছবিতে একটি বার ছবি বাবুকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখানো হয়েছে, এবং তার জন্যেই এত মেহনৎ।

আরো অনেক বড় অভিনেতার মতোই ছবি বাবুরও কতকগুলি 'বাই' ছিল। এক হল মেক-আপের ব্যাপারে। ফিল্মের চেয়ে যাত্রা-থিয়েটারের মেক-আপ অনেক সহজ। এক ক্লোজ-আপে ক্যামেরার চোখ দিয়ে মেক-আপের যে-সব ত্রুটি ধরা পড়ে, মঞ্চ অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের ব্যবধান হেতু মঞ্চের মেক-আপের ত্রুটি সে-ভাবে ধরা পড়ে না। শুধু তাই নয়, মঞ্চে স্বাভাবিক মেক-আপের শিল্পগত তাগিদও কম। কারণ সেখানে বাস্তব বা বাস্তবানুগ পরিবেশে অভিনয় হচ্ছে না, হচ্ছে কৃত্রিম তিন দেওয়াল বিশিষ্ট দৃশ্যের মধ্যে। সুতরাং কিছুটা রং-চড়ানো মেক-আপ মঞ্চের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যেসব চলচ্চিত্র স্বাভাবিক পরিবেশে তোলা হয় সেখানে মেক-আপের আতিশয্য দৃষ্টিকটু হতে বাধ্য। এদিকে ছবি বাবু মেক-আপের ব্যাপারে একেবারেই মঞ্চপন্থী। 'জলসাঘর'-এর শুটিং-এর গোড়ার দিকে এ-ব্যাপারে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সর্বস্বান্ত অকালবৃদ্ধ জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের 'ফ্ল্যাশ ব্যাকে' তাকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবাবস্থায় দেখানো হয়েছে। যেদিন প্রথম এই দৃশ্যের শুটিং হবে, সেদিন ছবি বাবু কর্মস্থলে হাজির হলেন একেবারে যাত্রার মেক-আপ নিয়ে। অথচ মেক-আপম্যান জানেন যে, আমি অতিরিক্ত রং মাখানো পছন্দ করি না, এবং মাঝবয়সী অভিনেতাকে জোয়ান বয়সে নামিয়ে আনতে যে সরাসরি চুনকামের প্রয়োজন হয় এও আমি

বিশ্বাস করি না। কাজেই আমার তো চক্ষুস্থির!

বললাম, 'ছবি বাবু। এ কি মেক-আপ!'

ছবি বাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'কেন? আপনি young make-up চাইছেন না?'

'তাই বলে গালে-ঠোঁটে এত রং? চোখে এত কাজল? ভ্রূ-তে এমন গাঢ় পেন্‌সিলের দাগ? এ যে যুবকের চেয়ে যুবতীকেই মানায় বেশি!'

ছবি বাবু ত্রুটি স্বীকার করলেন না। বললেন, 'ভোর বেলা মেক-আপ। আর ঘরে যথেষ্ট আলো নেই। তাই একটু চড়ে গেছে।'

আলোর বন্দোবস্ত হল। কিন্তু তাও রঙের মাত্রা কমল না। অনুসন্ধান ক'রে জানলাম, ছবি বাবু মেক-আপম্যানের হাত থেকে পেন্‌সিল কেড়ে নিয়ে ভ্রূ-অংকনের কাজটি নিজেই করেন। 'জলসাঘর' ছবির ক্লাশ ব্যাক দৃশ্যগুলির মেক-আপে এই ত্রুটি শেষ অবধি সংশোধন করা যায় নি।

'দেবী' ছবিতেও এক গোঁফ নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা গেছে। ভালো মেক-আপে গুম্ফ-রচনা রীতিমতো পরিশ্রমের কাজ, অনেক সময় প্রতিটি চুল আলাদা ক'রে লাগানোর প্রয়োজন হয়। ছবি বাবু সে পরিশ্রম পোষাতে নারাজ। তাই তাঁর জন্য একটি আলগা যাত্রা-মার্কা গোঁফ তৈরি ছিল। প্রতি শট্-এর আগে পিছনে এক পোঁছ আঠা লাগিয়ে খাবড়া দিয়ে সেটিকে নাক ও ঠোঁটের মধ্যিখানে আটকে নিতেন। উদ্বেগের কারণ সেখানেই। একদিন দেখি এক দীর্ঘ নাটকীয় শট্-এ কালিদাসের রঘুবংশ আবৃত্তি করতে করতে সে গোঁফ চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নিয়ে খুলি খুলি করছে।

এ ধরনের ঘটনা অবশ্যি একাধিকবার ঘটেছে। কিন্তু তাও ছবি বাবু তাঁর যাত্রা-মার্কা গোঁফ বর্জন করতে রাজি হন নি। বলতেন, 'আরে মশাই, আমার skin বড় delicate। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি সাঁটাসাঁটি করলে irritate করবে। তখন অভিনয়টা বেরুবে কোত্থেকে?' কথাটা সত্যি কিনা সেটা যাচাই করবার সুযোগও কোনোদিন পাওয়া যায় নি।

আগে থেকে সংলাপ মুখস্থ করার ব্যাপারেও ছবি বাবু নারাজ ছিলেন অবশ্যি তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তাই একবার শুনে বা পড়েই বড় বড় সংলাপ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু তাও তাঁকে মাঝে মাঝে ঠাট্টাচ্ছলে বলতাম, 'জানেন, বিদেশের বড় বড় actor-রা যখন কোনো বড় ভূমিকায় অভিনয় করেন, তখন তাঁরা দিনের পর দিন বাড়িতে বসে সেই ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করেন, সংলাপ মুখস্থ করেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই চরিত্রের বিশেষ ভঙ্গি ও mannerism-গুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। আর আপনি তো সংলাপের খাতাটি উল্টেও দেখেন না। এটা কি ঠিক, ছবি দা?' ছবি দা অতি সহজে আমার অভিযোগের উত্তরে একটি মৃদু হাসি

হেসে কৈফিয়তের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন।

কিন্তু মনে মনে যে তিনি এ-সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলেন সেটা বুঝেছিলাম দার্জিলিং-এ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শুটিং-এর সময়। ছবি বাবুর পার্টটি এবং চিত্রনাট্যের একটি কপি তাঁকে শুটিং-এর একমাস আগে কলকাতাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যেদিন দার্জিলিং-এ এসে পৌছালেন, সেদিন বললাম, 'শুটিং-এর আগে আপনাকে একবার পুরো ব্যাপারটা বলে দিতে চাই।'

ছবি বাবু ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'কেন, কোনো অদল-বদল হয়েছে নাকি?

'না। অদল-বদল হবে কেন? আপনার খাতায় যা আছে তাই আছে।'

'তবে আবার বোঝানো কেন? খাতায় যা আছে তা সব আমার মুখস্থ।'

কথাটি যে এক বর্ণ মিথ্যা নয় তার প্রমাণ তিন সপ্তাহব্যাপী শুটিং-এ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই পেয়েছি। চিত্রনাট্যের চারপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘতম যে ডায়ালগ, তাও শট্-এর আগে ছবি বাবুকে নতুন ক'রে মুখস্থ করতে হয় নি। তৈরিই ছিল। মেক-আপের কোনো প্রয়োজন এ ছবিতে ছিল না, কিন্তু থাকলেও আমার বিশ্বাস প্রকৃত চলচ্চিত্র মেক-আপের শ্রম স্বীকার করতে তিনি নারাজ হতেন না।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র সময় তাঁর যে কর্মস্পৃহা দেখেছি, তাতে এই মনে হয়েছিল যে, তিনি যেন অভিনয় সম্পর্কে একটা নতুন উৎসাহ নতুন উদ্দীপনা অনুভব করছেন। এই প্রৌঢ় বয়সেও যেন এক নবলব্ধ অগ্রগতির প্রয়াস তাঁকে অনুপ্রাণিত করছে।

বিশেষ ক'রে এই কারণেই তাঁর অকালমৃত্যুজনিত ক্ষতি আমার কাছে অপরিমেয়, অপূরণীয়।

প্রসঙ্গত

উপরের দু'টি লেখা সত্যজিৎ রায় লেখেন ছবি বিশ্বাসের শোচনীয় মৃত্যুর (১১ জুন ১৯৬২) অল্পদিনের মধ্যেই, যা সে-সময়ে দু'টি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরিচিতিবিহীন লেখা দু'টি এলোমেলো কাগজপত্রের মধ্যে পেয়ে যাওয়ায় জলসাঘর চিত্রনাট্য প্রকাশ উপলক্ষে এক্ষণে পুনঃপ্রকাশ করা গেল। কিন্তু কোথায় ও সঠিক কত তারিখে লেখা দু'টি প্রকাশিত হয়, তার হদিশ আপাতত আমাদের অজানা। জলসাঘর ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় স্মরণীয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সত্যজিৎ রায়ের সংক্ষিপ্ত দু'টি লেখাতেই ছবি বিশ্বাসের ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা-পরিচালক সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ মন্তব্য আছে, যা হারিয়ে যাওয়া উচিত নয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনুমতির জন্য কৃতজ্ঞতা সত্যজিৎ রায়। স. এ.।

উদীচী

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ-সংখ্যা

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'উদীচী' সাহিত্যপত্র তাঁর স্মরণ সংখ্যা রূপে পৌষ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতি, স্মৃতিকথা এবং কবিতা—সব মিলিয়ে পঞ্চাশটির অধিক রচনা সংকলিত হতে চলেছে। সংখ্যাটি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করছেন শ্রী উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও শ্রী অনাথনাথ দাস। মূল্য দশ টাকা।

লেখকসূচী

স্মৃতিকথা নিবন্ধ লীলা মজুমদার, অমিতা সেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার অধিকারী, ভূদেব চৌধুরী, গৌরী আইয়ুব, শোভনা মিত্র, সন্‌জীদা খাতুন, গোপাল ভৌমিক, বার্ণিক রায়, প্রভাস সেন, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, বুদ্ধদেব গুহ, বিশ্বজিৎ রায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

নিবেদিত কবিতা : অশোকবিজয় রাহা, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, নবকান্ত বরুয়া, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, রবীন আদক, বন্দনা সান্যাল, নীলিমা সান্যাল, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি।

-রচিত গ্রন্থের আলোচনা নৃপেন্দ্র সান্যাল, আনন্দ বাগচী, মনুজেশ মিত্র, কিন্নর রায়, অরুণকুমার বসু, প্রশান্তকুমার পাল, আদিত্য ওহদেদার, অশেষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ।

সম্পাদক : শ্রী কমলকুমার ঘোষ
আনন্দধারা / এন্‌ড্রুজ পল্লী
শান্তিনিকেতন। ৭৩১২৩৫

আধুনিক ইতিহাস-চর্চার উল্লেখযোগ্য সংযোজন

সুস্নাত দাশ-এর

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা

মুসোলিনী আর হিটলারের দানবিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ যে-সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ সহ বিশ্বের সর্বস্তরের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ সেই বিশাল প্রেক্ষাপটেই আলোচিত হয়েছে অবিভক্ত বাঙলা তথা ভারতের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থে লেখক এক দিকে যেমন তুলে ধরেছেন পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনি লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা এবং প্রগতি লেখক সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের অনুপুঙ্খ বিবরণ। দাম : ৫০·০০ টাকা।

প্রাইমা পাবলিকেশনস

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭

এক্ষণ

১৯৫৪ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : কলকাতা

২. প্রকাশের কালানুক্রম দ্বিমাসিক

৩. মুদ্রাকরের নাম : প্রবীর ঘোষ

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৪. প্রকাশকের নাম : প্রবীর ঘোষ

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৫. সম্পাদকের নাম নির্মাল্য আচার্য

জাতীয়তা : ভারতীয়

ঠিকানা : এক্ষণ

৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

৬. অধ্যধিকারী : নির্মাল্য আচার্য / ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ১. ৩. ১৯৮৯

(স্বাঃ) প্রবীর ঘোষ

। উনিশ শতকের দেশ-কাল-জীবনের অন্তরঙ্গ দেখা ।

আত্মকথা

৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হল

রামমোহন থেকে অবন ঠাকুর পর্যন্ত ১০০ মনীষীর আত্মকথা । প্রতিখণ্ড ৪৫·০০ ।

। ৯৫ বছর পর প্রকাশিত হল বৃটিশ আমলে বাজেয়াপ্ত উপন্যাস ।

প্রবোধচন্দ্র সরকারের

শালফুল

২০·০০

। তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার সংকলন ।

জানলা

তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য । ৪৫·০০

সম্পাদনা : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার অধিকারীর

বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি

২০·০০

। উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য নক্সার সংকলন ।

উনিশ শতকের বাংলা নক্সা

২০ ০০

সম্পাদনা : ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক

অনন্য প্রকাশন ৬৬ কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলকাতা ৭৩

সুবর্ণরেখার বই : উপন্যাস ও গল্প

কমলকুমার মজুমদার	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্তর্জলী যাত্রা	জলসাঘর ১০·০০
অভিজিৎ সেন	রাণু ভৌমিক
রহু চণ্ডালের হাড় ৩·০০	রমণী ও অন্যান্য ৩·০০
দেবর্ষি নারদ	সাধন চট্টোপাধ্যায়
রাজার জ্ঞানতৃষ্ণা	বেলা অবেলার কুশীলব

যন্ত্রস্থ

সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

প্রবীর ঘোষ কর্তৃক কে. ডি. প্রেস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত ।

॥ সুবর্ণরেখা-র বই ॥

সুনীলকুমার ধর
অন্ধকারের অধ্যায়
রক্তাক্ত আফ্রিকার ইতিহাস।
৫০·০০

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলার ভাস্কর্য
অসংখ্য সুমুদ্রিত আর্ট প্লেট-সহ।
৫০·০০

এ. এম. নায়ার
জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী
নেতাজী ও রাসবিহারী সম্পর্কে নতুন তথ্য।
৬০·০০

কপিভূষণ রায়
শরৎ-কণিকা
শরৎচন্দ্রের স্মরণীয় উক্তির সংকলন।
১৮·০০

অলোক মুখোপাধ্যায়
বিবর্তনের কথা
অত্যাধুনিক তথ্যে সমৃদ্ধ।
২৫·০০

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ : নৈঃশব্দের রূপ
১৬·০০

সজনীকান্ত দাস
রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য
৪০·০০

গার্গী দত্ত
মধুসূদনের রচনায় ভারতীয় উপাদান
৫০·০০

প্রসেনজিৎ সিংহ
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা কিছু চিন্তা
১৫·০০

★

আর একখানি মূল্যবান প্রকাশনা
রেণুকা দেবী চৌধুরানী
রকমারি নিরামিষ রান্না
বাঙালির লুপ্তপ্রায় ও প্রচলিত উভয় ধারার রান্নার পরিচয়।
৫০·০০

★

প্রকাশের অপেক্ষায়
কমলেন্দু ধর -প্রণীত
ভারতীয় রাজনীতির বিপণন

সুবর্ণরেখা ॥ ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ভাস্কর শিল্পী

রামকিঙ্করের

অসাধারণ সৃষ্টি রূপে পরিচিত

সাঁওতাল পরিবার

(ব্রোঞ্জ মেদ্মিকা)

বিধান নগর

বিদ্যুৎ ভবন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করে কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম বাংলায় সংস্কৃতি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

প্রকাশিত হয়েছে

শ্যামাপ্রসাদ বসু-প্রণীত

মহাবিদ্রোহ : বাংলা ও পাঞ্জাব

দাম ২০.০০ টাকা

গান্ধিজী ও কংগ্রেসের শতবর্ষ

দাম ৩০.০০ টাকা

নবজাতক প্রকাশন

এ ৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭

অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী

দাম ২৫.০০ টাকা

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

কলকাতার ৩০০ বর্ষপূর্তিতে
সুবর্ণরেখার বই

রাধারমণ মিত্র

কলিকাতা-দর্পণ

সাহিত্য অকাদেমি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সুধা বসু পুরস্কারে সম্মানিত। ৮৫.০০

বিনয়ভূষণ রায়

উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান-সাধনা

৪৫.০০

S. N. Mukherjee

CALCUTTA MYTHS & HISTORY

Rs 75.00

বিনোদিনী দাসী

আমার কথা ও অন্যান্য রচনা

অভিনেত্রীর আত্মকথা ও উনিশ শতকের কলকাতার রঙ্গমঞ্চের
অসামান্য আলেখ্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য ও
শংকর ভট্টাচার্য সম্পাদিত। বহু চিত্রে সমৃদ্ধ।
প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

৪০.০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭০ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

।সন ১৮৭৮।।
ঘর কয়েক ঘন্টা
কেটে যেত
গৃহবধূর
সযত্ন
কেশবিন্যাসে।

শতবর্ষ পেরিয়েও
ঘরে ঘরে জবাকুসুমের
কদর সমানই আছে।

জবাকুসুমের বিশুদ্ধ
প্রাকৃতিক উপাদান সব-
বয়সী চুলের সম্পূর্ণ
যত্ন নিতে সব ঋতুর
পক্ষে উপযোগী।
তাছাড়া সবচেয়ে বড়
কথা জবাকুসুম মাথা
ঠান্ডা রাখে, সুগন্ধেও
ভরিয়ে তোলে।

জবাকুসুম
কেশ তৈল

। সন ১১৮৯ ।

দিন কাটে
উর্ধ্বশ্বাস গতিতে।
তারই মাঝে
ব্যস্ত হাতে
চুলের যত্ন।

কাল বদলায়—বদলায় না রেশম কোমল চুলের কদর।

সি কে সেন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড, জবাকুসুম হাউস, কলকাতা ৭০০ ০১২

MCCES-4191A

EKSHAN Annual Number 1989 Rs. 24.00
Regn. No. 5308/61 Vol XVIII : No. 5-6

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Royson

- 5 OCT 1989

Regd. Office :

203 F, Maharshi Debendra Road, Calcutta 700 006
Phone : 38-7464, 38-4808

Sales Office :

ROYSON
ROY AGENCIES

34 Chittaranjan Avenue, Calcutta 700 012
Phone : 27-7546 Gram : SANDAL

Please Contact For :
SANDALWOOD OILS, AROMATIC CHEMICALS AND COMPOUNDS, LIQUID PARAFFIN, GLYCERINE, VEGETABLE OILS ETC.